ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য

সুকুমারী ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

ইতিহাসের আলোকে
বৈদিক সাহিত্য

সুকুমারী ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

ITIHASER AALOKE VAIDIK SAHITYA
(Vedic Literature in Historical Perspective)
Sukumari Bhattacharyya

প্রকাশকাল :
প্রথম মুদ্রণ : জানুয়ারি ১৯৬০/বি

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ
আর্য ম্যানসন (নবম তল)
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলকাতা ৭০০ ০১৩

বিপণন কেন্দ্র :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ বিপণন কেন্দ্র
১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
(সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের একতলা)
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ISBN : 81-247- 0356-6
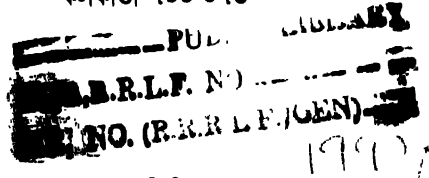
ডি. টি. পি.
প্রিন্টিং সেন্টার
১৮বি, ভুবন ধর লেন
কলকাতা ৭০০ ০১২

অফসেট প্রিন্টিং
টাইপোগ্রাফার্স অফ ইনডিয়া
৩৬এ, কে. জি. বোস সরণী
কলিকাতা ৭০০ ০৮৫

মূল্য : একশো চল্লিশ টাকা

ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক (শিক্ষা বিভাগ) নূতন দিল্লী কর্তৃক আঞ্চলিক ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের গ্রন্থ রচনা প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক শ্রী গুণেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত।

দ্বিতীয় মুদ্রণ উপলক্ষে প্রকাশকের নিবেদন

আর্থসামাজিক পরিবেশের নিরিখে বেদের বিচার, লিখিত রচনার তুলনায় কথ্য ও শ্রৌত রচনা হিসেবে প্রকৃতি ও উপাদানে বেদের স্বাতন্ত্র্য এবং সাহিত্য হিসেবে বেদের মূল্যায়ণ সম্বলিত এই জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থটির দ্বিতীয় মুদ্রণ সম্পন্ন হল।

লেখিকা অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টাচার্য রচিত এই বইটির দ্বিতীয় মুদ্রণজাত প্রকাশন পূর্বের মতই আদৃত হবে বলে আশা পোষণ করছি।

গুণেন্দ্রনাথ মজুমদার
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

আমার প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে

পূর্বভাষ

আমার Literature in the Voice Age প্রথম খণ্ড ১৯৮৪ ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৮৬ সালে কে. পি. বাগ্‌চি প্রকাশনা-সংস্থা থেকে বেরোয়। তার আগে থেকেই আমি অবহিত ছিলাম যে ইংরেজি বইটি বহু ছাত্রছাত্রীর কাছে দুরূহ হবে, শুধু ভাষার ব্যবধানেই নয়, কলেবর-মাহাত্ম্যেও বটে। মনে মনে সংকল্প ছিল, সংক্ষেপে এক খণ্ডে এর একটি বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করব। কিন্তু না ছিল সময়, না ছিল নিজের লেখা অনুবাদ করার উৎসাহ। এ কাজ সম্ভবই হত না, যদি না আমার স্নেহভাজন গবেষণার প্রাক্তন ছাত্র ডঃ তপোধীর ভট্টাচার্য ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী স্বপ্না ভট্টাচার্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এ দুরূহ ও গুরুভার কাজের ভার নিতেন। ওঁদের অনুবাদের কিছু অনুলিপি করেছিলেন আমার ছাত্রী শ্রীমতী সুদক্ষিণা ভট্টাচার্য এবং প্রাক্তন গবেষণার ছাত্র উপকারী-বন্ধু ডঃ শ্যামাপ্রসাদ দে সমস্তটা একবার দেখে দিয়েছেন। পরে আমিও বেশ কিছু পরিবর্তন, পরিবর্জন ও সংক্ষেপণের কাজ করেছি। তবু হয়ত ত্রুটি রইল কিছু, সে দায় আমারই। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ ছাপাবার দায়িত্ব নিয়ে অগ্রণী হন; তাঁরা এবং যাঁরা এ কাজে সহায়তা করেছেন তাঁরা সকলেই আমার কৃতজ্ঞতাভাজন। যাঁরা এ গ্রন্থে কিছু উপকৃত হবেন তাঁরাই এর সাফল্যের মাত্রা নির্ণয় করবেন।

সুকুমারী ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	১-১৮
প্রথম অধ্যায় ঃ ঋগ্বেদ সংহিতা	১৯-৮৬

ঋগ্বেদ ২০, রচনাকাল ২৫, ভাষ্যকার ২৭, সূক্তসমূহের প্রকৃতি ও কাঠামো ২৮, স্তোত্রগীতি সম্বন্ধে ঋষিকবিদের দৃষ্টিভঙ্গী ২৮, রচনা-প্রকরণ ৩০, সূক্তের শ্রেণীবিভাগ ৩১, সংবাদসূক্ত ৩৪, দানস্তুতি ৩৬, বালখিল্য ৩৬, খিলসূক্ত ৩৭, অন্যান্য সূক্তাবলী ৩৭, নিবিদ্ ৩৮, আপ্রী সূক্ত ৩৯, সোমমণ্ডল ৩৯, সর্বেশ্বরবাদ ৪১, একেশ্বরবাদ ৪২, উপাখ্যান ও প্রহেলিকা ৪৫, সূর্যাসূক্ত ৪৫, দ্যূতকরের অনুশোচনা ৪৬, যমসংহিতা ৪৬, মণ্ডূকসূক্ত ৪৭, রাত্রিসূক্ত ও অরণ্যানীসূক্ত ৪৭, ঋগ্বেদ ঃ লোকায়ত না ধর্মসাহিত্য? ৪৭, রচনারীতি ঃ ভাষা ৫০, স্বর ৫৪, মৌখিক সংহিতারূপে ঋগ্বেদ ৫৫, চিত্রকল্প ৬০, বর্ণনা ৬৪, ধর্ম ও দর্শন ৬৮, নীতিবোধ ৭০, প্রত্নকথা ৭০

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ সামবেদ সংহিতা	৮৭-১০২

ছন্দ ও ভাষা ৯৩, ধ্বনি ও স্বরগ্রাম ৯৪, সামবেদ ও সোমযোগ ৯৭, চন্দ্ররূপে সোম ১০১, সামবেদের উৎস ১০১

তৃতীয় অধ্যায় ঃ যজুর্বেদ সংহিতা	১০৩-১২৯

রচনাকাল ১০৬, বিষয়বস্তু ১০৭, অনুষ্ঠান চর্যা ১০৮, সমাজ ১১৪, আঙ্গিক ও ভাষা ১১৬, ইন্দ্রজাল ১১৯

চতুর্থ অধ্যায় ঃ অথর্ববেদ সংহিতা	১৩০-১৬৫

পাঠভেদ ১৩০, মূলপাঠ ১৩০, রচয়িতা ১৩১ বিষয়বস্তু ১৩৪, বৈদিক ঐতিহ্যে অথর্ববেদের অস্বীকৃতি ১৩৬, রচনাকাল ১৪৬, সূক্তসমূহের শ্রেণীবিন্যাস ১৪৬, সমাজ ১৪৮, দেবসঙ্ঘ ১৫০,

দর্শন ১৫১, ব্রাত্যসূক্ত ১৫৩, মৃগার ও কুন্তাপসূক্ত ১৫৫, ধর্মবিশ্বাস ১৫৭, ইন্দ্রজাল বা জাদু ১৫৮, আঙ্গিক ও ভাষা ১৫৯, কাব্যগুণ ১৬২

পঞ্চম অধ্যায় ঃ ব্রাহ্মণ ১৬৬-২২৮

পাঠভেদ ১৬৮, গৌণ রচনা ১৮২, আঙ্গিক ও ভাষা ১৮৩, দেবকাহিনী ১৮৭, ইন্দ্রজাল বা জাদু ১৯৪, দেবসঙ্ঘ ১৯৬, সমাজ ১৯৭, ইতিহাস ২০৪, রাজ-পদবী ২০৯, অর্থনীতি ২১১, পরিবার ২১৩, নারী ২১৪, জাতিভেদ ২১৫, সামাজিক আচার ২২১, দেবতা ও অসুর ২২২, নীতিবোধ ২২৬

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ আরণ্যক ২২৯-২৪২

বিষয়বস্তু ২৩০, আঙ্গিক ২৩২, সমাজচিত্র ২৩৪, দেবসঙ্ঘ ২৩৭, জ্ঞান ও জ্ঞানতত্ত্ব ২৩৮

সপ্তম অধ্যায় ঃ উপনিষদ্ ২৪৩-২৯২

বিষয়বস্তু ২৪৪, রচয়িতা ২৪৮, আঙ্গিক ও ভাষা ২৪৯, শিক্ষাব্যবস্থা ২৫২, আর্থনীতিক জীবন ২৫৩, পারিবারিক চিত্র ২৫৪, নীতিবোধ ২৫৫, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ২৫৬, দেবসঙ্ঘ ২৭০, যজ্ঞানুষ্ঠানের নবতর ব্যাখ্যা ২৭২, অতীন্দ্রিয়বাদী ও অধ্যাত্মবাদী প্রবণতা ২৭৫, নতুন উপাসনা পদ্ধতি ঃ প্রশ্ন ও সংশয় ২৮৩, পুনর্জন্ম ও মুক্তি ২৮৫, কাব্য ২৯০

অষ্টম অধ্যায় ঃ বেদাঙ্গসূত্র ২৯৩-৩৫৬

রচনাকাল ২৯৩, আঙ্গিক ও ভাষা ২৯৭, শিক্ষা ২৯৮, ব্যাকরণ ৩০৪, নিরুক্ত ৩০৭, জ্যোতিষ ৩০৯, বিবিধ সূত্র ৩১০, কল্পসূত্র ৩১১, সহায়ক সূত্র ৩১৮, গৃহ্যসূত্র ৩২০, রচনা পরিচয় ৩২১, রচনাকাল ৩২২, বিষয়বস্তু ৩২২, গৃহ্যসূত্রের উৎস ৩৩২, ধর্ম ৩৩৫, সমাজ ৩৩৫, ধর্মসূত্র ৩৩৯, রচনা ৩৪৯, রচনাকাল ৩৪১, আঙ্গিক ও ভাষা ৩৪২, বিষয়বস্তু ৩৪২, শুল্বসূত্র ৩৪৭, কল্পসূত্রে প্রতিফলিত জীবন ও সমাজ ৩৪৯।

ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য

মুখবন্ধ

বৈদিক সাহিত্যে অবস্থান শুধুমাত্র ভারতীয় সাহিত্যেরই সূচনা পর্বই জাগতিক নয়, ইন্দো-ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর প্রথম পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় ও সাহিত্যিক কীর্তিরূপেও তার পরিচিতি। ইদানীং শুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব, সমাজবিদ্যা, তুলনামূলক ধর্ম ও লোক পুরাণ, ভাষাতত্ত্ব এবং দর্শনশাস্ত্রের মত সহযোগী বিষয়ে নিরন্তর গবেষণার ফলে বৈদিক সাহিত্যের আলোচনাও সমৃদ্ধতর হয়ে উঠছে। বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণায় উদ্ভূত সিদ্ধান্তকে সমন্বিত ক'রেই আমরা বৈদিক জনসাধারণের জীবন, চিন্তাধারা, নীতিবোধ ও বিশ্বাসের সম্যক পরিচয় পেতে পারি। বৈদিক সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে অনেক অভ্যন্তরীণ ও বাইরের বিঘ্ন রয়েছে। তৎকালীন জীবনযাত্রা বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য এখনও খুবই বিরল ; ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব থেকে বৈদিক মানুষের দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধে উপাদান যা আমরা যৎসামান্য পেয়েছি, তাও আবার প্রায়ই রক্ষণশীল ও উগ্রজাতীয়তাবাদী মানসিকতায়, চিরাভ্যস্ত অনড় কুসংস্কারে কিংবা বিপরীতমুখী তাচ্ছিল্য ও অবহেলায় আবিল হয়ে উঠেছে। সাহিত্য হিসাবে বৈদিক সাহিত্যকে প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া হয় নি, কেবলমাত্র ধর্মীয় রচনা রূপেই অধিকাংশ সময় তাকে গ্রহণ করা হয়েছে। বহুশতাব্দীর বৈদেশিক শাসনের ফলে ভারতীয়দের মনে জাতীয় অসম্মানের ক্ষতিপূরণের প্রবণতা থেকে একধরনের মিথ্যা উন্নাসিকতার উদ্ভব হয় , বৈদিক সাহিত্যচর্চায় তার অনিবার্য প্রভাবও দেখা যায়। অন্যদিকে পরাধীন জীবনের অনগ্রসরতা ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির অভাবের ক্ষতিপূরণের জন্যে আধুনিকীকরণ ও প্রগতির বিপরীত মেরুতে বৈদিক সাহিত্যের কল্পিত গৌরবকে উপস্থাপিত করা হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বৈদিক সাহিত্যের আলোচনা তখনই নূতন ক'রে আমাদের দেশে শুরু হ'ল যখন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। তখনকার বৈষয়িক জীবনের হীনতা ও অভাববোধকে চাপা দেওয়ার জন্য দেশপ্রেমিক চিন্তানায়কেরা বৈদিক সাহিত্যের তথাকথিত তুরীয় আধ্যাত্মিকতার মধ্যে আশ্রয় নিলেন। আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের মধ্যে যা কিছু যথার্থ গৌরবের দিক ছিল, তার স্বাস্থ্যকর আলোচনার সম্ভাবনা এতে বিশেষভাবে ব্যাহত হ'ল। পরিবর্তে দেখা গেল রুগ্ণ এক গর্ববোধ, অর্থহীন উন্নাসিক আত্মসন্তুষ্টি, দৃষ্টিভঙ্গির চূড়ান্ত বিভ্রান্তি এবং গবেষণার নামে অবৈজ্ঞানিক কাল্পনিকতার প্রসার। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে এই প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হল ; আমাদের অন্তঃসারশূন্য

গর্ববোধ ও আত্মতৃপ্তির মোহাচ্ছন্ন উন্মাদনা বৈদিক সাহিত্যের গবেষণাকে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে দিল না।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নৃতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, ভাষাতাত্ত্বিক, ব্যাকরণবিদ, কোষবিশারদ, লোকপুরাণবিশেষজ্ঞ, দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ববিদ প্রমুখ গবেষকরা বৈদিক সাহিত্যের বিচিত্র দিকের উপর আলোকসম্পাত করার ফলেই আমরা আজ বিষয়টিকে সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করতে পারছি। উনিশ শতকের বিদ্যাচর্চার সাধারণ পরিবেশে ওতপ্রোতভাবে যে রোম্যান্টিকতা ছিল, তার প্রভাবও বৈদিক সাহিত্য আলোচনায় দেখা গেছে। তবে এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই বৈদিক সাহিত্য রচনায় নতুন এক পরিণত ধারার সূত্রপাত হয়েছে বলা যায়। বৈদিক সাহিত্যের সাম্প্রতিক আলোচনায় চিরাগত কুসংস্কার, পূর্বনির্ধারিত ধারণা কিংবা চেতন বা অবচেতন স্বার্থান্বেষার ভূমিকা তুলনামূলকভাবে কম হওয়াতে অকারণ নিন্দা বা অহেতুক প্রশংসা বিশেষ দেখা যায় না। প্রাচীন গ্রিক সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রেও একধরনের পূর্বনির্দিষ্ট সংস্কার ছিল ; কিন্তু গ্রিস যেখানে সাধারণভাবে স্বাধীন, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তা না হওয়াতে প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে মোহবিস্তারের মানসিক প্রয়োজন একসময়ে যেন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। ঐতিহাসিক উপাদান সামান্য হলেও যতটুকু আমরা পেয়েছি, তাকে উপেক্ষা করার ফলে বৈদিক সাহিত্যের আলোচনা একদেশদর্শিতায় আক্রান্ত। এমন একটা ভুল ধারণা এখনও ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে যে বৈদিক সাহিত্যের কোন বস্তুগত উৎস নেই, শূন্যের মধ্যেই তার সৃষ্টি। অবশ্য সাম্প্রতিক গবেষণার নিরাবেগ ও নির্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি উত্তরোত্তর শক্তিশালী হয়ে ওঠায় বৈদিক সাহিত্য আ্যালোচনার ক্ষেত্রেও আমরা এই সত্য ক্রমেই মেনে নিচ্ছি যে নৈতিক মূল্যবোধ ধর্মীয় বিশ্বাস ও দার্শনিক চিন্তাধারা প্রকৃতপক্ষে উৎপাদন-পদ্ধতির বিশেষস্তরে বৈদিক জনগোষ্ঠীর বিশেষ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থানের পরিচয় বহন করছে। তাই আমরা এখন বৈদিক সাহিত্যকে শুধু ধর্মীয় রচনা হিসাবে না দেখে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যরূপেও গ্রহণ করতে পারছি। জনসাধারণের মধ্য থেকে তাদেরই নিগূঢ় অনুপ্রেরণার তাগিদে এই সাহিত্যের জন্ম বলেই জনসাধারণের বৈষয়িক জীবনযাত্রার বিধি দিয়েই তা মূলত নিয়ন্ত্রিত।

ইন্দো-ইয়োরোপীয় জনগোষ্ঠীর যে শাখা শেষ পর্যন্ত ভারতে পৌঁছেছিল, ইরানের মধ্য দিয়েই তারা এদেশে আসে। সম্ভবত, সেই সময় তারা কাসাইট্দের প্রতিবেশী রূপে কিছুকাল কাটিয়েছিল—এই কাসাইট্ শাখা বস্তুত ইন্দো-ইয়োরোপীয়দের সেই গোষ্ঠী যারা মূল জনস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে খ্রিস্টপূর্ব ষোড়শ শতকের কাছাকাছি সময়ে ইরানে বসতি স্থাপন করে। গবেষকরা আরও বলেন যে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল ইরান থেকে ভারতবর্ষে নূতন বসতির

সন্ধানে প্রবেশ করেছিল। অনুমান করা যায়, ১৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ ইরানীদের সঙ্গে প্রত্ন-ভারতীয় আর্যজনগোষ্ঠীর তুমুল মতান্তর ও বিচ্ছেদ ঘটে এবং দক্ষিণ-পূর্বদিকে ভ্রমণ করতে করতে এরা একসময় ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়। এই গোষ্ঠীর আগমনের কিছুকাল পূর্বে, সম্ভবত ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি, অন্য একদল ইন্দো-ইয়োরোপীয় গোষ্ঠী খাইবার গিরিপথ দিয়ে কাবুল উপত্যকায় এবং অন্য আরেকটি দল আরও কিছুকাল পরে হিন্দুকুশ পর্বত দিয়ে বাল্‌খ্‌ এলাকায় উপস্থিত হয়। পণ্ডিতরা মনে করেন যে, এই সব জনগোষ্ঠীর মধ্যে শেষোক্তেরা পরবর্তীকালে বৈদিক আর্য হিসাবে পরিচিত হয়েছিল, কিন্তু প্রথমোক্তরা পূর্বেই ইরান থেকে অল্প সংখ্যায় ভারতবর্ষে এসে শান্তিপূর্ণভাবে প্রাগার্যদের মধ্যে মিশে গিয়ে আর্যাবর্তে বসতি স্থাপন করেছিল।

সেই সময় উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে সিন্ধু সভ্যতার স্ফূরণ ঘটেছিল, তা ছিল ব্রোঞ্জ যুগের নাগরিক সংস্কৃতি, এবং নৌবাণিজ্যের মধ্য দিয়ে মিশর ও সুমেরের সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সেই সব অঞ্চলের জনসাধারণ পশুপালন ও মৃগয়ার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত ; ধাতুবিদ্যা ও বয়নশিল্প যেমন তাদের জানা ছিল, তেমনি অলংকারের প্রয়োজনে বিচিত্র ও বহুমূল্য পাথর খোদাই-এর কাজও তারা আয়ত্ত করেছিল। তুলা চাষ ক'রে সুমেরীয়দের কাছে বিক্রি করত, এমন প্রমাণও পাওয়া গেছে।

ভারতবর্ষে উপনীত হওয়ার বহু পূর্বে বৈদিক আর্যরা তাদের মূল ইন্দো-ইয়োরোপীয় পিতৃভূমি পরিত্যাগ করে দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়ে এবং যাত্রাপথের বহু স্থানেই তারা দীর্ঘকাল অতিবাহিত করে। তাই মধ্য প্রাচ্যে প্রত্ন-ভারতীয় আর্য ভাষার কিছু কিছু শব্দের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে ; আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব বিংশ শতাব্দীতে মিতান্নি রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে যে নুজি শিলালেখটি পাওয়া গেছে, তাতে ঘোড়ার বিভিন্ন রং নির্দেশ করতে নিম্নোক্ত শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। —বব্রু (সংস্কৃত-'বভ্রু'), পরিত (সং-'পলিত') ও পিঙ্কব (সং-'পিঙ্গল')। তাছাড়া, খ্রিস্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দীর কাসাইট্‌ জাতির নথিপত্রে কয়েকজন ভারতীয় দেবতার নাম পাওয়া যায় (সুরিঅস্‌, মরুত্তস্‌, এবং বুগস্‌—সংস্কৃতে সূর্য, মরুতঃ ও ভগ), পঞ্চদশ শতাব্দীর তেল্‌-এল্‌-মিতান্নি শিলালেখে কিছু প্রত্ন-ভারতীয় আর্য নাম (অর্ততম, মুত্তর্ন এবং দশরত্ত), বৈদিক দেবনাম (ইন্দর ও মিত্ত্বর, উরুবন, নসেত্ত) এবং বন্য অশ্বের বশীকরণ সংক্রান্ত কিছু শব্দ পাওয়া গেছে। এছাড়া প্রত্ন-ভারতীয় আর্য সংখ্যাবাচক শব্দেরও সন্ধান পাচ্ছি, যেমন—ঐক্য, তের, পঞ্জ, সত্ত এবং নব। খ্রিস্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে সম্রাট সলোমন ভারতবর্ষ থেকে চন্দনকাঠ পেতেন ; লক্ষণীয় যে হিব্রু ভাষায় ময়ূর, বানর, গজদন্ত, তুলা এবং চন্দনবাচক শব্দগুলি সমার্থক

ভাবতীয় শব্দ থেকেই গৃহীত হযেছে। ভাবতবর্ষের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যেব যে দীর্ঘকালব্যাপী বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল তা খ্রিস্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে তৃতীয় সলোমানে রাজত্বকালীন নথিপত্র থেকেও প্রমাণ কবা যায়। এতে দেখছি, ভাবতবর্ষ থেকে বানর ও হাতি আমদানি করা হ'ত। অষ্টম শতাব্দীতে তৃতীয় টিগ্‌লেথ্‌-পিলেসেব্‌ ভারতবর্ষ থেকে দামি পাথর পাচ্ছেন এবং সপ্তম শতাব্দীতে অসুর .... একটি দলিলে 'সিন্ধু' শব্দটি পাওয়া গেছে। বভেরু জাতকে রয়েছে, ভারতীয় বাণিজ্যপোতগুলি ময়ূর নিয়ে ব্যাবিলনের দিকে যাচ্ছে। সুমেরুয়দের জ্যোতির্বিদ্যা এবং ব্যাবিলনের পরিমাপরীতি ভারতবর্ষকে প্রভাবিত করেছিল। গ্রিসের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাথমিক বাণিজ্য সম্পর্ক মিশরের মধ্য দিয়ে এবং ফিনিশীয় ও পারসিক বণিকদের মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল। কোন কোন গবেষক বলেছেন যে ভারতীয় উপকূলে হরপ্পার বন্দরগুলি থেকে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় এবং দ্বিতীয় সহস্রাব্দে বাহ্‌রেইন, সুমেরু এবং উত্তর সিরিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে অবশ্য গ্রিসের সঙ্গে ভারতবর্ষের সরাসবি বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। সুতরাং আমরা লক্ষ্য করছি, সিন্ধু সভ্যতার সময় থেকে উপনিষদের কাল পর্যন্ত ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগ প্রায় নিরবচ্ছিন্ন ছিল, কেবলমাত্র বৈদিক আর্যদের আগমনের পরে কয়েক শতাব্দীব জন্য বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

ব্যবহারিক সংস্কৃতির দিক দিয়ে সিন্ধু উপত্যকাব অধিবাসীবা নবাগত আর্যদেব চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সংগ্রামে জয়লাভ করে আর্যরা যখন এই সংস্কৃতিব বাতাবরণে বসতি স্থাপন করলেন, তখন দৈনন্দিন সান্নিধ্য ও পারস্পবিক বিবাহসূত্রে আদিম লোকজীবনের অনেক উপাদানই তাঁরা আত্মস্থ করে নিলেন। তাই মৃৎকুটীরবাসী আর্যরা যদিও কয়েক শতাব্দীর জন্য নিজেদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে কোন পুরাতাত্ত্বিক অবশেষ রেখে যান নি ; কিছুকাল পরেই কিন্তু গৃহ ও মৃৎপাত্র নির্মাণে তাঁরা যে প্রাথমিক প্রয়াস শুরু করেছিলেন তার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু উপাদানগত বিচারে শ্রেষ্ঠতর সংস্কৃতির প্রভাব যাযাবর ও পশুপালক আর্যদের উপব কীভাবে সর্বাত্মক হ'য়ে উঠেছিল তার কোন নিদর্শন কোথাও পাওয়া যায় না। আবার সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা যদিও আর্যদের মতো নিবক্ষর ছিলেন না, তবু তাঁদের ধর্মীয় বা সাধারণ জীবনবোধ সংক্রান্ত কোন সাহিত্যকর্মের অবশেষ আজও আবিষ্কাব করা যায়নি।

ঋগ্বেদ সংহিতার পর্যায়ে আর্য সংস্কৃতির উপর প্রাগার্য প্রভাব সম্পর্কে আমাদেব ধারণা সম্পূর্ণই অনুমান-নির্ভর। তবে বৈদিক যুগেব শেষ পর্বে আমবা কিছু কিছু স্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। অনার্য উপাদান নির্ণয়ের অন্যতম পদ্ধতি হ'ল অন্যান্য ইন্দো-ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে প্রতিতুলনা ক'বে সাধাবণ ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্যগুলি ...

চিহ্নিত করা। যদিও এই পদ্ধতিতে প্রচুর ত্রুটি রয়েছে এবং এর ফলাফলও সবসময় সন্তোষজনক নয়, তবুও ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবের ফলে বৈদিক সংস্কৃতি সম্পর্কে নিরাবেগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে এই পদ্ধতিটি অপরিহার্য। বৈদিক সাহিত্যের শেষ পর্যায়ে আমরা একটি জটিল ও মিশ্র সংস্কৃতির সম্মুখীন হই— আর্য ও প্রাগার্য উপাদানের সংশ্লেষণ একটি বিশেষ প্রবণতারূপে স্বীকৃতি লাভ করে, যদিও স্বভাবতই বিজয়ীর ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক বিশ্ববীক্ষা বিজিতের উপর আগ্রাসী প্রভাব বিস্তার করে।

প্রাচীন পারসিকদের সঙ্গে আর্যদের বিচ্ছেদ ঘটে যাওয়ার পরে তারা প্রথমোক্তদের নামের সঙ্গে বিদ্বেষসূচক বিশ্লেষণ 'দহাএ', বা 'দখু' যুক্ত করে, ভারতবর্ষে বসতি স্থাপন করার সময় আদিম অধিবাসীদের ক্ষেত্রেও এই শব্দজাত 'দস্যু' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। বৈদিক সাহিত্য অবশ্য 'দস্যু'র প্রতিশব্দরূপে 'অসুর'ও ব্যবহৃত হয়েছে। এর সঙ্গে লোকপুরাণ-নির্দেশিত সেই পদ্ধতি তুলনীয় যার সাহায্যে গ্রিকজাতিও গ্রিসের প্রাক্‌হেলেনীয় যুগের জনগোষ্ঠীকে বর্ণনা করত। বিজয়ীর প্রত্নকথার টাইটানদের নির্বাসিত করা হয়েছে পৃথিবীর শেষপ্রান্তে শীতল ও অস্পষ্ট দূরত্বে, আর তাদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে প্রেম, প্রীতি ও বিদ্বেষের বিচিত্র মিশ্র মনোভাবের আততি।

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান মূলত পুরাতত্ত্ব-নির্ভর ; সেখানে আমরা এমন কিছু উপাদানের সন্ধান পাই যা পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতিতে রূপান্তরিত অবস্থায় স্থান লাভ করে। লোথালে যে তিন ধরনের বেদী আবিষ্কৃত হয়েছে (অর্ধচন্দ্র, গোল ও আয়তক্ষেত্রের আকৃতিবিশিষ্ট) তা বৈদিক যজ্ঞের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেদীর কথাই মনে করিয়ে দেয় ; এছাড়া প্রত্নপশুপতি মূর্তি, মাতৃকামূর্তি, ধ্যানমগ্ন ভঙ্গী মূর্তির আনুষ্ঠানিক অবগাহনের প্রমাণ এবং সাধারণভাবে পুরোহিত-তান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ইঙ্গিত নিঃসংশয়ভাবে পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য-তন্ত্রের উপর ব্যাপক প্রভাবের পরিসর পরিস্ফুট করে। প্রাগার্য চিন্তাধারা এবং যদিও প্রায় সম্পূর্ণতই আমাদের কাছে অপরিচিত তবু অনুমান করতে বাধা নেই যে বৈদিক সাহিত্যের শেষ পর্যায়ে বিশ্ববীক্ষায় যতটুকু পরিবর্তন এসেছে তার পশ্চাতে সিন্ধুসভ্যতার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ভূমিকা মোটেই গৌণ নয়। এটা ঠিকই যে সেই যুগের কোন লিখিত বা মৌখিক সাহিত্যের নিদর্শন আমাদের জানা নেই, কিন্তু তা থেকে নিশ্চয়ই আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি না যে সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের কোন নিজস্ব সঙ্গীত, গীতিকা কিংবা ধর্মীয় ও লোকজীবনের গাথা ছিল না। সাহিত্য যেখানে বিজয়ীর সঞ্চয়ের মধ্যেই রক্ষিত হয় সেখানে বিজিতের সৃষ্টি কোনো সরাসরি স্বীকৃতি পায় না। শুধুমাত্র পরবর্তী সাহিত্যে রূপান্তরিত অন্তর্বস্তুর মধ্যেই আজ প্রাগবৈদিক সাহিত্যের অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব।

ভারতীয় সাহিত্যধারার আদিমতম নিদর্শন ঋগ্বেদ, দশটি মণ্ডলে বিভক্ত সহস্রাধিক মন্ত্রের সংকলন। দ্বিতীয় থেকে সপ্তম মণ্ডল এই গ্রন্থের প্রাচীনতম অংশ। এদের 'পারিবারিক মণ্ডল' বলা হয়ে থাকে কেননা ছয়টি কবি পরিবারের বিভিন্ন সদস্য এই ক'টি মণ্ডলের অন্তর্গত মন্ত্রগুলি রচনা করেছিলেন। অষ্টম মণ্ডল রচিত হয় এই অংশের কিছুকাল পরে। এই আটটি মণ্ডলের মধ্য থেকে সোমদেবের উদ্দেশ্যে রচিত মন্ত্রগুলি একত্র সংকলিত ক'রে একটি পৃথক মণ্ডল প্রস্তুত করা হয়। এই নবম মণ্ডলের অন্তর্গত মন্ত্রগুলি সোমযোগে আবৃত্তি করা হত। এর অল্প কিছুকাল পরে প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় অংশ রচিত হয়েছিল। এই মণ্ডলের প্রথম অংশ রচিত হয় সবচেয়ে অর্বাচীন দশম মণ্ডলের সমসাময়িক কালে। পারিবারিক মণ্ডলগুলিতে বহু সংখ্যক অভিন্ন বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি দেখা যায় কিন্তু অষ্টম মণ্ডলে কিছু কিছু নূতন বিষয়বস্তুর আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। নবম মণ্ডল সোমদেবের উদ্দেশে নিবেদিত মন্ত্রসমূহের কৃত্রিম একটি সংকলন, ফলে এই মণ্ডলের সূক্তগুলি বিভিন্ন সময়ের রচনা এবং সেগুলিতে কোন নূতনত্ব আশা করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে প্রথম মণ্ডলের প্রথম অংশে এবং দশম মণ্ডলে নূতন কিছু বিশ্বাস ও ধারণা, বিষয়বস্তু এবং দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় ; নূতন সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চেতনা এই প্রথমবার আত্মপ্রকাশ করে। আমরা তাই যুক্তিগ্রাহ্যভাবেই অনুমান করতে পারি যে পরস্পর ভিন্ন দুটি জনগোষ্ঠীর সামীপ্য ও সমন্বয়ের ফলেই এই নূতনত্বের উদ্ভাসন দেখা গিয়েছিল। প্রথম মণ্ডলের প্রথম অংশ এবং দশম মণ্ডল সম্ভবত তথাকথিত মহাভারতের যুদ্ধের সমসাময়িক, অর্থাৎ আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব নবম শতকের রচনা।

সংহিতা রচনার শেষদিকে সমগ্র উত্তর ভারতে সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনে গুরুতর পরিবর্তন ঘটছিল। আর্যরা কৃষিকাজে লাঙলে লোহার ফলা বা কাঠের লাঙলের ব্যবহার শিখে নিয়েছিল, ধীরে ধীরে অরণ্যভূমি বাসযোগ্য ও কৃষিযোগ্য করে তুলছিল এবং ক্রমে পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে নূতন বসতি স্থাপন করছিল। ক্রমাগত অপরিচিত ও অনধিগত অঞ্চলে আধিপত্য ও বসতি বিস্তার, প্রাথমিক সম্পদ সঞ্চয়ের ফলস্বরূপ শ্রেণীবিন্যাসেব সূচনা, কয়েক শতাব্দীর বিরতির পর মধ্য-প্রাচ্যের সঙ্গে নূতনভাবে নৌবাণিজ্যের সূত্রপাত ইত্যাদি ধীরে ধীরে সামাজিক জীবনের বিন্যাসকেও আমূল পরিবর্তিত ক'রে দিল। কৌম সমাজ ভেঙে গিয়ে গোষ্ঠীগুলি পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক ব্যবস্থায় বহুধা বিভক্ত হয়ে গেল, ফলে এই সমস্ত 'কুল' বা পরিবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী সংস্থায় পরিণত হ'য়ে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী শ্রমশক্তির ব্যবস্থাপক হ'য়ে উঠল। খাদ্যোৎপাদনের প্রকৃতি পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কগুলিও পুনর্বিন্যস্ত হল। পশুপালনের পরিবর্তে মুখ্য জীবিকা নির্বাহের

উপায়রূপে দেখা দিল কৃষিকর্ম। এই মৌলিক পরিবর্তন সাহিত্যেও প্রতিফলিত হল। কেননা যজ্ঞে পশু-মাংসের আহুতির সঙ্গে কৃষিজাত শস্যের হব্য যুক্ত হল, কখনো বা তার পরিবর্তে দেখা গেল উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের অর্ঘ্য এবং সেই সঙ্গে দেখা দিল জীবমাত্রের প্রতি করুণার্দ্র মনোভাব ; যজ্ঞে হন্তব্য পশুর প্রতি সম্বোধিত মন্ত্রে এই অপরাধবোধেরই প্রকাশ। কৌম সমাজ যখন ভেঙে গেল নূতন সামাজিক মূল্যবোধের উন্মেষে পারিবারিক সম্পর্কও পরিবর্তিত হল, প্রভুভৃত্যের সম্পর্ক এবং নারীর গৌরবহানিতে নূতন এক বাস্তব সামাজিক বোধের প্রমাণ পাওয়া গেল।

সংহিতা সাহিত্যকে আমরা মুখ্যত দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তুতি ও প্রার্থনারূপে চিহ্নিত করতে পারি। বৈদিক দেবগোষ্ঠীর প্রাচীনতর অংশ প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক শক্তির কল্পনাসমৃদ্ধ প্রকাশরূপে আমাদের সম্ভ্রম ও বিস্ময় উদ্রেক করে। নিসর্গের মানবায়িত অভিব্যক্তি চমৎকার কাব্যগুণমণ্ডিত হয়ে দেবতাদের আকৃতি, পরিচ্ছদ, অলৌকিক কার্যকলাপ এবং ওজস্বিতার বর্ণনায় প্রতিফলিত। অবশ্য সাধারণভাবে এইসব রচনায় পরিশীলন, কল্পনা বা প্রতিভার ভূমিকা গৌণ। আর্যদের বসতি স্থাপনের পরেও বেশ কয়েক শতাব্দী ধ'রে যে সংহিতা শাখার নিরবচ্ছিন্ন রচনা চলছিল, তাতে বিচিত্র বিষয়বস্তুর প্রকাশ দেখি। এতে আছে স্তোত্র, যুদ্ধগীতি, প্রত্নকথা, গীতিকা, মাদক সেবনের সংগীত, অপরাধীর প্রায়শ্চিত্ত গাথা, কামগীতি, বিবাহসংগীত, নূতন ধর্মচর্চার ইঙ্গিত, দাতার প্রশংসা বা দানস্তুতি, নাট্যসংলাপময় মন্ত্র বা সংবাদসূক্ত, ভক্তিগীতি, দার্শনিক ভাষ্য, সৃষ্টিতত্ত্বমূলক মন্ত্র, সংশয় ও অন্বেষাজ্ঞাপক মন্ত্র ইত্যাদি। সংহিতা রচনার একটা বাধা ছিল এই যে তার বহু বিচিত্র বিষয়বস্তুর জন্য এটাই একমাত্র প্রকাশ মাধ্যম ছিল, যদিও এর ছন্দোবৈচিত্র্য ও আঙ্গিকের দ্বারা এ রচনা অনেকটা মনোজ্ঞ হয়ে উঠতে পেরেছে। তবে কিছু চিত্রকল্পের আশ্চর্য সজীবতা ও সৌন্দর্য সূক্তগুলির কাব্যগৌরব বৃদ্ধি করছে। মহাভারতের যুদ্ধ বা খ্রিস্টপূর্ব নবম শতকে আর্যাবর্তের জাতীয় জীবনের কোনো ঘটনা সম্ভবত সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গি এবং বিষয়বস্তুতে যুগান্তর এনে দিয়েছিল, সংহিতাধর্মী রচনা এরপর আর দেখা গেল না। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম অংশ এবং দশম মণ্ডল শুধুমাত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মন্ত্রগুলিকে একত্র ক'রে, তখনো পর্যন্ত সংকলিত ধর্মগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট ক'রে সেগুলির সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল। সামবেদে কোন নূতন মন্ত্র নেই, কেবল যজুর্বেদে কিছু কিছু নূতন যজ্ঞানুষ্ঠানবিষয়ক মন্ত্র পাওয়া যায়। এদের মধ্যে রয়েছে প্রাগার্য বিষয় সংবলিত শতরুদ্রিয়র মতো মন্ত্রসমষ্টি। অথর্ববেদে বহু ঋগ্বেদীয় মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি হয়েছে, আবার এতে এমন কিছু ঐন্দ্রজালিক সম্মোহন মন্ত্র রয়েছে সুদূর অতীতে যাদের উৎস, এছাড়াও আছে প্রাগার্য সমাজসংস্থান ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও তদ্দ্বারা প্রভাবিত দার্শনিক ও সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত বেশ কিছু মন্ত্র।

সংহিতা সাহিত্যের প্রাচীনতর অংশ যেমন গ্রামীণ সংস্কৃতির ফসল, তেমনি বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে দেখি নাগরিক সংস্কৃতির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ প্রতিফলিত হয়েছে। তবে সন্দেহ নেই যে, এই দুই স্তরের মধ্যে বহু শতাব্দীর ব্যবধান। নূতন উৎপাদনপদ্ধতির ফলস্বরূপ নাগরিক সংস্কৃতির অভ্যুদয় ঘটতে অন্তত পাঁচশ' বছর লেগেছিল ; এই রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় প্রাচীন সমাজের অনেক বৈশিষ্ট্যই কালের গর্ভে বিলীন হ'য়ে গেল। আর্য-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে যেসব মৌলিক পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে সামাজিক মূল্যবোধ ও বিশ্ববীক্ষায় চরিত্রগত রূপান্তর ঘটে যায়, যার ফলে নূতন সংহিতা-সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল, তাদের মধ্যে রয়েছে— লোহার লাঙলের ফলা আবিষ্কারের ফলে কৃষিব্যবস্থার কিছু প্রসার ও তজ্জনিত উদ্বৃত্ত শস্যের সঞ্চয়, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী দ্বারা বৃহৎ জনসমষ্টির শাসন, ক্রমবর্ধমান সম্পদ আহরণ, প্রাথমিক মুদ্রাব্যবস্থার সূত্রপাত, পূর্বাঞ্চলে তামা ও লোহার খনির আবিষ্কার এবং ফলে সেইদিকে বসতি স্থাপনের জন্য জনগোষ্ঠীর পূর্বমুখে যাত্রা, ধাতুশিল্প ও কারিগরী বিদ্যা এবং সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যের প্রসার, জ্যোতির্বিদ্যার চর্চার ফলে পঞ্জিকার প্রবর্তন ও তার দ্বারা কৃষি ও নৌবাণিজ্যের সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। আমাদের আরো মনে রাখতে হবে যে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রেও সেই সময় গুরুতর পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র রাজ্যে গোষ্ঠীপতিরা রাজা হ'য়ে শাসনভার পরিচালনা করতে শুরু করেছিলেন ; আর তাঁদের রাজ্যের ভৌগোলিক সীমা বিস্তারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও প্রতিবেশী রাজ্যের আগ্রাসী আক্রমণ থেকে রাষ্ট্রনৈতিক নিরাপত্তা সুদৃঢ় করার বাসনাকে পুরোহিতরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মূলধন রূপে কাজে লাগিয়েছিলেন। এই সমস্ত ক্ষুদ্র গোষ্ঠীপতি, রাজা ও রাজন্যবর্গের সমৃদ্ধি ও রণক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকে নিশ্চিত করার জন্য পুরোহিতরাও বাজপেয়, রাজসূয় ও অশ্বমেধের মতো দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যয়সঙ্কুল নূতন নূতন যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করলেন।

ঋগ্বেদ রচনার শেষ পর্যায়ে যে নূতন যুগের সূত্রপাত, তখন অভিনব সৃষ্টিমাধ্যম রূপে 'ব্রাহ্মণ' সাহিত্যের সূচনা হ'ল। সমৃদ্ধিশালী কৃষি-অর্থনীতির কল্যাণে রাজকীয় অর্থকোষগুলি যখন পরিপূর্ণ, পুরোহিতরা তখন একদিকে নূতনতর যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্ভাবন এবং অন্যদিকে পুরাতন রীতিকে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করার দিকে মনোনিবেশ করলেন। সমৃদ্ধ পুরোহিততন্ত্রের বিচিত্র কার্যকলাপের প্রমাণ বিধৃত রয়েছে ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে। আর্যবসতি মধ্যদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ার পর যজ্ঞকেন্দ্রিক ধর্মচর্যা শীর্ষবিন্দুতে উপনীত হয়েছিল ; যজ্ঞের সংখ্যা চক্রবৃদ্ধিহারে বৃদ্ধি পেতে লাগল, সেগুলির বহুবিচিত্র শাখা-প্রশাখা সূত্রকারে লিপিবদ্ধ করার প্রবণতাও পুরোহিতদের মধ্যে দেখা গেল—আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে গেল যজ্ঞপরিচালক পুরোহিতদের সংখ্যা এবং যজ্ঞদক্ষিণারূপে দেয় দ্রব্য ও সম্পদের পরিমাণ। যেহেতু

বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে তখন আর্যদের বসবাস তাই পারস্পরিক যোগাযোগ সহজসাধ্য ছিল না, অভ্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান বিষয়ক শাস্ত্ররচনার অনিবার্য প্রয়োজনও তাই দেখা দিল। সেই সঙ্গে যজ্ঞধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞান দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে পুরোহিত রচিত-সাহিত্যের উৎসাহী পণ্ডিতদের মাধ্যমে প্রচার করার প্রয়োজনও দেখা দিল। বস্তুত সেইসময় পুরোহিতরা ধর্মপ্রচারকের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে যজ্ঞচর্যার মধ্যে যে তাত্ত্বিক ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন, তারই ফলশ্রুতিরূপে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক উপলব্ধিতে একধরনের সংহতি সৃষ্টি হয়েছিল।

বৈদিক ভারতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানগুলি তুলনামূলকভাবে জটিলতর ; আপাতদৃষ্টিতে এগুলি বিবিধ উৎস-জাত আচার অনুষ্ঠানের সংশ্লেষণ—তবে বিশেষ বিশেষ ঋতুযাগের অনুষ্ঠান ও চান্দ্র উৎসবগুলি বাদ দিলে কোন অনুষ্ঠানেরই বার্ষিক বা অন্য কোন সময়সীমা নির্দিষ্ট নেই। অঞ্চল ও পরিবার ভেদে অসংখ্য সামান্য রূপান্তর সহ যে বিপুল সাহিত্য ব্রাহ্মণ শাখায় গড়ে উঠেছিল, তা সংহিতার চেয়েও স্পষ্টতরভাবে তৎকালীন সমাজের সম্পূর্ণ চিত্রকে সংরক্ষণ করেছে। তখন সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসে শূদ্র, দাস ও নারীর মর্যাদা অবনমিত হচ্ছে, পুরোহিতদের দক্ষিণার বৈচিত্র্য ও পরিমাণ স্ফীততর হচ্ছে এবং বর্ণভেদ ও শ্রেণীবিন্যাস ধীরে ধীরে শিলীভূত হয়ে পরস্পরবিচ্ছিন্ন বর্গে পরিণত হয়েছে। উচ্চতর বর্ণের লোকেরা সম্পদ কুক্ষিগত করে সমাজের সুবিধাভোগী অংশরূপে নিম্নবর্গের হৃতমান জনসমষ্টিকে শাসন করেছে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহে আমরা প্রাসঙ্গিক ইতিহাস, ভূগোল, শিক্ষা, সামাজিক আচার ব্যবহার, নৈতিক মূল্যবোধ ও দার্শনিক মননের পরোক্ষ পরিচয় পাই। এই সব গ্রন্থের প্রাথমিক লক্ষ্য অবশ্যই বিভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠান তবুও জনসাধারণের মধ্যে এই ধর্মচর্যার কিছু ভূমিকা ছিল বলে পরবর্তী যুগের সাহিত্য অপেক্ষা ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিকে সামাজিক বাস্তবের অধিকতর প্রতিফলন ঘটেছে। কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানগুলির আতিপল্লবিত-তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, ক্রমবর্ধমান জটিলতা ও ব্যয়বৃদ্ধি সাধারণ জনমানসে বিপরীত প্রতিক্রিয়ার অবিশ্বাস ও প্রতিরোধের জন্ম দিল এবং প্রত্যক্ষভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অসমর্থ বিপুল সংখ্যক জনসাধারণ যজ্ঞের নির্বাক ও নিরাসক্ত দর্শকে পরিণত হল। জনমানসের কাছে যজ্ঞের ক্রমবর্ধমান জটিলতাকে বিশ্বাস্য করে তোলার প্রয়োজনে পুরোহিতেরা প্রত্যেক অনুষ্ঠানের অনুপুঙ্খকে প্রত্নকথা ও আদিকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত করে তুলতে চাইলেন। সৃষ্টিতত্ত্ব ও পাপপুণ্যের নির্দিষ্ট দার্শনিক ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার ফলে ব্রাহ্মণসাহিত্য সুপরিকল্পিতভাবে নিরর্থক ও রহস্য গ্রন্থিল হ'য়ে উঠল যেমন পৃথিবীর সব ধর্মগ্রন্থেই ঘটেছে। কল্পকুহেলি সৃষ্টির সচেতন প্রবণতাকে যুক্তিসম্মত ক'রে তোলার চেষ্টায় দেখা দিল শুষ্ক ও গতানুগতিক রচনাশৈলী। ব্রাহ্মণের বহুস্থানেই সমসাময়িক লোকজীবনের পরিবর্তনশীল অবস্থা প্রতিফলিত হয়েছে।

অনেক রাজ্য, রাজ্যাধিপতি ও রাজকীয় পুরোহিতদের উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষমতারও কিছু কিছু বিবরণ এগুলিতে পাওয়া যায়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ব্রাহ্মণসাহিত্যের প্রথম পর্যায় শেষ হওয়ার পরেই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্বের নিদর্শন দেখা দিচ্ছে। রাজন্যশক্তি ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে যেমন দ্বন্দ্ব দেখা দিল তেমনি বিভিন্ন পুরোহিত পরিবারের মধ্যে অভিসামন্ত শক্তির ধারকদের মধ্যে এবং নবজায়মান বণিকশক্তি বৈশ্যদের সঙ্গে উচ্চতর দুটি শ্রেণীর দ্বন্দ্বও ক্রমেই স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। সংহিতা যুগের সামাজিক সমন্বয়বোধ ক্রমশ ক্ষীয়মান হ'য়ে তখন নূতন ধরনের সমস্যাযুক্ত একটি নতুন সমাজব্যবস্থার সূত্রপাত হ'য়ে গেছে। যজ্ঞধর্ম প্রথমদিকে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হলেও পরবর্তী যুগের বহুমুখী জটিলতায় তার এই ভূমিকা আর রইল না। কেননা মুষ্টিমেয় বিত্তবান রাজা এবং ক্ষত্রিয় বংশজাত অভিজাত রাজন্যবর্গ ছাড়া অন্য কারো পক্ষেই যজ্ঞানুষ্ঠান করা সম্ভব ছিলনা। এই সব অনুষ্ঠান থেকে কেবলমাত্র রাজা ও বিত্তবান ক্ষত্রিয়রা প্রত্যক্ষ বা আধ্যাত্মিক লাভের আশা করতে পারতেন ; অন্যদিকে যজ্ঞ সম্পাদন করে পুরোহিত-সম্প্রদায় যথেষ্ট ধন উপার্জন করতেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে তার কোন প্রত্যক্ষ প্রাসঙ্গিকতাই ছিল না। জনমানসকে অভিভূত করার জন্য প্রতিটি নূতন অনুষ্ঠানের ওপর অতিরিক্ত গুপ্ত রহস্যের দ্যোতনা আরোপ করা হ'তে লাগল এবং তাদের গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাস্য ক'রে তোলার জন্য নূতন প্রত্নকথা ও উপাখ্যান আবিষ্কার ক'রে ইন্দ্রজাল, রহস্য, আপাতযৌক্তিকতা এবং যজ্ঞের ফলবত্তার স্তুতি যজ্ঞবর্ণনার সঙ্গেই যুক্ত করা হয়েছিল। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের যৌক্তিকতা, হিংস্রতা ও পশুহত্যার প্রয়োজনীয়তার সমালোচনা এবং যজ্ঞের উৎস, অনুষ্ঠান, পদ্ধতি ও যজ্ঞলব্ধ সুফল সম্পর্কে বিচিত্র উপাখ্যান যে আমরা ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের মধ্যেই পাই তাতে প্রমাণিত হচ্ছে যে আক্ষরিক ব্যাখ্যা জনসাধারণের কাছে অপ্রতুল ও অগ্রাহ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে। ফলে, মূলে যা আধ্যাত্মিক ছিল না, তার আধ্যাত্মীকরণের মধ্যে দিয়ে নূতন ধরনের এক তাৎপর্য অন্বেষণের সূত্রপাত হয়েছে। অভিনব মনস্তাত্ত্বিক সত্য রূপে 'শ্রদ্ধা'র আবির্ভাবও অন্য এক ধরনের প্রত্নকথার জন্ম দিয়েছে, স্পষ্টতই এর একটা বাস্তব ভিত্তিভূমিও ছিল।

স্মরণ করা প্রয়োজন যে এই সময়েই মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে নৌবাণিজ্য দীর্ঘ-বিরতির পর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে নূতন বিশ্বাস, দেবতা, আচারচর্যা, প্রত্নকথা, উপাখ্যান, উপকথা, উপাসনা-পদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও বহুবিধ সাংস্কৃতিক উপাদান মধ্যপ্রাচ্য ও তার মারফৎ ইয়োরোপ থেকে এদেশে এসে পৌঁছেছিল। লোহার লাঙলের ফলা ব্যবহারের ফলে পূর্বের তুলনায় অধিকতর কৃষিখামারের সংস্থান ব্যবস্থা সম্ভব হওয়াতে স্বল্প পরিমাণ হলেও ফসলের মজুত ভাণ্ডার গড়ে উঠেছিল। ধাতুশিল্পজাত

দ্রব্যের ব্যবসা এবং নৌবাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্যলব্ধ সম্পদ কৃষিজাত সমৃদ্ধিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এই সমস্ত সম্পদই মুষ্টিমেয় ধনাঢ্য ব্যক্তির কোষাগারে পুঞ্জিত হচ্ছিল। বৃত্তিগত শ্রেণীবিন্যাস বেশ দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছিল এবং বর্ণবিভাগও ক্রমশ কঠোরতর হয়ে উঠছিল, দরিদ্র পশুচারী ও কৃষিজীবী বৈশ্য এবং দরিদ্র শূদ্র ও দাসের যে বিপুল জনসাধারণ তারা শোষণের চাপে ক্রমে তলিয়ে গেল। সাহিত্যে স্বর্গ ও নরক বর্ণনা দেখা দিল—স্পষ্টতই সম্পদশালী ব্যক্তির জীবনযাত্রার প্রতিফলন দেখা গেল স্বর্গকল্পনায় এবং অন্যদিকে অসহায় নিম্নবর্গীয় যন্ত্রনাদগ্ধ জনতার নিপীড়ণের ছবি ফুটে উঠল নরক কল্পনায়। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যবর্তী ব্যবধান ক্রমাগত প্রসারিত হওয়ার ফলে সর্বসাধারণের জীবন পরবর্তী সাহিত্যে অকল্যাণ ও পাপের অভিব্যক্তির উৎস হয়ে উঠল। আমরা অবশ্য রাজসভাগুলিতে দার্শনিক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হওয়ার বিবরণ পেয়েছি ; সেই সঙ্গে এই সময়ে অরণ্যবাসী তপস্বী আচার্য ও ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসীদের দ্বারা নূতন এক মূল্যবোধ প্রবর্তিত হচ্ছিল যাতে যজ্ঞবিদ্যা বা অধ্যাত্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ ও আলোচনা রয়েছে। যজ্ঞ-অনুষ্ঠান বিষয়ক অনুপুঙ্খ এবং আধ্যাত্মিক তাৎপর্যযুক্ত প্রত্নকথার ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ এই নবজায়মান জীবনবীক্ষার পরিচয় বহন করে। এই সময়েই নূতন উপনিবেশ স্থাপনের জন্য বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করে আর্যরা দাক্ষিণাত্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। খনিজ সম্পদের আকর্ষণে পূর্বে ও দক্ষিণে নূতন বসতি গড়ে উঠে, নৌবাণিজ্যের পুনরাবির্ভাবে আরবসাগরের উপকূলবর্তী পশ্চিমাঞ্চলেও নূতন বসতির পত্তন হয়। সুপরিচালিত ধর্মসঙ্ঘের ব্যবস্থাপনা না থাকায় বিস্তৃত অঞ্চলব্যাপী বসতিগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য ও সামঞ্জস্য স্থাপন অসম্ভব হয়ে উঠে ছিল। উপরন্তু, সুবিধাভোগী ধনিকশ্রেণীর নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও বিশ্ববীক্ষা থেকে জনসাধারণ ক্রমশ দূরবর্তী ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। অনুমান করা যায় যে, অথর্ববেদে প্রাপ্ত লোক-বিশ্বাস ও লোকাচারগুলি সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অবশ্য, বহুপ্রাচীন কাল থেকেই এই সব লোকাচার লঘু ঐতিহ্যরূপে বিদ্যমান ছিল। জাদুঘর বা 'শামন' পুরোহিতের ভূমিকা নিয়ে ঝাড়ফুঁক বশীকরণ মন্ত্র পাঠ করত, অলৌকিক জাদু দেখিয়ে নানারকম অনুষ্ঠান পরিচালনা করত এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে দৈনন্দিন যে অজস্র আধি-ব্যাধি দুঃখ-দুর্দশা রয়েছে সেই সব পাঠ ও জাদু অনুষ্ঠানের সাহায্যে দূর করার চেষ্টা করত। বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মিশ্রণ এবং তজ্জনিত সাংস্কৃতিক সংশ্লেষণের ফলে প্রাগ্বৈদিক সিন্ধুসভ্যতা ও অন্যান্য পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতির আচার ব্যবহার, বিশ্বাস ও জীবনযাত্রার উপাদান আর্যসমাজে দীর্ঘকাল ধরেই স্থান পেয়ে আসছিল। বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ ঋগ্বেদ রচনার অন্তিমস্তর থেকে শুরু করে যজু ও অথর্ববেদ ব্রাহ্মণ সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে আরণ্যক ও উপনিষদের কাল পর্যন্ত আর্যাবর্তে প্রকৃতপক্ষে দুটি স্বতন্ত্র ধর্ম প্রচলিত ছিল—একটি হল সমষ্টিগত যজ্ঞধর্মের বৃহৎ ও

সম্ভ্রান্ত ঐতিহ্য অর্থাৎ সংহিতা ও ব্রাহ্মণসমূহে কথিত ধর্মবিধি, দ্বিতীয়টি হ'ল দৈনন্দিন গার্হস্থ্য-জীবনের অমঙ্গল-বিনাশকারী জাদুকর পুরোহিতদের ক্রিয়াকলাপসংবলিত লঘু ও গৌণ ঐতিহ্য। এই দুটি ঐতিহ্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ কোন সংঘাত ছিল না ব'লে সুস্পষ্ট শ্রেণীভেদগত সামাজিক অবস্থানে এরা সমান্তরালভাবে সহাবস্থান করত।

যজ্ঞগুলি যখন অত্যন্ত ব্যয়বহুল হ'য়ে উঠল এবং ঐহিক ফলদানে এদের নিরন্তর ব্যর্থতা যখন যজ্ঞ সম্বন্ধে জনসাধারণের আস্থা নষ্ট করছিল তখন সংশয়াচ্ছন্ন জনমানসে নূতন ধর্মচর্যা অন্বেষণের আগ্রহ দেখা দিল। ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানও যদি নিশ্চিত ফলের প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না, তবু এতে কোন দেবতার হস্তক্ষেপ বা ব্যয়বহুল পুরোহিততান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা এবং দীর্ঘকাল-ব্যাপী অনুষ্ঠানের জন্য দুর্মূল্য উপকরণ সংগ্রহের প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে এই সব ক্ষেত্রে এমন উপাদান ব্যবহৃত হয় যাদের প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানসম্মত উপযোগিতা রয়েছে ; যেমন অথর্ববেদে কথিত জাদু অনুষ্ঠানগুলিতে এমন কিছু ওষধি ও ধাতু প্রযুক্ত হত যাদের ভেষজপরীক্ষিত গুণ আকাঙ্ক্ষিত ফল দিতে সমর্থ। বিভিন্ন প্রকার ওষধি ও ধাতুর বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের প্রাথমিক স্তর যেহেতু অথর্ববেদে দেখা দিয়েছিল, আমরা তাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারি যে, বিজ্ঞানমনস্কতা ও সাংস্কৃতিক মননে অভূতপূর্ব উন্নতির পূর্বাভাস এরই মধ্যে সূচিত হয়েছিল।

এইভাবে ব্রাহ্মণ রচনার যুগে দুটি সমান্তরাল প্রবণতার অবস্থান বহিরঙ্গ ও অন্তর্ধৃত দিক দিয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করতে উদ্যত হল। লোকায়ত লঘু ঐতিহ্য সেই বহিরঙ্গ দিকেরই প্রতিভূ যা অধিকতর গ্রহণযোগ্য একটি বিকল্পের সন্ধান দিতে পেরেছিল। খুবই তাৎপর্যপূর্ণভাবে সম্ভ্রান্ত বৃহৎ ঐতিহ্যের অন্তিম পর্যায়ে লঘু ঐতিহ্যের উপাদানগুলি আত্মসাৎ ক'রে নিয়েছিল। অন্তর্ধৃত উপাদানের প্রভাবে যজ্ঞধর্ম নিরন্তর জটিলতর হয়ে ওঠায় একসময় তা জনসাধারণের আয়ত্তের বাইরে চলে গেল এবং ফলে সংশয় ও প্রশ্নের আবির্ভাবে, স্বভাবত স্পষ্ট ও অপ্রতীকী বিষয়বস্তুকে প্রতীকায়িত করে তোলার প্রবণতা দেখা দিল, কিন্তু রহস্য আবরণ নির্মাণের এই চেষ্টা যজ্ঞকে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জণাগর্ভ ক'রে তোলায় তা সম্পূর্ণতই জনসাধারণের বোধাতীত হয়ে উঠল। প্রতীকী ব্যাখ্যা প্রাধান্য লাভ করায় মূল অনুষ্ঠান তাৎপর্যহীন হয়ে কার্যত পরিহার্য বিবেচিত হল ; এতে যজ্ঞধর্মের ভবিষ্যৎও চিরকালের মত নির্ধারিত হয়ে গেল। ব্রাহ্মণসাহিত্যে যজ্ঞধর্ম চূড়ান্তে শীর্ষবিন্দুতে উপনীত হয়ে তারপরে অবধারিত ধ্বংসের পথে ক্রমান্বয়ে গিয়ে আপন মহিমা থেকে বিচ্যুত হল। আপাতদৃষ্টিতে যদিও যজ্ঞানুষ্ঠান চলতে থাকলে, দুটি স্তরে প্রতিস্রোত প্রবহমাণ ছিল ঃ বিরুদ্ধবাদী চিন্তাবিদদের মধ্যে ও নিম্নবর্গীয় জনসাধারণের মধ্যে। বস্তুত বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে যে নব্যচিন্তার সূত্রপাত হল তার দ্বারাই উপনিষদের

মতো স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি সম্ভবপর হয়ে উঠেছিল, প্রথমোক্ত বিরুদ্ধবাদী মনস্বীদের গোষ্ঠী তারই ফলশ্রুতি। অন্যদিকে, শেষোক্ত সাধারণ মানুষের মধ্যে সমান্তরাল ধর্মীয় আন্দোলনের ফলেই অথর্ববেদ আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করেছে, এই আন্দোলন ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিত পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়াতেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম আমূল রূপান্তরিত হয়ে পৌরাণিক হিন্দুধর্মে পরিণত হয়েছে। এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে যদিও দীর্ঘকাল লেগেছে, তবু যজ্ঞধর্মের আংশিক বিপরীত প্রতিক্রিয়া রূপে নূতন এই ধারার আভাস ব্রাহ্মণসাহিত্যের যুগেই পরিস্ফুট হয়েছিল। প্রাচীন বৈদিক সংস্কৃতি কয়েক শতাব্দী ধ'রে কিছু কিছু জনপ্রিয় বিশ্বাস ও সংস্কারকে আত্মস্থ ক'রে নিয়েছিল ; কিন্তু, ক্রমশ যজ্ঞের মধ্যবর্তী ভারসাম্য ভেঙে গেলে এবং পৌরাণিক যুগে সম্পূর্ণ নূতন স্তরে অভিনব সংশ্লেষণ না হওয়া পর্যন্ত এদের মধ্যে ব্যবধান ক্রমাগত বাড়তেই লাগল।

নব্যচিন্তার প্রকৃত অভিব্যক্তিরূপে আরণ্যক ও উপনিষদ্ শ্রেণীর গ্রন্থসমূহ ব্রাহ্মণসাহিত্যের অব্যবহিত-পরবর্তী উত্তরসূরী হয়ে উঠল। ব্রাহ্মণগুলিতে যে সমস্ত প্রবণতা সূত্রাকারে নিহিত এবং যেসব অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ উপস্থিত ছিল, পরবর্তী যুগে তৎপ্রসূত আন্দোলন কেবল আরো বেগবান ও স্পষ্টতরই হল। ধর্মীয় চিন্তাধারায় এর ফলে কিছু গুণগত পরিবর্তন দেখা দিল। কিছুদূর অবধি ধারাবাহিকতা বজায় থাকলেও পরিবর্তনই ততক্ষণে বেশি তাৎপর্যবহ হয়ে উঠেছে কেননা এই পরিবর্তন ছিল মৌলিক। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণভাবে বদলে গেল ; ঋগ্বেদে জীবনই আকাঙ্ক্ষিত সেই সম্পদ যাকে যতক্ষণ সম্ভব আকণ্ঠ ভোগ করতে হবে এবং সমস্ত বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক প্রয়াস মানুষকে এই লক্ষ্য পূরণের অভিমুখেই প্রচারিত করবে। কিন্তু নূতন যুগে জীবন অনিবার্য অবিমিশ্র অমঙ্গল বলে গণ্য হল, তাই জীবন থেকে পলায়নই হল তখন একমাত্র লক্ষ্য। তাছাড়া জীবন শুধু প্রত্যক্ষগোচর ইহলৌকিক সীমায় এখন আর আবদ্ধ রইল না ; মানুষের কাজের ভাল-মন্দ, পাপ-পূণ্যের ফল, আনন্দ ও যন্ত্রণারূপে তা অবশ্যভোগ্য। এই সিদ্ধান্ত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সৃষ্ট হল জন্ম-জন্মান্তরের এক অবিচ্ছিন্ন কল্পনা। এই শৃঙ্খল ভঙ্গ করাই হয়ে উঠল মানুষের চরম আধ্যাত্মিক লক্ষ্য। সংহিতা ও ব্রাহ্মণের যুগে জাগতিক অভীষ্ট লাভের এই ছিল উদ্দেশ্য এবং যজ্ঞানুষ্ঠানই ছিল তার সিদ্ধির একমাত্র উপায় ; কিন্তু এমন কর্ম ও জন্মান্তরের অবিচ্ছেদ্য পরম্পরা ছিন্ন করার পক্ষে যজ্ঞ সম্পূর্ণ অপর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হল। বস্তুত যজ্ঞ নিজেই কর্ম হওয়াতে এই যুগে তা হানিকর রূপেই গণ্য হল। জন্মান্তর-গ্রন্থি চিরতরে মোচন করার জন্যই কর্ম রুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। এই যুগেই সর্বপ্রথম দেহ ও আত্মা, বস্তু ও ভাবনার মধ্যে স্পষ্ট বিভেদ প্রদর্শিত হল ; সম্ভবত যাজ্ঞবল্ক্যই এই চিন্তাধারার প্রথম প্রবক্তা।

ব্রাহ্মণসমূহের শ্রেষ্ঠ অধিবিদ্যাসূচক অংশে যে ঐতিহ্যের স্ফুরণ ঘটেছিল, সাহিত্য হিসাবে আরণ্যক ও উপনিষদ্ তারই উত্তরসূরী। যেহেতু ঋষিকবিগণ আত্মাকে

পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্নরূপে উপলব্ধি করলেন, কাব্যিক অভিব্যক্তিতে এল গাঢ়তা ও উদ্বেলতা ; কল্পনার অভূতপূর্ব প্রসার আত্মা ও ব্রহ্মের বিচিত্র বিশ্লেষণে যুক্ত করল আশ্চর্য দীপ্তি, গভীরতা ও মহিমা। নূতন যুগের সাহিত্য মূলত বোধিনির্ভর ; সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিতর্ক রচিত হয়েছে সেইসব রাজা, ঋষি কিংবা মুনিসঙ্ঘের মধ্যে, তৎকালীন সমাজের কাছে যাঁদের ভাবমূর্তিতে আধ্যাত্মিক দীপ্তি ছিল বিশেষভাবে উজ্জ্বল। কিন্তু ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের অধিকাংশই যজ্ঞানুষ্ঠানবিষয়ক শুষ্ক, নিষ্প্রভ ও গতানুগতিক নির্দেশাবলীতে পরিপূর্ণ—তখনকার সমাজের কাছে এদের প্রাসঙ্গিকতা যেন প্রশ্নাতীত। এদের মধ্যে আমরা সমাজব্যবস্থার নির্ভরযোগ্য চিত্র খুঁজে পাই ; এমনকি, প্রত্নকথাগত কল্পনার প্রকাশগত আভাসও এতে রয়েছে—কিন্তু প্রকৃত আত্মিক অন্তর্দৃষ্টির নিদর্শন এতে খুব বিরল। পক্ষান্তরে, আরণ্যক এবং উপনিষদ্ মোটেই পুরোহিতকেন্দ্রিক সাহিত্য নয়। এগুলি প্রথমদিকে যজ্ঞের প্রতীকী ব্যাখ্যা দিয়ে তারপর যজ্ঞকে বর্জন ক'রে আধ্যাত্মবিদ্যার বিমূর্ততর ক্ষেত্রে নিবিষ্ট হয়েছে। বস্তুত নব্যচিন্তার উদগাতা হিসাবে এদের প্রকৃত তাৎপর্য এখানেই নিহিত। অত্যন্ত বাস্তব অর্থের দিক দিয়েই আরণ্যক ও উপনিষদ্‌গুলি পূর্ববর্তী যুগবাহিত মূল্যবোধকে সুনির্দিষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই যুগের কবিতা নিগূঢ় তাগিদে সম্পূর্ণ নিজস্ব স্বতন্ত্র এক কাব্যভাষা নির্মাণ করেছে—এই নিবিড় শক্তিশালী ও যথাযোগ্য রচনাশৈলী মনোজ্ঞ চিত্রকল্প মণ্ডিত হয়ে কাব্যে এমন সৌন্দর্য সঞ্চার করেছে যে, একমাত্র ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদের কিছু কিছু মন্ত্রের সঙ্গেই তা প্রতিতুলনীয়। ঋষিকবির অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ নূতন ছিল বলেই অভিব্যক্তি আশ্চর্য দ্যুতিমান হতে পেরেছে। মানুষের আধ্যাত্মিক স্বরূপের সন্ধানে যথার্থ আন্তরিক আকূতি ছিল ব'লে চিত্রকল্পে অভিনব গতি ও সৌষ্ঠব বারংবার সঞ্চারিত হয়েছে। পূর্ববর্তী সাহিত্যের মতো ধর্মীয় রচনা তখন আর একই রকম রইল না, তবু সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা ও চিত্র এখনও অনেক পাওয়া যায় ; নিম্নবর্গীয় জীবনের দারিদ্র, মালিন্য ও বৈচিত্র্যহীনতাই উচ্চমার্গীয় আধ্যাত্মিক আলোচনাচক্রের বাস্তব পরিপ্রেক্ষাটি নির্মাণ করছিল। সাধারণ পার্থিব প্রয়োজনের প্রতি কোন উন্নাসিক অবজ্ঞা বা উপেক্ষা নেই ; তবে ব্রহ্মের তুলনায় এই সব জাগতিক বাস্তব সত্য, তাই যজ্ঞ এখন অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ। অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির ভাববাদী দ্বান্দ্বিকতা অনিবার্যভাবে বাস্তব সম্পর্কে দ্বিমুখী প্রবণতার জন্ম দিয়েছে। কিন্তু এখনও তা সর্বব্যাপী বা স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত নয় ; কেননা এই পর্যায়ে উপনিষদের যাত্রা আরম্ভ হয়েছে, শঙ্করাচার্যের বেদান্ত দর্শন তখনও অনেক দূরে। কিন্তু স্পষ্ট শ্রেণী বিভাজন এবং বিত্তহীন উৎপাদক ও বিত্তবান্ ভোক্তার মধ্যেও অনতিক্রম্য সামাজিক ব্যবধান সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম ও জ্ঞানের দুই দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট ভেদরেখা চিহ্নিত হয়ে গেল ; তারই সূত্র ধ'রে চিন্তাক্ষেত্রে ভাববাদী অধ্যাত্মবিদ্যার ক্ষেত্র প্রস্তুত হল এবং দেখা দিল বস্তু ও ভাব, দেহ ও আত্মার মধ্যে

দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক। চরিত্রগতভাবে যাজক-তান্ত্রিক হয়েও ব্রাহ্মণ-সাহিত্য এমন এক ধর্মমতের প্রতিনিধিত্ব করেছিল যাতে অন্তত কিছুদূর পর্যন্ত সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ সম্ভবপর ছিল ; কিন্তু উপনিষদের ধর্ম ও দর্শন ছিল অপেক্ষাকৃত নিরাবয়ব এবং কঠোরভাবে সংরক্ষণশীল—মূলত তা সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে শ্রদ্ধাভাজন বিদ্বৎসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

উপনিষদের পরবর্তীকালে সাহিত্য নামে সূত্রসাহিত্য পরিচিত এর অপর নাম বেদাঙ্গ। ছয়টি বেদাঙ্গের মধ্যে রয়েছে ঃ শিক্ষা, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ, নিরুক্ত ও কল্প। শেষোক্ত কল্পসূত্রে আবার চারটি উপবিভাগ রয়েছে ঃ শ্রৌত (সামূহিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিধি), গৃহ্য (দৈনন্দিন ও পারিবারিক আচার অনুষ্ঠানের নিয়ম), ধর্ম (সামাজিক বর্ণাশ্রম ধর্মের বিধি) এবং শুল্ব (বেদী নির্মাণের প্রয়োজনীয় জ্যামিতি)। এই ছয়টি বেদাঙ্গেরই সাধারণ একটি ভাষাগত আঙ্গিক রয়েছে ঃ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ সূত্রনিবন্ধ গদ্যে এইগুলি রচিত এবং চূড়ান্ত শব্দসংক্ষেপ এগুলির প্রত্যেকের বিশিষ্ট লক্ষণ। অবশ্য বেদাঙ্গগুলির রচনাশৈলী বিষয়ভেদে পরস্পর থেকে ভিন্ন ; কোথাও শব্দগত শব্দপ্রয়োগগত কঠোরতা বেশি, কোথাও বা কম ; কোথাও বা গদ্য রচনার মধ্যেই কিছু কিছু শ্লোক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, কোথাও বা গদ্যে সুস্পষ্ট ভাবেই ব্রাহ্মণসাহিত্যের প্রতিধ্বনি। স্বচ্ছতা, যথার্থতা ও গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজনে মাঝে মাঝে চিত্রকল্প ব্যবহৃত হলেও কোন বেদাঙ্গই সাহিত্যিক ঔৎকর্ষের জন্য প্রয়াসী নয়। এগুলি নিঃসন্দেহে প্রধান যাজক পরিবারগুলির মধ্যে মৌখিক সাহিত্যরূপে রচিত ও সংরক্ষিত হয়ে শিক্ষক-ছাত্র পরম্পরায় এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে হস্তান্তরিত হ'ত। বেদাঙ্গগুলিতে কিছুমাত্র সাহিত্যিক মূল্য নেই এবং এই নেতিবাচক সাহিত্যের দিক থেকে বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাসে তাদের অনন্য ক'রে রেখেছে। বেদাঙ্গের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে বেদাঙ্গ কখনোই নিজেকে অপৌরুষেয় ব'লে দাবি করে নি। যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হয়েই বেদাঙ্গগুলি রচিত হলেও ব্যাকরণ, নিরুক্ত (অর্থাৎ ব্যুৎপত্তি শাস্ত্র) জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি এবং ছন্দঃশাস্ত্রের মতো নিরীক্ষাধর্মী বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের সূত্রপাত এদেরই মধ্যে। অল্পকাল পরেই বৈদিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রবণতার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় এবং ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি স্বতন্ত্র ক্রমবিবর্তন শুরু হয়।

সন্দেহ নেই, বেদাঙ্গ ধারার মধ্যেই শেষের বিবর্তন শুরু হয়ে গিয়েছিল ; সেই বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে এদের উদ্ভবে বৈদিকধর্মের ভিত্তিমূল শুধু কম্পিতই হয় নি, প্রকৃতপক্ষে অতি দ্রুত শিথিল ও স্খলিত হচ্ছিল। পূর্বযুগের ধর্মবিশ্বাস যখন সম্পূর্ণ অপ্রচলিত ও প্রত্যাখ্যাত সেইসময় বেদাঙ্গ রচনার মধ্য দিয়ে সেই ধর্মীয় সাহিত্যধারার বোধ ও বিশ্বাসের কালসীমা প্রসারণের একটি প্রাণপণ প্রয়াস হয়েছিল। সেই সময়

বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, আজীবিক ধর্ম এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মীয় প্রশাখার উদ্ভব যেমন পূর্ব যুগের ধর্মচর্যার জীবনীশক্তিকে শুষে নিয়েছিল তেমনি বহিরাগত আক্রমণকারীদের আবির্ভাব সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরে একটি তুমুল আবর্তেরও সৃষ্টি করেছিল। এরই পাশাপাশি জাতিভেদ প্রথা ক্রমেই জটিল ও কঠোর হয়ে উঠছিল। সমুদ্রপথে বাণিজ্যের মাধ্যমে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ গ্রামীণ সমাজের মধ্যে আর কোন নূতন সুস্থ শোণিতধারা সঞ্চালন করতে পারে নি। কেননা বণিক সমাজের প্রতিনিধিরা গ্রামের কৃষক ও কারুশিল্পীদের শ্রমশক্তি শোষণ করত, কিন্তু সর্বদাই তাদের গ্রামের প্রাথমিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যে অজ্ঞানের অন্ধকূপে নিমজ্জিত রাখত। যে অর্থনৈতিক ও উৎপাদন ব্যবস্থায় যজ্ঞধর্ম বর্ধিষ্ণু হতে পারত, ইতিমধ্যেই তা অপ্রচলিত হয়ে পড়েছিল। এইজন্য উপনিষদে তখনই নব্যচিন্তা অভিব্যক্ত হতে পারল, যখন তাদের বোধিদীপ্ত পরিপ্রেক্ষা ও অনুষ্ঠানবিরোধী ভূমিকা আচারমূলক যজ্ঞধর্মের সজীবতাকে হরণ করে নিল—ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে তখন এক বিপুল শূন্যতার সৃষ্টি হল। তৎকালীন চিন্তাবিদরা অনুমান করতে পারছিলেন যে বৈদিক যজ্ঞধর্ম আর সামাজিকভাবে যুক্তিগ্রাহ্য কিংবা অর্থনৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য থাকবে না, তাই তাঁদের প্রাথমিক প্রয়াস ছিল সম্পূর্ণ যজ্ঞবিধিকে যথাযথভাবে এবং যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত আকারে সংরক্ষণ করার জন্যই। সূত্র-সাহিত্যের জন্ম এভাবেই ; এগুলি কোন কবি বা ধর্মতত্ত্ববিদের রচনা নয়—সাধারণভাবে সেইসব পেশাদার পুরোহিত ও যজ্ঞবিদ্যার গবেষকগণই সূত্র প্রণয়ন করেছিলেন, যাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন বৈদিক বিদ্যাচর্চার অধোগতি, মৌলিক গ্রন্থসমূহের বিদূষণ, যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে ক্রমবর্ধমান ত্রুটিবিচ্যুতির হার, মন্ত্রের ত্রুটিপূর্ণ উচ্চারণ এবং দেখছিলেন অনুষ্ঠানের বাহ্যিক দিক সম্পর্কে অজ্ঞতা-হেতু মূলপাঠের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবনে অক্ষম পুরোহিতের ভুল উচ্চারণে মন্ত্র আবৃত্তি ও ভুল পদ্ধতিতে যজ্ঞ পরিচালনা।

সূত্র-সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিত তীব্র রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আলোড়নের সাক্ষ্য বহন করছে—একাদিক্রমে বহু বৈদেশিক আক্রমণের ফলে অসংখ্য নূতন নূতন জনগোষ্ঠী উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করছিল এবং সেই সঙ্গে নিয়ে এসেছিল অপরিচিত ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক ব্যবহারবিধি ও সংস্কার। তৎকালীন শিল্পে ও সাহিত্যে এই ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের প্রভাব অসামান্য গুরুত্ব ও গভীরতা সঞ্চার করেছিল। সেই সময় দেখা গেল তৎপর বৈদেশিক বাণিজ্য, গান্ধার ও মথুরা শাখার শিল্পকলা, বৌদ্ধধর্মের হীনযান থেকে মহাকাশযান উত্তরণ ও তার সঙ্গে বিপুল এক সাহিত্যসম্ভারের উত্থান। রচিত হল মহাভারত ও রামায়ণ, 'মহাবস্তু' ও 'ললিতবিস্তর', আর, সেই সঙ্গে বাৎস্যায়ন, পতঞ্জলি, অশ্বঘোষের গ্রন্থরাজি। সেই যুগের তাম্রলিপিসমূহে ধ্রুপদী রচনাশৈলীর সূত্রপাত হল, ভূমিদানপত্র ও তাম্রলিপিতে

নূতন ভূমিব্যবস্থার বিবরণ পাওয়া গেল। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্য যে, এটাই হল অভিপৌরাণিক যুগ ; ঠিক পরের যুগেই ধর্মীয় সাহিত্যের নূতন ধারা অর্থাৎ পুরাণ-সাহিত্যের রচনা আরম্ভ হল। তবে, পুরাণের প্রকৃত পূর্বসূরী হচ্ছে দুটি আর্য মহাকাব্যের নায়কের জীবনী ; রামায়ণে রাম এবং মহাভারতে কৃষ্ণ, সেইসঙ্গে মহাবস্তু ও ললিতবিস্তরে বুদ্ধও। আসলে এ যুগ হল আঞ্চলিক দেবতার ক্রমে দেবাদিদেব উন্নয়নের যুগ। অবশ্য নূতন সাহিত্যধারার সূচনার পূর্বে আদিম ধর্মবোধের পুনরুত্থান ঘটেছিল ; কেননা, উপনিষদ্ ও বৌদ্ধশাস্ত্রের দুর্বোধ্য তত্ত্ব সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে ছিল। যেহেতু প্রকৃতি শূন্যতা সহ্য করতে পারে না, তাই লঘু ঐতিহ্যের অন্তর্বর্তী ধর্মবিশ্বাস আবার সামাজিক চেতনার বহিঃস্তরে আত্মপ্রকাশ করল এবং যুক্তিসিদ্ধ উপন্যাস-পদ্ধতি রূপে গৃহীতও হল। বস্তুত, এতদিন তা আর্য ও অনার্য জনগোষ্ঠীর সামূহিক অবচেতনায় অন্তঃসলিলা ধারারূপে বিদ্যমান ছিল। তাই সূত্রসাহিত্য যদিও প্রকাশ্যভাবে বৈদিক ধর্মচর্যাকে ঘনীভূত ও সংক্ষিপ্তাকারে লিপিবদ্ধ করেছে, তবুও বেদাঙ্গের মাঝে মাঝেই অবৈদিক দেবতা ও পূজার আচার অনুষ্ঠান প্রাধান্য পেয়েছে।

বৈদিক সাহিত্যের সক্রিয় রচনার কাল প্রায় দেড় হাজার বছর। সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে সৃজনশীলতার চূড়ান্ত সিদ্ধি ঘটেছিল প্রারম্ভিক ও অন্তিম পর্যায়ে অর্থাৎ ঋগ্বেদ ও উপনিষদের রচনাসময়ে। অথর্ববেদের কিছু মন্ত্র ছাড়া অন্য কোন সংহিতাই কোন মর্মস্পর্শী উপলব্ধি, উন্নতস্তরের ভাবনা বা তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা উপহার দিতে পারে নি। ব্রাহ্মণ-সাহিত্য যৎসামান্য কিছু স্মরণীয় কাব্যাংশ যদিও পাওয়া যায়, তবুও এই ধারার বিপুল পরিধির তুলনায় পরিমাণগতভাবে তা খুবই নগণ্য। যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদের অধিকাংশ, ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের বিশাল পরিসর এবং সমগ্র বেদাঙ্গসূত্র সম্পূর্ণই অকাব্যিক ; আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনসিদ্ধি ও পার্থিব সমৃদ্ধি লাভের উদ্দেশে এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের যথাযথ জ্ঞান ও প্রয়োগের জন্য এইগুলি রচিত। সুতরাং স্বভাবধর্মেই এই রচনাগুলি প্রয়োগবাদী, গদ্যধর্মী ও প্রেরণাহীন।

ঋগ্বেদ থেকে উপনিষদের কালে উপনীত হতে গিয়ে আক্রমণকারী আর্যদের সহজ যাযাবর পশুচারী সামাজিক অবস্থান এবং ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন আমূল পরিবর্তিত হ'য়ে গিয়েছিল। কৃষিনির্ভর ও একটি জটিল মুদ্রা-ব্যবহারী অর্থনীতি, কুটিরশিল্প ও বাণিজ্যনীতি পশুপালক সমাজের পুরাতন অর্থব্যবস্থার স্থান অধিকার ক'রে নিল। আর্যদের সঙ্গে প্রাগার্য ও অনার্য জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে আদিম কৌম সমাজের পরিবর্তে ক্রমে ক্রমে পূর্ণবিকশিত শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থার পত্তন হল ; পিতৃতান্ত্রিক পরিবারই এই সামাজিক কাঠামোর প্রাথমিক ভিত্তি। অবৈদিক ও অনার্য উৎসজাত লোকপ্রিয় বিশ্বাস ও ধর্মচর্যার বিচিত্র উপাদান

আত্মসাৎ করেই পূর্ববর্তী সরল যজ্ঞনির্ভর বৈদিক ধর্ম থেকে সংশ্লেষণ-প্রবণ অভিপৌরাণিক ধর্ম জন্ম নিয়েছিল। ভারতীয় জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে ভিন্নমুখী পরিবর্তনের স্তরগুলি বৈদিক সাহিত্যের বিপুল পরিসরে প্রতিফলিত হয়েছে ; দেড়হাজার বছর ধ'রে ভারতীয় জীবনযাত্রা ও চিন্তাধারায় নিরন্তর বিবর্তনের প্রামাণিক সাক্ষ্যরূপে তার স্থান অনস্বীকার্য। স্পষ্টতই তখনকার সমাজে যারা যাজকতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্য ভোগ করত, সাহিত্য মুখ্যত তাদেরই চিন্তা, স্বার্থ, আচার-ব্যবহার, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমাজের বাকি অংশের জন্য পরিকল্পিত রীতি-নীতির প্রতিফলন হয়েছিল। তবু পরোক্ষভাবে সমগ্র সমাজের প্রতিচ্ছবিও কিছু এতে রয়ে গেছে। তাছাড়া ১২০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে বৈদিক আর্যদের এদেশে আগমণের সময় থেকে ৬০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে লিখিত সাহিত্যের আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত ভারতীয় সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শনই হবে বেদ ; আর, কেবলমাত্র এই জন্য তা অমূল্য। সেই সঙ্গে ইন্দো-ইয়োরোপীয় পরিবারের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ভাবনা ও আচরণের প্রথম পূর্ণাঙ্গ দলিল রূপে বৈদিক সাহিত্য এক অসামান্য গৌরবময় আসনের অধিকারী।

ঋগ্বেদ সংহিতা

ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ—এই চার বেদের প্রত্যেকটিই চারটি অংশে বিন্যস্ত : সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্। সংহিতার আক্ষরিক অর্থ হল আবৃত্তিযোগ্য (ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদের ক্ষেত্রে), গেয় (সামবেদ) ও জপনীয় (যজুর্বেদ) মন্ত্রসমূহের সংকলন। ঋগ্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদের একটি ক'রে সংহিতা রয়েছে—এদের প্রত্যেকটির এক বা একাধিক পাঠভেদ আছে; অন্যদিকে যজুর্বেদের দুটি সংহিতা—শুক্ল ও কৃষ্ণরূপে পরিচিত। প্রত্যেক সংহিতার সঙ্গে একাধিক ব্রাহ্মণ যুক্ত রয়েছে; শুধ অথর্ববেদের একটি মাত্র ব্রাহ্মণ। আবার চারটি সংহিতার প্রত্যেকটির একাধিক আরণ্যক ও উপনিষদ্ আছে ; তবে, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিযদের মধ্যবর্তী ভেদরেখা খুব স্পষ্ট নয়। সংহিতাগুলির রচনাশৈলী ও রচনাকাল স্পষ্ট হলেও ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্‌গুলি প্রায়শই পারস্পরিক সীমা লঙ্ঘন করেছে; তাই একই ধরনের রচনা কোনো শাখার কাছে ব্রাহ্মণ, আবার অন্য শাখার কাছে আরণ্যক বা উপনিষদ্ রূপে পরিচিত। কিংবা কোনো ব্রাহ্মণের হয়ত এমন উপসংহার অংশ রয়েছে, যাকে ঐ ব্রাহ্মণটি কখনো আরণ্যক কখনো বা উপনিষদ্ ব'লে উল্লেখ করছে অথবা একই সঙ্গে দুটোই।

বেদের সংহিতা পাঠ প্রচলিত ধরনে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে বিন্যস্ত হয়েছিল; এই পাঠ আবার শাখা বা চরণ ব'লে পরিচিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। প্রতিটি শাখায় একটি একটি সংহিতা রয়েছে ; অন্যদিকে চরণগুলির সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত আছে বিভিন্ন ব্রাহ্মণ ও সূত্র—এই পার্থক্য সাধারণভাবে আঞ্চলিক ভেদজনিত ব'লেই গণ্য করা যায়। ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশে এক যুগ থেকে অন্যযুগে আনুক্রমিক সঞ্চরণ এবং এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশের সঞ্চরণের ফলে মৌখিক সাহিত্যের বিশুদ্ধ পরম্পরা কিছু না কিছু পরিবর্তিত হতে বাধ্য। এটাও সম্ভব যে, কিছু কিছু বিকল্প পাঠের প্রতি আঞ্চলিক পক্ষপাতের ফলেই রচনার স্থানে-স্থানে পাঠভেদ তৈরি হয়েছে, যদিও সমগ্র সাহিত্যকে ঐশী প্রেরণালব্ধ ও অপৌরুষেয় (আর সেই জন্যে আবহমান কাল ধরে সমরূপ ও অপরিবর্তনীয়) ব'লে দাবি করা হয়ে থাকে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, বেদের এই পাঠভেদগুলি যে এত বিরল ও তাৎপর্যহীন—সেটাই বরং বিস্ময়ের। এতে আমরা যেমন চিরাগত ভারতীয়

রক্ষণশীলতার পরিচয় পাই, তেমনি উচ্চারিত শব্দকে অপরিমেয় তাৎপর্যপূর্ণরূপে গ্রহণ করার মৌলিক প্রবণতা সম্পর্কেও অবহিত হই।

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বেদের বহু প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া যায়—শ্রুতি, অনুশ্রব, আম্নায়, ত্রয়ী, ছন্দঃ, স্বাধ্যায়, আগম এবং নিগম। সংহিতা শব্দের তাৎপর্য এই যে, তা অনেক শিথিল, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মন্ত্রের সঙ্কলন। ঐতিহ্য অনুযায়ী এই সব মন্ত্রের আক্ষরিক অর্থ 'বিভাজন'। অঞ্চলভেদে সংহিতার বিভিন্ন বিভাগের নিম্নোক্ত ছক তৈরি করা যায় :—
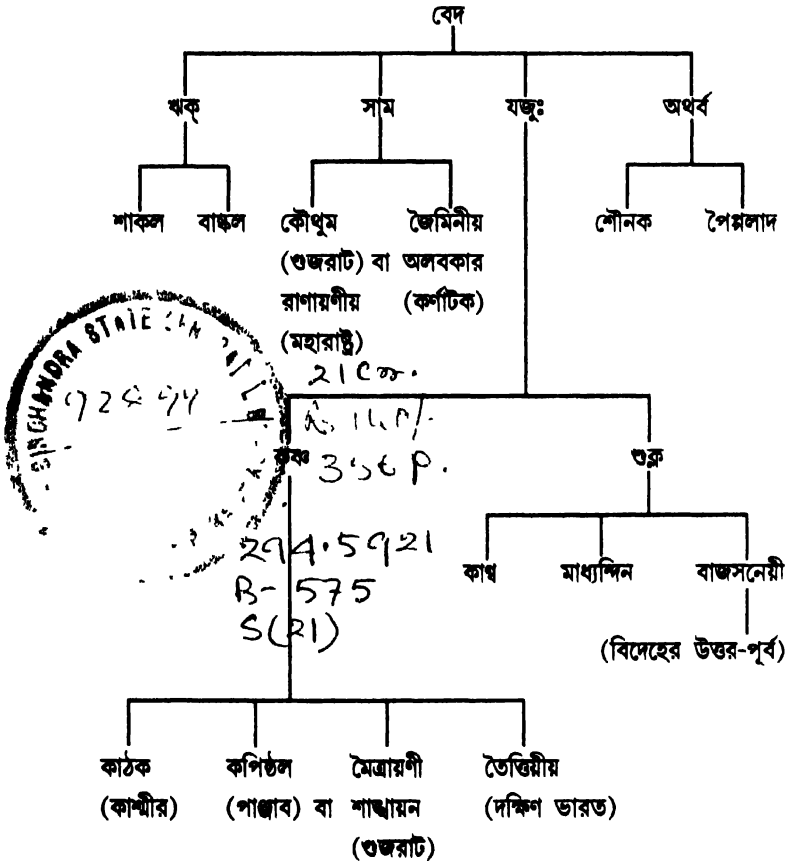
ঋগ্বেদ

আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বা তার এক শতাব্দী পরে মহাভারতের মহাযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সময় (যদি তা সত্যিই ঘটে থাকে) ঋগ্বেদ সম্ভবত তার বর্তমান

আকৃতি ধারণ করেছিল। মহাভারতের রচয়িতা ব্যাস সম্ভবত ঋগ্বেদের নবম খণ্ড অর্থাৎ সোম মণ্ডলের প্রণেতা ছিলেন কেননা এই মণ্ডলের মধ্যে সম্পাদকীয় প্রয়াস খুব স্পষ্ট। পূর্বতন নয়টি মণ্ডলের তুলনায় দশম মণ্ডল অনেক পরবর্তীকালের রচনা। বৈদিক সাহিত্যের প্রথম সৃষ্টিধর্মী পর্যায়ের মধ্যে রয়েছে চারটি সংহিতা। ঐতিহ্যগতভাবে ঋগ্বেদ দশটি খণ্ড বা মণ্ডলে বিভক্ত ; এই মণ্ডলগুলি আবার বিভিন্ন 'অনুবাকে' বিভক্ত; প্রতি অনুবাকে অনেক সূক্ত এবং প্রতি সূক্ত কিছু মন্ত্র বা শ্লোকের সমষ্টি। শাকল শাখা মণ্ডলক্রমে বিভাগকেই অনুসরণ করেছে ও বালখিল্য সূক্তগুলি সংকলন করেছে। প্রখ্যাত টীকাকার সায়ণ খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকে এই শাখাকেই অনুসরণ করেছিলেন। মণ্ডল বিভাগের প্রাচীনতম উল্লেখ রয়েছে ঐতরেয় আরণ্যকে। মণ্ডল বিভাগের তুলনায় যান্ত্রিকতর বিভাজন রয়েছে বাষ্কল শাখায় ; সেখানে সমগ্র ঋগ্বেদ সংহিতাকে পরিমাণগতভাবে সমান আটটি খণ্ড বা অষ্টকে বিন্যস্ত করা হয়েছে. প্রতি অষ্টকের আটটি ক'রে অধ্যায় এবং প্রতি অধ্যায়ের মোটামুটিভাবে তেত্রিশটি ক'রে বর্গ রয়েছে—আবার প্রতি বর্গই কিছু শ্লোকের সমষ্টি।

বাষ্কল— ৮ অষ্টক, ৬৪ অধ্যায়, ২০০৬ বর্গ
১০৪১৭ / ১০৬১৬ / ১০৬২২ সূক্ত

ঋগ্বেদ

শাকল ১০ মণ্ডল, ৮৫ অনুবাক, ১০১৭ (+১১ বালখিল্য) সূক্ত,
১০৮৫০ ঋক্, ১৫৩৮২৬ পদ

বৈদিক শাখা সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন গ্রন্থ চরণব্যূহ অনুযায়ী ঋগ্বেদ সংহিতার পাঁচটি বিভিন্ন পাঠভেদ ও সমপরিমাণ শাখা ছিল। বৃহদ্দেবতা গ্রন্থের অধিকতর সমীপবর্তী বাষ্কল শাখা বর্তমানে অপ্রচলিত। পরবর্তী ঋগ্বেদ-সাহিত্যের দুটি প্রধান শাখা ঃ ঐতরেয় এবং কৌষীতকি।

ঋগ্বেদের দশটি মণ্ডলের মধ্যে প্রত্যেকটির রচনাকাল ভিন্ন; এর মধ্যে অন্তত তিনটি প্রধান পর্যায় সহজেই আবিষ্কার করা যায়। প্রাচীনতম বা মূল পর্যায়ে রচিত হয় 'পারিবারিক মণ্ডল' রূপে পরিচিত দ্বিতীয় থেকে সপ্তম মণ্ডল। গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ ও বশিষ্ঠ—এই কটি ঋষি-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত কবিরাই মণ্ডলগুলির রচয়িতা। দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে মূলত কাণ্ব পরিবারভুক্ত কবিদের রচনা ঃ অষ্ট মণ্ডল, এবং এই মণ্ডল বিন্যাসের পরিকল্পনা অনুযায়ী সঙ্কলিত প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় অংশ (৫১ তম সূক্ত থেকে ১৯১তম সূক্ত)। তৃতীয় পর্যায়ে, সম্ভবত সোমযাগের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের জন্য, আটটি মণ্ডল থেকে সোমদেবতার উদ্দেশে

রচিত সমস্ত সূক্ত একটি পৃথক্ মণ্ডলে সঙ্কলিত হয়। এটিই হল নবম বা সোমমণ্ডল। আরো অন্তত দুই শতাব্দী পরে চতুর্থ বা শেষ পর্যায়ে রচিত হয় দশম মণ্ডল এবং প্রথম মণ্ডলের প্রথম অংশ (১-৫০ সূক্ত)।

শেষ দুটি পর্যায়ের সূক্তসমূহ বিষয়বস্তু অনুযায়ী সংহিতায় সঙ্কলিত; প্রথম দুটি পর্যায়ের মতো কবি-পরিবারে পরিচয় অনুযায়ী নয়।

সুতরাং আমরা ঋগ্বেদের চারটি ভিন্ন রচনাস্তরের রৈখিক বর্ণনা নিম্মোক্ত রূপে করতে পারি ঃ

(১ম মণ্ডল ২য় অংশ ও ৮ম মণ্ডলের সমকালীন; বিবিধ কবি)
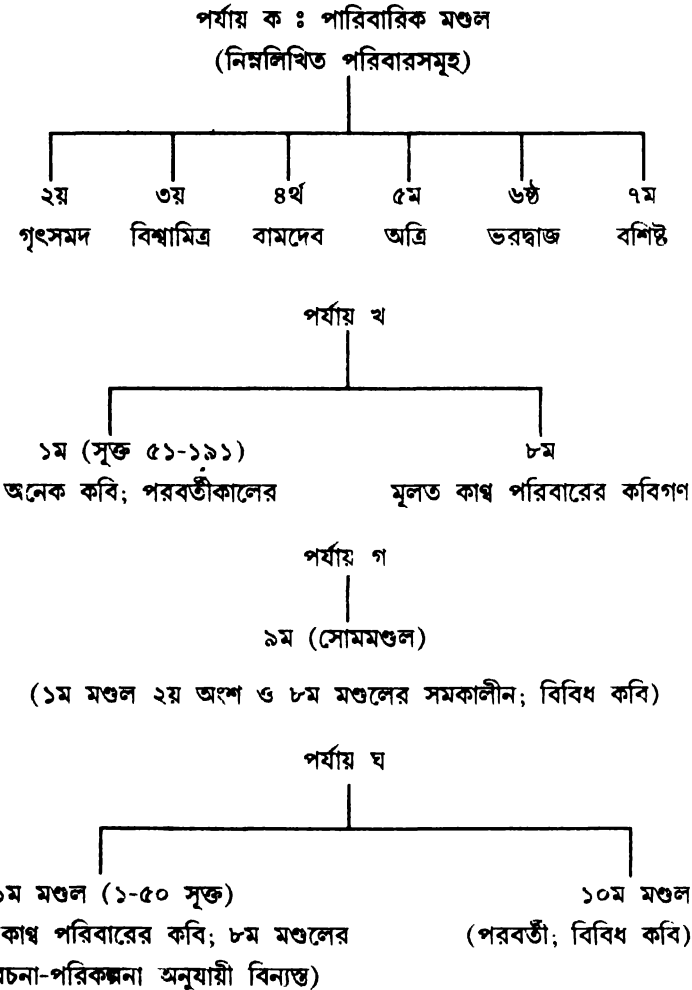
ডাঃ রাহুড়কর মনে করেন, দশম মণ্ডলের ১৫১টি কবি-নামের মধ্যে মাত্র ৭৮টি নাম নির্ভরযোগ্য; কিন্তু অন্য ৭৩টি কাল্পনিক।

মন্ত্র-বিন্যাসের পদ্ধতিতে কিছুটা অস্পষ্ট ও অসংলগ্ন পরিকল্পনার ছাপ দেখা যায় ; পারিবারিক মণ্ডলগুলির প্রত্যেকটির প্রথম সূক্ত অগ্নির প্রতি নিবেদিত— আবার নবম মণ্ডলে একমাত্র সোমদেবতাই স্তুত হয়েছেন ; সম্পূর্ণত ছন্দঃক্রম অনুযায়ী মন্ত্রগুলি বিন্যস্ত। বাইবেল বা কোরাণের মতো ঐতিহ্য অনুসারী বেদ ঐশীপ্রেরণাজাত, বোধিলব্ধ ও অপৌরুষেয়। নিশ্চিতভাবেই প্রত্যাদেশ রূপে বর্ণিত হওয়ায় বৈদিক সাহিত্য বিশুদ্ধ ও অখণ্ডনীয় অর্থাৎ যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণের উর্ধ্বে উন্নীত হয়েছে। তবে এর অন্যবিধ তাৎপর্যও রয়েছে, যে দৈব প্রেরণা মন্ত্রপ্রণেতাকে এতটা আলোড়িত করত যে তিনি শিহরিত হতেন (তুলনীয় 'বিপ্র', বিপ্ ধাতু, শিহরণ অর্থে) সেই প্রেরণার ফলেই দৈনন্দিন সাধারণ ভাষা থেকে মন্ত্রগুলির ভাষা খানিকটা পৃথক হয়ে পড়ত। এই পার্থক্যের মূলে আছে কাব্যিক ভাষায় উপলব্ধিগত তুরীয়ভাব প্রতিফলন। তাই ঋষিগণ 'মন্ত্র রচয়িতা' নয়, এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে গেছে তাই তাদের বলা হল 'মন্ত্রদ্রষ্টা', তা না হলে প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, সাধারণ মানুষই এই সর্বজনস্বীকৃত অতিমানবিক সাহিত্যের প্রণেতা। তাই মন্ত্র হয়ে উঠল প্রত্যাদেশ আর ঋষি-কবি হলেন দ্রষ্টা। খুবই যথার্থ অর্থে সমস্ত মহৎ কবিতাই প্রত্যাদেশ, কেননা মুষ্টিমেয় মহৎ কবিই তা রচনা করতে পারেন; আর, এই অনন্য অন্তর্দৃষ্টি ও যথাযোগ্য ভাষায় তাকে প্রকাশ করার ক্ষমতাই তাঁদের সাধারণ জনপ্রবাহ থেকে পৃথক ক'রে রাখে। সাধারণ মানুষও এই অসামান্য সৃষ্টিপুঞ্জকে পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয়রূপে গ্রহণ ক'রে বিশেষ মর্যাদা দিতে চাইল। প্রকৃতপক্ষে এ সমস্ত মন্ত্রের আবৃত্তিকালীন স্বরভঙ্গী ও আনুষ্ঠানিক প্রয়োগরীতি সংযোজক উপাদানরূপে সমাজসত্তাকে অখণ্ড সামগ্রিকতায় গ্রথিত রেখেছিল।

বহুপরিচিত বা স্বল্পপরিচিত পরিবারসমূহের কবি ছাড়াও আমরা কয়েকজন মহিলাকবি বা ঋষিকার সন্ধান পাই ; যেমন লোপামুদ্রা, (১ : ১৭৯), অপালা মৈত্রেয়ী (৮ : ৯১), যমী (১০ : ১০), বসুক্রের পত্নী (১০ : ২৮), কাক্ষীবতী ঘোষা (১০ : ৩৯-৪০), সূর্যা (১০ : ৮৫), উর্বশী (১০ : ৯৫), অম্ভৃণ-কন্যা বাক্ (১০ : ১২৫), ব্রহ্মজায়া (১০ : ১৩৯), বিবস্বৎ-কন্যা যমী (১০ : ১৪৫), ইন্দ্রানী (১০ : ১৪৫), শ্রদ্ধা কামায়নী (১০ : ১৫১), পৌলোমী শচী (১০ : ১৫৯)। এই সমস্ত সূক্তের নাম ও বিষয়সূচী অর্থাৎ প্রার্থনার প্রকৃতি বিশ্লেষণ ক'রে আমরা রচয়িতাদের সামাজিক পশ্চাৎপট সম্পর্কে অবহিত হই ; অর্থাৎ এইসব কবিদের তৎকালীন সমাজের নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধিরূপে গণ্য করা চলে। কোন মহিলাকবিই অন্য কারো সঙ্গে সর্বাংশে তুলনীয় নন, তবুও সামগ্রিকভাবে বৈদিক সমাজের

নারীজগৎ সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য পরিচয় তাঁদের রচনার মধ্যে দিয়েই আমরা পাই। যেসব কবি অনেক শ্লোক জানতেন কিংবা রচনা করেছিলেন, তাঁদের 'বহ্বৃচ' (বহু + ঋচ্) ব'লে উল্লেখ করা হয়। বিভিন্ন কবির মধ্যে চারণকবিসুলভ প্রতিযোগিতার লক্ষণও আমরা দেখতে পাই। বিশেষত বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে প্রায় সমতুল্য মর্যাদাদানের মধ্যে এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। পরবর্তী জনশ্রুতি অনুযায়ী এই দুই ঋষির প্রতিদ্বন্দ্বিতা চরম বিদ্বেষের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল। কিছু কিছু সূক্তে কবি পরিচয় অত্যন্ত যান্ত্রিকভাবে নির্ধারিত হয়েছে ; দেবতার উদ্দেশে প্রার্থনারত ঋষির নাম অনুসারে সংবাদ সূক্তগুলির প্রতি শ্লোকে সেই পরিচয় অর্থাৎ যাঁর উদ্দেশ্যে কিছু বলা হয়েছে তিনি তখন দেবতা এবং যিনি তা বলছেন তিনি ঋষি। তাছাড়া এমন কিছু সূক্তও রয়েছে যেখানে কবির পরিচয়ে কোন দেহধারী মানুষের ইঙ্গিত নেই ; যেমন মন্যু বা ক্রোধ (১০ : ৮৩) এবং অর্বুদ নামে সর্প (১০ : ৯৪)।

পুরোহিত-পরিবারগুলি বিশেষভাবে কৌতূহলজনক। যখন কোন অনুপ্রাণিত কবি কাব্যিক বা অনুষ্ঠানগতভাবে তাৎপর্যময় গীতিরচনায় সফলকাম হতেন, সম্ভবত তখনই তিনি তাঁর সৃষ্টির দীর্ঘায়ু কামনা ক'রে স্বাভাবিকভাবে সন্তান বা শিষ্যদের তা কণ্ঠস্থ করতে শিক্ষা দিতেন। নিরক্ষর সমাজও স্মরণীয় শ্লোক রচনায় সমর্থ ছিল, কিন্তু সংরক্ষণই ছিল তার সমস্যা ; অতএব স্বাভাবিকভাবেই সংরক্ষণ-বিষয়ে কবির নিকট-আত্মীয় বা শিষ্যগণ সর্বাধিক আগ্রহী এবং এঁরাই ছিলেন নির্ভরযোগ্য আধার। সম্ভবত তাঁরা মৌখিক সাহিত্য রচনার প্রক্রিয়াকে খুবই নিবিষ্টভাবে লক্ষ্য ক'রে থাকবেন এবং ক্রমশ আবেগের সংবেদনশীল মুহূর্তগুলিকে বাচনিক অভিব্যক্তিদানের রহস্যেও তাঁরা দীক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন। এভাবেই কিছু কিছু পরিবারের সদস্যরা অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশ-ক্ষমতার প্রমাণ দিয়ে এক একটি কবি-পরিবাররূপে সম্মানিত হয়েছিলেন ; কখনও কখনও পাঁচ প্রজন্ম এই মর্যাদা অক্ষুন্ন থেকেছে। আধুনিক গবেষণায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে চৌষট্টি প্রজন্ম ধ'রে ঋগ্বেদের প্রকৃত রচনা অব্যাহত ছিল।

পুরোহিত, চারণ-কবি এবং ঋষি-কবিদের গুণগ্রাহী পৃষ্ঠপোষকরা শিল্প-চাতুর্যের জন্য কবিদের রচনার পুরস্কার দিতেন। কেউ কেউ মনে করেছেন যে নববর্ষ উৎসবে চারণকবিরা পুরস্কারের আশায় রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন ; তা হয়ে থাকলে, খুব সম্ভবত এটি ইন্দো-ইয়োরোপীয় ঐতিহ্য (যেমন গ্রীসের ট্রাগোইডিয়াতে) যজ্ঞানুষ্ঠান যখন পরবর্তীকালে বহুমাত্রিক ও জটিল হয়ে উঠেছিল তখন ক্রমেই কবিপরিবারগুলি বিশেষ মর্যাদার আসনের অধিকারী হয়ে উঠছিলেন। তাই ঋগ্বেদের প্রতি সূক্তেই ছন্দ, দেবতা ও যজ্ঞবিষয়ক বিনিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে ঋষিকবির নামও

উল্লেখ থাকে। এ নামের উল্লেখে রচনাটির ওপরে স্বত্বাধিকারে স্বাক্ষর রয়ে গেছে। দেবতা ও বিনিয়োগ অবশ্য কবিতা ও যজ্ঞানুষ্ঠান বিষয়ক রচনা থেকেও কিছু কিছু পাওয়া যায় কিংবা অনুমান করা যায়, কিন্তু পরবর্তীকালের কিছু রচনায় স্পষ্টত কাল্পনিক নামগুলি ছাড়া সর্বত্রই ঋষিকবির নাম সচেতন ও অবধারিতভাবে স্তোত্রের সঙ্গে স্মরণ করা হয়েছে। এমন কি, তিন হাজার বছরেরও আগে রচিত এই স্তোত্রগুলি যে কবিনামবিহীন নয়, তাতেই বৈদিক জনসাধারণের কবিতা বা স্তোত্রবিষয়ক মনোভাবটি চমৎকারভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

রচনাকাল

মৌখিক কাব্যের ভাষা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। সমসাময়িক প্রতিশব্দ ও বাগ্‌বিধিকে আত্মস্থ ক'রে অব্যবহার্য্য ও প্রাচীনতর প্রকাশরীতিকে পরিত্যাগ করা হয়। তাই আদি বাসভূমি থেকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন দিকে যাত্রার পূর্বে যে ইন্দো-ইয়োরোপীয় মূল ভাষাটির প্রচলন ছিল, তা আর্যদের ভারতে আগমণের পূর্বেই পথিমধ্যে অন্য ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে সংযোগের ফলে এবং স্বাভাবিক সময়-বাহিত ধ্বনিগত ও শব্দার্থগত বিবর্তনের ফলে বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। এমনকি ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়ে ঋগ্বেদের প্রাথমিক সূক্তগুলি যখন তাঁরা রচনা করলেন, তারপরেও কথ্যভাষা স্থিতিশীল রইল না। লিখিতরূপের অভাবে আনুমানিক ১৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের অর্থাৎ ভারতভূমিতে আর্যরা পদার্পণ করবার আগেকার রচনার ভাষাকে নিরন্তর সমসাময়িক লক্ষণযুক্ত করে তোলা হচ্ছিল। সম্ভবত ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রচিত সমস্ত সূক্তে এই ভাষা সংস্কারের প্রবণতা অক্ষুণ্ণ ছিল। শেষোক্ত সময়সীমাতে সংহিতা-রচনার ধারা তুলনামূলকভাবে ক্ষীণ হয়ে সম্পাদনাকর্ম বেড়ে ওঠায় ভাষা কতটা স্থিতিশীল হয়ে পড়েছিল। ফলে সেই যুগের ভাষার সূক্তগুলিকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা একটি পবিত্র দায়িত্বরূপে গণ্য হয়েছিল। ভাষাগত পরিবর্তন থেমে যাওয়ার আরও একটি কারণ হল সেই সময়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সাহিত্যরীতি অর্থাৎ গদ্যে ব্রাহ্মণসাহিত্যের সূত্রপাত। সংহিতা রচনার প্রেরণাময় ও সৃষ্টিশীল পর্যায়টি ততদিনে শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেছিল এবং ক্রমশই অনুষ্ঠান-সর্বস্ব ভাষ্যমূলক গদ্য রচনার দিকে বিবর্তিত হচ্ছিল। ইদানীং ঋগ্বেদ রচনার কাল খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ (মতান্তরে ত্রয়োদশ) শতক থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে ধার্য করা হয়ে থাকে, যদিও সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন কালসীমা সম্পর্কে গবেষকদের ভিন্ন ভিন্ন অভিমত রয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পণ্ডিতরা সাধারণভাবে অনেক বেশি প্রাচীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। সমসাময়িক গবেষকদের মধ্যে কোন কোন ভারতীয় পণ্ডিত এখনও প্রাচীনতার পক্ষপাতী, কিন্তু সাধারণভাবে ভারতীয় ও বিদেশী

বিদ্বৎসমাজের অভিমত এই যে ঋগ্বেদ-রচনা আনুমানিক ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১০০০ বা ৯০০ খিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে হয়ে গিয়েছিল। পণ্ডিত টি বারো-র মতে প্রাচীনতর বৈদিক বা পূর্ব-বৈদিক সাহিত্য (অর্থাৎ ঋগ্বেদের প্রথম থেকে নবম মণ্ডলের সূক্তগুলি) ১২০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে রচিত হয়ে গিয়েছিল, আর উত্তর-বৈদিক সাহিত্য (অর্থাৎ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল থেকে উপনিষদ্ পর্যন্ত) ১০০০ থেকে ৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল। ডঃ সুকুমার সেন কতকটা পরবর্তীকালে রচনার সীমানিরূপণের পক্ষপাতী (অর্থাৎ সূচনা আনুমানিক ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ ; ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনায় বৈদিক ভাষার তুলনায় অবেস্তা কিছু পরবর্তী অর্থাৎ ৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ—অতএব এই দুটি ভাষার সাধারণ উৎসটি অর্থাৎ ইন্দোইরাণীয় সাহিত্যের আদিপর্ব ১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পিছিয়ে যাবে। তাঁর মতে ঋগ্বেদ খ্রিস্টপূর্ব একাদশ থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়ে গিয়েছিল। আবার কিছু কিছু গবেষক সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের রচনাকালের নিম্নতম সীমা ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ধার্য করেছেন, অবশ্য পণ্ডিতমহলে এ মত গৃহীত হয়নি।

ঋগ্বেদ-রচনায় সর্বাধিক কালগত ব্যবধান রয়েছে প্রথম নয়টি মণ্ডল থেকে দশম মণ্ডলের মধ্যে। যেহেতু একমাত্র দশম মণ্ডল থেকেই সামবেদ কোন উদ্ধৃতি দেয় নি, এতেই প্রমাণিত হয় যে দশম মণ্ডল সামবেদের পরবর্তী। ভাষাগত দিক দিয়েও এই মণ্ডলের অর্বাচীনত্ব প্রমাণিত ঃ শব্দ-ভাণ্ডার, ব্যঞ্জনবর্ণের রূপ, বাক্যগঠন রীতি, ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য—সমস্তই এখানে ভিন্ন। অনেক প্রাচীনতর বাক্‌রীতি অপ্রচলিত হয়ে গেছে এবং বহু নূতন বাক্‌পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে—বাগ্‌ভঙ্গি, ক্রিয়াপদের গঠন, শব্দরূপ ও ধাতুরূপের সীমাবদ্ধ বৈচিত্র্য সঙ্কুচিত ও বহুপূর্বপ্রয়োগ অচলিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছে। প্রত্নকথা, দেবকল্পনা, ভৌগোলিক সংস্থান ও দার্শনিক প্রতীতির দিক দিয়েও দশম মণ্ডলকে বহু পরবর্তী রচনারূপে চিহ্নিত করা যায়। যদিও এতে কিছু কিছু প্রাচীনতর সূক্ত সন্নিবেশিত হয়েছে, আমাদের মনে হয় যে সামূহিক স্মৃতি সম্পূর্ণ ক্ষয় হওয়ার পূর্বে কয়েকটি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্প তাৎপর্যপূর্ণ সূক্তকে সংরক্ষণ করার একটা চেষ্টা হয়েছিল। স্বভাবতই এই প্রবণতা সেই সময়ের দিকেই সংকেত করছে, যখন মন্ত্ররচনার সৃষ্টিশীল পর্যায় অবসিত হয়ে সংরক্ষণ, পুনরাবৃত্তি ও সংশ্লেষনের পর্যায় আরম্ভের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। তাই দশম মণ্ডলকে পরবর্তী বৈদিক-সাহিত্য সূচনার প্রথম সৃষ্টিরূপে সাধারণভাবে গ্রহণ করা হয়।

ভের্নন আর্নল্ড্ বলেছেন যে, ঋগ্বেদের সূক্তগুলি তিনটি প্রধান ভাবে বিন্যস্ত হয়েছিল। প্রথম ভাগে রয়েছে প্রথম মণ্ডলের ৫১তম সূক্ত থেকে মণ্ডল পর্যন্ত ; এতে প্রকৃতপক্ষে আরোহী সূক্ত-সংখ্যার ভিত্তিতে সংগৃহীত চৌদ্দটি মন্ত্র-সংগ্রহ রয়েছে। এইগুলি হচ্ছে তথাকথিত পারিবারিক মণ্ডল যেখানে প্রথম সূক্তগুচ্ছ অগ্নির উদ্দেশে

নিবেদিত, আর তার পরই রয়েছে ইন্দ্রসূক্তগুলি। দ্বিতীয় বিভাগে রয়েছে প্রথম মণ্ডলের ১-৫০ সূক্ত এবং অষ্টম মণ্ডল—এটাও আসলে পারিবারিক সংগ্রহেরই আরেকটি পর্যায়, যেখানে সূক্তবিন্যাস প্রথম বিভাগের মত নিয়মিত নয় এবং অগ্নি-সূক্তগুলি মণ্ডলের প্রারম্ভিক অংশ নয়। এই বিভাগটি প্রথম বিভাগের তুলনায় ক্ষুদ্রতর। তৃতীয় বিভাগে রয়েছে নবম মণ্ডল। আর্নল্ড্ মনে করেন এই মণ্ডলেই ঋগ্বেদের নূতন ধরনের পাঠ প্রস্তুত করার প্রয়াস আরম্ভ হয়ে গেছে, যেখানে সূক্তবিন্যাস কবি ও তাঁর পরিবারের পরিচয় দিয়ে নির্ধারিত না হয়ে উদ্দিষ্ট দেবতা অনুযায়ী হয়ে থাকে। কিন্তু এ ধরনের কোন চেষ্টা যদি সত্যিই হয়ে থাকে, তা নবম মণ্ডলেই সীমাবদ্ধ ছিল। চতুর্থ বিভাগে রয়েছে দশম মণ্ডল, যেখানে রচনার দুটি অংশে সূক্তসমূহ মন্ত্রসংখ্যার আরোহী ও অবরোহী ক্রমে বিন্যস্ত হয়েছে।

ভাষ্যকার

প্রাথমিক ও্ং বৈদিক সাহিত্যের ভাষা ছিল আচার্য ও শিষ্যের আলাপ অর্থাৎ মৌখিক এবং এই জন্যই সেগুলি সংরক্ষিত হয় নি। অধিকাংশ আর্য বালকের শিক্ষাব্যবস্থার পাঠ্যতালিকা ছিল বেদের সূক্তগুলি; যেহেতু দেবতারা সাধারণ্যে পরিচিত ছিলেন এবং সঙ্ঘবদ্ধ সামাজিক অনুষ্ঠানরূপে যজ্ঞ প্রায়ই আয়োজিত হত আর সমগ্র সমাজ এতে অংশগ্রহণ করত—তাই ভাষ্যের প্রয়োজন সম্ভবত খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞানুষ্ঠান যতই বিরল ও দীর্ঘ ব্যবধানে অনুষ্ঠিত হতে লাগল এবং সেই সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম ও আনুক্রমিক যুগবাহিত নূতন অধ্যাত্মবিদ্যার মধ্য দিয়ে নূতন নূতন চিন্তার প্রচলন হতে লাগল, —প্রাচীন সাহিত্যের সংরক্ষণ করার প্রয়োজন ততই অনুভূত হল ; ফলে নানারকম ভাষ্যও রচিত ও সংরক্ষিত হল। এদের মধ্যে আদিমতম হচ্ছে ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি : পরবর্তীকালে আরণ্যক ও উপনিষদ্ সাহিত্যে যজ্ঞ প্রতীকীভাবে ব্যাখ্যাত হল। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত কোন ভাষ্য আমরা পাই নি, সম্ভবত সেগুলি থাকলেও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

যে সমস্ত ভাষ্যকারদের রচনা আমাদের কালে এসে পৌছেছে তাঁদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে খ্যাতকীর্তি ব্যক্তিদের নাম হল : স্কন্দস্বামী, নারায়ণ, উদগীথ, হস্তামলক, উবট (১১শ শতাব্দী), বেঙ্কটমাধব (১২শ), আনন্দতীর্থ (১২-১৩শ), আত্মানন্দ (১৩শ), সায়ণ (১৪শ), রাবণ (১৬শ), দেবস্বামী, ভট্টভাস্কর, হরদত্ত, সুদর্শনসূরি, ভবস্বামী, রহুদেব, শ্রীনিবাস, ভাস্করমিশ্র, মাধবদেব ও মাধবাচার্য। লুই হুনু বলেছেন, প্রাথমিক পর্যায় থেকেই ঋগ্বেদ সাহিত্য ভাষ্যের বিবিধ প্রবণতার প্রেরণাস্থল হয়েছে—কিছু কিছু ব্যাখ্যা যজ্ঞানুষ্ঠানকেন্দ্রিক, কিছু বা দূরাবগাহী

ভাবনাকেন্দ্রিক, কিছু কিছু আবার প্রত্নকথা ও কাল্পনিক উপাখ্যানের অনুগামী। ভাষ্যকারদের আপন প্রবণতা অনুসারেই ভাষ্যগুলির চরিত্রে এই পরিবর্তন।

সূক্তসমূহের প্রকৃতি ও কাঠামো

ঋগ্বেদীয় কাব্যসাহিত্য সাধারণত একটি স্তবকের মধ্যেই কোনও ভাব সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করে। কয়েকটি স্তবক একটি সাধারণ বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করেই একটি সূক্তে সংকলিত হয়; সচরাচর একজন দেবতাকে সম্বোধন করা হলেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে শুধু যে বহু দেবতাই একটি সূক্তে সামগ্রিকভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে স্তুত হতেন তাই নয়—একই সূক্তের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়বস্তুও সন্নিবিষ্ট হয়ে থাকে। বেশ কিছু সূক্তের দানস্তুতি অংশগুলি এবং আপ্রীসূক্তের আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-অসংলগ্ন অংশগুলি বা সূর্যাসূক্ত (১০ : ৮৫) কিংবা বহু সংবাদ-সূক্তকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা যায়। আমরা যদি স্তোত্রগীতির প্রতি ঋগ্বেদের কবিদের দৃষ্টিভঙ্গি, এবং সেই সঙ্গে সূক্তসমূহের তথাকথিত ঐন্দ্রজালিক শক্তি দিয়ে দেবতাদের অনুকূল করার প্রচলিত বিশ্বাস, এবং সূক্তগুলিতে অভিব্যক্তি সাধারণ মানুষের মানসিকতা বিশ্লেষণ করি, তবে ঋগ্বেদের কাব্য-মহিমা আমরা আরও ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারব।

স্তোত্রগীতি সম্বন্ধে ঋষিকবিদের দৃষ্টিভঙ্গি

সম্ভবত ঋগ্বেদের কবিদের রচনায় কিছু কিছু আদিম বিশ্বাস কাব্য-রূপ পরিগ্রহ করেছে; বিশেষত ঐন্দ্রজালিক সম্মোহনের সম্বন্ধে আদিম জাদুকর বৈদ্যের মনোভাব এতে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে দেবতাদের ক্ষমতা ও মহাজাগতিক ক্রিয়াকলাপকে পরিপুষ্ট করেই সূক্তগুলি ঐন্দ্রজালিক আবেশ তৈরি করতে সমর্থ। স্তুতি দেবতাদের প্রীতি উৎপাদন করে ঠিক যেভাবে আহুতিরূপে অর্পিত খাদ্য তাদের পরিপুষ্ট করে ; তাই সূত্রগুলি তাদের বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করে। স্তুতি রণক্ষেত্র ইন্দ্রের যোদ্ধা চরিত্রের উৎকর্ষ ত্বরান্বিত করে, এটা অতি প্রচলিত ধারণা ; কেননা ইন্দ্র প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করে আর্যদের জয়, সমৃদ্ধি, শান্তি, স্বাস্থ্য ও সম্পদবৃদ্ধিকে নিশ্চিত করে তোলেন। যজ্ঞের সবচেয়ে প্রীতিকর উপকরণই হচ্ছে মন্ত্র ; একটি শক্তিশালী মন্ত্র যজ্ঞের মান বাড়িয়ে দিতে পারে। মন্ত্রগুলির মধ্যে শব্দের ইন্দ্রজাল নিহিত থাকে এবং যথার্থ স্বরন্যাস, উচ্চারণ, সুর ও অনুষ্ঠানসহ যজ্ঞে প্রযুক্ত হলে সেইসব শব্দ রহস্যময় অলৌকিক ক্ষমতা উৎপন্ন করে (মীমাংসা দর্শনের 'অপূর্ব' সম্বন্ধে ধারণা স্মরণীয়)। মন্ত্রগুলি ঋষিকবিকে অনন্যসাধারণ অন্তর্দৃষ্টিতে ভূষিত করেছিল ; এমন কি সূর্যও নিজেকে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির কাছে প্রকাশ করেছিলেন। এসব কথা শুনি সূক্তে।

এটা অনুধাবন করার জন্য উচ্চারিত শব্দের প্রতি আর্যদের অদ্ভুত শ্রদ্ধাবোধের তাৎপর্য প্রয়োজন, তাঁদের কাছে বাক্ (গ্রীক 'লোগস') হল সেই বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণ যা মানুষকে প্রাণিজগতের বহু উর্ধ্বে উন্নীত করে ; এমন একটা স্তরের কাছাকাছি নিয়ে আসে যেখানে তার সঙ্গে দেবতাদের অবারিত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সুপ্রযুক্ত স্তোত্র শতবর্ষব্যাপী পরমায়ুর আশ্বাস দেয়; যে ব্যক্তি দেবতাদের স্তুতিগান করে না, জীবনে তার কোনো উন্নতি হয় না। প্রশস্তি তো শুধু দেবতাদের ওজস্বিতাবর্ধক অন্নই নয়, তা তাঁদের সৌন্দর্যে অলঙ্কৃত করে। মন্ত্রের সাহায্যে ঋষিকবি পাপ ও দুর্ভাগ্য অতিক্রম ক'রে নিরাপত্তার বেলাভূমিতে উপনীত হওয়ার প্রত্যাশা করেন ; এই রকম মন্ত্রই মানুষের সকল বন্ধন-শৃঙ্খল শিথিল ক'রে দেয়।

অতিলৌকিক অর্থেও স্তোত্রগীতি সৃজনধর্মী হতে পারে। অঙ্গিরা বংশের ঋষিরা ছিলেন দেবতাদের প্রতিবেশী ও প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রকৃত কবি ; সেই পূর্বসূরিগণ গোপন নিগূঢ় জ্যোতি জয় করেছিলেন ; নিজেদের স্তোত্রের সাহায্যে তাঁরা উষাকে অর্জন করেছিলেন। এই বক্তব্যের মূলগত তাৎপর্য এই যে, দেবতাদের প্রতিবেশী সত্যভাষী অঙ্গিরা ঋষিরা যদি যথার্থ প্রশস্তি না গাইতেন, তাহলে সম্পূর্ণ সৃষ্টিই প্রগাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন রয়ে যেত। অতএব মন্ত্রের অতিজাগতিক ভূমিকা স্পষ্ট ; তাদের মাধ্যমেই মানুষ ঐহিক সীমিত স্তর থেকে উৎক্রমণ ক'রে বিশ্বস্রষ্টার স্তরে উন্নীত হয়।

স্তুতি শুধুমাত্র কাব্যিক আবেগ-উন্মাদনার অভিব্যক্তি নয় ; এর দ্বারাই প্রার্থিত বরলাভের প্রত্যক্ষ উল্লেখ বারবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নূতন মন্ত্ররচনা ক'রে সম্পদ ও বলদায়ী অন্ন দান করার জন্য বিভিন্ন দেবতার কাছে প্রার্থনা করা হয়, প্রশস্তির বিনিময়ে দৈব অনুগ্রহ ও প্রাণ-প্রাচুর্য কামনা করেন ঋষি-কবি উপাসনার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্গ হল স্তোত্রপাঠ। সূক্তরচনার আরো একটি কারণ এই যে, দেবতারা তাদের মাধ্যমে নন্দিত হতে ভালবাসেন ; এইজন্য বারবার তাঁদের উপস্থিত হয়ে মন্ত্রের স্তুতি উপভোগ করার আহ্বান জানানো হয়। বলা হয়েছে যে বিপ্ররা অর্থাৎ ঐশী প্রেরণা-ধন্য কবিরা ঋভুদের জন্য স্তোম রচনা করেছেন।

ঋগ্বেদের প্রধান দুই দেবতার অন্যতম অগ্নিকে দেবতাদের কবি ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁর প্রতি নিবেদিত স্তুতি দিয়েই প্রাচীনতর মণ্ডলগুলির প্রারম্ভিক সূক্তসমূহ গঠিত হয়েছে, এর অন্যতম কারণ সম্ভবত অগ্নির কবিসংজ্ঞা। কবিদের হৃদয়েই স্তোত্রের জন্ম ; রথনির্মাতা যেভাবে তার শিল্পকে ধৈর্য ও শ্রমের সাহায্যে প্রকাশ করে তেমনি কবিও শব্দের মাধ্যমে অনুরূপভাবে অনুভূতিকে অভিব্যক্ত করেন। সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নের উপমা দিয়েও এই একই বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। জনৈক কবি নিজেকে শব্দের কারিগর ব'লে অভিহিত করছেন, তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে,

তিনি সচেতন শিল্পী এবং কাব্যের শিল্পকর্মটিও যত্নসাপেক্ষ যেমন ধীর নিষ্ঠার বস্ত্রবয়ন সম্পাদিত হয় তেমনই। আরেকজন কবি ঘোষণা করেছেন যে, তাঁদের নূতন ভাষা দিয়েই দেবতারা কাব্যের প্রধান উপাদান সৃষ্টি করেছিলেন ঃ মনোরমা বাক্ যদি যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়, তা'হলে অন্ন ও ওজস্বিতা উৎপাদন করে ; তাই বাক্ প্রকৃতপক্ষে কামধেনু। মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার পূর্ববর্তী বিনিময়ভিত্তিক প্রাচীন ভারতীয় বাণিজ্যে গাভী মুদ্রার মতোই ব্যবহৃত হ'ত, এ-কথা মনে রাখলে কামধেনুর চিত্রকল্পটি বিশেষ তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে। অন্যত্র বলা হয়েছে, প্রেমময়ী সুসজ্জিতা নববধূ তার দয়িতের কাছে যেভাবে নিজেকে উন্মোচিত করে, তেমনিঁ কবির কাছে বাক্ও আপন সৌন্দর্য প্রকাশ করে। প্রেরণা ও ছন্দোযুক্ত হওয়ার পরই সাধারণ বাক্ নবরূপে অপৌরুষেয় হয়ে ওঠে।

অধিকাংশ কাব্যশিল্পবিষয়ক মন্ত্র যে আমরা প্রথম (৫১-১৯১ সূক্ত) ও দশম অর্থাৎ কালগতভাবে দুটি নবীনতম মণ্ডলে পাই, তা খুবই কৌতূহলপ্রদ। সৃষ্টিশীল রচনাপ্রবাহে যখন ভাঁটার টান শুরু হয়েছে, পরবর্তী প্রজন্মগুলি সম্ভবত তখন নিরাসক্ত দূরত্ব থেকে সৃষ্টির রহস্যকে বিশ্লেষণ ক'রে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে চাইছিল। নবম মণ্ডলে আমরা প্রায়ই 'প্রত্নমন্ম বা পুরাণীগাথা' অর্থাৎ পুরাতন প্রশস্তি বা পুরাতন গীতির কথা শুনি। বস্তুত, নূতন রচনা কবির গভীর শ্রদ্ধাবোধেরই পরিচায়ক যার প্রভাবে তিনি উদ্দিষ্ট দেবতার জন্য নূতন রচনার অর্ঘ্য নিবেদন করছেন। অন্যান্য মণ্ডলেও পুরাতন ও নূতন গীতিকে একই সঙ্গে এমনভাবে প্রশস্তি করা হয়েছে যাতে মনে হয়, এদের গুণগত মাত্রা প্রতিসূক্তেই ভিন্ন। প্রায় কুড়িটি নূতম বা 'নব্য' সূক্তের উল্লেখ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বৈদিক কবিরা এই তথ্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন যে তাঁদের নিজস্ব সময়ের বহুপূর্ব থেকেই ঋগ্বেদের সূক্ত-রচনার সূত্রপাত হয়েছিল।

রচনা প্রকরণ

সৌন্দর্য ও লাবণ্য সম্পর্কে ঋগ্বেদে অনেক শব্দ রয়েছে যেমন ঃ পেশ, স্বর, শ্রী, বল্গু, ভদ্র, ভন্দ, চারু, প্রিয়, বপুস্, রূপ, কল্যাণ, শুভ, চিত্র, স্বাদু, রণ্ব (বা রণ্য) ; বাম, যক্ষ ও অদ্ভুত। এই সমস্ত শব্দের মধ্যে অনেকগুলি প্রাথমিক ভাবে বিভিন্ন শিল্পকলার দিকে ইঙ্গিত করছে। কয়েকটি শুভবাচক এবং অন্যগুলি মুগ্ধতা ও মিষ্টস্বাদের অর্থবহ। কবিরা অবশ্য আসবাব বা রথ নির্মাণ এবং বস্ত্র বয়নের চিত্রকল্প নিয়েই প্রধানত বেশি যত্নবান্, কেননা কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁদের যৌথ অবচেতনে এই দুটি মৌলিক ভাবনাই সমধিক সক্রিয় ছিল। এইসব চিত্রকল্প বিশ্লেষণ ক'রে আমরা বুঝতে পারি—(ক) শেষতম বা চূড়ান্ত কারুশিল্পী কর্তৃক ব্যবহৃত হওয়ার পূর্বেই কাঠামোর অংশগুলি পৃথকভাবে নির্মাণ করা যেতে পারে ; (খ) সম্পূর্ণ পৃথক

ব্যক্তিগণ এইসব অংশ করতে পারেন কিংবা পূর্বসূরিদের দ্বারা নির্মিত সামগ্রিক কাঠামো থেকে পূর্বপ্রস্তুত সমরূপ অংশগুলি উত্তরাধিকার হিসাবে গৃহীত হতে পারে ; (গ) বা শেষতম চূড়ান্ত শিল্পীটি পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী কাঠামোর পূর্বপ্রস্তুত অংশগুলিকে ব্যবহার করেন ; (ঘ) যেহেতু প্রত্যেক শিল্পীর চূড়ান্ত সৃষ্টিই অন্য যে কোন শিল্পীর তুলনায় ভিন্ন, সেহেতু শিল্পনির্মিতির অন্ত্য অভিব্যক্তিতেও পৃথক ব্যক্তিত্বের অনিবার্য স্বাক্ষর থাকে ; সেই অন্ত্য অভিব্যক্তিকে হয়তো বা অনুকরণ করা যায়, কিন্তু কখনোই অন্য কেউ তাকে 'সৃষ্টি' করতে পারেন না ; (ঙ) অতএব, অন্তর্দৃষ্টি যেহেতু শিল্পীকে পরিচালিত করে, তাই তিনি (বিশেষত যদি কবি হয়ে থাকেন) সমকালীন অন্যান্য মানুষের থেকে আপন স্বভাবধর্মে পৃথক ; অসামান্য প্রতিভান্বিত হওয়াতেই তাঁর সৃষ্টি 'ঐশী প্রেরণাসঞ্জাত' বা 'অপৌরুষের' রচনারূপে পরিগণিত হয়।

রূথ ফিনেগান বলেছেন, শ্রুতি-ঐতিহ্যের কবি তাঁর রচনায় একই সঙ্গে বদ্ধ ও স্বাধীন ; একাধারে পুরাতন ও নূতন, ঐতিহ্য ও মৌলিকতার প্রতিনিধি—তিনি যেমন স্বাধীন ও তাৎক্ষণিকভাবে নূতন ধরনের সংযোজন করেন তেমনি একই সঙ্গে একটি-সর্বসম্মত পরিপ্রেক্ষার মধ্যেই তিনি তাঁর শিল্প-কাজ করেন। তন্তুবায় বা রথনির্মাতার উপমায় এ দুই কারুশিল্পীর ব্যবহারের জন্য কোন সামগ্রিক বস্তুর খণ্ড খণ্ড উপাদানের অস্তিত্বের উপমান শ্রুতি-সাহিত্যের প্রকৃতিকেই প্রকাশ করে ; কেননা তাতেও কোন একক শব্দের পরিবর্তে মুখ্যত সেইসব পদগুচ্ছ ব্যবহৃত হয় যা সুদূর অতীতের পূর্বসূরি কবিদের দ্বারা নিরন্তর পরিমার্জিত হয়ে অবশেষে যথাযথ ও সুসম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই দিক দিয়ে ভাবলে বহুস্তরে-বিন্যস্ত ঋগ্বেদ কোন সর্বতোভাবে নতুন সাহিত্য-ধারাব জন্ম দেয় নি। বহু রচয়িতার সন্তান সন্ততি ও শিষ্যদের পরম্পরায় আমাদের কাছে যে সমস্ত সূক্ত দীর্ঘ শ্রুতি ঐতিহ্যের পথ বেয়ে এসে পৌঁছেছে, সেইসব বিভিন্ন যুগের কাব্য রুচি ও কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। শব্দই কবির মৌল উপাদান ; আবার শব্দের অন্তরালে নিহিত রয়েছে কাব্যিক অভিজ্ঞতা—একই সঙ্গে যা আবেগ-নির্ভর ও বোধিদীপ্ত ; অনুভবগম্য চিরচঞ্চল।

সূক্তের শ্রেণীবিভাগ

ঋগ্বেদের প্রায় প্রত্যেক মন্ত্রই স্বয়ং-সম্পূর্ণ একক ; অধিকাংশ সূক্তই একটি-মাত্র ছন্দোরীতি অনুসরণ করে, যদিও অন্তিম বা উপসংহারের কয়েকটি শ্লোক কখনও কখনও ভিন্ন ছন্দে রচিত হয়—পরবর্তী মহাকাব্যগুলিতেও সর্গের সমাপ্তি বোঝাতে এই রীতিই ব্যবহৃত হত। মাঝে মাঝে একই সূক্তে দুটি ভিন্ন ছন্দও ব্যবহৃত হয়েছে। গঠনকৌশলের দিক দিয়েও যে কোনো সূক্ত সাধারণত একটি মাত্র বিষয়বস্তুকে

অবলম্বন ক'রেই রচিত ; তবে প্রসঙ্গ-বিচ্যুতি ও বিষয়গত প্রক্ষেপ বহুস্থানেই পাওয়া যায়—এদের কিছু কিছু বেশ দীর্ঘায়ত এবং এই প্রক্ষেপের জন্যে নূতন ক'রে মূল বিষয়বস্তুতে প্রত্যাবর্তন করার প্রয়োজন হয়।

ভি. এম. আপ্‌টে ঋগ্বেদের সূক্তগুলিকে পরিপ্রেক্ষা অনুযায়ী পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—(১) ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিষয়ক ঃ বিবাহ, অন্তিম সংস্কার প্রভৃতি গৃহ্য অনুষ্ঠানে যে সব ব্যবহৃত ; (২) প্রার্থনা বিষয়ক ঃ আশীর্বাদ, প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি (৩) প্রত্নকথা বিষয়ক ঃ প্রত্ন উপাখ্যান-সূচক সেইসব সূক্ত যেখানে প্রাসঙ্গিক অনুষ্ঠানসমূহে এদের প্রাসঙ্গিকতা নিহিত। (৪) আনুষ্ঠানিক উৎসর্গমূলক ঃ যজ্ঞের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সঙ্গে যে সমস্ত সূক্তের যথেষ্ট প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে, (৫) যজ্ঞে প্রযুক্ত হলেও অনুষ্ঠানের সঙ্গে যে সমস্ত সূক্তের যোগ নিতান্ত শিথিল।

আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্য অবশ্য আমরা অন্তরঙ্গ মানদণ্ড দিয়ে অর্থাৎ সূক্তগুলির বিষয়বস্তুর স্বভাববৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রেণী-বিভাগ করছি। যেহেতু অধিকাংশ মন্ত্রই প্রশস্তি বা প্রার্থনা জাতীয়, আলোচনার শুরুতেই আমরা সর্বপ্রথম তাদেরই গ্রহণ করছি। এই সমস্ত সূক্তে প্রশস্তি ও প্রার্থনা হয়তো বা অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশ্রিত নয়, তবে সাধারণত কোন দেবতাকে আহ্বান ক'রে বিভিন্ন অর্ঘ্যের উপচার স্তব দ্বারা তাঁর বন্দনা করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, দেববন্দনায় তাঁর অবয়ব, পোশাক, অলঙ্কার, আয়ুধ, রথ ও অশ্বের উল্লেখ ক'রে তারপর সাফল্য এবং পূর্ব প্রার্থীদের প্রতি প্রদত্ত দানের বর্ণনা করা হয় ; অনেকক্ষেত্রেই এই সব প্রার্থীদের নামে ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের পরিচয়ও নিহিত। এ ধরনের সূক্ত সমস্ত বৈদিক দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়েছে।

প্রশস্তি অংশের পরে আসে প্রার্থনা ; এর বিষয়বস্তু সাধারণত আহুত দেবতার চরিত্র এবং দেবকল্পনায় তার ভূমিকার দ্বারা নির্ধারিত। স্বাস্থ্য, প্রাচুর্য, আরোগ্য, শক্তি, জয়, পরমায়ু, জীবনীশক্তি, সম্পদ, স্বর্ণ, গবাদি পশু, উর্বরতা, দাম্পত্য সুখ ও সন্তানের জন্য সৌর দেবতাদের নিকট প্রার্থনা জানানো হয়। মৃত্তিকার উর্বরতা, বিপদে সুরক্ষা ও দীর্ঘ জীবনের জন্য প্রার্থনা জানানো হয় পাতালের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদের কাছে। প্রার্থনাগুলি শুনে প্রায়ই মনে হয় যে দেবতা ও তাঁর উপাসকদের সম্পর্ক শুধু দাতা ও গ্রহীতার। দেবতাকে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ ক'রে মূল্যবান দানসামগ্রীর কথা, কখনও বা পরিমাণ উল্লেখ করেও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে এই তথ্যও জানিয়ে নেওয়া হয় যে প্রার্থিত প্রাপ্তি যেন দানের সমানুপাতিক হয়। কবি ও সূক্তভেদে প্রার্থনার ভঙ্গী ভিন্ন—কিছু সূক্ত প্রসন্নতা ও শান্তি কামনায়, কিছু কিছু আবার অনুনয়

ও স্তাবকতায় পূর্ণ, আবার কোথাও বা স্পষ্ট বলা হয়েছে যে উপাসক যদি নিজে দেবতা হতেন, তা হলে সমস্ত প্রার্থনাই তিনি যথাযথভাবে পূরণ করতেন।

প্রশস্তি ও প্রার্থনামূলক বিষয়বস্তু ছাড়াও ঋগ্বেদের মধ্যে বহুবিচিত্র বিষয়বস্তুর সমাহার লক্ষ্য করা যায়। এসবের মধ্যে রয়েছে বিচিত্র ধরনের গীতিকবিতা, বহু বীর ও বীরত্বের উপাখ্যান সম্বলিত গীতিকা, প্রণয়সঞ্চারী সম্মোহন ও উর্বরতাবর্ধক ইন্দ্রজাল বর্ণনা, অলৌকিক কাহিনী, বন্দনা-গীতি, নিসর্গকাব্য (যেমন রাত্রি সূক্ত বা অরণ্যানী সূক্ত), পানবিষয়ক গীতি, প্রেম-সঙ্গীত, শোক-গাথা, বিবাহ-গীতি এবং আক্ষেপ-গীতি ও অন্যান্য বহু বিষয়ে রচিত সূক্ত। বহু স্তোত্রকেই আমরা যুদ্ধগীতি রূপে চিহ্নিত করতে পারি যেখানে আদিম জনগোষ্ঠীর উপর আর্যদের জয় বর্ণিত হয়েছে। বাইবেলের মধ্যেও এই জাতীয় স্তোত্র লক্ষ্য করা যায় ; যেমন দেবোরার গান, (বুক অব্ জাজেস্ ৫ অধ্যায়) বিজয়গীতি (১ম স্যামুয়েল ১৮ : ৭ এবং জেনেসিস্ ৪ : ২৩)। বৈদিক যুদ্ধগীতিগুলির মধ্যে উৎসাহ ও আড়ম্বরের একটা বিশেষ বাতাববণ রয়েছে ; এছাড়া, এতে শত্রুর উল্লেখ, ইন্দ্রের বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি বার বার উল্লিখিত হয়েছে। এ ধরনের রচনায় আমরা একদিকে আক্রমণকারী আর্যজাতির সেনাপতিরূপে বন্দিত ইন্দ্র এবং অগ্নি, বায়ু, সোম, মরুদ্‌গণ ও বিষ্ণু এবং অন্যদিকে বৃত্র, অহি, নমুচি, ধুনি, চুমুরি এবং অন্যান্য প্রাগার্য জাতির গোষ্ঠীপতিদের মধ্যে ভয়ঙ্কর এক সংগ্রামের আভাস পাই। প্রতি পক্ষেই অনগামী সৈন্যদল বর্ণিত হয়েছে, শেষ পর্যন্ত ইন্দ্র প্রাচীর-বেষ্টিত বসতিগুলির দুর্গ-প্রতিরোধ ভেদ ক'রে বিজিত জাতির গবাদি পশু, স্বর্ণ সম্পদ লুণ্ঠন করেন এবং বিজিত বন্দী শত্রুদের দাস ও দস্যু ব'লে অভিহিত করে আর্য দেবতার ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতাও উল্লিখিত তবু শত্রুর শক্তিকে প্রায়ই 'মায়া' বলে অভিহিত করা হয়েছে। শত্রুর বীরত্ব ছাড়াও আর্যপক্ষের জয়কে যা নিশ্চিত করেছে তা হল বজ্র। এর ঠিক পরেই রয়েছে আনন্দ অভিব্যক্তির মন্ত্র। যাযাবর আক্রমণ-কারীরা বসতি বিস্তারের বিশেষ প্রয়োজনে ভূমি অধিকারের জন্য নির্মম ও নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল। আক্রমণকারীদের ক্রোধ উদ্রেক করার জন্য আদিম অধিবাসীরা যদিও কোন অপরাধই করে নি এবং নিজেদের গোষ্ঠী ও বসতিকে রক্ষা করার জন্যই তারা যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল— তবু তারাই পাপ ও অমঙ্গলের প্রতীক বর্বর জাতিরূপে অকারণে নিন্দিত। কিন্তু যুগে যুগে অনিবার্যভাবেই আক্রমণকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি এরকমই হয়ে থাকে। পূর্বোক্ত যুদ্ধগীতিগুলিতে ইন্দ্র ও তাঁর সহায়কদের সম্পর্কে অসংখ্য গৌরবসূচক বিশ্লেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে এবং অন্যদিকে অনার্যজাতি মাত্রকেই অন্ত্যজ ও ঘৃণ্যরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, ইন্দ্রের বজ্রই সম্ভবত ভারতবর্ষে ব্যবহৃত প্রথম লৌহ-নির্মিত অস্ত্র। সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের কাছে এই ধাতুটি ছিল সম্পূর্ণ

অপরিচিত ; প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বলেন, মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীতে তা সম্ভবত এদেশে প্রথম ব্যবহৃত হয়।

সংবাদসূক্ত

ঋগ্বেদে প্রায় কুড়িটি সংলাপ সূক্ত বা 'সংবাদ-সূক্ত' রয়েছে ; এদের প্রকাশরীতি কতকটা বিস্ময়কর, কেননা আপাত দৃষ্টিতে এদের মধ্যে আকস্মিকতা এবং যজ্ঞীয় বিনিয়োগের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যদিও প্রকৃত সংলাপের মতোই প্রকাশরীতি এগুলিতে রয়েছে, তবু বক্তাদের নাম উল্লিখিত নেই ব'লে প্রকরণ থেকেই সেগুলি অনুমান ক'রে নিতে হয়। অনেকগুলি সূক্ত পড়ে মনে হয় যেন সেগুলি স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়, এও মনে হয় যেন প্রচলিত পাঠ থেকে ব্যাখ্যামূলক গদ্য অংশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এই থেকে বহু গবেষক এই সব সূক্তের মৌলিক স্বভাব-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নানা-রকম অনুমান-নির্ভর সিদ্ধান্ত করেছেন। এদের খণ্ডিত অবস্থা বিচার ক'রে ওল্ডেনবের্গ এদের আখ্যান বা গীতিকা-ধর্মী সূক্ত রূপে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, শুধুমাত্র শ্লোকাংশই স্মৃতিতে গ্রথিত করা হত ব'লেই ব্যাখ্যামূলক ও সংযোজক গদ্য অংশগুলি লুপ্ত হয়ে গেছে ; প্রতিটি অনুষ্ঠানেই গদ্যাংশগুলি নূতন ক'রে পরিমার্জিত হত, ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি প্রকৃত পক্ষে সেইসব বিলুপ্ত অংশ-সমূহের সম্পূরণ করত। সিলভ্যাঁ লেভি জানিয়েছেন যে সংবাদ-সূক্তগুলি নাটকেরই বিশিষ্ট একটি ধরন। এই সব সূক্তের প্রকৃত চরিত্র বা মৌলিক উদ্দেশ্য নির্ণয় করার মতো কোন উপায় আমাদের নেই, তবে যজ্ঞীয় বিনিয়োগের অনুপস্থিতি থেকে পণ্ডিতরা নানাবিধ অনুমান প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। সাধারণভাবে ঋগ্বেদের সূক্তগুলি যদিও প্রথাগতভাবে কবির নাম, ছন্দ ও দেবতার নাম এবং যজ্ঞীয় বিনিয়োগের নির্দেশ দিয়ে থাকে, সংবাদ-সূক্তগুলি কিন্তু সেদিক থেকে প্রচলিত নিয়মের অন্যতম ব্যতিক্রম। এর কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে হ্বিন্টারনিৎস্ বলেছেন যে সংবাদ-সূক্তগুলি সম্ভবত সমাজ-মানসে ভাসমান গীতিকার অংশ ছিল, যে সব উপাদান পরবর্তীকালে বিভিন্ন মহাকাব্য, পুরাণ, বৌদ্ধ সাহিত্য এবং এমনকি ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের নাটকগুলিতেও ব্যবহৃত হয়েছিল। তবে নিশ্চিতভাবে এখন বলা সম্ভব নয়, প্রকৃতই সংবাদ-সূক্তের কোন সহগামী গদ্য অংশ ছিল কিনা ; তৎকালীন শ্রোতার কাছে এই প্রকাশরীতিই সম্ভবত পর্যাপ্ত ছিল, কেননা উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ প্রত্নকথাও উপাখ্যান যেমন শ্রোতৃ-সমাজের কাছে পরিচিত ছিল তেমনি সর্বজনসম্মত প্রকাশরীতি ও উপযুক্ত স্বরন্যাস ও ইঙ্গিতপূর্ণ প্রত্যক্ষ অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে সম্ভবত শ্রোতা ও দর্শকের কাছে অধিকতর স্পষ্টতা লাভ করত।

সংবাদ-সূক্তগুলির মধ্যে উর্বশী ও পুরূরবার সংলাপই (১০ : ৯৫) সর্বাধিক পরিচিত। রাজা পুরূরবার অপ্সরা-বধূ উর্বশী চার বছর তাঁর সঙ্গে অতিবাহিত ক'রে

পুরূরবাকে ত্যাগ করেছিলেন। পুরূরবা উর্বশীকে তীব্র ব্যাকুলতার সঙ্গে অন্বেষণ করে শেষ পর্যন্ত একটি সরোবরে অন্য অপ্সরাদের সঙ্গে ক্রীড়ারত হংসীরূপে দেখতে পেলেন। রাজা উর্বশীকে প্রত্যাবর্তনের জন্য আকুল অনুরোধ ক'রে ব্যর্থ হলেন। উর্বশী দৃঢ়ভাবে পুরূরবাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। দু-জনের সংলাপ অত্যন্ত মর্মস্পর্শী—একদিকে রয়েছে বিচ্ছেদ-সম্ভাবনায় কাতর মর্ত মানুষের আর্তি ও আকূতি, অন্যদিকে আছে অপ্সরার স্পষ্ট হৃদয়হীন ঔদাসীন্য। ব্যাবিলনের গিল্‌গামেশ মহাকাব্যের সেই সংলাপমূলক অংশটি এর সঙ্গে তুলনীয় সেখানে দেবী ইষ্টার মরণশীল গিল্‌গামেশকে তাঁর প্রণয়ী হওয়ার জন্য আহ্বান করছেন- কিন্তু মর্ত নায়ক দেবীর প্রণয় প্রত্যাখ্যান করছেন। এই বিষয়বস্তুর সামান্য ভিন্ন ধরনের অভিব্যক্তি ঘটেছে আর একটি সংবাদ-সূক্তে—এটির নাম যমযমী সূক্ত (১০ : ১০)। এই সূক্তের আকস্মিক সমাপ্তি গবেষকগণ লক্ষ্য করেছেন। পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাপ্ত সৃষ্টিবিষয়ক প্রত্নকথাগুলির সঙ্গেই এই সূক্তের আত্মীয়তা, কেননা এই ধরনের রচনায় এই বিশ্বাস প্রতিফলিত হয় যে মনুষ্যসৃষ্টির প্রাথমিক পর্বে ভ্রাতা ও ভগিনীর মিলনের ফলেই মানবজাতির প্রথম সৃষ্টি। পরবর্তী সমাজে অজাচার নিষিদ্ধ হওয়ার পরে স্বাভাবিকভাবে অবাধ যৌনতার উপর যে নিষেধ আরোপিত হয়, সম্ভবত তারই ফলশ্রুতি হিসাবে আলোচ্য সংবাদ-সূক্তের উপসংহারটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এছাড়া বৃষাকপিসূক্তে (১০ : ৮৬) ইন্দ্রাণী, ইন্দ্র ও তার পোষ্য বৃষাকপির মধ্যে একটি কৌতূহল-ব্যঞ্জক সংলাপ দেখা যায়। বৃষাকপি অর্থাৎ হনুমানের প্রতি ইন্দ্রের মাত্রাতিরিক্ত প্রশ্রয় ইন্দ্রাণী মেনে নিতে পারছেন না। লোকসমাজের মধ্যে প্রচলিত ও পরবর্তীকালে সবিশেষ জনপ্রিয় হনুমান-উপাসনা পদ্ধতির প্রতি প্রথম ইঙ্গিতরূপে এই সূক্তটিকে গ্রহণ করা যায় যে বৈদিক যুগের ইন্দ্র-চর্চাকে যে সমস্ত লোকচর্যা পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ করে দিয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম হনুমান-উপাসনার সূত্রপাত, বৈদিক যুগের অনার্য সংস্কৃতিতে। অন্যান্য সংবাদ-সূক্তগুলির মধ্যে রয়েছে ইন্দ্র, বসুক্র ও তাঁর স্ত্রীর সংলাপ (১০ : ২৮), অগ্নি ও দেবতাদের সংলাপ (১০ : ৫১-৫৩), ইন্দ্র ও মরুতের সংলাপ (১০ : ৬৫), ইন্দ্র ও অগস্ত্যের সংলাপ (১ : ১৭০), অগস্ত্য, তাঁর শিষ্য, ও অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রার সংলাপ (১ : ১৭৯)। আরো একটি বিখ্যাত সংলাপ হয়েছে সরমা ও পণিদের মধ্যে (১০ : ১০৮)। এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে অধিকাংশ সংবাদ-সূক্তই রয়েছে সংহিতার অন্তিম পর্যায়ে অর্থাৎ প্রথম ও দশম মণ্ডলে। এর কারণ সম্ভবত এই যে সৃষ্টিশীলতার পর্যায় সমাপ্ত হওয়ার পরে যখন সংকলন ও সম্পাদনার প্রক্রিয়া চলছিল তখন জনপ্রিয় গীতিকাগুলিও আহরণ করা হচ্ছিল। সম্ভবত যজ্ঞীয় বিনিয়োগ না থাকায় এই সব গীতিকা পূর্বে সংহিতার অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

দানস্তুতি

অন্য যে ধরনের সূক্ত বা সূক্তাংশ ঋগ্বেদে অধিক সংখ্যায় পাওয়া যায়, তা দানস্তুতি। এই শব্দটি বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে প্রথম উল্লিখিত হয়েছে। অতএব বৃহদ্দেবতা রচিত হওয়ার পূর্বেই দানস্তুতিগুলি বহুপরিচিত হয়ে ছিল ; এটা সহজেই বোঝা যায়। ম্যাকডোনেলের মতে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত 'অনুক্রমনী' গ্রন্থ দানস্তুতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছে—"দাজ্ঞাঞ্চ দানস্ততয়ঃ (২ : ২৩)"। অর্থাৎ রাজাদের দানের স্তুতি এগুলি প্রকৃতপক্ষে নামটি অসার্থক, কেননা এই সব সূক্ত সরাসরি দানকর্মকে প্রশংসা করে না ; বরং তার স্তুতির লক্ষ্য প্রাচীনকালের সেই সব দাতা রাজাদের দান, যাঁরা তাঁদের যজ্ঞ-নির্বাহক পুরোহিতদের পর্যাপ্ত দক্ষিণা দিতেন। সমসাময়িক পৃষ্ঠপোষকরা যাতে পূর্বসূরিদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে প্ররোচিত হন, এই জন্য প্রাচীনকালে প্রদত্ত দানসামগ্রীর আনুপুঙ্খিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ এই সব দানস্তুতিতে রয়েছে। কোন দান-স্তুতিই স্বয়ংসম্পূর্ণ সূক্ত নয় ; কোন দেবতার মহিমা বিবৃত করার জন্য প্রচলিত প্রার্থনা ও প্রশস্তিসহ রচিত একটি সাধারণ সূক্তের পরিপূরক রূপে এই শ্রেণীর কয়েকটি ঋক্ এই সূক্তগুলিতে সংযোজিত হয়েছে। কোন এক নির্দিষ্ট বিন্দুতে এই জাতীয় সূক্ত আকস্মিকভাবে প্রাচীন কালের কোন সম্পৎশালী দাতার বদান্যতার প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠে। অনিবার্যভাবেই এই সব সূক্তের দানস্তুতি অংশটি সাহিত্যের বিচারে নিম্নমানের ও দীন, স্পষ্টতই এই অংশের রচয়িতাও ভিন্ন। সন্দেহ নেই যে, এই ধরনের শ্লোক আপন শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারত না অথচ পূর্বদাতাদের দানের প্রশংসা সমকালীন রাজাকে অনুরূপ দানে ও দক্ষিণায় অনুপ্রেরিত করবে ব'লেই পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বাধ্য হয়েই তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত কোন সূক্তে সংলগ্ন করে রাখতে হত।

বালখিল্য

অষ্টম মণ্ডলের সমাপ্তি-অংশে (৪৯-৫৯ সূক্ত) তথাকথিত বালখিল্যসূক্তগুলি ঋগ্বেদের সমগ্র সম্পূরক বিভাগের সর্বাধিক পরিচিত অংশরূপে পরিগণিত। স্পষ্টতই এই সূক্তগুলি মিশ্র রচনার প্রমাণ নিয়ে পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছিল এবং এ জন্যই এরা সর্বজনগ্রাহ্য নয়। সায়ণ এই সূক্তগুলির কোন ভাষ্য রচনা করেন নি। আটটি সূক্তের মধ্যে যে পুনরাবৃত্তি দেখা যায়, সেই সম্পর্কে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৬ : ২৮) এবং কৌষীতকি ব্রাহ্মণ (৩০ : ৪) সচেতন ছিল। অধিকাংশ সূক্তই ইন্দ্রের উদ্দেশে নিবেদিত ; কিছু কিছু সূক্ত অগ্নি, সূর্য, বরুণ ও অশ্বীদেরও আহ্বান করেছে। এদের মধ্যে কোন নূতন বিষয় ও গঠনগত বা সাহিত্যিক কোনো বৈশিষ্ট্য নেই।

খিলসূক্ত

আপাতদৃষ্টিতে বহু পরবর্তী সম্পূরক সূক্তসমূহের আরও একটি গুচ্ছ সংহিতার শেষভাগে সংস্থাপিত হয়ে 'খিলসূক্ত' রূপে পরিচিত হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে নিবিদ্, পুরোরুচ্, প্রৈষ এবং কুন্তাপ-সূক্ত—একত্রে এই সমগ্র সম্পূরক অংশ ঋক্-পরিশিষ্ট রূপে বিখ্যাত। শৌনকের রচনারূপে প্রচারিত 'আর্ষানুক্রমণী' ও 'অনুবাকাক্রমণী' গ্রন্থেই 'খিল' নামটি সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। যাস্ক খিলসূক্ত থেকে শ্লোক উদ্বৃত করলেও তিনি তাদের 'নিগম' ব'লেই উল্লেখ করেছেন। ম্যাক্সম্যুলার বত্রিশটি খিলসূক্ত গণনা করেছেন কিন্তু আউফ্রেখ্ট-এর মতে এদের সংখ্যা সাতাশের বেশি নয়। স্পষ্টতই অনেক দেরিতে সংহিতার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলেই খিলসূক্তের চরিত্রে বিষমতা দেখা গেছে ; সংহিতার মূল ধারায় গৃহীত হওয়ার পরিবর্তে তাদের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে সম্পূরক অংশে। তবে এই বিলম্বিত অন্তর্ভুক্তি কিন্তু তাদের রচনাকালকে প্রতিফলিত করে নি কেননা এই সব সূক্তের বেশ কয়েকটি মন্ত্রই সংহিতার প্র[illegible] চেয়েও প্রাচীনতর। যাই হোক, খিলসূক্তগুলি যে পরবর্তীকালে সঙ্কলিত হয়েছে তার আরও একটি প্রমাণ হল মূল ঋগ্বেদ থেকে এগুলিতে শ্বাসাঘাতের চিহ্নের পার্থক্য।

বাস্কল শাখার পাঠে খিলসূক্তগুলিকে ঋগ্বেদের অংশরূপে গ্রহণ করা হয়েছিল বলেই মনে হয় ; যদিও এদের অধিকাংশই শাকল পাঠের পূর্ববর্তী। প্রখ্যাত পণ্ডিত কীথ্ মন্তব্য করেছেন যে খুব সম্ভবত খিলসূক্তগুলি ঋগ্বেদে সংহিতার সামান্য পরবর্তী। তবে সাম্প্রতিক রচনার সমকালীন বত্রিশটি সূক্তের মধ্যে সব খিলসূক্তগুলি হয়ত একই পর্যায়ে রচিত হয় নি। এই সব সম্পূরক সূক্তের মধ্যে প্রয়োগ যৎ-সামান্য ; কখনও কখনও যদিও বা সংযোগসূত্র দেখা গেছে, প্রকৃতপক্ষে তা অত্যন্ত ক্ষীণ। এদের বিষয়বস্তুতে রয়েছে নানা বৈচিত্র্য—যেমন স্বস্তিবচন, বিবাহ-অঙ্গীকার, অভিশাপ, জাদুবিদ্যা, স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা, ধীশক্তিবর্ধনের কামনা, সপত্নীদলন, গবাদি পশুর কল্যাণ এবং উত্তম সঙ্কল্প ইত্যাদি ; এরা প্রায়শই খণ্ডিত, কখনও কখনও গূঢ়ার্থবহ এবং সংহিতার মূল অংশ থেকে প্রায়ই কিছু কিছু শ্লোক ঋণ হিসাবে গ্রহণ করে ব'লে বিষয়গত সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নি। খিলসূক্তগুলির মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত হল লক্ষ্মীসূক্ত ও শিবসঙ্কল্পসূক্ত দুটি।

অন্যান্য সূক্তাবলী

পুরোরুচ্, নিবিদ্ ও পৈষন সূক্তগুলি সম্ভবত বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতর পর্যায়ে রচিত হয়েছিল কিন্তু বালখিল্য, মহানাম্নী এবং কুন্তাপ-সূক্তগুলি স্পষ্টতই পরবর্তী

কালের রচনা। এগারটি গদ্যসূক্তসম্বলিত নিবিদ্ অংশে বিভিন্ন দেবতা কিংবা একই দেবতার ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য স্তুত হয়েছে ; এই অংশই ঋগ্বেদীয় কালের প্রাচীনতম গদ্য এবং নিশ্চিতভাবেই প্রচলিত ঋগ্বেদসংহিতার চেয়ে প্রাচীনতর। এই নিবিদ্ সূক্তগুলির অধিকাংশই সংক্ষিপ্ত—বিশুদ্ধ জাদুবৈশিষ্ট্যযুক্ত কয়েকটি মাত্র অক্ষরে বিধৃত সম্মোহনমন্ত্র। প্রকৃতপক্ষে ঋগ্বেদের বহু মন্ত্রই এই সব নিবিদের ছন্দোবদ্ধ রূপ। খুব সম্ভবত প্রৈষ অংশ ঋগ্বেদের সমাপ্তি পর্বের রচনা ; আপ্রীসূক্তগুলির মত এখানেও অগ্নিকে বহু নামে বন্দনা করা হয়েছে। কুন্তাপ অংশে রয়েছে বিচিত্র চরিত্রের বারটি সূক্ত। এদের মধ্যে যেমন রয়েছে নারাশংস জাতীয় মানব প্রসংসা এবং কামনা ও উর্বরতা-সূচক গীতি, তেমনি রয়েছে দুর্বোধ্য বাগাড়ম্বরপূর্ণ এতশপ্রলাপ। এটি আপাতদৃষ্টিতে অপরিমার্জিত যৌনকামনার তাৎপর্যযুক্ত সূক্ত যার সঙ্গে তৎকালীন কোন উর্বরতাচর্যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল ব'লে মনে হয়।

নিবিদ্

হ্রস্ব-কলেবর নিবিদ্ মন্ত্রগুলি আদিতে গদ্যে রচিত হয়েছিল ব'লে যে অনুমান করা হয় তার কারণ, সাধারণ ঋগ্বেদীয় সূক্তগুলির মতো এগুলি ছন্দোবদ্ধ রচনা নয় তবু এদের মধ্যে অদ্ভুত তাল ও লয়ের প্রবাহ রয়েছে। কোন কোন গবেষকের মতে ঋগ্বেদে নিবিদ্গুলি প্রয়োগিক কারণে ব্যবহৃত হয়েছে। অবেস্তা গ্রন্থে আমরা 'নিবেদয়েম্' শব্দটি পেয়েছি কিন্তু সেখানে তার অর্থ অবশ্য আলাদা। ব্রাহ্মণগ্রন্থ অনুযায়ী নিবিদ্-সূক্তে সেই সব দেবতাদের আহ্বান করা হয় যাঁরা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে সোমযাগে হবি গ্রহণ করেন। নিবিদ্সূক্তে কোন শ্বাসাঘাত নেই এবং উচ্চাবচতাহীন সুরে অর্থাৎ একশ্রুতির মধ্যদিয়ে এদের আবৃত্তি করা হয় ; সম্ভবত এ ধরনের উচ্চারণে এদের ঐন্দ্রজালিক গাম্ভীর্য বর্ধিত হয়। নিবিদের মধ্যে মাত্র একজন পুরোহিত অর্থাৎ হোতাই উল্লিখিত হয়েছেন। আহুতির মধ্যে সোমকে উপাদানরূপেই গ্রহণ করা হয়েছে, দেবতারূপে নয়, এতে নিবিদের প্রাচীনত্বই প্রমাণিত অর্থাৎ সোম দেবত্বে উপনীত হবার পূর্বেই নিবিদ্গুলি রচিত হয়েছিল। সম্ভবত যাযাবর আর্যজাতির ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আদিম পর্যায়ের যজ্ঞে এগুলি প্রযুক্ত হত। তাছাড়া ভাষা বিশ্লেষণ ক'রে নিবিদ্গুলির বিশেষ প্রাচীনতা, এমন কি ইন্দো-ইয়োরোপীয় পর্যায়ের নিকটবর্তী অবস্থানই প্রমাণ করা যায়। প্রাথমিকস্তরে নিবিদ্ সংক্ষিপ্ত ঐন্দ্রজালিক সূত্ররূপে থাকলেও ক্রমশ এগুলিকে কেন্দ্র ক'রে দীর্ঘ প্রার্থনা সূক্ত রচিত হতে থাকে। সম্ভবত অসংখ্য নিবিদ্ বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল, কিন্তু আমাদের কালে এর সমস্ত অংশ এসে পৌছয় নি।

আপ্রী সূক্ত

আপ্রীসূক্তের সংখ্যা মোট দশটি এবং এদের প্রত্যেকটিরই পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আপ্রী শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—সকলের মনোরঞ্জনকারী। (আ = সমন্তাৎ, প্রীণয়ন্তি ইতি আপ্রী)। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র অনুযায়ী বিভিন্ন বৈদিক শাখায় আপ্রীসূক্তগুলি ভিন্ন ভিন্ন। যজ্ঞে আহুতি অর্পণের পূর্বে আপ্রীসূক্তগুলি গীত বা আবৃত হয়। আপ্রীসূক্তগুলির বিষয়বস্তু ও চরিত্র-লক্ষণের মধ্যে প্রীতিদায়ক ভাবটি পরিস্ফুট। যজ্ঞানুষ্ঠানের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেবতা অগ্নির প্রীতি উৎপাদনের জন্য তার বিভিন্ন নাম ঘোষণা করে প্রশংসা করা হয়েছে—সমিদ্ধ, ইধ্ম তনূনপাৎ, নারাশংস, ইল, দেবীর্দ্বারঃ, বা দ্বারো দেব্যঃ, উষাসানক্তা, দেব্যৌ হোতারৌ এবং হব্যবহ। মৌখিক সাহিত্য রচনার যুগে কবিরা যেহেতু শব্দের স্বল্পতার জন্য সচেষ্ট থাকতেন, দেবতার বিভিন্নমুখী দক্ষতাকে প্রশংসা করার প্রয়োজনে তাই পূর্বোক্ত বিশেষণগুলি ব্যবহৃত হত। আপ্রীসূক্তগুলি যজ্ঞের প্রাচীনতম ধারা অর্থাৎ পশুযাগের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল ; স্পষ্টতই এগুলি পাচীনতর যুগের রচনা যখন পশুপালন-নির্ভর যাযাবর সমাজে অঞ্চলগতভাবে গোষ্ঠী ও পরিবারের ধারাবাহিকতা প্রতিষ্ঠিত হয় নি এবং সেই জন্য ধর্মীয় ঐতিহ্যের মাধ্যমে নিজেদের সাংস্কৃতিক নীতিকে কঠোরভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা হত।

সোমমণ্ডল

ঋগ্বেদের সমগ্র নবম মণ্ডলই সোমদেবতার প্রতি নিবেদিত। এর বিষয়বস্তু থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সম্পাদনার প্রক্রিয়া অনেক বিলম্বে ঘটেছিল পূর্ববর্তী মণ্ডলগুলি থেকে একজন নির্দিষ্ট দেবতা অর্থাৎ সোমের প্রতি নিবেদিত সূক্তসমূহ একটি পৃথক মণ্ডলে সন্নিবিষ্ট করার মধ্যেই এ-প্রক্রিয়া সীমাবদ্ধ ছিল। এই সম্পাদনা কর্মের পশ্চাৎপটে সক্রিয় অনুপ্রেরণার সন্ধান করতে গিয়ে আমরা এই বিশেষ তথ্যের সম্মুখীন হই যে, বৈদিক ধর্মের কেন্দ্রীয় ও সর্বাত্মক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে সোমযাগ ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। সোমদেবের মধ্যে রাজধর্ম প্রতীকায়িত হয়ে উঠেছিল ; এই রাজধর্মের মধ্য দিয়েই একজন ক্ষত্রিয় সোমদেবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতেন। রাজপদে সোমের উন্নয়ন সোমচর্যার গৌরব বৃদ্ধির সঙ্গে একই সূত্রে গ্রথিত। অভিষেকের সময় সোমদেবকেই ব্রাহ্মণদের রাজারূপে বর্ণনা করা হয় ; এতেও তাঁর আধিপত্য ও আনুষঙ্গিক জাদুশক্তি প্রমাণিত।

সন্দেহ নেই যে, সোমরসের মধ্যে যে মাদকতাময়, উল্লাসজনক ও ভ্রম উৎপাদক বৈশিষ্ট্য ছিল, তারই ফলে যজ্ঞানুষ্ঠানে এর গুরুত্ব ক্রমশ বর্ধিত হয়। দীর্ঘায়ু লাভের

জন্যও এই পানীয় ব্যবহার করা হত। ঋগ্বেদের সোমের মতই অবেস্তায় 'হওম' স্বর্গ থেকে উচ্চ পর্বতে একটি বিপুলকায় পক্ষী দ্বারা আনীত হয়েছিল। ব্যাবিলনীয় প্রত্নকথাতেও রয়েছে, সূর্যদেব শামসের নিকট পবিত্ররূপে গৃহীত ও দীর্ঘায়ুপ্রদ একটি জাদুকরী লতা পর্বতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের সূক্তগুলি সাধারণভাবে পবমান সোম অর্থাৎ পশমের চালুনির মধ্যে দিয়ে ছেঁকে-নেওয়া সোমরসের প্রতি নিবেদিত। শ্বেতবর্ণ, উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় রস 'দ্রোণ' কলসে রক্ষিত হওয়ার সময়ে যে মধুর ধ্বনি নির্গত হ'ত পানকারীদের কানে তা অতি মধুর ঠেকত। ঋগ্বেদীয় প্রত্নকথা অনুযায়ী সোম মূলত দৈব সম্পদ ; পক্ষী দ্বারা পৃথিবীতে আনীত হয়ে তা পার্বত্য অঞ্চলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বহুবিধ বাস্তব, আনুষ্ঠানিক ও প্রতীকী বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে সেই সোম সংগ্রহ করতে হত। সোমলতা থেকে নিষ্কাশিত রসের সঙ্গে নানারকম দুগ্ধজাত দ্রব্য, মধু ও ভৃষ্ট যবচূর্ণ মিশ্রিত ক'রে তার মাদকতা শক্তি বর্ধিত করা হত। আনুষ্ঠানিকভাবে সোমরস প্রস্তুতির সমগ্র প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন সূক্তে এবং বারেবারে বিবৃত হয়েছে। এমনকি প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন পাত্র, দ্রোণকলস, হাতা, পেষণ-প্রস্তর (শিল-নোড়া), ছাঁকনি প্রভৃতিও উল্লিখিত ও প্রশংসিত হয়েছে।

সোমযাগ সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী ; সমস্ত বৈদিক যজ্ঞের মধ্যে দীর্ঘতম হল 'সত্র', এটি একাদিক্রমে দ্বাদশ বর্ষ ধ'রে অনুষ্ঠিত হত। কিছুকাল পরে চারজন পুরোহিত সম্বলিত একদিবসীয় যজ্ঞও এত সম্প্রসারিত হল যে যজ্ঞনির্বাহক পুরোহিতদের সংখ্যা এবং আনুষ্ঠানিক অনুপুঙ্খ অনেক বেড়ে গেল ; বস্তুত সোমযাগ যজ্ঞশ্রেষ্ঠ ব'লে স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত যজ্ঞের সরল কাঠামোয় সম্ভ্রম-উৎপাদক উপাদান, ইন্দ্রজাল ও রহস্য নিরন্তর সংযোজিত হয়ে চলেছিল। পরবর্তী সময়ে সোমযাগের অনুষ্ঠানগত তাৎপর্য বিশেষভাবে বর্ধিত হয়ে যখন তার নিজস্ব অতীন্দ্রিয় রূপকর্ম গড়ে উঠল এবং সংহিতার পূর্বতন অংশ থেকে যখন নবম মণ্ডল পৃথক হয়ে গেল—সোমগীতি বহুসংখ্যায় রচিত ও পরিমার্জিত হয়ে প্রভূত ধর্মীয় ও আনুষ্ঠানিক তাৎপর্যবহ সূক্তসমূহে সন্নিবেশিত হল।

প্রাথমিক পর্যায়ে সোম পার্থিব উদ্ভিজ্জ ; কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে দৈব সত্তায় উন্নীত এবং 'রাজা', 'সম্রাট্' ও ব্রাহ্মণদের অধিপতিরূপে অভিহিত। লক্ষণীয় যে, তৎকালীন ভারতবর্ষে রাজকীয় পদবী যখন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দৃঢ় রূপ পরিগ্রহ করছিল, সে সময়েই রাজার সঙ্গে প্রতীকী ভাবে সোমের সমীকরণ ঘটে এবং তার গুরুত্বও এর দ্বারা বহুগুণ বেড়ে যায় আনুষ্ঠানিক ও ঐন্দ্রজালিক তাৎপর্য যেমন কালক্রমে সমন্বিত হয়েছে, তেমনি আনুষ্ঠানিক পানীয় ও দেবতার মধ্যে ব্যবধানও ক্রমে লুপ্ত হয়ে গেছে। তাছাড়া, সোমের সঙ্গে ইন্দ্রের সম্পর্ক যেহেতু ঘনিষ্ঠ, নবম মণ্ডলের অনেক মন্ত্র প্রাথমিকভাবে সোমসম্বন্ধীয় হয়েও ইন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

নবম মণ্ডলের প্রধান কবিরা কাণ্ব, ভৃগু ও অঙ্গিরা পুরোহিত-পরিবারের সদস্য ; এঁরা যথাক্রমে আট, বারো ও তেইশটি সূক্ত রচনা করেছিলেন। এঁরা এবং অন্যান্য কবিরা সোমকে লতা, দেবতা ও আকাশবিহারী চন্দ্ররূপে বন্দনা করেছেন। সমস্ত বৈদিক ছন্দই এই মণ্ডলে ব্যবহৃত হয়েছে ; তবে মোট সূক্তের অর্ধেকেরও বেশি রচিত হয়েছে গায়ত্রী ছন্দে। সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে অধিকাংশ সোমসূক্ত আমাদের হতাশ করে ; কাব্যগত ভাবে স্পষ্টতই এগুলি নিম্নমানের রচনা। এই মণ্ডলের বেশ কিছু সূক্ত অন্যান্য প্রাচীন কাব্যে প্রচলিত মদ্যপান-গীতির মতো ; পানীয় ও তজ্জাত মাদকতার অবস্থা এসব রচনায় বর্ণিত হয়েছে। অতিদীর্ঘায়িত ও পুনরাবৃত্তিময় যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে এদের নিবিড় সম্পর্ক স্পষ্ট ; প্রসঙ্গ থেকে শ্লোকগুলিকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিলেও কাব্যিক সৌন্দর্য প্রায় কোথাওই খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে মণ্ডলের শেষ সূক্তটি একটি চমৎকার ব্যতিক্রম।

সর্বেশ্বরবাদ

সামগ্রিক বিচারে ঋগ্বেদ নিশ্চিতভাবেই সর্বেশ্বরবাদী। তবু, অন্তিম পর্যায়ের রচনায় পুরোনো বিশ্বাসের প্রতি ক্লিষ্ট সংশয়ের কিছু কিছু চিহ্ন এমন কি একেশ্বরবাদের প্রতি সুস্পষ্ট ঝোঁকও কোথাও কোথাও লক্ষ্য করা যায়। দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রের এতদিনকার তর্কাতীত প্রাধান্য এখন আর বিনা বাক্যে গ্রহণীয় নয়। পারিবারিক মণ্ডলগুলির একটি সূক্তে (২ ঃ ১২) যুদ্ধবিজয়ী ও অলৌকিক খ্যাতিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ দেবতারূপে ইন্দ্র যদিও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বন্দিত হয়েছেন, তবু তার মধ্যেও কয়েকটি মন্ত্রে যেন সংশয়ের কালো ছায়াও ফুটে উঠেছে। এই সূক্তটি 'সজানীয়' ব'লেও পরিচিত কেননা এর প্রতি মন্ত্রে একই ধ্রুবপদ ঃ 'স জনাস ইন্দ্র'। পরবর্তী একটি সূক্তে (৮ : ১০০) সংশয়ের ছায়া আরো স্পষ্ট ও ঘনীভূত। অবশ্য সংশয়ের এই তীক্ষ্ণ সুরকে বেশি দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে দেওয়া হয়নি ; দেবতা এখানে যেন স্বয়ং যজমানকে নিজ গৌরবের কথা জানিয়ে আশ্বস্ত করেছেন, অবিশ্বাসীর সন্দেহ দূর ক'রে তাঁর প্রতি আস্থাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ইন্দ্র বা অন্যান্য দেবতার অস্তিত্ব বা পরিচয় সম্পর্কে সরাসরি অবিশ্বাস প্রকাশ না ক'রেও হয়তো বা এই সব মন্ত্র যথার্থই গভীরতর সংশয় ব্যক্ত করেছিল। লক্ষণীয় সে ঋগ্বেদের আদিপর্বেই মানুষ প্রশ্ন করছে 'কে জানে, কে দেখেছে',—অর্থাৎ সংশয় ও প্রত্যয় একই যুগে দেখা দিয়েছে। বহু সংখ্যক দেবতা সম্ভবত সাধারণ মানুষের পক্ষে বিভ্রান্তিজনক ব'লে প্রতিভাত হয়েছিল এবং যাঁরা চিন্তা বা বিশ্বাসের মধ্যে শৃঙ্খলা আনতে চেয়েছিলেন, তাঁদের মনেও এই বিশাল দেব-সঙ্ঘের অস্তিত্ব সম্পর্কেই সাহসী ও স্পষ্ট সংশয় দেখা দিয়েছিল। বৈদিক ধর্মীয় ভাবনার ইতিহাসের কোন এক

অজ্ঞাত সন্ধিক্ষণে সর্বেশ্বরবাদ সম্পর্কিত সংশয় একেশ্বরবাদী প্রবণতা সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে ধীর কিন্তু নিশ্চিতভাবে সহায়তা করেছিল ; এই প্রক্রিয়ায় অস্পষ্টতা ও প্রচুর অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ছিল—প্রাথমিকভাবে যে বিশুদ্ধ প্রত্নপৌরাণিক একেশ্বরবাদের জন্ম হয়েছিল তাতে দেবতাদের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব অন্তরালে রয়ে গিয়েছিল। একটি দেশজ অনার্য প্রভাব কিংবা আর্য ধর্মীয় চিন্তার দ্বন্দ্ব নিরসনের মধ্য দিয়ে অথবা, সমালোচক পেত্তাজোনির মত অনুযায়ী, কোন আকস্মিক সামাজিক বিপ্লবের ফলে এই ব্যাপারটা ঘটেছিল। আবার এও হতে পারে যে, পূর্বোক্ত উপাদানগুলি একসঙ্গে এমন এক নব্য প্রবণতায় শক্তি জুগিয়েছিল যা শেষ পর্যন্ত একেশ্বরবাদে পরিণত হয়। উৎস যাই হোক না কেন, সংহিতা-রচনার শেষ পর্বে আমরা একেশ্বরবাদের স্পষ্ট লক্ষণ যথার্থই দেখতে পাই।

একেশ্বরবাদ

সর্বেশ্বরবাদ থেকে একেশ্বরবাদে রূপান্তর যে কোন ক্রমবিবর্তনের ফলে ঘটেনি, এটা অবশ্যই কৌতূহলপ্রদ তথ্য। ঋগ্বেদের চূড়ান্ত পর্যায়ে (অর্থাৎ প্রথম মণ্ডলের প্রথম অংশ এবং অষ্টম ও দশম মণ্ডলে) আমরা একেশ্বরবাদী চিন্তাকে দৃঢ়প্রোথিত অবস্থায় দেখতে পাই। অবশ্য অন্যান্য মণ্ডলেও কোথাও কোথাও এমন কথা পাই যাতে মনে হয় অস্পষ্টভাবে হলেও একেশ্বরবাদের দিকে ঋষিদের প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল। কিছু কিছু নূতন দেবনাম প্রবর্তিত হয়ে শ্রেষ্ঠ দেবতার পদবীতে উন্নীত হয়েছে এবং বিমূর্ত সৃষ্টিতত্ত্বরূপে গৃহীত হয়েছে। এই সংশয়ের তাৎপর্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে যদি আমরা স্মরণে রাখি যে প্রচলিত ধর্মীয় বাতাবরণ তত্ত্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার পরিবর্তে প্রত্নকথা ও অনুষ্ঠান-চর্যার উপর নির্ভরশীল ছিল। সেই সময়ে কোন পথ-সন্ধানী একেশ্বরবাদীর পক্ষে প্রত্নকথা ও রহস্য-নিষণ্ণত পরিমণ্ডল থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা অত্যন্ত কঠিন ; তাই কিছু কিছু বহুদেববাদী ও প্রত্ন-পৌরাণিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশমান একেশ্বরবাদী ভাবনার সঙ্গে সংলগ্ন হয়েছিল।

যদিও ঋগ্বেদের সমস্ত প্রধান দেবতাকেই কোথাও না কোথাও সৃষ্টিকর্তার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, সংহিতার শেষ পর্যায়ে জগৎ স্রষ্টা রূপে সম্পূর্ণ নূতন কয়েকটি দেবনাম প্রবর্তিত হয় ; যেমন প্রজাপতি, বিশ্বকর্মা, হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মণস্পতি, পুরুষ ও পরমাত্মা। কোন কোন সূক্তে সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গেই তাদের সম্পর্কিত করা হয়েছে। এদের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত হল ভাবসূক্ত— (১০ : ১৯০), নাসদীয় সূক্ত (১০ : ১২৯) এবং অস্যবামীয় সূক্ত (১ : ১৬৪)। অধিকাংশ অধ্যাত্মবিদ্যা ও সৃষ্টিতত্ত্ববিষয়ক সূক্তে অতীন্দ্রিয়বাদী উপাদান স্পষ্টই দৃষ্টিগোচর হয় ; এর কারণ হিসাবে আমরা আদিম দার্শনিকের দৃষ্টিতে দুর্জ্ঞেয়তার অভিব্যক্তি এবং বিষয়বস্তুর নিজস্ব অন্তর্নিহিত রহস্যের

কথা উল্লেখ করতে পারি। এই সব রহস্যময় অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির স্পষ্টীকরণে পরবর্তী ভাষ্যগুলি সহায়তা করতে সর্বদা সমর্থ হয় নি ; এদের প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে কোনো অকাট্য যুক্তি এখনও উপস্থাপিত করা যায় নি।

পরমেশ্বর যখন সৃষ্টি করেন, তাঁকে সাধারণত ধ্যানরত যোগী রূপে কল্পনা করা হয়—পরবর্তী বৈদিক সমাজের ধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গি যে দেখা দিয়েছে, তার একটা ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যায়। এমন কি দিকসমূহ (আশাঃ) এবং যে সমস্ত দেবতার সঙ্গে নিদানবিদ্যাবিষয়ক প্রত্নকথা সম্পৃক্ত—তাঁদের উত্তানপাদ যোগী রূপে বর্ণনা হয়েছে। সেই সঙ্গে সৃজন-প্রক্রিয়ায় নিরত স্রষ্টা দেবতাদের 'তপস্'-এর উল্লেখ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে 'স্রষ্টা যোগী' একটি নূতন সামাজিক ধারণা রূপে বৈদিক সাহিত্যের শেষ অংশে দেখা দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত ধ্যানমগ্ন দেবতার মূর্তির কথা আমাদের মনে পড়বে। সম্ভবত যোগী দেবতার এই আদিমতম রূপটি ঋগ্বেদের দমশ মণ্ডল রচিত হওয়ার সময়ে অধিকতর সমৃদ্ধ হয়ে ভারতীয় ধর্মীয় জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হয়েছিল।

নাসদীয় সূক্তে (১০ : ১২৯) 'অসৎ' বা অনস্তিত্ব থেকে সৎ বা অস্তিত্বের সৃষ্টি কল্পনা। কবি তাঁব কল্পনাকে মহাসময়ের এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যখন সৃষ্টির সূচনাও হয়নি। অনস্তিত্বের আদিমতম অন্ধকার এবং সময় ও পরিসরের সার্বিক শূণ্যতা তাঁর কবিদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কবি-দৃষ্টির এই উদ্ভাসনেই সূক্তটির গৌরব নিহিত কেননা আধ্যাত্মিক ভাবনা এতে অস্পষ্ট ও বিশৃঙ্খল। প্রজাপতি মাত্র চারবার উল্লিখিত হয়েছেন যদিও পরবর্তী সাহিত্যে তাঁকে শক্তিমান স্রষ্টার ভূমিকায় দেখা গেছে। স্রষ্টারূপে তিনি কালের প্রতীক ; অন্যদিকে সর্বাতিগ আকাশ দেবতারূপে পরিকল্পিত মহাপরিসরের মানবায়িত রূপ আমরা বৃহস্পতির মধ্যে দেখতে পাই। আবার ইন্দ্র, অগ্নি, সোম, বরুণ, প্রজাপতি, বৃহস্পতি প্রমুখ প্রধান দেবতাদের বিশ্বস্রষ্টার ভূমিকায় বিমূর্তায়িত প্রকাশ লক্ষ্য করি বিশ্বকর্মার মধ্যে। এছাড়া, হিরণ্যগর্ভ স্বর্ণোজ্জ্বল অণ্ড বা সৃষ্টির আদিকণিকারূপে জগৎপ্রক্রিয়ার একটি বিশেষ স্তরের প্রতিভূ।

যজ্ঞানুষ্ঠান থেকে দর্শনে উত্তরণের স্তরের প্রামাণ্য রচনা হল পুরুষসূক্ত (১০ : ৯০) ; এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সূক্তে পুরুষ স্রষ্টারূপে প্রশংসিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং সৃষ্টি করেন নি , দেবতারা তাঁকে যজ্ঞে হব্যরূপে অর্পণ করেছিলেন ; তাঁর সেই বলিপ্রদত্ত শরীর থেকে ক্রমে ক্রমে সমগ্র সৃষ্টি উদ্ভূত হয়েছিল। অধিবিদ্যার স্তরে পুরুষসূক্ত যজ্ঞের মাধ্যমে বিশ্বজগৎ সৃষ্টির চূড়ান্ত প্রতীকী বিবরণ দিয়ে যজ্ঞানুষ্ঠানকে মৌলিক আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে ভূষিত করেছে যা আরণ্যক ও উপনিষদের

স্তর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এই সূক্তের ষোড়শ মন্ত্রের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসামান্য কেননা সেখানে পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও চরণ থেকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চার বর্ণের উৎপত্তি বর্ণিত হয়েছে। সমগ্র ঋগ্বেদে এটাই একমাত্র নিদর্শন যেখানে সামাজিক শ্রেণীভেদের ইঙ্গিত-সহ চতুবর্ণ উল্লিখিত—যদিও 'বর্ণ' শব্দটি এখানে উচ্চারিত হয় নি।

অম্ভৃণ ঋষির কন্যা 'বাক্'-বিরচিত পরমাত্ম-সূক্ত (১০ : ১২৫) বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে যেহেতু এখানেই প্রথম এক নারী কবি সমস্ত দেবতার সঙ্গে আপন সত্তার একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। পরবর্তী বহু ভারতীয় দর্শনে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যে একাত্মতা ঘোষিত হয়েছে তার প্রথম উচ্চারণ যেন এই নারী কবিটির রচনায়। উপনিষদ ও বেদান্তে অভিব্যক্ত দার্শনিক ভাবনার উৎস রূপে একে গ্রহণ করা যায়। রচয়িতা 'বাক্' যেহেতু নারী এবং উত্তম পুরুষের বাচনিকভঙ্গিতে নিজের সঙ্গে দেবসঙ্ঘ ও বিশ্বজাগতিক তাবৎ উপাদানকে একাত্মীভূত ক'রে যেহেতু তিনি কাব্য প্রণয়ন করেছেন, তাই পরমাত্মার সমতুল্য আদ্যাশক্তির প্রতি নিবেদিত প্রথম স্তোত্র হিসাবে এই সূক্তকে গ্রহণ করা যায়। পরবর্তীকালে তাই এর জনপ্রিয় নামান্তর হল 'দেবীসূক্ত'। যদিও এখানে ভ্রান্তির সম্ভাবনা থেকে গেছে কারণ 'বাক্' নিজেকে দেবী বলেন নি, পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্নই বলেছেন।

সংক্ষিপ্ত ভাবসূক্ত (১০ : ১৯০) সৃষ্টিতত্ত্ব-বিষয়ক তিনটি মাত্র মন্ত্রে গঠিত ; এতে সৃষ্টির ক্রমপর্যায় বিবৃত হয়েছে। বহু পরবর্তী দার্শনিক চিন্তার ভ্রূণ এতে পাওয়া যায়। 'অস্যবামীয়' সূক্তের (১ : ১৬৪) নামকরণ হয়েছে মন্ত্রের প্রারম্ভিক দুটি শব্দ দিয়ে ('অস্য' ও 'বামস্য', বিখ্যাত ব্যাবিলনীয় কাব্য 'এনুমা এলিশ'-এর মতো) ; এর উপযুক্ত টীকা ও ব্যাখ্যা এখনো রচিত হয়নি। বিষয়বস্তুর অর্ধ-অতীন্দ্রিয় দুর্জ্ঞেয়তা ও গূঢ় বিদ্যার বৈশিষ্ট্য ভাষ্যকারকে বিমূঢ় করে। মূলত এটি সৃষ্টিতত্ত্ববিষয়ক সূক্ত ; বহু প্রাচীন কালের ঋষিতুল্য কোনো যজমান এখানে স্রষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ। গভীর বিনয়ের সঙ্গে কবি সৃষ্টির বস্তুগত কারণ ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে মৌলিক হেতুতাত্ত্বিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। কবিত্বশক্তির গুণে কিছু কিছু মন্ত্র অসামান্য, বিশেষত বিংশতিতম মন্ত্রটি (দ্বা সুপর্ণা...) বিভিন্ন বর্গীয় পাঠকের মধ্যে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। অধিবিদ্যাগত তাৎপর্যের সন্ধান না করেও আমরা অনায়াসে এর কাব্যাস্বাদ গ্রহণ করতে পারি ; সেই সঙ্গে জীবনের প্রতি প্রত্যক্ষনিবিড় ও নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গির সার্থক অভিব্যক্তিকে তার কাব্য মর্যাদায় উপলব্ধি করতে সমর্থ হই। আবার, সর্বেশ্বরবাদ ও একেশ্বরবাদের মধ্যে সমন্বয়-প্রয়াস পরিস্ফুট হয়েছে এই সূক্তের ষট্‌চত্বারিংশৎ মন্ত্রে।

উপাখ্যান ও প্রহেলিকা

এই সব সূক্তে ক্রমাগত কিছু প্রহেলিকাধর্মী অংশ পাওয়া যায় এখনো যাদের প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণ স্পষ্ট নয়। অনেক গবেষক অবশ্য এদের সম্পর্কে সূক্ষ্ম ও সযত্ন বিশ্লেষণ প্রস্তুত করেছেন, টীকা রচনা করেছেন। এটাই বিশেষ বিস্ময়জনক যে সাধারণভাবে ধর্মীয় কাব্য ব'লে পরিচিত বৈদিক সংহিতায় এ জাতীয় প্রহেলিকা সন্নিবিষ্ট, এমনকি সংরক্ষিত হয়েছিল। অনুমান করা যেতে পারে যে, সত্রের মতো দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞ (যেখানে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অংশে প্রথম ভাগে অনুষ্ঠিত যজ্ঞক্রিয়াগুলির বিপরীতক্রমে পুনরাবৃত্ত হ'ত) যখন একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে ক্লান্তিকর ও একঘেয়ে হতে পড়ত, পুরোহিতরা তখন সেই একঘেয়েমির অবসাদ দূর করার জন্য হয়ত এই সমস্ত প্রহেলিকা ও নানা উপাখ্যান (যেমন পারিপ্লব ইত্যাদি) বিবৃত করতেন। হয়তো বা বৈদিক জনসাধারণের মগ্ন স্মৃতিতে এইসব প্রহেলিকার কোনো গূঢ় বা অতীন্দ্রিয় তাৎপর্য প্রোথিত ছিল ; কিন্তু পরবর্তীকালে তা সময়ের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। আদিম মানুষের কাছে সৃষ্টির মতো রহস্যোদ্দীপক আর কিছুই ছিল না ; তাই সৃষ্টিবিষয়ক একটি সূক্তের মধ্যে যে আলোচ্য প্রহেলিকাগুলি সংরক্ষিত হয়েছিল, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কখনো কখনো প্রহেলিকার আপাত কিছু সমাধান দেওয়া হয়েছে ; কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, প্রকৃত উত্তর অদীক্ষিতদের কাছ থেকে প্রত্যাহৃত রয়ে গেছে।

সূর্যাসূক্ত

অনন্য বিষয়গৌরবের জন্য কিছু কিছু সূক্ত আমাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। মোট সাতচল্লিশটি মন্ত্রযুক্ত সূর্যাসূক্ত (১০ : ৮৫) রূপে পরিচিত বিবাহ সূক্তটি বেশ আগ্রহ-উদ্দীপক। যদিও এতে মূলত সবিতৃকন্যা সূর্যার পতিগৃহে যাত্রার বর্ণনা রয়েছে, প্রকৃতপক্ষে শেষ পর্যন্ত তা বিবাহ-অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আশীর্বাদ ও মাঙ্গলিক আচার এবং তৎসহ ঐন্দ্রজালিক ও আনুষ্ঠানিক অনুপুঙ্খসমূহের প্রামাণিক বিবৃতিপূর্ণ সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের একটি আদর্শ বিবাহ-সূক্তে পর্যবসিত হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে সাধারণত শীত-প্রধান অঞ্চলেই সূর্য নারী বা দেবী রূপে কল্পিত, যেমন প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যের দেবী আরিন্না। জার্মান ভাষায়ও সূর্য স্ত্রীলিঙ্গ। আলোচ্য সূক্তে সূর্যাকে বধূরূপে পাওয়ার জন্য দেবতারা পরস্পরের সঙ্গে ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সূর্যার পিতা সূর্যাকে তাঁর প্রেমিক সোমদেবের কাছে অর্পণ করতে উদ্যত ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত অশ্বীরা রথে ক'রে তাঁকে হয়ত সোমের কাছেই নিয়ে যান। সূক্তের শেষ ভাগে নবদম্পতীর জীবনকে নির্বিঘ্ন করার জন্য অশুভ

জাদুশক্তি ও অধিদৈবিক আধি-ব্যাধিকে মন্ত্রবলে বিতাড়িত করার কথা পাই। সবশেষে রয়েছে বিখ্যাত আশীর্বাণী ঃ বধূ যেন শ্বশুরালয়ে সম্রাজ্ঞী হতে পারে।

দ্যূতকরের অনুশোচনা

বিখ্যাত অক্ষসূক্ত (১০ : ৩৪) অর্থাৎ পাশা খেলোয়াড়ের মর্মন্তুদ স্বগতোক্তির এই সূত্রটি সম্পূর্ণই ভিন্ন ধরনের এক রচনা। পাশা খেলার প্রলোভন দুর্নিবার, অন্তহীন তার আমোদ. সোমরস পানের মতো যা উল্লাসজনক ও মানুষের চিত্তকে অধিকার ক'রে সম্মোহিত রাখার জাদুশক্তি যাতে নিহিত—সেই পাশা খেলার প্রশস্তি দিয়েই এই সূক্তটির সূচনা। কিন্তু তার পরই দ্যূতাসক্ত ব্যক্তির মর্মান্তিক করুণ অবস্থা, তার পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় অত্যন্ত সংযত ভাষায় বর্ণনা করেছেন কবি। সূক্তের সমাপ্তিতে পরিস্ফুট হয়েছে অনুশোচনা এবং অন্য দ্যূতকরদের প্রতি উপদেশ—যাতে তারা পাশার মারাত্মক আকর্ষণ প্রতিরোধ ক'রে জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষিকার্যে নিরত হয়।

যমসংহিতা

যমসংহিতা ব'লে পরিচিত সূক্তগুচ্ছে রয়েছে অন্ত্যেষ্টিবিষয়ক মন্ত্রসমূহ। এগুলি যদিও দশম মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত তবু শুধু এই তথ্য দিয়ে এদের অর্বাচীনত্ব প্রমাণিত হবে না। কেননা মৃত্যু ও প্রখ্যাত পূর্বপুরুষ সম্পর্কিত আচার-অনুষ্ঠান ও প্রত্নকথা ছাড়া কোনো প্রাচীন জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বই সম্পূর্ণ অকল্পনীয়। আলোচ্য অন্ত্যেষ্টিসূক্তগুলিতে যম, ভৃগু, অঙ্গিরা, অগ্নি এবং পিতৃগণ বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছেন। বিচিত্র ধরনের আবেগ ও দৃষ্টিভঙ্গি এদের মধ্যে অভিব্যক্ত হলেও অপরিচয়ের স্বাভাবিক অবিশ্বাসজনিত মৃত্যুভীতিই এতে সবচেয়ে মৌলিক। ইহজীবনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যেহেতু এই ভয় দূরীকরণের পক্ষে একেবারেই যথেষ্ট নয়, প্রাচীন মানুষ তাই বিচিত্র আবেগের দ্বারা আলোড়িত হ'ত ; মৃতমানুষেরা এক সময় জীবিতের প্রিয় পরিজন ছিল, অতএব অচিরেই তাদের জীবিত মানুষের পক্ষে অনিষ্টকারী হয়ে ওঠার আশঙ্কা নেই। তবুও অতৃপ্ত সুখতৃষ্ণা ও আকাঙ্ক্ষা তাদের প্রসন্ন আত্মাকেও হয়ত বা ভীতিপ্রদ ক'রে তুলতে পারে, এমন বিশ্বাস ছিল। তাই উপযুক্ত অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে সে আতঙ্কিত সম্ভাবনাকে ঠেকাবার চেষ্টা করা হত। জীবিতদের মধ্যে প্রথম যিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন, সেই যম নিশ্চয়ই বিদেহী প্রিয়জনকে মরণোত্তর কোনো জগতে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন এবং অঙ্গিরা, মাতলি ও ভৃগুর সাহচর্যে আমোদ-প্রমোদে কালযাপনে সাহায্য করবেন। মৃত আত্মীয়ের মরণোত্তর ভবিষ্যৎ জীবিতদের

কাছে অজ্ঞাত, অজ্ঞেয় ; তাই যাতে প্রিয় পরিজন পরলোকে সুখেস্বাচ্ছন্দে ও আনন্দে থাকে এই ঐকান্তিক কামনা ও তাদের মঙ্গলের জন্যে উৎকণ্ঠা ও আকুতি এই সূক্তগুলিকে একটি করুণতায় মণ্ডিত করেছে। এইখানেই এদের কাব্যমূল্য। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিষয়ে এইসব সূক্তের সঙ্গে তুলনীয় রচনা অন্যান্য প্রাচীন জনগোষ্ঠীর সাহিত্যের মধ্যেও পাওয়া যায়।

মণ্ডূকসূক্ত

'সংবাদ সূক্ত'গুলির মতো মণ্ডূকসূক্ত'বা ভেকগীতির (৭ : ১০৩) কোন যজ্ঞীয় বিনিয়োগ নেই। এই সূক্তের প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে তাই প্রচুর মতভেদ রয়েছে ; কারও মতে এটি বৃষ্টি আনয়নের উদ্দেশ্যে ভাবগম্ভীর একটি জাদুগীতি, আবার কারও মতে এতে রয়েছে বেদপাঠকারী ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের সম্বন্ধে একটি অন্তর্লীন ব্যঙ্গ। প্রথম মন্ত্রে সম্ভবত এই দুয়েরই সমন্বয় ঘটেছে।

রাত্রিসূক্ত ও অরণ্যানীসূক্ত

প্রাচীন ভারতীয়দের অরণ্যবেষ্টিত বসতিতে ঘনকৃষ্ণ রাত্রি যে রহস্য ও ভীতি সঞ্চার করত, তারই সজীব অভিব্যক্তি ঘটেছে রাত্রিসূক্তে (১০ : ১২৭)। অন্ধকারের শক্তি যেহেতু অনতিক্রম্য, কবি রাত্রির কাছে রাত্রিকালীন বিভিন্ন বিপদ—নেকড়ে বাঘ, চোরডাকাত ও আকস্মিক মৃত্যু থেকে রক্ষা করার জন্য তাই প্রার্থনা জানিয়েছেন। আদিম মানুষ যখন মূলত প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভরশীল ছিল, অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় যখন সে নিরন্তর কম্পমান থাকত—তখনকার উদ্বেগের সূক্ষ্ম প্রতিফলন রয়ে গেছে এই সূক্তে।

অরণ্যানীর প্রতি উদ্দিষ্ট সূক্তটিও (১০ : ১৪৭) বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এর সঙ্গে তুলনীয়। নূতন আর্য বসতিগুলির চতুষ্পার্শ্বের নিবিড় অরণ্য ছিল একই সঙ্গে জীবনধারণের উৎস ও বহুবিধ সমাধানহীন রহস্যের আকর। এই সূক্তেও বৈদিক কবির কল্পনাশক্তি ও বর্ণনাচাতুর্য স্পষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

ঋগ্বেদ : লোকায়ত না ধর্মসাহিত্য?

ঋগ্বেদের চরিত্র সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধ'রে বাদানুবাদ চলে আসছে,—উৎপত্তি ও অন্তর্বস্তুর বিচারে তা ধর্মসাহিত্য না লোকায়ত গ্রন্থ? কোনো কোনো কবি তাঁদের রচিত সূক্তে যজ্ঞের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু প্রায়ই সংহিতা-পাঠের সঙ্গে যজ্ঞীয় বিনিয়োগের সঙ্গতি রক্ষিত হয় নি। স্পষ্টতই এই সব সূক্তের যজ্ঞীয় বিনিযোগ

পরবর্তীকালে যান্ত্রিকভাবে পর্যালোচনাপ্রসূত পুনর্ভাবনার ফলে ঘটেছিল। লুই রেনু তাঁর একটি গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে বেদে লোকায়ত কাব্য রয়েছে। যথার্থ বিচারে অবশ্য এরকম নিদর্শন পাওয়া যায় না ; শুধু কিছু কিছু লোকায়ত বিষয়বস্তু, গান, ধ্রুবপদ ও কৌতুককর আখ্যানকে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে বিশেষ ধরণে প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বেদের সমস্ত কিছুই ধর্মীয় বিধিরই অধীন ; এর লক্ষ্য দ্বিবিধ—একদিকে পর্যাপ্ত অলঙ্কৃত ভাষায় দেবতার স্তুতি এবং অন্যদিকে পুরোহিতের ক্রিয়াকলাপের পার্থিব দাবিসমূহ পরিপূর্ণ করা।" অর্থাৎ বিভিন্ন সূক্তে মাঝে মাঝে লোকায়ত বিষয় প্রবর্তিত হলেও ঋগ্বেদ মূলত ধর্মীয় সাহিত্য। বস্তুত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রাচীন সাহিত্যরূপে আমাদের কাছে যা কিছু এসে পৌঁছেছে তার অধিকাংশই নিছক শিল্পবোধপ্রণোদিত সৃষ্টি নয়, বরং সঙ্ঘবদ্ধ সামাজিক জীবনের আয়তনের মধ্যে এদের একটা সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যমূলক প্রয়োগিক দিক ছিল। যথোপযুক্ত সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতেই তাদের সর্বপ্রথম স্থাপিত ক'রে, শুধু সাহিত্যরীতি হিসাবে বিচার না করে, বিশেষ অভিব্যক্তি রূপেই গ্রহণ করতে হবে। প্রচলিত সংহিতার যে যজ্ঞীয় বিনিয়োগ পাওয়া যায় তা সায়ণ কর্তৃক ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র থেকে সঙ্কলিত হয়েছিল। কারো মতে ঋগ্বেদের সূক্তগুলি প্রথম যজ্ঞানুষ্ঠান থেকে এবং ভারতীয় আর্যদের নিরাপত্তা ও বিজয় বিধানের জন্য দেবতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপক সূক্তগুলি থেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে রচিত হয়েছিল ; পরবর্তীকালে সূক্তগুলির উপযোগিতা ব্যাপকতর করার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল। ঋগ্বেদের বহু মন্ত্রই কেবলমাত্র সংহিতায় পাওয়া যায় ; এতে প্রমাণিত হয় যে যজ্ঞে এদের প্রয়োগ ছিল না। এই বাদানুবাদকে আমরা তিনটি সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করতে পারি ; যেমন ঋগ্বেদে (১) প্রাথমিক ভাবেই যজ্ঞীয় আচার-বিধিমূলক, (২) এটি ধর্মসাহিত্য অর্থাৎ দেবকল্পনার বিবরণ, (৩) এটি লোকায়ত বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের সাহিত্য।

অন্তর্ধৃত অর্থাৎ সংহিতাপাঠের প্রমাণ থেকে সম্ভবত নির্দ্বিধায় বলা যায় যে অধিকাংশ সূক্তই দেবতাদের উদ্দেশে প্রার্থনারূপেই রচিত এবং সমস্ত সংহিতাটি প্রাথমিকভাবেই একটি স্তোত্র-সংগ্রহ। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, প্রখ্যাত পণ্ডিতদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষ বিশুদ্ধ লোকায়ত রচনা প্রাচীন মানুষের পক্ষে অকল্পনীয়, যেহেতু তাদের বিশ্ববীক্ষা মূলত ধর্মকেন্দ্রিক ও অনুষ্ঠাননির্ভর, তাদের জগৎ রহস্য-নিয়ন্ত্রিত। ঋগ্বেদের সূক্ত শুধুমাত্র দেবতার প্রশস্তিবাচক গান নয়, কোন রাজকীয় শাসককে সন্তুষ্ট করার প্রয়োজনে রচিত বিশেষ ধরনের কাব্য, সর্বসাধারণের ব্যবহার উপযোগী ও ঐতিহ্যনিয়ন্ত্রিত বিশেষ শৈলীতে সেই কাব্য রচিত হ'ত। যজ্ঞীয় বিনিয়োগের সঙ্গে সম্পর্কহীন মন্ত্র যেমন রচিত হয়েছিল, তেমনি বিনিয়োগযুক্ত কিছু কিছু মন্ত্র সম্ভবত রচনা-মুহূর্তে কোন যজ্ঞের সঙ্গেই সম্পর্কিত ছিল না। কাব্যসৌন্দর্য

বা রচনাশক্তির জন্যই পরবর্তীকালে এগুলি যজ্ঞের অংশ হ'য়ে পড়ে। ঋগ্বেদের চূড়ান্ত সম্পাদনা ও সংকলনের সময়ে অর্থাৎ দশম মণ্ডলের উৎপত্তি পর্যন্ত কিছু কিছু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মন্ত্র ভাসমান অবস্থায় বিরাজ করছিল।

নিরুক্তে প্রদত্ত শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী কিছু কিছু মন্ত্র নিরর্থক অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকভাবে তাৎপর্যহীন। আরো কিছু মন্ত্রের যজ্ঞীয় উপযোগিতা সম্পর্কে সায়ণ বলেছেন, 'বিনিয়োগঃ লৈঙ্গিকঃ' অর্থাৎ অনুষ্ঠানের প্রকৃত প্রয়োজন অনুযায়ী মন্ত্রপ্রয়োগ। এইসব মন্ত্রের বিষয়বস্তু এবং তাদের আনুষ্ঠানিক বিনিয়োগের মধ্যে সম্পর্ক সমস্ত ক্ষেত্রেই অত্যন্ত শিথিল। যজ্ঞ যখনই প্রচলিত উপাসনা-পদ্ধতি অর্থাৎ অতিপ্রাকৃতের সঙ্গে যোগাযোগস্থাপনের সর্বজনগ্রাহ্য উপায় হয়ে উঠল—সম্ভবত তখন থেকেই আনুষ্ঠানিক বিনিয়োগের প্রয়োজন বিভিন্ন সূক্তের রচনায় নূতন একটি পর্যায়ের সূচনা হল অর্থাৎ বিশুদ্ধ যজ্ঞেরই উদ্দেশ্যে সূক্ত রচিত হতে শুরু হল। যদিও বিশ্লেষণে দেখা যায় এ জাতীয় সূক্তের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। বিবিধ লক্ষ্যযুক্ত মন্ত্র রচনার বিভিন্ন স্তরগুলি আমরা হয়ত কতকটা নির্ধারণ করতে পারি। সম্ভবত প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মনিরপেক্ষ প্রেরণার কিছু কিছু সূক্ত রচিত হয়েছিল, যদিও সাম্প্রতিক অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ জীবনবীক্ষা প্রাচীন মানুষের ছিল না ; সেগুলি ছিল নিতান্তই অনুষ্ঠান-নিরপেক্ষ, কিংবা বলা যায় তাদের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের কোনো প্রকাশ্য অভিব্যক্তি ছিল না। পরবর্তীকালে যজ্ঞানুষ্ঠান যখন অধিকতর গুরুত্ব অর্জন করল তখন স্পষ্ট আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনে সূক্ত রচনার সূত্রপাত হল ; সেই খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভের জন্য কবিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হল। অনুমান করা যায় যে, রাজকীয় পরিবারগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চারণকবিরা লোভনীয় পুরস্কারের আশায় পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। প্রতিযোগিতার আবেগ-মথিত উদ্যমে চারণকবিদের পরিবারে যে মৌলিক কাব্যপ্রক্রিয়ার স্ফুরণ ঘটেছিল তাকে ভের্নন আর্নল্ড্ 'চারণকবিদের পর্যায়' বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু এখানে বলা প্রয়োজন সুসমৃদ্ধ রাজন্যবর্গের তুষ্টির জন্য অধিকাংশ সূক্তই পরস্পর প্রতিস্পর্ধী চারণকবিদের দ্বারা রচিত হয়েছিল—এমন সিদ্ধান্ত খুব একটা যুক্তিসংগত নয়। আর্যদের ইতিহাসে আদিম ইয়োরোপীয় প্রথম বাসভূমি থেকে বেরিয়ে মধ্যপ্রাচ্য ইরান হয়ে এদেশে এসে পৌছে এখানকার আদিম অধিবাসীদের যুদ্ধে পরাস্ত করে, তাদের বাসভূমি দখল ক'রে বসবাস, প্রাগার্য ঐশ্বর্য লুণ্ঠন ও ক্রমে কৃষিনির্ভর জীবনযাত্রার অভ্যাস, রাজ্যবিস্তার ও সমৃদ্ধিলাভ—এই দীর্ঘ জীবন-পরিক্রমার ইতিহসের বহু স্মরণীয় অধ্যায় নানা বংশের নানা কবির প্রেরণায় সূক্তরূপে ব্যক্ত ও রচিত হয়েছিল। স্থানে কালে তার ব্যাপ্তি যেমন সুদূরপ্রসারিত, তেমনই উদ্দেশ্যে ও সিদ্ধিতে বৈচিত্র্যও বিস্ময়কর। আক্রমণকারী আর্যদের যাযাবর জীবনেই সম্ভবত বহু সূক্ত গ্রথিত হয়েছিল। ভারতভূমিতে আর্যবসতি স্থাপিত হওয়ার পরই যদিও অধিকাংশ মন্ত্র রচিত, তবুও তাদের মধ্যে অনিশ্চিত ও অনিকেত বাতাবরণের একটা দ্যোতনা রয়ে গেছে।

রাজন্যদের সন্তুষ্টিবিধানের প্রয়াস সম্পর্কে বহু মন্ত্রই প্রত্যক্ষ কোনো ইঙ্গিত বহন করে না, যদিও পরবর্তী সূক্তগুলিতে তেমন অনেক দৃষ্টান্ত আমরা খুঁজে পেয়েছি। সূক্ত রচনার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কিত সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি অভিমত অনুযায়ী প্রথম পর্যায় ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, দ্বিতীয়টি নিশ্চিতভাবে যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানমূলক এবং তৃতীয়টি মৌল প্রেরণাগত বিচারে ধর্মনিরপেক্ষ, দর্শন-অভিমুখী।

রচনারীতি ঃ ভাষা

সাধারণ বিচারে ঋগ্বেদে ব্যবহৃত ভাষা সর্বত্র সমান নয় ; সতর্ক ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে জাতিগত ও ভাষাগত সংমিশ্রণ এবং বহু শতাব্দীব্যাপী রচনা, গ্রন্থনা, সম্পাদনা ও আঞ্চলিক বৈষম্যের ফলে ভাষা প্রয়োগে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা দিয়েছে। শৈলী ও ব্যাকরণের ক্ষেত্রে কতকটা কৃত্রিমভাবেই সামঞ্জস্য রক্ষা করার চেষ্টা হয়েছে, তাতে শব্দভাণ্ডারের অন্তর্গত বৈচিত্র্য ও কথ্য ভাষার উপযোগী ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যকে নূতন তাৎপর্যে অন্বিত করার সঙ্গে সঙ্গে ভাষাগত শব্দ নির্বাচনের দিকটিও পরিস্ফুট হয়েছে। বৈদিক সংস্কৃত ভাষা তৎকালীন উপভাষাগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টায় একটি বিশেষ কথ্যভাষাকে অধিক গুরুত্ব দিলেও বিভিন্ন উৎস থেকে যে উপাদান সংগ্রহ করছিল, তার বহু চিহ্নই ঋগ্বেদের মধ্যে রয়ে গেছে। ঋগ্বেদের ভাষা মূলত কবিদের সচেতন প্রয়াসে নির্মিত একটি সাহিত্যিক ভাষা—কোন বিশেষ গোষ্ঠীর বা কোন অঞ্চলের কথ্যভাষার সম্পূর্ণ অনুগামী নয়। তখনকার চারণকবিদের কাছে এই ভাষাটিই আদর্শ ব'লে বিবেচিত হয়েছিল। যখন কথ্যভাষা রূপে বৈদিক সংস্কৃত প্রচলিত ছিল, সেই সুদূর অতীতেই প্রাক্‌পালি এক প্রাকৃত ভাষার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করে। সামাজিক অবচেতনায় তার নিগূঢ় প্রভাবের সঙ্গে বিভিন্ন উপভাষার সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার গভীর সংযোগের ফলে বৈদিক চারণকবিদের কথ্যভাষা ধীরে ধীরে গড়ে উঠে। বৈদিক ভাষা প্রকৃত পক্ষে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার সেই প্রত্নরূপ যা পরবর্তী নব্য আর্যভাষাগুলির জন্ম দিয়েছে। ভারতীয় আর্যগণ যখন এদেশে এসেছিলেন ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষা-ভাণ্ডারের উত্তরাধিকার ছাড়াও তাঁরা দীর্ঘ পথ অতিবাহনের ফলে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত শব্দাবলী নিতে নিতে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে প্রাচীন ব্যাবিলন ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য অংশের সঙ্গে বাণিজ্যের ফলে তাঁদের ভাষায় কিছু কিছু বিদেশী শব্দের প্রভাবও দেখা গিয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের নিজস্ব ভাষা যেমন বিবর্তিত হয়েছিল তেমনি ভারতীয় অনার্য জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে বৈবাহিক ও দৈনন্দিন নানা আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলে স্থানীয় ভাষাও গঠনমূলক প্রভাব বিস্তার করেছিল। শুধু তাই নয়, অবৈদিক আর্যভাষার শব্দও যে ঋগ্বেদে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল, এমন অনুমানেরও যথেষ্ট হেতু আছে।

কৃষি-সভ্যতার দৈনন্দিন জীবন থেকেই অধিকাংশ শব্দ ঋণ হিসাবে গৃহীত হয়েছিল, কেননা গ্রামনিবাসী আর্য্যদের পক্ষে নাগরিক জীবনের কোন অভিজ্ঞতা থাকা সম্ভব ছিল না। ঋগ্বেদের সূক্তসমূহ যখন ভারতভূমিতে রচিত হচ্ছিল, অষ্ট্রিক ও হয়ত অল্প কিছু দ্রাবিড় উৎসজাত শব্দ তখনই আর্য শব্দ-ভাণ্ডারে প্রবেশ করে। বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ও বহু শতাব্দী ধ'রে যেহেতু ঋগ্বেদের সূক্তগুলি রচিত ও সঙ্কলিত হয়েছিল, সেহেতু বৈদিক ভাষার শব্দ-ভাণ্ডারে অনেকগুলি কথ্যভাষার বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় হওয়া স্বাভাবিক ছিল ; কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো নির্দিষ্ট জাতি গোষ্ঠীর কথ্যভাষার পরিধির মধ্যে তা কখনোই সীমাবদ্ধ ছিল না। সংহিতার বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভাষা-ব্যবহারে পার্থক্য লক্ষিত হয়, কেননা অনেক শব্দ, বিশিষ্ট বাক্যাংশ বা বাগ্‌বিধির গুচ্ছ ও বাচনিক সঙ্কেতসূত্রকে প্রাচীন সাহিত্য-ভাণ্ডার থেকে উত্তরাধিকার রূপে আহরণ করে বৈদিক কবি বিভিন্ন সময়ে শূন্যস্থান পূরণের জন্য পূর্ব নির্দিষ্ট ভাষা সঙ্কেতরূপে প্রয়োগ করেছিলেন ; অথচ ততদিনে এইসব বাচনিক উপাদান দৈনন্দিন ব্যবহারের বৃত্তবহির্ভূত ও ফলে অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে।

ঋক্‌সংহিতা থেকে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার পদান্বয়রীতি সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন, যেহেতু কাব্যরচনায় কখনো নির্দিষ্ট কোনো পদান্বয় রীতি অনুসৃত হয় না। তাছাড়া, প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় গদ্য-পদ্য নির্বিশেষে বাক্যের অর্থ পদক্রমের ওপর নির্ভরশীল নয়। সংহিতা যেহেতু মৌখিক সাহিত্য বা শ্রুতিকাব্য, ছন্দ ও শ্বাসাঘাতের প্রাধান্য সেখানে তর্কাতীত এবং পদান্বয়ে তাদেরই নির্ধারক ভূমিকা। বস্তুত, যজুর্বেদ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহের গদ্যভাষার সঙ্গে পরিচিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা বৈদিক ভাষার পদান্বয়-রীতি সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণাই অর্জন করতে পারি না। সাধারণ গদ্য ভাষায় বিশ্লেষণ পদ বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত হলেও পদ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগরীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ; কেননা ছন্দ ও শ্বাসাঘাতের নিজস্ব প্রয়োজনে বিশ্লেষণ বাক্যের যে-কোনো স্থানে ব্যবহৃত হতে পারে। অক্ষরজ্ঞান আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ববর্তী পর্যায়ে ভাষা যখন বিভিন্ন প্রজন্মের দ্বারা কেবলমাত্র মৌখিকভাবেই সংরক্ষিত হত, তখন শব্দব্যবহারে চূড়ান্ত মিতব্যয়িতা ও তজ্জনিত সংহতি (সংক্ষেপীকরণ) অনিবার্য ছিল। অতএব আমরা নিঃসন্দেহে এই অনুমান করতে পারি যে সংহিতায় প্রযুক্ত বিশেষণগুলি সম্পূর্ণ যথাযথ, অপরিহার্য ও অ-পরিবর্তন সহ এবং কবির পরিকল্পিত ভাবনার অনুগামী সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ততম অভিব্যক্তিরই নিদর্শন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেবতাদের নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষণসমূহ তাঁদের প্রত্নপৌরাণিক কার্যকলাপ বা প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনার ইঙ্গিতবহ। হোমারের ইলিয়াড ও অডিসিতেও বিশেষণ প্রয়োগের এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, অবেস্তাতেও। প্রাক্‌-লিখন যুগে শব্দব্যবহারের অপরিহার্য একটি লক্ষণ হ'ল যে নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত কোনো শব্দই প্রযুক্ত হ'ত না ; অতএব প্রত্যেকটি শব্দই সুপ্রযুক্ত এবং কবির একান্ত অভীষ্ট।

ব্যতিক্রম শুধু কিছু কিছু পাদপূরণার্থক অব্যয়, যেগুলি ছন্দের অনুরোধে ব্যবহৃত। তাই ইন্দ্রকে যখন পুরন্দর বা বৃত্রহা বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে—তার মধ্যে নিহিত রয়েছে আর্য সেনাপতি ইন্দ্র কর্তৃক প্রাগার্য বসতিগুলির প্রাচীরসমূহ চূর্ণ করার ইঙ্গিত বা অনার্য কোনো প্রবলপরাক্রান্ত গোষ্ঠীপতিকে হত্যার অভ্যাস। আবার অংহোমুক্ বা পাপক্ষালনকারী কিংবা ওজস্বৎ বা শক্তিশালী অভিধায় ইন্দ্রকে যখন বর্ণনা করা হচ্ছে, তখন বুঝতে পারি, এই জাতীয় নিহিত বিশেষণে বিশেষ বিশেষ প্রত্নবিশ্বাসের প্রাধান্য।

এই সমস্ত বিশ্লেষণ করে আমরা এই সত্যে উপনীত হই যে, সংহিতার ভাষার অধিকাংশেই সাংস্কৃতিক সমরূপতার প্রবণতা। তাই এই সাহিত্য এমন করে বহু বিশিষ্ট সর্বজনীন অভিজ্ঞতার সামূহিক প্রত্নস্মৃতির অমেয় ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে। 'বৃত্রতূর্য'-এর মতো বিশেষণ-প্রয়োগ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে মন্ত্রের শ্রোতা আর্যদের প্রাচীন সমাজ-জীবনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অবহিত, অর্থাৎ সে জানে ঐ বিশেষণের মধ্যে ইন্দ্রের বৃত্রবধের কাহিনীর একটি অধ্যায় বিধৃত আছে। সামূহিক জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ অতীত বৃত্তান্তগুলির প্রতি তর্জনীসঙ্কেত করে বলেই এই ধরনের বিশেষণ জাতি-গোষ্ঠী-বহির্ভূত ব্যক্তির কাছে অর্থাৎ আর্যসংস্কৃতির পরিমণ্ডলের বাইরের ব্যক্তির কাছে সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য ও অর্থহীন রূপে প্রতিভাত হবে। পরবর্তী ধ্রুপদী সংস্কৃতের তুলনায় সংহিতায় ব্যবহৃত সমাসগুলি সবলতর, প্রায় কখনোই দুয়ের বেশি শব্দ সমাসবদ্ধ হয় নি এবং সমাস সত্যই সংক্ষেপকরণের এবং সুখশ্রুতির জন্যেই ব্যবহৃত। মৌখিক সাহিত্যের ঐতিহ্যে যেহেতু স্বতঃস্ফূর্তিই প্রধান বৈশিষ্ট্য, তাই সেখানে সমাস-ব্যবহারের দৃষ্টান্তও বিরল। সংক্ষিপ্ততা, পরিচ্ছন্নতা ও যথার্থতা—অর্থাৎ যে সমস্ত গুণ শ্রুতিকাব্যের পক্ষে অপরিহার্য, বিশেষত পরবর্তী অলংকার সাহিত্য যাকে ওজঃ ও প্রসাদ গুণ বলেছে, তাই। সমাস-প্রয়োগে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয় গাঢ়তা ও বহুমুখী ব্যঞ্জনা। যেমন—ইন্দ্র হচ্ছেন শতক্রতু ও পুরন্দর ; সৌরদেবতারা হিরণ্যবাহু ; মিত্র ও বরুণকে বলা হচ্ছে ঋতাবৃধা ; অগ্নিকে জাতবেদা, গৃহপতি ও রত্নধাতম, পুরুষকে সহস্রশিরাঃ, সহস্রাক্ষ ও সহস্রপাৎ, অরণ্যানী অঞ্জনগন্ধী, বহ্বন্না ও অকৃষীবলা। গ্রীক প্রত্নকথায় পাচ্ছি একই ধরনের দেবনামগত বিশেষণ (যথা আপোল্লো লুকোকটোনোস, স্মিনথিওস, পার্নোপিত্তস ও নোমিওস কিংবা জিউস অ্যালেক্সিকাকোস, এফেস্টিওস, ফ্যামেলিওস ও এ্যাগার‍্যাইয়োস ইত্যাদি) প্রকৃতপক্ষে বৈদিক ভাষায় যে সমৃদ্ধি দেখা যায়, মূল ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাগত কাঠামোর অন্তর্নিহিত শক্তিতেই তার উৎস।

ধ্বনিগত বা রূপগত দিক দিয়ে বৈদিক ভাষা অনড় স্থানুপদার্থ নয় ; বহতা নদীর মতো নিজস্ব গতিতে সেই ভাষা ক্রমশ বিবর্তিত ও সরলীকৃত হয়ে শেষ পর্যন্ত যে ধ্রুপদী সংস্কৃতের সমীপবর্তী হয়েছে—তার বিভিন্ন পর্যায় ঋক্‌সংহিতার মধ্যেই

স্পষ্ট। প্রাচীনতর পর্যায়ে বৈদিক ভাষায় ব্যাকরণগত বৈচিত্র্য ও বিকল্পের সংখ্যা যে অনেক বেশি, তার কারণ সম্ভবত এই যে, বহু কৌম ও জনগোষ্ঠী উপভাষাগুলির সংমিশ্রণে গঠিত একটি সর্বজনবোধ্য বাচনিক কাঠামোকে ভিত্তি ক'রেই ঋক্‌সংহিতা রচিত। প্রতি গোষ্ঠীরই একটা নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র শব্দভাণ্ডার ছিল ; সর্বজনীন রূপটি কালের নিয়মে বিবর্তিত হলেও কিছু কিছু অংশ আবার সেই নিয়মকে অস্বীকার ক'রেই প্রাচীন বাগ্‌বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ব্যবহৃত ভাষা তাই স্বভাবতই পূর্ববর্তী মণ্ডলগুলির তুলনায় অনেকাংশে ভিন্নপথগামী হয়ে পড়েছে। প্রাচীনতর বৈদিক সাহিত্যের অধিকাংশই খ্রিস্টপূর্ব একাদশ ও দশম শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল। সূক্তসমূহের ভাষা বিশ্লেষণ ক'রে যেহেতু প্রাকৃত ভাষাগুলি থেকে ঋণগ্রহণের বহু দৃষ্টান্ত প্রমাণ করা যায়, তা থেকে এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হওয়া যায় যে, কোনো এক সময়ে সাধারণ জনতার ভাষা ও আনুষ্ঠানিক সাহিত্যের ভাষার মধ্যে কোনো একান্ত বা অলঙ্ঘ্য বিচ্ছেদের প্রাচীর বিদ্যমান ছিল না। কাব্যের প্রয়োজনে প্রচলিত বাচনিক কাঠামোকে কখনও কখনও কৃত্রিমভাবে পরিমার্জিত করার ফলেই ঋগ্বেদের ভাষা তার নিজস্ব পরিশীলিত অভিব্যক্তি লাভ করেছিল। ঋগ্বেদ সংহিতা যখন সম্পূর্ণভাবে দীর্ঘকালব্যাপী প্রয়াসের ফলে সংকলিত হল, তার মধ্যে রয়ে গেল প্রাচীন অলৌকিক আখ্যানের ভগ্নাবশেষ, মহাকাব্যের লক্ষণযুক্ত স্তর যা পরবর্তীকালে কখনোই পূর্ণাঙ্গ মহাকাব্যে পরিণত হল না, এবং সেই সঙ্গে জাদুগীতি ও কিছু বিরল গীতিকবিতার অংশ। ঋক্‌সংহিতা বহু শতাব্দীব্যাপী এমন এক ধরনের প্রয়াসের ফসল যার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তির অবকাশ খুব কমই ছিল ; অভিজাত ও যুদ্ধনিপুণ সভ্যতা সুসংগঠিত ও বিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যে বিশেষ যে সাংস্কৃতিক মননের পরিবেশ রচনা করেছিল—ঋক্‌সংহিতা তারও ফলশ্রুতি। বহু প্রজন্মের চেষ্টায় যে সৃষ্টি গড়ে উঠেছে তাতে চিত্রধর্মিতার চেয়ে নানা বর্ণের প্রস্তরখচিত কারুকার্যই যেন প্রকট হয়ে উঠেছে বেশি। পরিশ্রমসাধ্য যান্ত্রিক পরিশীলনের অভিব্যক্তি এই সাহিত্যে আছে ব'লেই কোনো কোনো সমালোচকের মতে তাতে সুখী ও ধর্মভীরু আদিম সমাজের কোন যথার্থ প্রতিফলন নেই। যে নগর-সভ্যতাগুলিতে লিখনপদ্ধতি প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল, সাধারণভাবে ইন্দো-ইয়োরোপীয় জনগোষ্ঠী এবং বিশেষভাবে বৈদিক আর্যরা এই পরিধির বাইরে থাকায় একদিকে যেমন এদের মৌখিক সাহিত্যের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, অন্যদিকে তেমনি গুরুশিষ্যপরম্পরাক্রমে মৌখিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানেরও প্রচলন হয়েছিল। এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে মৌখিক সাহিত্য ও শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে যে ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ছিল, তারই অনিবার্য ফলশ্রুতিরূপে যে কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতার বাতাবরণ ও রক্ষণশীলতার প্রবণতা দেখা দেয় তাতেই বৈদিক ভাষা বিদ্বৎসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে দৈনন্দিন কথ্য ভাষা থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

স্বর

ইন্দো-ইয়োরোপীয় শ্বাসাঘাত পদ্ধতি বৈদিক সংস্কৃতের মধ্যেই সবচেয়ে ভালভাবে সংরক্ষিত হয়েছিল ; এই শ্বাসাঘাত সম্পূর্ণত ব্যাকারণগত কাঠামোর উপর নির্ভরশীল, অর্থের ভূমিকা এখানে নিতান্তই গৌণ। বিভিন্ন শব্দের রূপতাত্ত্বিক ও ব্যাকরণগত চরিত্র অনুযায়ী তা নির্ধারিত, পদাণ্বয়ের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। ধ্রূপদী সংস্কৃতের সঙ্গে বৈদিক ধ্বনিতত্ত্বের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদ এখানেই যে বৈদিক ভাষা শব্দের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপেই স্বাধীন সাঙ্গীতিক শ্বাসাঘাত ব্যবহার করে। ভিন্ন ভিন্ন রচনায় তার প্রয়োগ যেমন ভিন্ন, তেমনি মূল্যও পৃথক।

প্রাচীন ভাষাগুলিতে দু'ধরনের শ্বাসাঘাত প্রচলিত ছিল ; এদের একটি হল উচ্চারণের ঝোঁক অনুযায়ী গ্রিকরীতির শ্বাসাঘাত এবং অন্যটি হল বৈদিক সূক্তে ব্যবহৃত সাঙ্গীতিক স্বরের আরোহন-অবরোহণ নির্ভর শ্বাসাঘাত। কণ্ঠস্বর যখন উচ্চগ্রামে উন্নীত হয়, তাকে বলে 'উদাত্ত', মধ্যম অবস্থানে 'স্বরিত' এবং নিম্নগ্রামে 'অনুদাত্ত'। কোন শব্দে কেবল একটি স্বরবর্ণেরই 'উদাত্ত' শ্বাসাঘাত থাকা সম্ভব। শ্বাসাঘাতের চরিত্র শব্দের বহিরঙ্গ সংস্থান অনুযায়ী নির্ধারিত হত না ; বহু প্রাচীন ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষায় সারাধণভাবে পালনীয় কিছু রূপতাত্ত্বিক নিয়ম অনুযায়ী শ্বাসাঘাত নির্ণীত হ'ত। এই শ্বাসাঘাত শব্দের ধ্বনিগত কাঠামোরই অঙ্গ ছিল। গ্রিক ভাষায় শ্বাসাঘাতের প্রধানতম ঝোঁকের মতো বৈদিক ভাষায় উদাত্ত স্বরেরও শব্দাবলীতে বা অণ্বয়ে কোন নির্দিষ্ট অবস্থান ছিলনা—শব্দের যে কোন স্বরবর্ণেই তা প্রযুক্ত হতে পারত। ইন্দো-ইয়োরোপীয় মূল ভাষার বক্রস্বরটি অবশ্য প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় উত্তরাধিকার রূপে গৃহীত হয় নি ; বৈদিক শ্বাসাঘাতপ্রক্রিয়ায় বিশিষ্ট লক্ষণরূপে স্বরিতের স্বতন্ত্র অবস্থান লক্ষণীয়। উচ্চাবচতাহীন স্বরবর্ণ ও শব্দাংশে অনুদাত্ত শ্বাসাঘাত সংস্থাপিত হয়। স্বরিত যেমন ঋগ্বেদে উচ্চতম স্বরগ্রাম রূপে গৃহীত, যজুর্বেদ সংহিতায় উদাত্ত এই গৌরবের অধিকারী। বৈদিক সাহিত্যে মোট যে ছয় ধরনের শ্বাসাঘাত পাওয়া যায়, নিম্নতম থেকে উচ্চতম স্বরপর্যায়ের ক্রমিক অভিব্যক্তিরূপে সেগুলি হল ঃ অনুদাত্ততর → অনুদাত্ত (নিহিত বা একশ্রুতি) → প্রচয় → সন্নতর → উদাত্ত → উদাত্ততর। শ্বাসাঘাতের এ সমস্ত সূক্ষ্ম বৈচিত্র্যের উল্লেখ পাওয়া যায় শুক্লযজুর্বেদে। সাধারণভাবে স্বরবিন্যাসে তিনটি স্বরই স্বীকৃত ; উদাত্ত, স্বরিত এবং অনুদাত্ত। শ্বাসাঘাতের ফলে সূক্ত-আবৃত্তি অধিকতর আকর্ষণীয়, সৌষ্ঠবপূর্ণ ও গতিময় হয়ে ওঠে ; আপাতদৃষ্টিতে যা সাধারণ শব্দপুঞ্জ তাতে সেই সম্ভ্রম ও বিস্ময়বোধ যুক্ত হয়, ইন্দ্রজাল ও ধর্মের পক্ষে বা অপরিহার্য। যথার্থ শ্বাসাঘাতসহ সতর্ক উচ্চারণ বিশেষীকৃত প্রশিক্ষণের উত্তম ফলশ্রুতিরূপে গণ্য ছিল ; এই শিক্ষা ছিল হোতৃ শ্রেণীর পুরোহিতদের নিঃসপত্ন অধিকার। তবে যেহেতু কিছু

কিছু ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ জাতীয় গ্রন্থেও শ্বাসাঘাত প্রযুক্ত হয়েছিল, তাই অনুমান করা যায় যে, সমুন্নীত যাজকতান্ত্রিক ভাষারই অর্থাৎ সেই যুগের পরিশীলিত সাহিত্যিক ভাষারই এই একটা বিশিষ্ট লক্ষণ।

মৌখিক সাহিত্যরূপে ঋগ্বেদ

প্রাচীনতম মৌখিক সাহিত্যের নিদর্শনগুলির মধ্যে যে সমস্ত রচনা পর্যাপ্ত পরিমাণে সংরক্ষিত হয়েছিল, ঋগ্বেদসংহিতা তাদের অন্যতম। হোমারের দুটি মহাকাব্য এবং রামায়ণ ও মহাভারতের বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে গীতিকবিতা, গীতিকা ও সূক্তের সংকলনরূপে ঋগ্বেদ গড়ে উঠেছে এবং মহাকাব্যের পূর্ববর্তী মৌখিক কবিতার রূপ ও চরিত্র অনুশীলনের একটি বিরল সুযোগ আমাদের কাছে তুলে ধরেছে। মৌখিক কাব্যের স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী ঋগ্বেদের প্রথম পর্যায়ে প্রশস্তি ও স্তুতিগানের সরল পদ্ধতিরূপে ছন্দোরীতির উৎপত্তি হয়েছিল ; কালের গতিতে ছন্দের জটিলতা ও দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাই 'গায়ত্রী' (গান করা অর্থে 'গৈ' ধাতু থেকে উদ্ভূত ছন্দের নাম) নামের মধ্যে রয়েছে গানের অনুষঙ্গ, তেমনি 'প্রগাথ' কথাটির অর্থ প্রকৃষ্টরূপে গীত। স্তুভ্-ধাতু নিষ্পন্ন 'ত্রিষ্টুভ্' ও 'অনুষ্টুভে'র মধ্যে রয়েছে প্রশস্তির দ্যোতনা কেননা এই দু'টি নামের তাৎপর্য যথাক্রমে 'তিনবার স্তুতি' ও 'পরবর্তী স্তুতি'। লক্ষণীয় যে, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুভ্ ও অনুষ্টুভ্ প্রাচীনতম ছন্দরূপে পরিগণিত ; যদিও গায়ত্রী, অনুষ্টুভ্ ও পঙ্ক্তি ও মহাপঙ্ক্তির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল—প্রত্যেকের আটটি ক'রে অক্ষর যথাক্রমে তিন, চার, পাঁচ ও ছয়টি চরণ রয়েছে। আবার বিরাজ্, ত্রিষ্টুভ্ ও জগতী ছন্দে প্রত্যেকটির রয়েছে চারটি চরণ এবং যথাক্রমে দশ, এগারো ও বারোটি অক্ষর। অন্যদিকে উষ্ণিহ্, বৃহতী, ককুভ, সতোবৃহতী ও অত্যষ্টি ছন্দে অক্ষর ও চরণের সংখ্যা—দুটোই পরিবর্তিত হয়ে যায়।

পৃথিবীর প্রাচীনতম মৌখিক রচনারূপে ঋগ্বেদ আমাদের সামনে এমন কিছু লক্ষণ তুলে ধরেছে যা অক্ষর বা লেখা আবিষ্কারের পরবর্তী সাহিত্যের তুলনায় স্বরূপত ভিন্ন। যুগোস্লাভিয়ার মৌখিক মহাকাব্য সম্পর্কে অসামান্য গবেষণা করে বিদগ্ধ সমালোচক মিল্ম্যান প্যারি ও তাঁর সুযোগ্য ছাত্র-সহকর্মী এ. বি. লর্ড কাব্যের মৌখিক চরিত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন এবং হোমার ও অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যিকদের রচনার আলোচনায় সেই সব সিদ্ধান্ত সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন। সাহিত্যের লিখিতরূপে প্রত্যেকটি শব্দই মৌলিক এককরূপে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু মৌখিকভাবে রচিত সাহিত্যে সাধারণত শব্দগুচ্ছই মূল ও ন্যূনতম উপাদান। কখনো কখনো মৌখিক সাহিত্যেও একক শব্দ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু রচনার প্রধান প্রবণতা সেদিকে থাকে না। সুদূর অতীতের প্রাচীন কবিরা যে সব শব্দগুচ্ছ ব্যবহার

করে গেছেন, পরবর্তী কবিদের দ্বারা তা অক্ষয় উত্তরাধিকাররূপে সাদরে নিরন্তর গৃহীত ও ব্যবহৃত হয়। লেখা আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বকালে বারংবার ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছ স্মৃতিতে ধারণ করার পক্ষে যেমন সহজতর তেমনি নির্দিষ্ট ছন্দোগত কাঠামোয় সংস্থাপিত করার পক্ষেও সহজসাধ্য। মৌখিক সাহিত্যের চারণকবি যেহেতু বিচিত্র ধরনের ঐতিহ্যগত কাঠামোর সীমার মধ্যে কাব্যরচনা করতেন, তাই ভাষাগত অনুপুঙ্খের সাধারণ উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে নিজস্ব রীতিতে কাব্যভাষাকে প্রয়োজনমতো নমনীয়তা-যুক্ত করতেও কোনো বাধা ছিল না। তাই মৌখিক ঐতিহ্যের কবি একই সঙ্গে স্বাধীন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ। ঋগ্বেদের পুনরাবৃত্ত অংশগুলিকে গভীরভাবে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করলে মৌখিক কাব্যের নানা বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মন্ত্রের সূচনায় ও সমাপ্তিতে কখনো সম্পূর্ণ চরণ, কখনো বা বাক্যাংশ পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এছাড়াও পুনরাবৃত্তির সূক্ষ্মতব কিছু পদ্ধতিও রয়েছে—চরণের মাঝামাঝি পুনরাবৃত্তি, পরবর্তী স্তবকের সূচনায়ও পূর্ববর্তী স্তবকের শেষাংশের পুনরাবৃত্তি, কোনো স্তবকেব মধ্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট শব্দের বারংবার আবৃত্তি, সুপরিচিত, প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় চরণ ও বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তি ইত্যাদি। এই জাতীয় বাচনিক পদ্ধতির মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট কবি কখনো বা কবি-পরিবারের নিজস্ব ঘরানার ছাপও স্পষ্টভাবে রয়ে গেছে। অধিকাংশ সূক্তই যেহেতু যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় সমবেত জনতা কিংবা পুরোহিত ও তাঁর সহকারীদের দ্বারা গীত হ'ত,—তাই কোন একটি চরণকে ধ্রুবপদ রূপে বারবার আবৃত্তি করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। প্রাথমিকভাবে কোনো চরণ পুনরাবৃত্ত হওয়ার পিছনে সম্ভবত এই বিশ্বাস সক্রিয় ছিল যে, এই সমস্ত চরণে ঐন্দ্রজালিক শক্তি নিহিত রয়েছে।

পুনরাবৃত্ত চরণে আর্যদের প্রার্থনার গুরুত্ব প্রতিফলিত ; আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক সঙ্কট থেকে রক্ষিত হওয়ার জন্য দেবতার প্রসন্ন অভিব্যক্তি যে তাঁদের প্রার্থিত, তা বোঝানোর জন্য এবং সেই সঙ্গে অন্তর্নিহিত জাদুকরী শক্তি উদ্বোধনের জন্য মন্ত্রের নির্দিষ্ট কোনো অংশ বারবার আবৃত্তি করা হ'ত। কখনো কখনো একাধিক দেবতার সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে একটি চরণ অনুরূপভাবে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এতে যে অতিজাগতিক শক্তির স্ফূরণ প্রত্যাশিত ছিল, বলা নিষ্প্রয়োজন ; খুব কম ক্ষেত্রেই তা শুধুমাত্র নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, খুব সম্ভবত ঐন্দ্রজালিক শক্তি উদ্রেকের জন্যে এক প্রত্যয় কবি ও তাঁর শ্রোতৃমণ্ডলীর অবচেতন মনে বিশেষ তাৎপর্য বহন করত। সমস্ত প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসের প্রথম পর্বে বিশেষভাবেই শব্দের মধ্যে নিহিত এক অতিপ্রাকৃত শক্তি সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল কবি মনীষীর ক্ষমতা আছে এই শক্তিকে মন্ত্রের দ্বারা সমষ্টি বা ব্যষ্টির কল্যাণে নিয়োজিত করার। এ বিশ্বাস সব প্রাচীন সমাজেই ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান ছিল। আবার কোন

স্তবকে একটিমাত্র শব্দ যখন বহুবার পুনরুক্ত হ'ত, তখন তা যেন তার নিজের প্রতি বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট ক'রে সেই স্তবকে বিধৃত ভাব-বিন্যাসের তীক্ষ্ম একটি কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠত। ফলে সেই স্তবকের অন্য শব্দগুলি তুলনামূলকভাবে গৌণ হয়ে বাক্যের পশ্চাৎপটে অপসারিত হ'ত। তাছাড়া, পুনরুক্ত শব্দটি শ্রোতার মনে এমন মোহময় বা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থার সৃষ্টি করত যাতে সেই শব্দাশ্রিত ভাবনা মনে সুদৃঢ়ভাবে নিবিষ্ট হয়ে অন্য সমস্ত চিন্তাকে গৌণ ও নিষ্প্রভ ক'রে দেয়। সংক্ষেপে বলা যায়, এই রচনা-পদ্ধতি এমন সম্মোহনকারী শাব্দিক ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করত যার প্রতি সমগ্র সমাজের অনুমোদন অভিব্যক্ত হওয়াকে কবি তাঁর কাব্যের ব্যবহারিক কার্যকারিতার প্রমাণ হিসাবে ধ'রে নিতেন।

আবার কোন সূক্তে যখন একটি বিশেষ চরণ পুনরাবৃত্ত হয়—মৌখিক সাহিত্যের ঐতিহ্য অনুযায়ী তা রচয়িতা ও স্তুত দেবতার সাময়িক ঐক্য বা একাত্মতা সূচিত করে। দ্বিতীয় মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের প্রত্যেকটি ঋক্ই সমাপ্ত হয়েছে 'স জনাস ইন্দ্রঃ' দিয়ে। এই পুনরুক্তি একটি সঙ্গে দু'টি ভূমিকা পালন করছে ঃ একদিকে এই শব্দগুচ্ছ অলৌকিক ঘটনার স্রষ্টারূপে ইন্দ্রের গৌরব দৃঢ়ভাবে প্রচার করছে এবং অন্যদিকে দেবতার অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয়াচ্ছন্ন মন থেকে সমস্ত রকম সম্ভাব্য সন্দেহও দূর করছে। আর্যদের প্রথম বিজয়ী সেনাপতি ইন্দ্র একদা নিশ্চিতই রক্তমাংসের মানুষই ছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর পর ক্রমে ক্রমে জনসাধারণের স্মৃতিতে তিনি অমর দেবত্বে মণ্ডিত হয়ে ওঠেন। দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক ইন্দ্র হয়ত সামূহিক জীবনে চূড়ান্ত সাময়িক, সামাজিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অধিকার ক'রে গিয়েছিলেন ; ফলে প্রথম ইন্দ্র সম্পর্কে যত দৈব ও অলৌকিক শক্তিসম্ভূত কীর্তিকলাপ প্রচারিত হয়েছিল—সেই সবই সংশয়ের বিষয় হয়ে উঠল. আলোচ্য পুনরুক্তি ইন্দ্রের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ও তাঁর সাম্প্রতিক প্রত্নপৌরাণিক দৈবস্বভাবকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

পৃথিবীর বহু স্থানেই এই বিশ্বাস প্রচলিত যে, নির্দিষ্ট কিছু শব্দ ঐন্দ্রজালিক শক্তিযুক্ত ; এগুলি বহুবার পুনরুক্ত হলে শ্রোতার মনে একটি সম্মোহনী বাতাবরণ নির্মিত হয়, বিশেষভাবে দেবনামে রয়েছে পবিত্রভাবের দ্যোতনা ও অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার আভাস। বহু ক্ষেত্রেই আমরা লক্ষ্য করি যে, আহূত দেবতাকে বিবিধ বিভক্তিযুক্ত শব্দরূপের মাধ্যমে উল্লেখ করা হচ্ছে ; প্রশস্তির প্রতি দেবতার মনোযোগ আকর্ষণ করা কবির সাধারণ উদ্দেশ্য হলেও, দেবনামে অন্তর্নিহিত ঐন্দ্রজালিক শক্তিকে উদ্বোধিত করাও নিঃসন্দেহে তাঁর অভিপ্রেত। আবার কখনো কখনো পুনরুক্তির মধ্যে নান্দনিক আবেগও প্রচ্ছন্ন থাকে—ধ্রুবপদ জাতীয় চরণে উপমা ও অনুপ্রাসের প্রয়োগ ছাড়াও অনুকার ধ্বনির ব্যবহারে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সব ক্ষেত্রে কবি

আত্মসচেতন শিল্পীর মতো সূক্ষ্ম প্রয়োগ নৈপুণ্যের অধিকারী ; রচনারীতির প্রতি তাঁর এই বিশেষ মনোযোগের মধ্য দিয়ে তিনি একই সঙ্গে তাঁর অভীষ্ট দেবতা ও সমসাময়িক জনসাধারণের তৃপ্তি বিধান করতে চান।

মৌখিক সাহিত্যের বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণ—অর্থাৎ শব্দগুচ্ছ, পুনরুক্তি, অনুপ্রাস, সমধ্বনিযুক্ত অক্ষর এবং অন্যান্য স্মৃতিসহায়ক বাচনিক উপাদান—ইত্যাদির উপস্থিতি লিখিত সাহিত্যের সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্যকে স্পষ্ট ক'রে তোলে। লেখন-পদ্ধতির বিস্তারের পরে লেখকরা বাচনিক এককরূপে একটি মাত্র শব্দকে ব্যবহার করতে সমর্থ হলেন ; ফলে অন্যান্য উপাদানের আর কোনো প্রয়োজন রইল না। মৌখিক সাহিত্য সর্বতোভাবে স্মৃতিবাহিত ব'লেই বাচনিক উপাদানরূপে পুনরুক্তি এতে অপরিহার্য ; এগুলির কিছু প্রার্থনাসূচক, কিছু বা আহ্বানমূলক আর কিছু অপেক্ষিত জাদুশক্তি-উদ্বোধক—শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে আবেগ সঞ্চার করার প্রয়োজনে শব্দগুচ্ছগুলি সামগ্রিকভাবে ব্যবহৃত হয়। যে সমস্ত পুনরুক্তি সম্মোহনসঞ্চারী ;—অন্তর্বস্তু, চিত্রকল্প, ছন্দ ও অনুপ্রাসের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে সেই সব এমন এক বাতাবরণ সৃষ্টি করে যেখানে সামূহিক আনুষ্ঠানে নিষ্ক্রিয়ভাবে যে জনতা যোগদান করে তাদের উপযোগী তন্দ্রাচ্ছন্ন মানসিক পরিণতি সৃষ্টির জন্য সমস্ত বিচারবুদ্ধির ক্রিয়া সাময়িকভাবে স্থগিত হয়ে যায়। প্রখ্যাত সমালোচক জি. এস. কার্ক নিয়মতান্ত্রিক সাহিত্যের পরিধিতে সন্নিবিষ্ট স্বাভাবিক রচনা এবং নিয়মতান্ত্রিক সাহিত্যশৈলীতে অভিব্যক্ত ইচ্ছাকৃত আত্মসচেতন রচনার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। যথার্থ মৌখিক সাহিত্যের পরিচয়জ্ঞাপক নিম্নোক্ত তিনটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন : (১) সংক্ষেপীকরণের আদর্শ অনুসরণ ; (২) সূত্রবদ্ধ শব্দাবলীর পরিবর্ধন ও সোচ্চার গ্রন্থনীর স্বাভাবিকতা এবং (৩) ছন্দ, তাল বিষয়ে ঐতিহ্যগত অনুপুঙ্খ। তবে উক্ত সমালোচক যেহেতু হোমারের মহাকাব্যই বিশ্লেষণ করেছেন তাই তাঁর নির্দেশিত সমস্ত লক্ষণ নির্বিচারে বৈদিক কাব্য সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়, কেননা ঋগ্বেদ প্রাক্-মহাকাব্য যুগের রচনা এবং চরিত্রগতভাবে বহুলাংশে আনুষ্ঠানিক। কার্ক-এর আলোচনা থেকে এইটুকু গ্রহণীয় যে, নিয়মতান্ত্রিক শৈলীতে রচিত যথার্থ মৌখিক সাহিত্যের চরিত্রবৈশিষ্ট্য লিখিত সাহিত্যের তুলনায় স্বরূপত ভিন্ন—সম্ভবত লেখন-পদ্ধতি ইতিমধ্যেই আবিষ্কৃত হয়েছিল কিন্তু সাহিত্য-রচনায় তা ব্যবহৃত হত না। এমন এক যুগে অনুকরণশীল মৌখিক রচনায় নিশ্চিতই পূর্বক বিদের রচনা থেকে প্রভূত পরিমাণ ঋণ-গ্রহণের চিহ্ন থাকাই স্বাভাবিক।

দশম-মণ্ডলের সূক্তগুলি পূর্ববর্তী মণ্ডলের অন্তত দুই শতাব্দী পরে সঙ্কলিত হয়েছিল, পূর্ববর্তী রচনা থেকে কাব্যিক উপাদান ঋণরূপে আত্মীকরণের চিহ্নও তাই এতে অধিকতর পরিমাণে ও স্পষ্টভাবে বিদ্যমান এবং সহজেই আবিষ্কারযোগ্য। বস্তুত

ঋগ্বেদের গঠনগত উপাদানসমূহ বিভিন্ন কালে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রয়োজন অনুসারে সংবর্ধিত হয়েছিল ; সম্ভবত, সেই সঙ্গে, বিচিত্র সামাজিক ক্রিয়ায় জড়িত ব্যক্তিরা এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সমগ্র মৌখিক সাহিত্যের ঐতিহ্য দীর্ঘকালব্যাপী ইতিহাসের ফলশ্রুতি, বেদ ও সুদীর্ঘকালীন শৈলীগত পরিমার্জনের ফসল, এর কাব্যভাষাও অনুরূপ কাব্যিক প্রক্রিয়ার ও পরিণতির চূড়ান্ত এক অভিব্যক্তি। বিশাল কাব্যভাণ্ডারের বহু প্রজন্মব্যাপী স্রষ্টাদের স্মৃতি যাতে অবাঞ্ছিতভাবে পীড়িত না হয়, কোনো অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় শব্দ যুক্ত না করার প্রতি কবিগণ তাই যত্নশীল থাকতেন। মৌখিক সাহিত্যের প্রধান চরিত্রলক্ষণ হল অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে কঠোর মিতভাষিতা। এই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে অদৃশ্য দেবতার সন্তুষ্টি মূলত অনুমাননির্ভর হলেও সম্পৎশালী রাজন্যদের বদান্যতাটা কিন্তু সর্বদাই প্রত্যক্ষগোচর এবং কিছু কিছু নির্দিষ্ট কবিতা রাজকীয় দাতাদের কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত অধিক আনুকূল্য লাভ করত ব'লে এইসব গানের গৌরব সমাজে যেন তর্কাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে যেত। বিভিন্ন কবিদের মধ্যে দান-সামগ্রী লাভের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা ছিল ব'লেই মন্ত্রে তার উপযোগী অংশের পুনরুক্তির প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। কেননা, নান্দনিকভাবে তৃপ্তিকর কোন চিত্রকল্প জনগোষ্ঠীর সাহিত্যভাণ্ডারে সতর্ক সংরক্ষণের যুগে নিশ্চয়ই একবার মাত্র ব্যবহৃত হয়ে বর্জিত হতে পারে না। বরং উপযুক্ত অবকাশে এই জাতীয় উপকরণ বারংবারই ব্যবহৃত হওয়া স্বাভাবিক। মৌখিক সাহিত্যের কবি উত্তরাধিকারসূত্রে সামাজিক প্রত্নস্মৃতি থেকে বাচনিক আঙ্গিকসমূহ আহরণ ক'রে, সামান্য পরিমার্জন ক'রে নিজস্ব এক কাব্যরচনার শৈলী নির্মাণ করতেন। এই পদ্ধতি কেবলমাত্র অধিকতর নির্ভরযোগ্যই ছিল না একই সঙ্গে শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ছিল। উপসংহারে আমরা এই মন্তব্য করতে পারি যে, কবিদের প্রথম প্রজন্মকে অর্থাৎ যাঁরা কাব্যের প্রাথমিক উপাদানরূপে মূল শব্দ বা শব্দগুচ্ছ নির্মাণ করেছিলেন তাঁদেরই প্রধান অনুপ্রাণিত কবি রূপে চিহ্নিত করা যায় কেননা প্রাথমিক পথ-প্রদর্শক রূপে তাঁদের সম্মুখে সূত্রবদ্ধ তেমন কোন বাক্যাংশের দৃষ্টান্ত ছিল না যা থেকে তাঁরা অনায়াসে ঋণগ্রহণ করতে পারতেন। পরবর্তী প্রজন্মের কবি, শিষ্যবর্গ বা উত্তরাধিকারীরা প্রাগুক্ত অনুপ্রাণিত কবিদের রচনা থেকে যথেচ্ছ মন্ত্রাংশ বা চরণ গ্রহণ করেছিলেন। তৃতীয় পর্যায়ে এলেন স্বল্পমেধা কবিরা, অপটু অনুকারক এবং নিছক আবৃত্তিকারেরা। এদের কোন রকম কাব্যপ্রতিভা বা নান্দনিক উপলব্ধি বা প্রকাশক্ষমতা ছিল না ব'লেই উত্তরাধিকাররূপে গৃহীত বাক্যাংশকে যথাযথ প্রসঙ্গ অনুযায়ী ব্যবহার করতে এঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন, ফলে এঁদের রচনা ত্রুটিযুক্ত ও কাব্যমূল্যে দীন।

চিত্রকল্প

মৌখিক কাব্যের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বাক্‌সংযম। যদিও এটি বিবিধ উপায়ে সাধিত হত, তবু বাক্‌স্বল্পতা অর্জনের প্রয়াস শুষ্ক ও নিষ্প্রাণ আনুষ্ঠানিক সঙ্কেতসূত্রেই পর্যবসিত হয় নি। যে কোন মানদণ্ডেই ঋগ্বেদীয় সূক্তের অনেক সূক্তই কাব্যপদবাচ্য।

বহু-কবি-বিরচিত এই জাতীয় বিপুল সাহিত্যে, খুব স্বাভাবিকভাবেই, কাব্যবিচারে বেশ কিছু অংশ উৎকৃষ্ট আবার অনেক অংশই নগণ্য হয়। প্রাচীন কাব্যে যে ধরনের প্রচলিত রীতি রয়েছে, সে সমস্তই বৈদিক সূক্তে ব্যবহৃত হয়েছে। বৈদিক সূক্তের বহুলাংশই অনলংকৃত এবং সম্ভবত তৎকালীন সাধারণ বাগ্‌ভঙ্গির খুবই নিকটবর্তী ; তবু এর বহুস্থানে চিত্রকল্প প্রযুক্ত হয়েছে এবং তা সার্থকভাবেই। মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রাচীন সাহিত্য চিত্রকল্প শুধুমাত্র শোভাবর্ধক নয়—এর একটি কার্যকরী ভূমিকাও রয়েছে, কেননা অলংকৃত কাব্যে শব্দনির্ভর এক ইন্দ্রজাল রচনার উদ্দেশ্য স্পষ্ট প্রতীয়মান। বৈদিক চিত্রকল্পের অধিকাংশই নির্মিত হয়েছে উপমা, রূপক, সমাসোক্তি ও অনুপ্রাসের প্রয়োগের দ্বারা। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমরা যাকে চিত্রকল্প ব'লে মনে করছি, বৈদিক কবিদের বা তাঁদের শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে তার তাৎপর্য সম্ভবত অনেকটাই ভিন্ন ছিল, কেননা তথাকথিত চিত্রকল্পগুলি ছিল তাঁদের দৈনন্দিন বাগ্‌ব্যবহারের সাধারণ অঙ্গ। কিন্তু ভাষাগত অভ্যাস ও শৈলীগত প্রকরণের দিক দিয়ে বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের যুগের যে স্পষ্ট ব্যবধান এসে গেছে, তার ফলে আমাদের পক্ষে পূর্বপরিকল্পিত আলংকারিক রীতির সঙ্গে সাধারণ ভাষার বিশেষভঙ্গির পার্থক্য নিরূপণ করা আজ খুবই কঠিন।

বৈদিক উপমা প্রধানত তিন ধরনের—স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাব্যিক, পরিকল্পিতভাবে আলংকারিক ও স্পষ্টতই ঐন্দ্রজালিক। সংহিতায় নিছক শোভাবর্ধক উপমা প্রকৃতপক্ষে খুব কমই খুঁজে পাওয়া যায়। কাব্যিক ও ঐন্দ্রজালিক উপমাই পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবশ্য এই দুই জাতীয় উপমা পরস্পর ভিন্ন নয়। অন্যভাবে বলা যায়, উপমা কবিতার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে বা দেবতা ও মানুষের নিকট আরো প্রীতিকর ক'রে তোলে ব'লেই সেহেতু কবি তার প্রয়োগ করেন, তাই একই সঙ্গে তাঁর অবচেতনায় এই উপলব্ধিও রয়েছে যে, উপমা সূক্তটিকে অনুষ্ঠানগতভাবে অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক দিক দিয়ে আরো নিশ্চিত ফলপ্রদ ক'রে তুলবে। যজমানের অভীষ্ট সিদ্ধির প্রয়োজনে দেবতাকে তাঁর প্রার্থনা পূরণের অনুকূল ক'রে তোলার জন্য কবি যে সমস্ত অনুষ্ঠানগতভাবে কার্যকরি সূক্ত রচনা করতেন, তাতে উপমার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এই বাচনিক উপাদান সূক্তকে অধিকতর মনোমুগ্ধকর ও

জাদুশক্তিতে সমৃদ্ধতর ক'রে তুলত। বৈদিক উপমা দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত গণ্ডী থেকেই উপমান সংগ্রহ করেছে। মোটামুটিভাবে সেই সব উপমানকে নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করা যায়—(ক) প্রকৃতি ঃ যেমন নদী, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি (খ) প্রাণীজগৎ—যেখানে পরিচিত প্রাণীদের মধ্য থেকে মানবিক গুণাবলীর সাদৃশ্য সন্ধান করা হ'ত ; (গ) বিভিন্ন মানবিক সম্পর্ক, যেমন—অপত্যস্নেহ, দাম্পত্য প্রেম, প্রতিবেশিপ্রীতি ও অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কের অনুভূতি ; (ঘ) বিবিধ বৃত্তি (ঙ) দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন উপকরণ বস্তু এবং (চ) মহাজাগতিক।

অভিব্যক্তির কার্যকারিতাকে তীক্ষ্ণতর ক'রে তোলার জন্যে মানুষ বহু প্রাচীন কালেই প্রতীক বা বস্তুর সমান্তরাল বিকল্প অর্থাৎ প্রত্নকথার সন্ধান ও প্রয়োগ করতে শিখেছিল। সুসংহত প্রত্নকথা থেকেই প্রথম পর্যায়ের উপমার সৃষ্টি এবং আরও বেশি সংহতি ও শব্দসংকোচের পর্যায়ে তা রূপকে পরিণত হয়েছিল। প্রাচীন কবিতায় এই সব চিত্রকল্পের নিজস্ব বাস্তব জীবন ছাড়াও তাৎক্ষণিক সৌন্দর্য সৃষ্টির অতিরিক্ত কিছু বিশেষ ধরনের [illegible] ছিল। কবির কল্পনা ও প্রতিভা অব্যবহিত পরবর্তী প্রসঙ্গে গভীরতর জীবনাবেগ যুক্ত করার জন্যই তাকে জীবনের অন্য কোন সমান্তরাল দিকের সঙ্গে তুলনা করত। প্রত্যক্ষ যে জগৎ অথবা পরম্পরাক্রমে আগত দেবপুরাণের যে জগৎ তার থেকে তুলনীয় উপাদান আহরণ ক'রে বিবক্ষিত বস্তুটিকে স্পষ্টতর ও দৃঢ়তর করার প্রয়াসেই প্রথম ব্যবহৃত হ'ল উপমা। ফলে এই শক্তিসাধক অলংকরণের দ্বারা মন্ত্রের ব্যঞ্জনাশক্তি বহু শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও অনুষ্ঠানের ঈপ্সিত ফল উৎপাদনে সমর্থ ব'লে উপস্থাপিত করল। চূড়ান্ত বিচারে চিত্রকল্প বিষয়বস্তুর গৌরব বৃদ্ধি ক'রে ফললাভের সম্ভাবনাকেই সুনিশ্চিত করে। বৈদিক উপমাগুলির শক্তি ও কার্যকারিতা সমান নয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগু[illegible] অত্যন্ত সতেজ ও সজীব। অনুমান করা যায় যে, বৈদিক সূক্তগুলি রচিত হওয়ার বহু পূর্ব হতেই শ্লোক রচনার একটি সুদীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল ; এমন কি সংহিতাতেও কিছু কিছু উপমাকে গতানুগতিক ও বিধিবদ্ধ মনে হয় ; আবার একই সঙ্গে কিছু কিছু উপমা নবীন ও প্রাণবন্ত। উপমাকে সংক্ষিপ্ত করে, দৃঢ়তর ও শক্তিযুক্ত করে রূপক ; ঋগ্বেদে বেশ কিছু রূপকেরও ব্যবহার আছে।

উপমা ও রূপকের তুলনায় অতিশয়োক্তি কিছু অধিক সংখ্যায় পাওয়া যায় ; শ্রোতৃমণ্ডলীকে প্রভাবিত করার জন্য চূড়ান্ত আতিশয্যের আশ্রয় নেওয়ার পদ্ধতি সাধারণভাবে প্রাচীন ও অর্বাচীন সব সাহিত্যেরই বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণ ঋগ্বেদে পড়ি ঃ সমুদ্র যেভাবে জল ধারণ করে, ইন্দ্রের পাকস্থলীও তেমনি সোমরসে পূর্ণ (১ : ৮ : ৭)। বস্তুত ইন্দ্রের কীর্তি বর্ণনা প্রসঙ্গেই অতিশয়োক্তি সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়েছে ; এছাড়া, বায়ুবাত দেবতাদের শক্তি, সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত যে কোন

দেবতার বিশ্বজাগতিক কার্যকলাপ এবং আর্যদের শত্রুবাহিনীর অত্যাচার ও বৈরিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রচুর অতিশয়োক্তি প্রযুক্ত হয়েছে। দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রশস্তি ও প্রার্থনা এই অলংকার প্রয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। বিশেষত যখন সদ্য ফললাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবল এবং অভীষ্ট পূরণে সূক্তের ক্ষমতা সম্পর্কে বিপুলসংখ্যক প্রত্যাশী ও সাগ্রহ অংশগ্রহণকারী শ্রোতৃমণ্ডলীকে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রভাবিত করা প্রয়োজন। বৈদিক কবিতায় অতিশয়োক্তির ভূমিকা নিছক আলংকারিক নয়, তার একটা ধর্মীয় ও প্রত্নপৌরাণিক কার্যকারিতাও রয়েছে। দেবতাদের ঐশী ক্ষমতাসম্পন্ন রূপে উপস্থাপিত করার অর্থ তাদের অতিমানবিক গৌরব প্রতিষ্ঠা ; কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ ক'রে অভীষ্ট বস্তুদানের ক্ষমতা সম্পর্কে দেবতাদের উপর বিশ্বাস জাগাবার জন্য কবি তাঁদের ক্ষমতা ও কীর্তিকাহিনীকে মাত্রাহীন আতিশয্যে মণ্ডিত করতে চেয়েছেন। দেবতাদের অতীত কার্যকলাপ সম্পর্কে বর্তমানে কোন প্রমাণ সংগ্রহের প্রয়োজন নেই ; সমাজের গোষ্ঠীগত প্রয়োজন নির্বাহের জন্য দেবতাদের ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা লাভের গৌরবজনক অতীত কাহিনী বর্ণনা ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করা হ'ত। শ্রোতাদের জানানো হ'ত, তাঁদের পূর্বপুরুষের জন্য দেবতারা কত কিছু করেছিলেন—যথোপযুক্তভাবে সন্তুষ্টি বিধান করা হলে তাঁদের জন্যও তাঁরা একই রকম উদার বদান্যতায় দান করবেন। এই উদ্দেশ্যেই অতিশয়োক্তি প্রযুক্ত হ'ত—যাতে আকাঙ্ক্ষা ও তার পূর্ণতা, এবং সম্ভাব্যতা ও বাস্তবের মধ্যবর্তী ব্যবধানের মধ্যে সেতু নির্মাণ করা যায়। অর্থাৎ তাদের প্রয়োগ নিছক আলংকারিক নয়, একই সঙ্গে প্রত্নপৌরাণিক ও আনুষ্ঠানিক। অতএব আমরা দেখছি যে, বৈদিক কবিতায় শুধুমাত্র শোভাবৃদ্ধির জন্য অলংকার ব্যবহৃত হয় না, তার কিছু সাহিত্যাতিরিক্ত উদ্দেশ্যও রয়েছে। কবি তাঁর নিজের জন্য, গোষ্ঠীর জন্য এবং দেবতার জন্যই রচনা করতেন; কিন্তু অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে তিনি রচনা করতেন পুরোহিতের জন্য, যাতে সেই পুরোহিতরা গোষ্ঠীর প্রয়োজন দেবতার নিকট আরও ভালভাবে উপস্থাপিত করতে পারেন এবং দেবতা তাদের প্রার্থনা পূরণ করেন। এই প্রার্থিব প্রয়োজনের আবেগ অবশ্য কবির সমুন্নত দেবস্তুতিতে কোন হানি করে নি ; বস্তুত গোষ্ঠীর প্রয়োজনে কবির আবেগ পরিশীলিত হওয়াতে তাঁর প্রার্থনার গৌরব বৃদ্ধি হ'ত। এইজন্য কবি উপমা, রূপক, অনুপ্রাস এবং অতিশয়োক্তির মতো যে সমস্ত অতিরিক্ত শিল্প প্রকরণের আশ্রয় নিতেন—দেবতাদের নিকট প্রশস্তি তাতে আরো রমণীয় হ'ত এবং দেবতারা তাতে যেন আরও সংবেদনশীল হয়ে উঠতেন, ফলে প্রার্থনার সাফল্য তাদের কাছে নিশ্চিততর হ'য়ে প্রতিভাত হ'ত এবং সেই সঙ্গে তাদের কল্পনায় যজ্ঞও হয়ে উঠত আশু ফলপ্রদ।

শব্দালংকারের ক্ষেত্রে অনুপ্রাস সবচেয়ে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত। তবে পরবর্তী সংস্কৃত কাব্যের মতো অনুপ্রাস বৈদিক কাব্যে কবির রচনাপ্রতিভা প্রদর্শনের বা নিছক

আঙ্গিকগত সমৃদ্ধির প্রয়োজনে খুব কমই ব্যবহৃত হয়েছে ; মূলত মন্ত্র আবৃত্তিতে অধিকতর গতিময়তা ও সৌষ্ঠব সৃষ্টির জন্য এবং আনুষ্ঠানিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই সংহিতায় অনুপ্রাস প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রাচীন গ্রিক ও ইরাণীয় সাহিত্য পর্যালোচনা ক'রে আমাদের মনে হয়, অনুপ্রাস ইন্দো-ইয়োরোপীয় কাব্যে সম্ভবত ব্যাপকভাবেই ব্যবহৃত হ'ত। স্বরবর্ণের ছন্দোবদ্ধ পুনরাবৃত্তি এবং ব্যঞ্জন বর্ণের আনুপ্রাসিক প্রয়োগ সতর্ক যত্ন ও দক্ষ কারুকুশলতার পরিচয় বহন করে। সদৃশ ধ্বনির পরস্পর সংবেশন এবং বিশেষত নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তাদের ছন্দোনিয়ন্ত্রিত পুনরাবৃত্তি মাঝে মাঝে এমন ধরনের বাচনিক অভিঘাত নির্মাণ করেছে যেখানে ধ্বনির মধ্যে দিয়েই অর্থ স্পষ্ট উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

চতুস্পার্শ্বস্থ জীবনের ঘনিষ্ঠ প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের ফলে এ ধরনের চিত্রকল্প নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল ব'লেই ঋগ্বেদীয় চিত্রকল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সজীবতা ও স্পষ্টতা। এটা অনস্বীকার্য যে, কিছু কিছু সূক্ত এমন ধরনের স্বল্পধী উচ্ছ্বাসপ্রবণ চারণকবিদের দ্বারা রচিত হয়েছিল, প্রতিভার দৈন্যে যাঁরা প্রাচীনতর কবিদের রচনা নির্বিচারে আত্মসাৎ ক'রে প্রায়শই বিচিত্র উৎস থেকে সঙ্কলিত ও বহুব্যবহৃত চিত্রকল্প কাব্যে সরাসরি ব্যবহার করতেন। তবে সংহিতার বহু সূক্তই প্রকৃত শিল্পীর সৃষ্টি ঃ সেখানেও শুধুমাত্র শোভা বর্ধনের জন্য চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয়নি ; অভিজ্ঞতার অনিবার্য প্রেরণার ফলেই এবং অনুষ্ঠানের অভীষ্ঠ সিদ্ধির জন্য এদের স্বতঃস্ফূর্ত আবির্ভাব। চিত্রকল্পপ্রয়োগের পশ্চাতে এই দৃঢ়-বিশ্বাস সর্বদাই সক্রিয় ছিল যে, সার্থক বর্ণনা অনুষ্ঠানগতভাবেও অধিকতর ফলপ্রসূ। সমস্ত ঋগ্বেদীয় সূক্তই যে স্বাধীন কাব্যিক অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত উৎসসারণ নয়, সম্ভবত তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায় সম্পূর্ণত অকাব্যিক দানস্তুতিসমূহে, এবং সেইসব সূক্তগুলির মধ্যে যেখানে হোতা, পোতা, ঋত্বিক্, নেষ্টা, প্রশাস্তা, অধ্বর্যু ও ব্রহ্মা শ্রেণীভুক্ত পুরোহিতদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নীরস অকাব্যিক গদ্যভঙ্গীতে বিবৃত হয়েছে।

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হ'ল শ্লোক রচনার আঙ্গিকটি শুধু বৈদিক কাব্যের সঙ্গেই সহব্যাপ্ত নয়, কেননা স্তবস্তুতি ছাড়াও আনুষ্ঠানিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ যে কোন বস্তুই সংহিতার উপজীব্য। যজ্ঞে ব্যবহারের উপযোগী বস্তুসমূহের আনুষ্ঠানিক পবিত্রীকরণের প্রয়োজনে সেখানে সূক্তগুলিতে সেই সব বস্তু উল্লিখিত হয়েছে, জনসাধারণের স্মৃতিতে তাদের ওপর অলৌকিক মহিমা আরোপ করার একমাত্র উপায়ই ছিল শ্লোক রচনার প্রচলিত আঙ্গিক। নিরক্ষর সমাজে যেহেতু সমস্তই মৌখিকভাবে রচিত ও সংরক্ষিত হ'ত, তাই একমাত্র শ্লোকের আঙ্গিকই কোনও রচনাকে স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা দিতে পারত। সাহিত্যগতভাবে সংরক্ষণযোগ্য সমস্ত কিছুই যেহেতু শুধু পদ্যেই রচিত হতে পারত, কারণ প্রাক্-লেখন যুগে ছন্দোবদ্ধ

রচনাই কণ্ঠস্থ করা সহজ ছিল, তাই বিশুদ্ধ কাব্যের তুলনায় তার ক্ষেত্র ব্যাপকতর ছিল। বস্তুত, সংহিতার বহু অংশ প্রাথমিকভাবে কাব্যিক রচনা নয়, আনুষ্ঠানিক কারণে কণ্ঠস্থ করার সহায়ক ; তাই বহু স্থানেই আমরা প্রকৃত কাব্য খুঁজে পাই না, এমনকি প্রত্যাশাও করি না। তাছাড়া চারণ কবিদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথাও আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। লুই হ্রেনু যেমন বলেছেন ; বিভিন্ন পুরোহিত পরিবারের প্রতি রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা একটি সামাজিক রীতি ছিল, তাই কার্যকরী ও শক্তিশালী সূক্ত রচনার জন্য পুরোহিতরা পরস্পর প্রতিস্পর্ধায় প্রবৃত্ত হতেন। নিঃসন্দেহে প্রেরণাই কাব্যচর্চার প্রধান উৎস ছিল, কিন্তু সে প্রেরণা গীতিকবি কিংবা মহাকাব্যিক চারণ কবি বা গীতিকার রচয়িতার বিমূর্ত ও নিরাসক্ত কাব্যরচনার সমগোত্রীয় নয়। পুরোহিতরা যখন সচেতনভাবে অনুষ্ঠান উপযোগী শ্লোক রচনার চেষ্টা করতেন তখন বহু স্বতঃস্ফূর্ত গীতিকবিতাই আনুষ্ঠানিক প্রয়োগের জন্য গ্রহণ করা হ'ত। কবিরা সম্ভবত তাঁদের রচনার এই জাতীয় প্রয়োগ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং সক্রিয়ভাবে যজ্ঞের প্রয়োজনে তৎকালীন সামাজিক দাবি ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার চেষ্টা করতেন।

ঋগ্বেদের বহু অংশেই গীতিকা বা আখ্যান কাব্যের লক্ষণযুক্ত রচনা পাওয়া যায়, চরিত্রগতভাবে ধর্মীয় আবেদনযুক্ত মৌখিক সাহিত্যের পক্ষে তা-ই স্বাভাবিক। যুদ্ধগীতি, অলৌকিক আখ্যান ও প্রত্নকথা, প্রহেলিকা, রহস্যপূর্ণ এবং বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ স্বাভাবিকভাবেই বিবৃতিধর্মী আখ্যানকাব্যের উপযোগী আঙ্গিকের জন্ম দিয়েছিল। ফলে যদিও ঋগ্বেদের অধিকাংশ রচনা ধর্মীয় চেতনা থেকেই হয়েছে এবং চরিত্রগতভাবে এগুলি অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক, তবু বহু সূক্ত আঙ্গিকের দিক থেকে আখ্যানকাব্যের সঙ্গে গভীর সাদৃশ্যের চিহ্ন বহন করে। বস্তুত, কাব্য হিসাবে ঋগ্বেদের বহু সূক্তই মানবিক আবেগের উত্তাপে আতপ্ত, কোথাও বা এগুলি আড়ম্বরপূর্ণ ও রহস্য-দ্যোতক ভাবনা উপস্থাপিত করে ; সেই সঙ্গে এগুলি সমুন্নত আদর্শ, স্পষ্ট বর্ণনা ও বিচিত্র ভাবাবেগের কাব্যিক অভিব্যক্তি।

বর্ণনা

ঋগ্বেদের কবির বিস্ময়বোধ যখন নিবিড় এবং বর্ণনীয় বিষয় সাধারণ গণ্ডীর বহির্ভূত, সেই সব ক্ষেত্রে বর্ণনা বহুলাংশে উদ্দীপক হয়ে উঠেছে। ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য, অগ্নি, মরুৎ ও আদিত্যগণের বর্ণনায় কবিত্বশক্তি বিশেষভাবে উচ্ছ্বসিত ; সোমমণ্ডলে বিশ্বজগতের কেন্দ্রবিন্দুরূপে সোমদেবের বর্ণনায় ঋষিকবি অনুরূপ মুগ্ধতার সঞ্চার করেছেন। আবেগ-সমুন্নীত বর্ণনায় অতিশয়োক্তির দ্বারাই কবি রচনা করেছেন। ইন্দ্র এবং সোমদেবতার বর্ণনা প্রসঙ্গে তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। উন্নত আদর্শ যে

সমস্ত অংশে অভিব্যক্ত, কাব্যিক সমৃদ্ধির প্রকাশ সেগুলিতে স্পষ্টতর ; বিশেষত সৃষ্টিতত্ত্ব ও দর্শনবিষয়ক সমস্ত সূক্তে এই জাতীয় চিন্তার পরিপূর্ণ ও মনোজ্ঞ প্রকাশ ঘটেছে। বিখ্যাত মধুসূক্তটি (১ : ১৮ : ৬-৮) সমগ্র বিশ্বজগতের সঙ্গে পরিপূর্ণ একটি হৃদয়ের বিমুগ্ধ উৎসার প্রকাশ ক'রে বৈদিক কবির মানসিক প্রবণতার ধ্রূপদী অভিব্যক্তি হয়ে উঠেছে। বাচনিক পুনরাবৃত্তি, স্বস্তি ও শান্তির আবাহন এবং সূক্তের আঙ্গিক ও কাঠামোর বিশেষ ধরণ এর অন্তর্বস্তুতে আরও শক্তিশালী ও কাব্যিক ফলশ্রুতিকে আরও প্রসারিত করে।

সোমমণ্ডলের কিছু কিছু অংশে কবিরা যেহেতু দৈনন্দিন জীবনের উপাদান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তাদের চিত্রকল্প ও বিশিষ্ট উল্লেখের মৌল রূপটি আহরণ করেছেন, তাই এই সমস্ত সূক্তে আমরা খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শেষাংশে প্রাচীন ভারতীয় সামাজিক অবস্থার পরিচয় লাভ করি। যখন কোন কবি নিতান্ত প্রসঙ্গক্রমেই দারিদ্র্য বর্ণনা করেন তখন তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যেই বিরল এক সাফল্য অর্জন করেন। নবম মণ্ডলের একটি সূক্তে সমাজে অনুসৃত বিভিন্ন বৃত্তিধারী শ্রেণীগুলির বাস্তবনিষ্ঠ ও অত্যন্ত আকর্ষণীয় বর্ণনা রয়েছে। মিশরের উনবিংশতিতম রাজবংশের (১৩৫০-১২০০ খ্রিঃ পূঃ) আমলে রচিত বিখ্যাত 'স্যাটায়ার্স অন্ দি ট্রেডস্' শীর্ষক রচনার কথা আমাদের মনে পড়বে যা প্রহসন হিসাবে যথার্থ সার্থক এবং মিশরের তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতিরও উজ্জ্বল নিদর্শন।

রাত্রি ও অরণ্যানীর প্রতি নিবেদিত সূক্তে নিসর্গের সম্ভ্রম-উৎপাদক মহিমার ও সৌন্দর্যের বর্ণনা উল্লেখযোগ্য। বৈদিক যুগের পরবর্তীকালের দেবী লক্ষ্মীর বর্ণনাও (খিল ২ : ৬ : ৫) উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। দেবী ঊষার প্রতি নিবেদিত বিখ্যাত সূক্তগুলিতে দৈনন্দিন প্রত্যক্ষগোচর জীবনের অভিজ্ঞতার অনুরণন অত্যন্ত স্পষ্ট। অনুরূপভাবে মরুৎদের প্রতি নিবেদিত সূক্তে বাস্তবের সেনাবাহিনীর বর্ণনার প্রতিধ্বনি মেলে এবং সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ সেনা অভিযানের বর্ণনার গৌরব অনুভূত হয় এবং একই সঙ্গে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ নৈসর্গিক দৃশ্যও বিশেষভাবে অনুভূতিগোচর হয়ে ওঠে। কিছু কিছু সূক্ত আবার উন্নত ভাবনা ও বিশ্বজগতে অন্তর্নিহিত রহস্যের বোধ প্রকাশ ক'রে সাধারণ মানের অনেক উর্দ্ধে উঠেছে। শেষ পর্যায়ের রচনা, অর্থাৎ প্রথম ও দশম মণ্ডলে এই জাতীয় অধিকাংশ সূক্ত যজ্ঞানুষ্ঠানের অব্যবহিত নিকটবর্তী প্রসঙ্গ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে জনসাধারণের অন্তর্লীন স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত ক'রে তুলেছে। একই সঙ্গে সর্বেশ্বরবাদ থেকে একেশ্বরবাদে বিবর্তনের যে পর্যায় কিছু কিছু মন্ত্রে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তাতে বর্ণনার অভিনবত্ব ও ভাষাগত পরিবর্তন বেশ সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়।

ইন্দো-ইয়োরোপীয় প্রত্ন-পুরাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এই যে তা দেবতাদের মানুষের চেয়ে সর্বতোভাবে ভিন্ন বা অলঙ্ঘ্য দূরত্বে নির্বাসিত ব'লে মনে

করে না। অন্যভাবে বলা যায়, ইন্দো-ইয়োরোপীয় বিশ্ববীক্ষায় মানুষ দেবতাদের অত্যন্ত নিকট প্রতিবেশী ; এমন কি মানুষ ও দেবতারা পরস্পর অন্যোন্যনির্ভরশীল। তাই বৈদিক কবি উচ্চারণ করেন—'হে বৃত্রঘাতী ইন্দ্র! তুমি আমি একত্রে চেষ্টা করব যতক্ষণ না আমরা ধন লাভ করছি' (৮ : ৬২ : ১১)। শেষ পর্যায়ের আরও কিছু সূক্তে ইন্দ্রকে সমস্ত সৃষ্টির মর্মমূলে নিহিত মৌলিক আদিশক্তি রূপে বর্ণনা করা হয়েছে ; পার্থিব ও অতিজাগতিক বহু কীর্তিরই তিনি অধিনায়ক, দেবতাদের মধ্যে তিনি শুধু শ্রেষ্ঠই নন, সর্বদেবের প্রতিনিধিও। স্পষ্টতই ইন্দ্রের এই চরিত্রগত রূপান্তর সর্বেশ্বরবাদ থেকে একেশ্বরবাদে বিবর্তিত হওয়ার স্তরেই সম্ভবপর ; কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি বিমূর্ত সৃষ্টির প্রেরণার উৎস ব্রহ্মের প্রায় সমগোত্রীয়। যে বিবৃতিকে নির্লজ্জ আত্মপ্রশস্তি ব'লে ভ্রম হয় ; প্রকৃতপক্ষে তা হ'ল ইন্দ্র যখন চরম বিশ্বসৃষ্টির অন্তর্নিহিত মূল শক্তিরূপে বন্দিত হন তাঁর সেই চূড়ান্ত রূপান্তরের অব্যবহিত পূর্বে মুহূর্তের ইঙ্গিত বহন করে যখন তাঁকে সর্বদেবতার প্রতীকরূপে দেখা হচ্ছে। বৈদিক দেবসঙ্ঘে যাঁর বিলম্বিত প্রবেশ, সেই বিশ্বকর্মাও দশম মণ্ডলে এই গৌরবের অধিকারী। বাস্তবতার প্রকৃতি ও উৎস সম্পর্কে মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি পূজ্য দেবতাদের নিকট উত্থাপিত করা যায় না ; যাঁরা যাজক পুরোহিত রূপে কল্পিত, সংহিতা-রচনার শেষ পর্বে যেসব বিমূর্ত বিশ্বস্রষ্টা দেবতার আবির্ভাব হয়েছিল, শুধু তাঁদের কাছেই গূঢ় জিজ্ঞাসাগুলি নিবেদন করা চলে। এই পর্যায়েই এল সেই উপলব্ধি যে সত্য বা ঋতই পৃথিবীকে ধারণ করে, সত্যেই বিশ্বজগৎ প্রতিষ্ঠিত। আদিত্যদের (সৌরদেবগণ) সত্তা বিধৃত আছে বিশ্বজগতের মৌল আদর্শ ঋতের মধ্যেই।

অগ্নির প্রতিশব্দ 'বৈশ্বানর' পৃথক নাম রূপে সূর্য ও আগুন—এই উভয়ের দ্যোতক বিশ্বজাগতিক আলোক সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়েছে। এই আলোক যখন প্রথম আবির্ভূত হ'ল—সমগ্র সৃষ্টি, দেবগণ, আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র এবং উদ্ভিদ্‌জগৎ আনন্দমুখর হয়ে উঠেছিল কেননা তার পূর্বে সমস্তই ছিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ঋগ্বেদের চূড়ান্ত পর্যায়ের বহু সূক্ত অনুরূপ উন্নত ভাবনায় পূর্ণ। প্রজাপতিসূক্ত (১০ : ১২১ ; ১০ : ১৩০) ; বাগাম্ভৃণীয় বা পরমাত্মা সূক্ত (১০ : ১২৭) এবং মুখ্যত নাসদীয় সূক্তে (১০ : ১২৯) অত্যন্ত উচ্চমানের দার্শনিক কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। সেইসময়ে বিমূর্ত শ্রদ্ধাও সে দৈবীকরণপ্রক্রিয়ায় পৃথক দেবতা হয়ে উঠেছেন, সম্ভবত তার কারণ এই যে, বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে প্রচলিত ধর্মবিধি সম্পর্কে অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা কালের বাতাবরণে অস্পষ্টভাবে অনুভব করা যাচ্ছিল। এই সময়কার নবোদিত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়গুলির মতাদর্শ মানুষকে যজ্ঞের তাৎপর্য ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে নতুন করে চিন্তা করতে প্রবৃত্ত করছিল। ফলে শ্রদ্ধার নতুন মূল্যায়ণ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

ঋগ্বেদীয় বহু সূক্ত আবেগ গাঢ় ও বিষয়গৌরবে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ, যদিও অধিকাংশ সূক্তই উৎস ও প্রেরণাগত বিচারে স্পষ্টতই আনুষ্ঠানিক। তবে সূক্তগুলির যথার্থ মানবিক অভিজ্ঞতার উৎসমূলের গভীরে অবগাহন ক'রে আমরা বুঝতে পারি, এ ব্যাপারটাও খুবই স্বাভাবিক। কবি যখনই প্রশস্তি ও প্রার্থনার পরিমার্জনার পূর্ববর্তী পর্যায়ের শেষ দিকে শিল্প-ক্রিয়ার স্তরে প্রবেশ করেন তখন আপন অভিজ্ঞতাই তিনি প্রকাশ করতে চান ; তাঁর ব্যবহৃত চিত্রকল্পগুলির মধ্যে সেইসব অভিজ্ঞতার ছাপই ফুটে ওঠে। ভীতি ও উদ্বেগ ঋগ্বেদের বহু কবিতার উৎস। বিস্তীর্ণ স্থলভাগের উপরে সুদীর্ঘ প্রবাস ও পরিক্রমার পরে আর্যরা যখন ভারতে উপস্থিত হলেন তখন সম্পূর্ণ ভিন্নস্বভাবের জনগোষ্ঠী এবং অপরিচিত নৈসর্গিক দৃশ্যের মুখোমুখি হয়ে তাঁরা দেখলেন তাঁদের ভাবী বসতিস্থল আদিম অধিবাসীদের দ্বারা অধ্যুষিত। তাঁদের দৃষ্টিতে তাই এই সব জনগোষ্ঠী, তাঁদের যজ্ঞানুষ্ঠান পণ্ড করে দিয়ে সর্বপ্রকার ঐহিক কল্যাণলাভের সম্ভাবনাকে বিড়ম্বিত করেছে। এইরকম বিপর্যয় আশঙ্কার সম্মুখীন হয়ে আর্যদের প্রধান মানসিক অবস্থায়ই ছিল ভীতি, অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতায় কণ্টকিত। আর্যরা তাঁদের আত্মীয়-পরিজন ও গোসম্পদের জন্য যখন নিরাপত্তার প্রার্থনা করতেন, সেই সব সূক্তে তাই বহুস্থানেই পূর্বোক্ত মানসিকতার স্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখা গেছে। শত্রুদের পরাজিত করার জন্য এবং সেই সঙ্গে সমস্ত রকম অমঙ্গল ও বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য যে সমস্ত প্রার্থনা সূক্তগুলি রচিত হয়েছে, গভীরতম আবেগের অন্তঃস্থল থেকে তা উৎসৃত ব'লে যথার্থ মর্মভেদী আবেগের সৃষ্টি করেছে। সাম্যবোধের জন্য যে প্রার্থনা অথর্ববেদে মাঝেমাঝেই আছে, ঋগ্বেদের চূড়ান্ত পর্যায়েই তাদের প্রথমবার লক্ষ্য করা যায়। সাম্যবোধ ও সমন্বয়ের জন্য এই যে আকাঙ্ক্ষা ঋগ্বেদ রচনার উপসংহারে আমরা লক্ষ্য করি তা অবশ্যই এক সুদীর্ঘ সংঘাতেরই সমাপ্তি সূচনা করছে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য যে অকথিত অস্পষ্ট প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয়, তারই ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক সংমিশ্রণে ও সমবেত প্রচেষ্টায় বহুবিধ গঠনমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত বহুজাতিক, বহুভাষিক ও বহুগোষ্ঠীভূক্ত ভারতীয় সভ্যতার জন্ম হয়।

পরাজিত আদিম জনগোষ্ঠীর নিরবচ্ছিন্ন প্রচ্ছন্ন শত্রুতা থেকে পরিত্রাণ লাভ করার আকাঙ্ক্ষায় দূরদর্শী ঋষিকবিগণ শক্তির সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। সম্ভবত আদিম জনগোষ্ঠী ছাড়াও অবৈদিক আর্যগোষ্ঠী এবং আর্য শ্রেণীভুক্ত বিবদমান শাখাগুলির মধ্যেও শান্তিস্থাপন বিশেষভাবে জরুরি হয়ে উঠেছিল। তাই এই সমস্ত প্রার্থনাকে নিছক ধর্মীয় আকাঙ্ক্ষারূপে বিচার না করে সেই সময়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের অভিব্যক্তিরূপে গ্রহণ করাই সমীচীন ; কেননা তখনকার কলহদীর্ণ পরিবেশে যে কোনো জনগোষ্ঠীর বিকাশের পক্ষে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

অপরিহার্য ছিল। এছাড়াও সূক্তগুলিতে জীবনের অন্ধকার দিকেরও অভিব্যক্তি রয়েছে। সমৃদ্ধির প্রার্থনা তাই প্রায়শই শত্রুর প্রতি ঈর্ষাকাতর আর্যের প্রার্থনা, যাতে তার দেবতা শত্রুর সর্বপ্রকার অমঙ্গল সাধন করেন। ভিন্ন গোত্রজাত ও কৌমসমাজগত প্রতিদ্বন্দ্বী ছাড়াও আদিম জনগোষ্ঠীভুক্ত যে সমস্ত মানুষ পরাজিত হয়েও বশ্যতা স্বীকার করে নি বা পর্যুদস্ত হয়ে যায় নি—তারাই ছিল শত্রুপদবাচ্য। বৈদিক কবি শুধু তাদেরই ধ্বংস ও মৃত্যুর জন্যে উদগ্র কামনা ব্যক্ত করেন নি, তাদের আত্মীয় পরিজন এবং শেষ সম্পদের সর্বনাশও চেয়েছেন।

এরই পাশাপাশি সরল সংশয়ও বহুবার প্রকাশিত হয়েছে। সর্বজনগ্রাহ্য উপাসনা-পদ্ধতি রূপে যজ্ঞানুষ্ঠান সমাজে যখন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হ'ল, জনসাধারণের ধর্মীয় জীবনের ভিত্তিই তা শুধু গঠন করে নি—যজ্ঞের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্যও দাবি করেছিল। তখন কিছু কিছু সূক্ষ্মতর অনুভূতি বিদ্রোহী হয়ে উঠে এই জীবনবীক্ষার মৌল বিধিগুলির ভিত্তিভূমিকে অপসারিত ক'রে অর্চনীয় দেবসঙ্ঘের গুরুত্ব খর্ব ক'রে দিতে চাইল। সম্ভবত বিমূঢ় বিস্ময়বোধের প্রকাশই ঘটেছিল দশম মণ্ডলের দুটি সূক্তের অন্তর্গত (১২১ ও ১২৯) কিছু প্রখ্যাত মন্ত্রে ; এর মধ্যে অন্যতম সেই বহু পরিচিত ধ্রুপদ : 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম'। মৌলিক সংশয়সূচক মন্ত্রগুলিতে এক ধরনের জরুরি ও আন্তরিক তাড়নার আভাস রয়েছে ; এদের মধ্যে আমরা আত্মিক আলোড়ন ও গভীর অন্তর্লীন আন্দোলন অনুভব করি ; বুঝতে পারি যে, অনুষ্ঠাননির্ভর জগতে প্রচলিত সংস্কারের প্রতি অভ্যস্ত বিশ্বাসের চেয়ে সহজ সংশয়ের যৌক্তিকতা অধিক। ঋগ্বেদের বহু স্থানেই যেহেতু প্রেরণাশূণ্য অনুষ্ঠানমূলক সাহিত্যের নিদর্শন রয়েছে, তাই বেশ কিছু শুষ্ক ও নীরস মন্ত্র খোলাখুলি ও নির্লজ্জভাবে রাজা ও দাতাকে. পুরোহিতদের বদান্যভাবে দান করতে প্রবৃত্ত করতে চেয়েছে। এ জন্যে প্রাচীন দাতা ও দানের নজির উল্লেখ ক'রে তারা যুক্তিজাল বিস্তার করেছে। এ সমস্তই ঋগ্বেদের অন্তিম পর্যায়ভুক্ত এবং এতেই একটি সমৃদ্ধ কাব্যিক ঐতিহ্যের ক্ষয় ও ধ্বংসের বীজ নিহিত রয়েছে।

ধর্ম ও দর্শন

যখনই আমরা ঋগ্বেদের ধর্ম ও দর্শনের কথা চিন্তা করি তখন বহুজাতিক সাংস্কৃতিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত ও অন্তত এক সহস্রাব্দব্যাপী ইতিহাসের বিবর্তনের পরিশীলিত বিচিত্র একটি জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস ও আচার আচরণের জটিল আয়তন সম্বন্ধে সচেতন হই। এই সময়ে বৈদিক সাহিত্য বিবর্তনের পথে সম্পূর্ণ পরিণতরূপে কখনও নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্থির থাকে নি। ফলত, প্রত্নপুরাণ ও অধ্যাত্মবিদ্যার ক্ষেত্রে ক্রমোন্নতির বিবিধ পর্যায়ের অবশেষ-চিহ্ন এতে খুঁজে পাওয়া

যায়। এখানে ধর্ম বলতে আমরা বুঝি প্রত্নকথা, অনুষ্ঠানচর্যা, ইন্দ্রজাল ও নীতিবোধ ; অন্যদিকে দর্শন বলতে বুঝি একটি আধ্যাত্মিক উপগঠন—যাকে হয়ত স্পষ্টভাবে জনসাধারণ ঘোষণা করে নি কিন্তু তাদের সামূহিক জীবনদৃষ্টি এবং ব্যক্তিগত আচার-আচরণে তার নিগূঢ় ও নিয়ন্ত্রক ভূমিকা অনস্বীকার্য। ঋগ্বেদসংহিতা অবশ্য এই সম্পর্কে সরাসরি বেশি কিছু আমাদের জানায় না কেননা অনার্য উপাদানের সঙ্গে নিরন্তর ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া ও সমন্বয়-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তা মূলগতভাবে নিরঙ্কুশ আধিপত্যশীল আর্য জনগোষ্ঠীর এক প্রায়-অখণ্ড সংস্কৃতির প্রতিনিধি। ঋগ্বেদের মধ্যে আমরা প্রত্নকথাগুলিকে সম্পূর্ণত বা সুশৃঙ্খলভাবে বিবৃত হতে দেখি না ; বরং এমনভাবে সেইগুলি উল্লিখিত এবং মাঝেমাঝে উদ্দেশ্যহীনভাবে বিবৃত হয়েছে যে, আমাদের মনে হয়, তৎকালে প্রচলিত প্রত্নকথাগুলির সঙ্গে পরিচিত এই আপাত-সরল ভঙ্গির কারণ। সেই সঙ্গে এটাও স্পষ্ট যে, সামূহিক অনুষ্ঠানগুলির সঙ্গে পরিচিত ও সে সম্বন্ধে প্রয়োগিক জ্ঞান এবং সেই সঙ্গে যজ্ঞে যথোপযুক্ত সূক্তগুলির প্রয়োগ সম্পর্কে অবহিত থাকার ফলে সংহিতা তার প্রচলিত রূপটি ধারণ করতে পেরেছিল।

যজুর্বেদে আমরা যজ্ঞানুষ্ঠানের কিছু কিছু বিবরণ পাই। তবে এইসব বিবরণ শুধু নির্দিষ্ট গোষ্ঠীচক্রের জন্যেই সংরক্ষিত ছিল ; ফলে এগুলি গূঢ়ার্থবাহী ও সংক্ষিপ্ত, যাতে অনুষ্ঠান-চর্যায় নিষ্ণাত ব্যক্তিদের মধ্যেই কেবলমাত্র সীমাবদ্ধ থাকে। যে ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহ আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে প্রকৃতপক্ষে যজুর্বেদেরই এক নিরবচ্ছিন্ন রূপান্তর, সর্বপ্রথম তাদের মধ্যেই যথার্থ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে গ্রথিত প্রত্নকথাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবৃতি পাওয়া যায়। প্রত্নকথাগুলির এইরূপ সারাংশ প্রণয়নের উদ্দেশ্য, অনুষ্ঠান-চর্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যাবলীর যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা ও ব্যাখ্যাদান এবং সেই সঙ্গে যজ্ঞের প্রত্নপৌরাণিক তাৎপর্য নির্ণয়।

বৈদিক জনসাধারণের চিন্তাধারা, বিশ্বাস ও কার্যাবলীর আধ্যাত্মিক কাঠামোটি যদিও সংহিতা ও ব্রাহ্মণ থেকে অনুমানলব্ধ সিদ্ধান্তরূপে আবিষ্কার করা সম্ভব, এই ধরনের আনুমানিক সিদ্ধান্তের যোগফল পর্যাপ্ত হয় না। এর একটি কারণ এই যে, প্রাচীন গ্রিকদের মতো বৈদিক আর্যরাও আরও অনেকদিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত এই সমস্ত বিশ্বাসের একটি স্পষ্ট রূপ দিতে আগ্রহ বোধ করেন নি। অন্যভাবে বলা যায়, তখনও তাঁদের ধর্মীয় ধ্যানধারণাগুলি নিতান্ত অস্পষ্ট ছিল। সমাজ হয়ত বা কতকটা অজ্ঞাতসারেই সেইসব গ্রহণ ক'রে তার অংশভাক্ হয়েছিল—যদিও সমস্তই তখনও সামূহিক অবচেতনের স্তরে নিমজ্জিত। কালক্রমে আরও নানা উপাদান এর সঙ্গে যুক্ত হ'ল ; কয়েক শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পরই তা সচেতন স্তরে উন্নীত হয়ে অধ্যাত্মচিন্তার প্রণালীবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করল। বৈদিক যুগের অন্তিম পর্যায়ে অর্থাৎ দশম মণ্ডল ও প্রথম মণ্ডলের শেষাংশ রচিত হওয়ার সময়ে দার্শনিক ভাবনার

প্রথম স্ফূরণ হয় ; নবীনতর ব্রাহ্মণ ও প্রাথমিক উপনিষদ্গুলিতে আছে তারই পরিণত রূপ পরিগ্রহণ।

নীতিবোধ

যজ্ঞানুষ্ঠাতা বৈদিক আর্যগোষ্ঠীর বিশ্ববীক্ষায় দৈব হস্তক্ষেপ ছিল স্বাভাবিক ও অনিবার্য। কেননা তখন দৈনন্দিন জগতে দেবতা, দানব, পিশাচ, প্রেত, নাগ ও পশু বিরাজ করত। প্রত্নকথাগুলিতে তখন এই বিশ্বাস পরিস্ফুট হয়েছে যে, সৃষ্টিতে কোনো নীতিহীন বিশৃঙ্খলা নেই ; বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়মে শাসিত। বিশ্বজগতের অন্তর্লীন সাম্যবোধ বিপর্যস্ত করার জন্য কিছু কিছু শক্তি সক্রিয় ; বিধ্বস্ত ঐক্যবোধকে পুনর্বিন্যস্ত করার অনিবার্য আবশ্যিক প্রেরণা থেকে প্রাগুরু প্রত্নকথাগুলির জন্ম হয়েছে। সৃষ্টির মূলগত ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দেবতারা মানুষের ওপর অর্পণ করেছিলেন ব'লেই মানব জীবন একটি কেন্দ্রীভূত বিশ্ববোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই আধ্যাত্মবাদী প্রবণতা থেকেই এক মহৎ নীতিবোধের জন্ম হয়েছিল ; তাই অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক মানসিকতাই তৎকালীন সমাজে একমাত্র স্বীকৃত দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে উঠল এবং প্রত্যেক তাৎপর্যপূর্ণ মানবিক কার্যই হয়ে উঠল ধর্মাচরণের অঙ্গ। যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রত্যেক অনুপুঙ্খ প্রত্ন-পৌরাণিক তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে নীতিবোধের বিচিত্রগামী অভিব্যক্তিতে নতুন একটি মাত্রা যোগ করল। ঋগ্বেদের নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে বিশদ তথ্য পাওয়া যায় সেই সমস্ত সূক্তে যেখানে দেবতা এবং মানুষকে ধৈর্য, দান, ঋজুতা, দয়া, অতিথিপরায়ণতা ও সহযোগিতা জাতীয় গুণাবলীর জন্য প্রশংসা করা হয়েছে। অগ্নি, বরুণ, ইন্দ্র কিংবা অশ্বীদের মতো দেবতারা পূর্বোক্ত গুণগুলির জন্যই মহৎ ; বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে জীবনকে সার্থকভাবে সমন্বিত করার প্রেরণা তাঁরা দিয়েছেন ; সেই সঙ্গে বিপদ, ক্ষুধা, ব্যাধি, অন্ধকার ও মৃত্যুর কবল থেকে জীবনকে মুক্ত করার যথার্থ পথও তাঁরা নির্দেশ করেছেন। বিশেষত আলোর জন্য নিরন্তর তৃষ্ণা ঋগ্বেদে বারেবারে ব্যক্ত হয়েছে। কেননা বৈদিক আর্যদের নিকট এই আলো একই সঙ্গে জ্ঞান, উপলব্ধি, আনন্দ ও জীবনের প্রতীক। ঋগ্বেদের বিখ্যাত প্রার্থনা—'উদয় সূর্যকে যেন আমরা চিরদিন দেখতে পাই'। ঋগ্বেদের নীতিবোধের মূল প্রেরণাই এই যে, জীবন অমূল্য এবং মূলত কল্যাণময়, মধুর ও উপভোগ্য ব'লেই এই আশ্চর্য রহস্যময় জীবনকে যতদিন পর্যন্ত সম্ভব, উপভোগ করাই বাঞ্ছনীয়।

প্রত্নকথা

সৃষ্টির উৎস হয়েছিল মহাসময়ের যে উষাকালে, প্রত্নকথাগুলিতে তারই প্রতীকী বিবৃতি পাওয়া যায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাত্ত্বিক কারণ অনুসন্ধানের ফলেও কিছু কিছু

প্রত্নকথা উদ্ভূত হয়েছিল। সৃষ্টি ও সংরক্ষণের জন্য দেবতারা যে সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, সমাজের প্রতি দায়িত্বসম্পন্ন মানুষ সৃষ্টিকে সংরক্ষণ করার জন্য সেই সমস্ত শাস্ত্র নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানই পুনরায় যজ্ঞের মধ্যে প্রবর্তন করে। প্রত্নকথাগুলির মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রত্নপৌরাণিক সময়ে পার্থিব জীবন ছিল বিঘ্ন-সঙ্কুল, তাই দেবতারা নানা যজ্ঞের দ্বারা সমস্ত অমঙ্গলকে দূর করতেন। অনুরূপ বিপদের আশঙ্কার সম্মুখীন হয়ে মানুষও প্রাচীন দৈব যজ্ঞগুলি পুনরায় নূতন ক'রে অনুষ্ঠান করে। সংহিতাগুলিকে দেবতাদের কার্যাবলী সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হয়েছে যেহেতু তৎকালীন সমাজে সেই সমস্তই ছিল সর্বজনগোচর। ঋগ্বেদের ধর্মবোধও বিবিধ ক্রিয়াকার্যকে দেবতাদের কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছে।

বেদের ধর্ম স্পষ্টতই বহু দেববাদী ; ক্ষমতার ক্রম অনুযায়ী বিন্যস্ত এইসব দেবতাদের প্রত্যেকেই কখনও না কখনও শ্রেষ্ঠ দেবরূপে বন্দিত হয়েছেন। বৈদিক জনগণ ইন্দো-ইয়োরোপীয় ঐতিহ্য থেকে কয়েকজন দেবতাকে আহরণ ক'রে সঙ্গে এনেছিলেন ; ভারতে উপনীত হওয়ার পথে নানা জনগোষ্ঠী থেকেও কিছু কিছু দেবতাকে সংগ্রহ করেছিলেন এবং এই উপমহাদেশে বসতি স্থাপনের পরে এখানকার প্রাগার্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের ফলে আরও কিছু দেবতাকে সৃষ্টিও করেছিলেন। যেহেতু প্রথম দুটি স্তরে তাদের জীবন ছিল মূলত পশুচারী, তাই ঐতিহ্যগত অধিকাংশ দেবতাই পশুপালনের সঙ্গে সম্পর্কিত আকাশদেবতা ও সূর্যদেবেরই বিভিন্ন রূপ। পিতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে মধ্যবর্তী স্তর ছিল নিরন্তর সংগ্রাম ও পরিক্রমার কর্মবহুল। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তাঁরা তখনও পশুচারী ; কিন্তু তখন ধন আহরণের আর একটি নতুন উপায় অর্থাৎ লুণ্ঠন তাদের জীবনযাপনের অঙ্গ হয়ে পড়েছে। যাত্রাপথে যত কৌম ও গোষ্ঠীকে তাঁরা পর্যুদস্ত করেছিলেন, তাঁদের ধন আত্মসাৎ ক'রেই নূতন ভূমি অন্বেষণে তাঁরা অগ্রসর হয়েছিলেন। ভারতবর্ষে বসতি স্থাপনের পরে প্রাগার্য কৃষিচারীদের কৃষিকর্মের প্রভাবে ধীরে ধীরে আর্যরা কৃষিজীবী হয়ে উঠলেন এবং পশুপালন হ'ল তাদের ধন ও খাদ্য সংগ্রহের পরিপূরক উৎস। যাস্ক যে ত্রিবিধ দেবতার কল্পনা করেছিলেন, তার সঙ্গে উপরোক্ত আলোচনার মোটামুটি একটা ঐক্য রয়েছে। আপাতত বলা যেতে পারে যে, আকাশদেবতা ও প্রাচীনতর সৌরদেবগণ বৈদিক আর্যদের সামূহিক জীবনের সেই স্তরে আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন তাঁরা পিতৃভূমি ত্যাগ ক'রে নিশ্চিন্তে পশুপালনের জীবনে অভ্যস্ত। তার কিছু পরে কিছু বর্ষণ ও বজ্রের দেবতা উদ্ভূত হয়েছিলেন নিরন্তর সংঘর্ষমুখর সেই জীবনে, যখন দীর্ঘতম যাত্রাপথে তাঁরা ইয়োরোপীয় ভূখণ্ড থেকে মধ্য প্রাচ্যের অভিমুখে অগ্রসর হয়েছিলেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে আবির্ভূত হলেন শস্যের ও পাতালের অধিষ্ঠাতা দেবগণ, যদিও প্রাচীনতর পর্যায়েও কোন না কোন আকারে

তাঁদের উপস্থিতি আভাসিত হয়েছিল ; বিশেষত অন্তিম সংস্কার ও পরলোক বিষয়ক দেবতারা প্রাচীনতর পর্যায়ে উপস্থিত থাকলেও কৃষিজীবী রূপে আর্যদের প্রতিষ্ঠা লাভের পরেই তাঁরা নতুন এক তাৎপর্য নিয়ে অভিনব সজীবতার সঙ্গে আবির্ভূত হয়েছিলেন। একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, বৈদিক দেব-সঙ্ঘে অধিকাংশ প্রাচীনতর দেবতাদের অবস্থান সুরক্ষিত হলেও তাঁদের মধ্যে গৌরবের আসনগুলি প্রায়শই বিবর্তিত ও পরিবর্তিত হয়েছিল। কৃষিজীবী জনতারূপে তাঁরা বিশেষভাবে শস্য সমৃদ্ধি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলেই শস্যের ও পাতালের দেবতা এবং পিতৃলোকের অধিষ্ঠাতা দেবতাদের প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক কেননা তাঁরা কৃষির জন্য উপযোগী ভূমির উর্বরতাকে নিশ্চিত করতে উৎসুক ছিলেন। সব প্রাচীন সভ্যতাকেই ভূমির উর্বরতা বিধান করে ভূমির অধিষ্ঠাতা দেবতা, পরলোকগত আত্মারাও পাতালের অধিষ্ঠাতা দেবতারা। অগ্নির সঙ্গেও এদের একটি প্রত্যক্ষ যোগ থাকে। পশুচারী আদিযুগে তাই দ্যৌঃ ও সূর্যই প্রধান দেবতা, পথপরিক্রমা এবং যুদ্ধের যুগে ইন্দ্র, বায়ুবাতাঃ পর্জন্য এঁরাই প্রধান এবং স্থিতিশীল কৃষিজীবী যুগে অগ্নি, নির্ঋতি, ভূমি, প্রজাপতি, যম ও পাতালবাসী কিছু দেবতা প্রাধান্য লাভ করে। কৃষিজীবী স্তরে আর্যরা নির্দিষ্ট সময়মত বৃষ্টি এবং আবহাওয়াজনিত বিপত্তি নিবারণের জন্যে সচেষ্ট ছিলেন। বিশেষভাবে উদ্ভিদজগতের অধিষ্ঠাতা দেবতা, সৌর ও বর্ষণের দেবতাদের প্রয়োজনও তাদের পক্ষে এখনও ছিল অপরিহার্য ; এঁরা শুধুমাত্র অঙ্কুরোদগমের পক্ষে প্রয়োজনীয় উত্তাপই দান করবেন না ; মেঘ ও বৃষ্টি সৃষ্টি ক'রে পরোক্ষভাবে বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রণও করবেন।

পশুপালক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত আকাশের দেবতারা ছিলেন মূলত নিষ্ক্রিয়। সম্ভবত, এই পর্যায়েও কোন ধরনের পিতৃদেব-পূজা বৈদিক আর্যদের ধর্মচর্যার অঙ্গ ছিল, কিন্তু এই সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সামান্য। শুধু কিছু পরোক্ষ প্রমাণই রয়েছে। একই ভাবে মাতৃকাদেবী এবং পাতাল ও শস্য অধিষ্ঠাতা দেবতাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা অনায়াসে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যদিও তা শেষ পর্যন্ত অনুমান-নির্ভরই। যাযাবর জীবনের বৃষ্টি ও বজ্রের দেবতারা পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত দেব-সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আক্রমণকারী আর্যদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় প্রত্ন-পৌরাণিক রূপান্তরের ছায়াপথ ঘটেছে তাদের উপর। ভূমির উর্বরতা পশুপ্রজনন ও সন্তান-বৃদ্ধির পরিপোষক উর্বরতাবিধায়ক দেবতারা এবং সেই সঙ্গে মাতৃকাদেবী ও পাতাল ও শস্য অধিষ্ঠাতা দেবতারা, ও আঞ্চলিক জীবনের অভিভাবক দেবতারা একত্র সম্মিলিত হয়ে বৈদিক দেব-সঙ্ঘকে সম্পূর্ণতা দান করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঋগ্বেদে নৈসর্গিক উপাদানসমূহের উপর দেবত্ব আরোপিত হয়েছে প্রত্নপৌরাণিক পদ্ধতিতে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেবগোষ্ঠীর মতো বৈদিক দেবতাদের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন

শ্রেণীর উপদেবতাদের অস্তিত্বও লক্ষ করা যায়—যেমন অপ্সরা, গন্ধর্ব, যক্ষ প্রভৃতি। নৈসর্গিক উপাদানের উপর দেবত্ব আরোপিত ক'রে বৈদিক আর্যরা যাদের সৃষ্টি করেছিলেন, তারাই ঋগ্বেদের দেবগোষ্ঠীর প্রাচীনতর স্তর ; পরবর্তীকালে বিভিন্ন পর্যায়ে বিচিত্র চরিত্র ও ভূমিকাযুক্ত দেবতাদের সৃষ্টি হয় কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানের অনিবার্য পরিবর্তনশীল প্রয়োজনে দেবতাদের নিরন্তর উত্থান ও বিলয় ঘটেছে। বস্তুত জনসাধারণের সামাজিক অর্থনৈতিক ও অস্তিত্বের নিগূঢ় স্তরে অনুভূত প্রয়োজনের প্রেরণাতেই দেবতাদের সৃষ্টি। ঋগ্বেদের শেষ পর্যায়ে এমন কিছু দেবতার উৎপত্তি ঘটেছিল যাঁরা কোন প্রকৃত ধর্মচর্যা বা আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে সুনির্দিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন না ; বিমূর্ত আদর্শায়িত রূপেই শুধু যাঁরা আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। যদিও যজ্ঞের সঙ্গে সম্পূর্ণত সম্পর্কহীন কোন দেবতা ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না, তথাপি ঋগ্বেদ রচনার শেষ পর্যায়ে অনুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব আরোপিত না হয়ে নিতান্ত বিমূর্ত ধারণার উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হতে শুরু করে।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর বিখ্যাত তাত্ত্বিক ও নিরুক্তকার যাস্ক বৈদিক দেবতাদের বাসস্থান অনুযায়ী তিনটি ভাগে বিন্যস্ত করেছিলেন—পৃথিবী নিবাসী, অন্তরীক্ষ নিবাসী ও দ্যুলোক নিবাসী। তবে মনে হয় যে, যাস্কেরও অগোচরে এই শ্রেণীবিন্যাসের পশ্চাতে বর্ণভেদগত ধ্যান ধারণাও সক্রিয় ছিল। সামূহিক আর্যমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই ত্রিবর্ণের ভিন্নমুখী ভূমিকা অনুযায়ী দেবতাদেরও শ্রেণীবিন্যাস কল্পনা করেছিল। ব্রাহ্মণ-শ্রেণী সমাজের উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন না, যাজকতান্ত্রিক গ্রন্থরচনা ও যজ্ঞকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁরা। তাই, সমাজের প্রতি তাঁদের অবদান ছিল মুখ্যত আধ্যাত্মিক। সমগ্র গোষ্ঠীর আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্রাহ্মণদের দ্বারা অনুষ্ঠিত মহান আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন ও সর্বত্র কল্যাণকর 'তপঃ' সৃষ্টি ও স্থিতির প্রতিভূ হয়ে উঠল ; এবং ব্রাহ্মণ বর্ণটিও দেবতাদের পার্থিব প্রতিরূপ হয়ে উঠলেন।

ঋগ্বেদে যে সমস্ত দেবতা প্রাচীনতম স্তরের প্রতিভূ এবং ইন্দো-ইয়োরোপীয় দেবগোষ্ঠীর প্রভাবজাত, তাদের মধ্যে রয়েছেন—দ্যৌঃ, সূর্য, মিত্র, বরুণ, সবিতা, উষা, যম, ভগ, অংশ, দক্ষ, অর্যমা, বিবস্বান্, মার্তণ্ড, অশ্বীরা, অদিতি প্রভৃতি। ইন্দো-ইয়োরোপীয় আকাশের দেবতাদের মধ্যে দৌঃ-ই প্রাচীনতম এবং সর্বত্রই পশুপালক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ; কেননা সভ্যতার উষাকালে সেই গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ আকাশের অনন্ত বিস্তার ও সর্বব্যাপিতা অবলোকন ক'রে গভীর বিস্ময় ও আতঙ্কে নিমগ্ন হ'ত। পৃথিবী আকাশদেবের পত্নীরূপে পরিকল্পিত। সৌরদেবগণ যে আদিত্য বা অদিতি-পুত্র রূপে কল্পিত হয়েছেন তারও মূলে আছে ইন্দো-ইয়োরোপীয় ঐতিহ্য। তাঁদের মধ্যে মুখ্যতম হলেন সূর্যদেব, ইনি স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও উর্বরতা দানের

জন্য বন্দিত হয়েছেন। এছাড়াও সাধারণ মানুষ সৌরদেবতাদের নিকট প্রার্থনা করত ঐশ্বর্য, সমৃদ্ধি, শস্য, আরোগ্য, পরমায়ু, জ্ঞান ও আত্মিক উন্মেষ। প্রথম পর্যায়ে বরুণও ছিলেন আকাশেরই দেবতা ; পরবর্তী স্তরে তিনি হলেন নৈশ আকাশের অধিষ্ঠাতা, নক্ষত্রপুঞ্জ যাঁর চোখ। এই স্তর পর্যন্ত প্রত্ন-পৌরাণিক স্বরূপের চেয়েও তাঁর নৈতিকতার দিকের প্রবলতর অভিব্যক্তি পাওয়া যায়। নক্ষত্ররূপ চক্ষু দ্বারা মানুষের গোপন পাপ তিনি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে অবলোকন করেন এবং প্রয়োজনমত শাস্তিবিধানও করেন। মানুষের আচার আচরণের প্রতি এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত এবং বিচারক ও শাস্তিদাতার ভূমিকায় বরুণদেব ভীতি ও সম্ভ্রম উৎপাদন করেন ; বস্তুত তিনিই একমাত্র দেবতা যাঁর ভাবমূর্তিতে একটি নৈতিক মাত্রা যুক্ত হয়েছে। পরবর্তীকালে তিনি সৌরদেবমণ্ডলী অর্থাৎ আদিত্যগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন। গ্রিকদেবতাদের মধ্যে তাঁর প্রতিরূপ পাই উরানস্-এ এবং নীতিবিদ বিচারকের ভূমিকায় প্রাচীন পারসিক পরম দেবতা অহুর-মজ্‌দার সঙ্গেও তিনি তুলনীয়। প্রায়শ মিত্রদেবের সঙ্গে দ্বৈরথরূপে মিত্রাবরুণ দিন ও রাত্রির আকাশের অধিষ্ঠাতা। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর ভূমিকা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে পড়ায় তিনিই প্রথম কল্পিত এবং পরে সাধারণভাবে সমুদ্রের অধিদেবতা হয়ে উঠেন। বরুণদেবের শারীরিক বর্ণনা অস্পষ্ট ছিল ব'লেই তাঁর ভূমিকার এই কৌতূহলজনক রূপান্তর সম্ভবপর হয়ে উঠেছিল। যথাক্রমে রাত্রিকালীন আকাশ, অস্তায়মান সূর্য, দৈব জলরাশির অধিরক্ষক এবং সমুদ্রের অধিষ্ঠাতা রূপে তাঁর বিবর্তন ক্রমে সম্পূর্ণ হয়েছিল। পশুপালক সমাজের স্বাভাবিক দেবতা থেকে কৃষিনির্ভর সমাজের দেবতায় রূপান্তরিত হওয়ার ইতিহাসই এর মধ্যে বিধৃত আছে। পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থায় কৃষিজীবী আর্যদের পক্ষে আর্থিকভাবে কল্যাণপ্রসূ ভূমিকা নিয়েই বরুণ আপন ক্ষমতা অটুট রেখেছিলেন ; আর্যদের কল্পনায় দৈব জলরাশির রক্ষক রূপে উপযুক্ত ঋতুতে তিনি ছিলেন বৃষ্টিপাতের নিয়ন্তা। তেমনই পরবর্তী বাণিজ্যিক উদ্যোগের যুগে সমুদ্রযাত্রী বণিকদের কল্পনায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন সপ্তসমুদ্রের অধিপতি।

একদিক দিয়ে দেখলে দেখি সমগ্র ঋগ্বেদীয় কাব্যের ভাবকেন্দ্রে রয়েছে সূর্য ও সৌরদেবগণের বন্দনা। সূর্যরূপে আদিত্য আলো, স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির উৎস, সবিতারূপে ধীশক্তির প্রেরয়িতা ও অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের মোচনকারী। মিত্ররূপে আদিত্যের বন্ধুত্বের ভূমিকা লক্ষণীয়। এছাড়া রয়েছে, ভগ, অর্যমা, অংশ ও দক্ষের মধ্যে আদিত্যদের অধস্ফুট ভাবমূর্তি। সম্ভবত, ভারতবর্ষে আগমনের পূর্বে আর্য দেবগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের স্পষ্টতর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপ অটুট ছিল। দাম্পত্যজীবনের শান্তি ও জন্মপ্রক্রিয়া ছাড়াও পত্নী এবং মাতারূপে মহিলাদের ভূমিকার সঙ্গে ভগদেবের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। দক্ষের ভূমিকা খুব স্পষ্ট নয়, হয়ত বা কারুজীবীর ইষ্টদেবতা ছিলেন

তিনি। তেমনি অংশ দেবতারূপে সম্পূর্ণ ছায়াবৃত—ভগ, দক্ষ ও অর্যমার সঙ্গে সামূহিকভাবেই শুধু তাঁকে বন্দনা করা হয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণকারী দেবতা রূপে তখনি অর্যমার উদ্ভব ঘটেছিল যখন অনার্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনুপ্রবেশ ক'রে আর্যরা বসতি স্থাপন করেছিলেন। সৌরদেবতাদের আদিমাতারূপে অদিতিকে পাওয়া যায়। বিষ্ণুর তিনটি পদক্ষেপের বর্ণনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও পর্বতনিবাসী দেবতারূপে ঋগ্বেদে তিনি নিতান্তই গৌণ দেবতা, কেননা তাঁর উদ্দেশে মাত্র তিনটি সূক্ত নিবেদিত। তবে তাঁর মধ্যে সূর্যের ত্রিবিধ গতির প্রকাশ ঘটছে। ধাতা ও বিবস্বান্ সৌরদেবরূপে অত্যন্ত অস্পষ্ট ; তবে সম্ভবত ধাতা সূর্যদেবের সৃজনশীল দিক এবং বিবস্বান্ তাঁর উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে প্রকাশের প্রতীক। অন্যদিকে মার্তন্ড সম্ভবত অস্তায়মান সূর্যের প্রতিনিধি। যাই হোক, আর্যদের সৌর দেবমণ্ডলীর মধ্যে আদিত্যরাই প্রাচীনতম গোষ্ঠী ; ভারতবর্ষে প্রবেশ করার সময় এঁদের অধিকাংশই আর্যমানসে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। স্পষ্টতই আদিত্যের বিভিন্ন রূপের মধ্যে মাস ও ঋতুভেদে এবং উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত সূর্যের বিভিন্ন অবস্থানের অভিব্যক্তি ঘটেছে। পূষা নিতান্ত পরোক্ষভাবে সৌরদেবমণ্ডলীর সঙ্গে সম্পৃক্ত ; আর্যরা যখন যাযাবর জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল, ভূমির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকার ফলে বৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের জন্য উর্বরতার অন্য স্থায়ী উপাদান অর্থাৎ সূর্যের উত্তাপের উপরই তাদের নির্ভর করতে হ'ত। আর্যসভ্যতার যাযাবর পশুপালকস্তরে গো-সম্পদের রক্ষকরূপেও পূষার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পূষাকে 'অঘৃণি' অর্থাৎ জ্বলন্ত বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে, তাতেই সূর্যের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক আভাসিত। অবয়বগত আনুষঙ্গিক অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের জন্যও পূষা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। কেননা, তিনি রথের পরিবর্তে ছাগবাহন, তাঁর চুল বেণীবদ্ধ, 'করম্ভ' অর্থাৎ যবচূর্ণমিশ্র তাঁর খাদ্য। এতে মনে হয় যে, ভারতবর্ষে উপনীত হওয়ার পথে আর্যরা খুব সম্ভবত মোঙ্গোলিয়ার মধ্যে দিয়ে যখন এসেছিলেন সেই সময়ে মোঙ্গোলীয় আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ ও খাদ্যাভাসযুক্ত বিশিষ্ট কোনো দেবতার কল্পনা তাঁরা পথে সংগ্রহ করেছিলেন। সুদীর্ঘ তৃণে আচ্ছন্ন দুর্গম ভূমিতে পথভ্রষ্ট গো-সম্পদের পুনরুদ্ধার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল ব'লেই গোসম্পদের পুনরুদ্ধারকারী দেবতারূপে পূষার আবির্ভাব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কালক্রমে তিনি পথিক মানুষ ও বিচরণশীল পশুর পথপ্রদর্শক দেবতার ভূমিকাও গ্রহণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত তা মৃত্যুলোক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। মরণোত্তর লোকে প্রয়াত আত্মা যাতে পথভ্রষ্ট না হয় তার জন্যও পূষার কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে।

উষা ঋগ্বেদে সবচেয়ে সুললিত বর্ণনায় সমৃদ্ধ কিছু সূক্তের উদ্দিষ্ট দেবী। প্রতিটি প্রভাতই স্বভাবত অতিসূক্ষ্ম ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্যের আভাস আনে। দেবী উষা তাই ঋষিকবিদের বর্ণনায় পরমা সুন্দরী, সজীব ও চিরতরুণী ; রক্ত পরিচ্ছেদে তাঁর যৌবন

সঞ্জীবক ও দ্যুতিময়। জীবজগৎকে প্রতিদিন সকালে তিনি নিদ্রা থেকে জাগরিত ক'রে দৈনন্দিন কর্তব্যে প্রেরণা জোগান। উষা নিজের চিরতারুণ্য অক্ষুণ্ণ রেখেও মানুষকে দিনে দিনে বার্ধ্যকের অভিমুখে প্রেরণ করেন। উষাকে সূর্যের মাতা, কন্যা বা পত্নীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। দেবীর সক্রিয় ভূমিকা অপেক্ষা তাঁর কাব্যিক ভাবমূর্তি সূক্তগুলিতে অধিক অভিব্যক্ত। নূতনতর তৃণভূমির সন্ধানে সতত বিচরণশীল পশুপালক জনগোষ্ঠীর জন্য নিসর্গদৃশ্য স্বাভাবিকভাবেই ছিল এক পরিবর্তনশীল উপাদান ; একমাত্র স্থায়ী উপাদান হ'ল আকাশ, বায়ু ও সৌরদেবমণ্ডলী। তাই মনে হয় যে, আর্যদের সামূহিক জীবনের প্রাচীনতর পর্যায়েই উষাসূক্তগুলি রচিত হয়েছিল ; সম্ভবত ভারতবর্ষে উপনীত হওয়ার সময় আর্যরা এই সব রচনা সঙ্গে নিয়েই এসেছিলেন। প্রাথমিক স্তরে উষা সূক্তগুলির কোনো যজ্ঞীয় বিনিয়োগ ছিল না।

সোমদেব চন্দ্র রূপে অন্তরীক্ষে বিরাজিত এবং উজ্জ্বল ও জ্যোতিষ্মান রূপ ছাড়া তাঁর দেবত্ব নিতান্তই অস্পষ্ট রয়ে গেছে। উদ্ভিদ সোম বর্ণনায় কোনো দেবত্ব আরোপ করা সম্ভব নয়। যদিও ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলে সোমরসের মাদকতাই যেন উদ্ভিজ্জ সোমের উপর দেবত্ব আরোপ করেছে। এখানে সোম থেকে রস নিষ্কাশনের যে বর্ণনা সোমপায়ীর দীপ্ত কল্পনা তাকে এক তুরীয় লোকে নিয়ে গেছে।

যম প্রেতলোকে মৃত ব্যক্তিদের আত্মার হিতকারী অভিভাবক। তিনি মৃত ব্যক্তিদের দেবতা ; পরবর্তী সাহিত্যে মৃত্যুর ভয়ঙ্কর অধিদেবতা রূপে যমের যে ভাবমূর্তি, তা ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না। মানুষের মধ্যে তিনিই প্রথম মৃত্যুলোকে প্রয়াণ করেছিলেন। বস্তুত ঋগ্বেদে তাঁর প্রসন্ন ও আনন্দময় অভিব্যক্তিই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পার্থিব জীবনের দীর্ঘায়িত প্রতিরূপে হিসাবেই পরলোক কল্পিত হয়েছে, তবে তৎসম্পর্কিত কাহিনীগুলিতে এই কল্পনার প্রকাশ অস্পষ্ট ও পারম্পর্যহীন, কেননা ঋগ্বেদের সর্বত্রই পার্থিব জীবনই একান্তভাবে আকাঙ্ক্ষিত। যাই হোক, তখনও পর্যন্ত পরলোক, যন্ত্রণার ক্ষেত্র নয় এবং যমদেব প্রয়াতদের সদয় সত্বাধিকারী ও তাদেরই পূর্বপুরুষ। যমযমীর সংলাপমূলক বিখ্যাত সংবাদসূক্তটি (১০ : ১০) সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক—যমী তার যমজ ভ্রাতা যমকে প্রণয় নিবেদন করছেন এবং যম তা প্রত্যাখ্যান করছেন। দশম মণ্ডল রচনার সময়ে অজাচারের বিরুদ্ধে সামাজিক বিধি নিষেধ যেহেতু অত্যন্ত কঠোর হয়ে পড়েছিল তাই যম ও যমীর দীর্ঘ বাদানুবাদের অতি সামান্য অংশই সংরক্ষিত হয়েছে। পৃথিবীর সর্বত্র প্রচলিত এই জাতীয় প্রত্নকথাগুলির সঙ্গে তুলনায় আমরা বুঝতে পারি যে, আদিম মানুষের মধ্যে অজাচার মানব জাতির সৃষ্টির আবশ্যিক পূর্বশর্ত রূপেই বিবেচিত হ'ত।

অশ্বীরা যমজ দেবতা। এই দুই ভ্রাতা নাসত্য ও দস্র নামেও পরিচিত। এই নাসত্য নামটি খ্রিস্টপূর্ব চতুর্দশ শতকের মিতান্নি ও হিট্টাইটদের সন্ধির সমকালীন

কেননা তৎকালীন বোঘাজকোঈ থেকে প্রাপ্ত সেই বিখ্যাত সন্ধিপত্রে মিত্র বরুণ ও ইন্দ্রের সঙ্গে নাসত্যের নামও উল্লিখিত হয়েছে। গ্রিক প্রত্নকথাতেও এই যমজ দেবতার প্রতিরূপ লক্ষ করি ক্যাস্টর ও পলিডেউকিস্-এর মধ্যে ; আবার রোমান প্রত্নকথায় তাঁরা ক্যাস্টর ও পোলাক্স নামে বিখ্যাত। উত্তর ইয়োরোপের পুরাণে এঁরা দিবো দিওয়ালি বা দিবো সুনেলেই নামে পরিচিত। আদিত্যদের মধ্যে একমাত্র অশ্বীরাই বিভিন্ন সংকট, অসুস্থতা, অগ্নিকাণ্ড ও জলনিমজ্জন-এর মতো আপৎকালীন পরিস্থিতিতে শারীরিকভাবে মানুষের সহায়তা ক'রে থাকেন। তাঁদের রোগ নিরাময় করার ক্ষমতা প্রত্যক্ষগোচর ; অন্যান্য সৌরদেবরা সাধারণত উদ্যমহীন, শুধুমাত্র অশ্বীরা প্রবলভাবে সক্রিয়। তাঁরা সূর্য এবং মধুকে রথে বহন ক'রে নিয়ে আসেন। অশ্বীদের পরিচয়বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে যাস্ক বলেছেন যে, বিভিন্ন বিদ্বজ্জনের কাছে এই যুগলদেবতা দিন ও রাত্রি, আকাশ ও পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্রের প্রতিনিধি ; আবার যাস্ক বলেছেন যে, ঐতিহাসিক প্রস্থানের কাছে তাঁরা পুণ্যকৃৎ নৃপতি ; অর্থাৎ জনকল্যাণকারী ঐতিহাসিক রাজাদেরই দেবত্বে উপনীত রূপ। তাদের মানবিক পরিচয় স্পষ্ট হওয়ার জন্যই সম্ভবত পরবর্তী প্রত্নকথাগুলিতে দেবভোগ্য সোম থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ (অশ্বের অধিকারী) বিশ্লেষণ ক'রে মনে হয়, আর্যদের মধ্যে তাঁরা ছিলেন প্রাচীনতম অশ্বারোহী।

অন্তরীক্ষের অধিষ্ঠাতা দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রই প্রধান ; বিভিন্ন যুদ্ধবিগ্রহে বীরত্বে প্রদর্শনের দ্বারা তিনি স্পষ্টতই ক্ষত্রিয় সেনাপতির দেবরূপ। অন্তরীক্ষ বিষয়ক দেবতাদের মধ্যে তাঁর সহায়ক—বায়ুবাতঃ, পর্জন্য, রুদ্র ও মরুৎগণ। তাদের প্রত্যেকেই যোদ্ধা, শত্রু-ধ্বংসকারী বিজয়ী ; তাঁরা ক্ষমতাশালী ও বীর, ভীতি-উৎপাদক ও পৌরুষদীপ্ত। বীরত্বের জন্য এই সব দেবতা প্রশংসিত ; সেই সঙ্গে জয়লাভের জন্যও তাঁদের নিকট প্রার্থনা জানানো হয়। বায়ুবাতাঃ ও পর্জন্য যথাক্রমে বাতাস, ঝড় ও বজ্রপাতের দেবায়িত রূপ। বৈদিক বায়ু দেবতার মধ্যে একদিকে যেমন আছে প্রাণধারণের অপরিহার্য উপাদান বায়ু, অন্যদিকে তেমনি প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের শক্তিও। প্রকৃতপক্ষে বায়ুবাতাঃ শব্দবন্ধে এই দুটি বৈশিষ্ট্যের স্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখা যায় ; প্রথমটি বায়ু দ্বিতীয়টি বাত্যা বা ঝড়ের বাতাস। মৃ-ধাতু নিষ্পন্ন মরুৎ শব্দের মধ্যে রয়েছে ভয়ংকরের দ্যোতনা। মৃত আত্মার সঙ্গে মরুৎগণ সম্পর্কিত ; বজ্র ও বিদ্যুৎ এঁদের অস্ত্র হওয়াতে এঁরা ঝড়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। সিংহের ন্যায় গর্জনশীল মরুৎগণ উত্তরদেশের অধিবাসী, পৃষতী মৃগ তাঁদের বাহন এবং তীক্ষ্ণ ও দংশন-উন্মুখ বৃষ্টিধারা যেন তাঁদের লৌহনির্মিত দন্তরাজি। অরণ্যের বৃক্ষশ্রেণী যখন তাঁদের প্রবল আঘাতে উন্মূলিত ও ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, মনে হয় যেন পরাক্রান্ত সৈন্যবাহিনীর আক্রমণে শত্রুপক্ষ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। রুদ্র ও পৃশ্নি মরুদ্গণের পিতা ও মাতা এবং ইন্দ্র তাঁদের ভ্রাতা। যজুর্বেদের পর্যায় থেকে মরুৎদের ভীতিপ্রদ বৈশিষ্ট্য স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

তুলনামূলকভাবে বায়ুদেবরূপে পর্জন্যের ভাবমূর্তি কতকটা অস্পষ্ট ; মৌসুমি বায়ুজনিত বৃষ্টিপাতের অগ্রদূতরূপে তাঁর সামান্য কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আপঃ দেবতার ভাবমূর্তির পশ্চাতে রয়েছে আকাশে প্রচ্ছন্ন একটি কাল্পনিক জলাধার। আপঃ বা জলরাশিকে কখনো কখনো উচ্চতম স্বর্গে নিবদ্ধ ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। কখনো বা অন্তরীক্ষে প্রচ্ছন্ন বলা হয়েছে। এই সব উৎস থেকে জীবন ও পরিপুষ্টিদায়ক সজীব বৃষ্টিধারারূপে অবতরণ ক'রে তা শস্যে পুষ্টিসঞ্চার করে।

ঋগ্বেদে রুদ্র একজন গৌণ দেবতা যাঁর উদ্দেশ্যে মাত্র তিনটি সূক্ত নিবেদিত। যদিও রুদ্রের ক্ষতিকর বাণবর্ষণের কথা বলা হয়েছে, তবু সাধারণভাবে তিনি অন্যান্য ঋগ্বেদীয় দেবতার মতই কল্যাণপ্রদ—আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যর দিক্ দিয়ে অন্যদের থেকে কিছুমাত্র পৃথক নন। রথে আরূঢ় এই দেবতাটির গলায় সোনার হার এবং হাতে তীর-ধনুক। কিন্তু বিপজ্জনক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা তাঁর মধ্যে রয়েছে ব'লেই যজমানের সন্তান, আত্মীয় ও গোসম্পদের ক্ষতি না করার জন্য প্রায়ই তাঁর নিকট আর্ত, করুণ মিনতি ও প্রার্থনা জানানো হয় এবং সেই সঙ্গে যজমানের শত্রুদের ধ্বংস করার জন্যও অনুরোধ জানানো হয়। তাঁর ভাবমূর্তির মধ্যে কৌমজীবনের পৃষ্ঠপোষক দেবতার রূপ প্রচ্ছন্ন, প্রতিবেশীদের অকল্যাণের বিনিময়ে, প্রয়োজনবোধে অনৈতিকভাবে যিনি নিজ কৌম ও গোষ্ঠীর কল্যানসাধনে প্রয়াসী হচ্ছেন। তাঁর কল্পনার মধ্যে যে দ্বৈধতা রয়েছে তার উপর ভিত্তি ক'রেই পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে এবং মহাকাব্য ও পুরাণের যুগে রুদ্র-শিব দেবভাবনার উৎপত্তি ; প্রাচীনতর দেবকল্পনায় যে বৈশিষ্ট্য ও সেই সঙ্গে অপূর্ণতা রয়েছে, পরবর্তী প্রত্নকথাগুলিতে তা ক্রমে সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। প্রাচীনতম রুদ্র ও পৃশ্নির সন্তানরূপে পরবর্তী রুদ্রগণের জন্ম। এঁরা নির্মম ও শক্তিশালী। যে মৌসুমিবায়ুজনিত বৃষ্টিপাতের সঙ্গে আর্যরা ভারতবর্ষে উপনীত হওয়ার পরেই প্রথম পরিচিত হয়েছিলেন, এই রুদ্রদের গোষ্ঠী তারই প্রতিভূ। ঝড়ের মেঘের মতো রক্তবর্ণ রুদ্র ও চর্মনির্মিত জলাধার বা পৃশ্নি প্রকৃতপক্ষে মৌসুমিমেঘাবৃত বর্ষাকালীন আকাশের দ্যোতনা নিয়ে আসে। এটা স্পষ্ট যে, বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রায় সমস্ত দেবতাই মৌসুমি-বায়ু সৃষ্ট ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ আকাশের রক্তাভ দ্যুতি এবং বৃক্ষ উৎপাটনকারী ভয়ংকর ঝড়ে আন্দোলিত মেঘপুঞ্জের প্রতিনিধি। রুদ্র শব্দের ব্যুৎপত্তিতেও রক্তিমাভার পরিচয় মেলে। সন্দেহ নেই, এইসব দেবকল্পনায় প্রকৃতি একটি অবয়বগত ভিত্তি নির্মাণ করেছিল আর আক্রমণকারী আর্য সৈন্যবাহিনীর পরাক্রম প্রত্নপৌরাণিক ভাবমূর্তি নির্মাণে সাহায্য করেছিল। তাই মৌসুমিবায়ুর বিভিন্ন রূপকে বায়ুবাতাঃ, পর্জন্য, রুদ্র, মাতরিশ্বা কিংবা মরুদ্‌গণরূপে শক্তিশালী, অস্ত্রযুক্ত ও বিজয়ীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রত্নকথার প্রয়োজনে সৈন্যবাহিনীর জন্যে যে সেনাপতি প্রয়োজন, ইন্দ্র-কল্পনায় তারই অভিব্যক্তি।

ঋগ্বেদের এক-চতুর্থাংশের চেয়েও বেশি সূক্ত ইন্দ্রের প্রতি নিবেদিত ; বৈদিক দেবসঙ্ঘে তাঁর অসামান্য গুরুত্বই এতে প্রমাণিত হচ্ছে। অবয়ব সংস্থানের দিক দিয়ে ইন্দ্র উজ্জ্বল, তারুণ্যদীপ্ত, সুদর্শন, সুগঠিত হনু-যুক্ত ; তিনি 'সহসঃ সূনুঃ' অর্থাৎ স্বয়ং শৌর্যের সন্তান ; হরি নামক সুন্দর অশ্বসমূহ দ্বারা বাহিত রথে তিনি আরোহন করেন। তাঁর অসংখ্য ও বিচিত্র বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপের মধ্যে অধিকাংশই যুদ্ধবিগ্রহ সংক্রান্ত। অন্য যে কোনো প্রধান বৈদিক দেবতার মতো ইন্দ্রকেও বিশ্বস্রষ্টা রূপে প্রশংসা করা হয়েছে। তিনি গোসম্পদ দান করেন ; পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করেন খাদ্যসম্ভারে। ভারতের আদিম অধিবাসী অর্থাৎ 'অসুর' নামে পরিচিত সিন্ধু-উপত্যকার প্রাগার্য জনতার সঙ্গে বহু সংগ্রামে বিজয়ী হয়েই ইন্দ্র তাঁর বিক্রমের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ সম্ভব ক'রে তোলেন। ইন্দ্রের যুদ্ধজয়ের কাহিনী অস্পষ্ট ও নির্বিশেষ নয় ; যে সমস্ত শত্রুর সঙ্গে ইন্দ্র যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন, তাদের সুনির্দিষ্ট ইতিহাসসম্মত নাম পাওয়া যায়। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, ইন্দ্রের প্রাচীনতম ভাবমূর্তির পশ্চাতে প্রকৃত একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি ছিল ; আক্রমণকারী আর্যবাহিনীর সেনাপতিরূপে প্রাগার্যদের সঙ্গে দীর্ঘকাল ব্যাপী অসংখ্য যুদ্ধে তিনি সাফল্য অর্জন করেছিলেন। ইন্দ্র শত্রুদের সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত ক'রে ও তাদের শক্তির কেন্দ্রগুলিকে ধ্বংস ক'রেও ঐসব জনগোষ্ঠীর প্রধানদের বন্দী করেন, তাদের গোধন ও সম্পদ লুণ্ঠন ক'রে নিয়ে নিজের অনুচরদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। সেই কৃষ্টিনেতারূপে ইন্দ্র আর্য জনগোষ্ঠীর আনুগত্য অর্জন করেন, পশুপালক যাযাবর আর্যদের তিনি কৃষিজীবীরূপে বিজিতের বাসভূমিতে বসতি স্থাপন করতে সাহায্য করেছিলেন।

ইন্দ্র যে বজ্র নামক অস্ত্র ব্যবহার করতেন, তা লৌহনির্মিত কোনও অস্ত্র ব'লেই মনে হয় এবং সেই কারণেই তা সেই ব্রঞ্জের যুগে অপ্রতিরোধ্য ছিল। ১৪৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনের পতনের পরে লোহা ব্যবহারের গোপন বিদ্যা ব্যাবিলনবাসীদের মধ্য থেকে প্রতিবেশী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। আর্যদের মধ্যে ইন্দ্রই কেবলমাত্র বজ্রাস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন এবং ব্রঞ্জ ব্যবহারকারী সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসীদের কাছে সেই অস্ত্রকে প্রতিরোধ করার মতো কোন উপায় ছিল না। দীর্ঘকাল ব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অগ্নিবায়ু মরুদগণ, বিষ্ণু ও বৃহস্পতি ইন্দ্রকে সাহায্য করেছিলেন। গ্রিক প্রত্নকথার জেউস্ ও হেরার সঙ্গে ঋগ্বেদের ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী তুলনীয়। ইন্দ্রের সবচেয়ে শক্তিশালী শত্রুরূপে বৃত্র উপস্থাপিত, অবশ্য বিজয়লব্ধ সম্পত্তি অর্থাৎ বৃষ্টি, আলোক, সম্পদ বা গোধন অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে তাকে অনাবৃষ্টি বা অন্ধকারের অসুর কিংবা মানবদেহধারী শত্রুর নিধনকারী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বাস্তবিকভাবে ইন্দ্র সম্ভবত পরাজিত গোষ্ঠীপতির গোধন ও সম্পত্তি অধিকার করেছিলেন ; হয়তো বা কখনো কখনো তিনি শত্রুদের জলাধার ও বাঁধ ধ্বংস করে সঞ্চিত জলরাশিকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। ইন্দ্রের অন্যান্য শত্রুদের মধ্যে রয়েছে অহি (ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুযায়ী সম্ভবত বৃত্রেরই নামান্তর কিংবা ইন্দো-ইয়োরোপীয়

ব্যুৎপত্তি থেকে গ্রিক 'অফিস্' অর্থাৎ সর্পের নাম), পিপ্রু, উরণ, শুষ্ণ প্রভৃতি। এরা সম্ভবত ভারতের আদিম জনগোষ্ঠীগুলির নেতা, প্রত্যেকেই ইন্দ্রের দ্বারা পরাভূত বা নিহত। বহু যুদ্ধের বিজয়ী বীর রূপে ইন্দ্র 'শতক্রতু' বিশেষণে অভিনন্দিত হলেও তাঁর সর্বাধিক গৌরব নিহিত রয়েছে 'বৃত্রহন্' পরিচয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, অবেস্তায় ইন্দ্র ও বেরেথ্রগ্ন শব্দদুটি পৃথক্ ব্যক্তির পরিচয় বহন করছে। অন্যদিকে 'মঘবা' শব্দের মধ্যে এই তথ্য প্রচ্ছন্ন যে, ইন্দ্রই প্রধান সম্পদদাতা।

ইন্দ্রের সঙ্গে প্রীতিপ্রদ, উত্তেজক ও রমণীয় মাদকতা-উৎপাদক পানীয় সোমের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এই পানীয় ও তার উৎসকে কেন্দ্র ক'রে যে রহস্য ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল এবং সোমপানের ফলশ্রুতিরূপে শত্রুজয়ের যে ঐতিহ্য পরিস্ফুট হয়ে গিয়েছিল তারই প্রভাবে পরবর্তী যুগে সোমযাগ এমন বিকশিত হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে পানীয় গ্রহণের রীতিও প্রচলিত হয়ে যায়। ঋগ্বেদীয় যুগের সঙ্গে ইন্দ্রের প্রাধান্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পরবর্তী সাহিত্যে ইন্দ্রের গৌরব ম্লান হওয়ার কারণ, ভারতভূমিতে আর্যদের চূড়ান্ত বিজয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে আর্য জনগোষ্ঠীর জন্য সম্পদ, ভূমি ও গোধন অর্জন করার ঐতিহাসিক ভূমিকাও শেষ হয়ে গিয়েছিল।

প্রাচীনতর পারিবারিক মণ্ডলগুলিতে ইন্দ্রসূক্তসমূহের সুস্পষ্ট কাব্যিক সৌরভ রয়েছে ; অধিকাংশই সাধারণভাবে যুদ্ধগীতি এবং এদের মধ্যে আমরা যেন অস্ত্রের ঝনৎকার ও বিজয়ীর সিংহনাদ ধ্বনিত হ'তে শুনি। প্রাগার্য গোষ্ঠীপতির ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা বা 'মায়া' অধিগত ব'লে তারা আর্যদের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে, কিন্তু ইন্দ্র ও তাঁর অনুচরদের নিকট এরা অসহায়। বহিরাগত আর্যদের শ্রেষ্ঠতর অস্ত্র ও বীরত্বের নিকট প্রাগার্য জন-গোষ্ঠী পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। অধিকাংশ সূক্তই ইন্দ্রের বীরত্বের গৌরবজনক কাহিনী সামূহিক প্রত্নস্মৃতি থেকে তুলে এনে দেবতার আহ্বানসূচক স্তোত্র রূপে প্রযুক্ত হয়—যাতে দেবতা সন্তুষ্ট হ'য়ে জনগোষ্ঠীর সাম্প্রতিক প্রয়োজন অর্থাৎ সময়মত বর্ষণ, প্রভূত পরিমাণ উত্তম শস্য, গোধন ও মানুষের উর্বরতা, বিজয়, ঐশ্বর্য ও দীর্ঘজীবন দান করতে পারেন। ঋগ্বেদের ইন্দ্র সর্বদা ন্যায়পথে চলেন নি, যুদ্ধজয়ের প্রয়োজনে বহুবার তিনি ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু নীতিবোধ কখনওই কৃষ্টি-নেতার চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য নয়, বিজয় অর্জনই তাঁর লক্ষ্য এবং সেখানেই তাঁর যথার্থ গৌরব। কেননা আর্যজনগোষ্ঠীর পক্ষে তখনকার সংগ্রাম জীবনমরণের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই জনগোষ্ঠী তাঁদের ইন্দো-ইয়োরোপীয় আদি বাসভূমি থেকে দীর্ঘকালব্যাপী ভ্রমণের পথে বহুদূরে উপনীত হয়েছিলেন এবং দৃঢ় ও নিরাপদ বসতি স্থাপন তাঁদের পক্ষে অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছিল। ইন্দ্রের জয় তাঁদের শান্তি ও ঐশ্বর্যকে সুনিশ্চিত করেছিল ব'লে বৈদিকে দেবগোষ্ঠীতে তাঁর প্রাধান্য তর্কাতীত।

পৃথিবীস্থান দেবতার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন অগ্নি। ঋগ্বেদের সূচনা ও সমাপ্তি হয়েছে অগ্নিবিষয়ক সূক্ত দিয়ে—গুরুত্বের দিক দিয়ে তিনি ইন্দ্রের ঠিক পরেই। প্রধানত তিনি দূতের ভূমিকা পালন করেন ; যজ্ঞানুষ্ঠানে দেবতাদের তিনি আহ্বান ক'রে আনেন এবং তাঁদের উদ্দেশে নিবেদিত অর্ঘ্য ও আহুতি বহন ক'রে নিয়ে যান। অগ্নি উজ্জ্বল, পিঙ্গল বা রক্তবর্ণ, প্রাণপ্রাচুর্যে পূর্ণ, সক্রিয় ও চিরতরুণ। তিনি পুরোহিত এবং সম্পদদাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (রত্নধাতম) খাদ্য ও ধনের অধিকারী (বাজস্বৎ, অন্নবৎ, বসুমৎ)। যেহেতু তিনি ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠ মিত্র, 'দাতা শ্রেষ্ঠ' বিশেষণটিতে সম্ভববত তাঁর দহনকর্ম, যুদ্ধনীতি সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী সূচিত হচ্ছে। অর্থাৎ বহিরাগত আর্যরা যখন প্রাগার্য ভূমি আত্মসাৎ করে তখন অগ্নিসংযোগের দ্বারা শুধু যে তাঁরা জমিতে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন তা নয়, অগ্নিদহনে আরণ্যভূমি এবং ঊষর ক্ষেত্রকে কৃষির উপযোগী ক'রে তোলেন। অতএব অগ্নিই প্রকারান্তরে আর্যদের ধনদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ। শতপথ ব্রাহ্মণের একটা বিবৃতি অনুযায়ী আর্যবসতি স্থাপয়িতাদের প্রথম প্রজন্ম অগ্নিকে অকর্ষিত ভূমিতে বহন ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন ; অনার্যদের ভূমির অধিকার করার পূর্বে আক্রমণকারী আর্যরা বনভূমিতে অগ্নিসংযোগ করতেন। এভাবে নূতন ভূমি অধিকার করে তারা গোসম্পদ ও ধন লাভ করতেন। এইজন্য সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যের সর্বত্র অর্থাৎ আর্যজনগোষ্ঠীর বিজয় ও বিস্তারের প্রথম পর্বে অগ্নি তাদের প্রধান ধনদাতা দেবতা। আবার অগ্নি রাত্রে যেহেতু জ্বলন্ত প্রাচীর রূপে গোধনের নিরাপত্তা বিধান করতেন, সেহেতু এই উজ্জ্বল ও তারুণ্যদীপ্ত দেবতা আর্যদের যাযাবর জীবনে পশুসম্পদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবেই সম্পর্কিত ছিলেন—কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা শুরু হওয়ার পরও অগ্নির সঙ্গে আর্যগোষ্ঠীর এই সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল, তাই অগ্নি সুদীর্ঘকাল ধ'রে মুখ্য দেবতা থেকেছেন।

অগ্নির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, তিনি দ্বিজ কেননা ইন্ধনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অগ্নি শুষ্ক দারুঘর্ষণ ক্রিয়ার দ্বারা দ্বিতীয় জন্ম পরিগ্রহ করেন। এই পরিচয় তাঁকে ব্রাহ্মণের সমতুল্য অর্থাৎ দ্বিজ করেছে ব'লে দেবসমাজে তিনি কুলীন ও উচ্চতম স্তরের অন্তর্ভুক্ত এবং এই জন্যই প্রায় সমস্ত মণ্ডলই অগ্নিসূক্ত দিয়েই শুরু হয়েছে। দশটি অঙ্গুলি অগ্নির দশমাতা রূপে কল্পিত।

আপ্রীসূক্তগুলি সম্ভবত অত্যন্ত প্রাচীন মন্ত্রসংগ্রহ, তবে এদের মৌলিক তাৎপর্যের বহুলাংশেই আমাদের নিকট অজ্ঞাত। পশুযাগে আবৃত্ত এবং গীত এই আপ্রীসূক্তগুলিতে প্রধান যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ হওয়ার সময় অগ্নিকে সুসমিদ্ধ, পাবক, তনূনপাৎ, নরাশংস, ইলা, বর্হিঃ, দ্বারো দেব্যাঃ, উষাসানক্তা, দৈব্যৌ হোতারৌ ইত্যাদি নাম দিয়ে স্তব করা হয়েছে। এই সব বিশেষণের সূত্রাকারে বহু প্রয়োগ সম্ভবত অতিপ্রাচীনকালেই আরম্ভ হয়েছিল ; অগ্নি তখন মানুষের রক্ষাকর্তা ও শুভার্থীদের অগ্রগণ্য ছিলেন। এই অগ্নি মানুষকে প্রথম যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে দেবতাদের সন্নিকটে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং

দিবারাত্র তিনি সকল মানুষের সঙ্গে থাকতেন। 'দৈব্যৌ হোতারৌ' বা দৈব পুরোহিত রূপে অগ্নির বর্ণনা সম্ভবত অগ্নিচর্যার দুজন প্রাচীনতম পুরোহিত অর্থাৎ অথর্বা ও অঙ্গিরার দিকে ইঙ্গিত করছে। স্পষ্টতই অথর্বা ও অঙ্গিরাকে পরবর্তী ব্যাখ্যায় যথাক্রমে মঙ্গল ও অমঙ্গলের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে। এঁদের যে দুরকমের (শুভ ও অশুভ) ইন্দ্রজালের পুরোহিতরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তার সূত্রপাত হয়েছিল সুপ্রাচীনকালে যখন অগ্নিচর্যার শামান বা জাদু পুরোহিতরা পশুচারী জনগোষ্ঠীর মাংসের অর্ঘ্যযুক্ত প্রাথমিক যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। যজ্ঞীয় পশু বলিদানের অব্যবহিত পূর্বে অগ্নির দ্ব্যর্থবোধক বিশেষণগুলি সহ যে আপ্রী সূক্তগুলি প্রযুক্ত হ'ত, তাতে সম্ভবত প্রাচীনতম পর্যায়ের মাংসাহুতি দানের স্মৃতি প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে। পরবর্তী যুগে কৃষিজীবী সভ্যতার প্রবর্তনের পর নিরামিষ হবোর প্রচলন হয়।

অগ্নি যেহেতু রাত্রিতে সূর্যের প্রতীকী বিকল্প, তাই অনিবার্যভাবেই তিনি আলোক ও অশুভ প্রতিরোধের সঙ্গে সম্পর্কিত। মমতার পুত্র অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমাকে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। রাত্রিকালে প্রজ্বলিত অগ্নিরূপে তিনি দানব বিনাশকারী বা রক্ষোহা। তবে অগ্নির স্বভাবে ভয়ংকর দিকও যথেষ্ট ছিল ; তাই তাঁকে ক্রব্যাৎ বা শব-ভুক্ রূপেও বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ শবদাহে অগ্নি শবকে গ্রাস করেন এমন মনে হয়। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে অগ্নির প্রসন্ন ও ক্রুর এই দুটি আপাতবিরোধী বৈশিষ্ট্যের মধ্যে স্পষ্ট একটি ভেদরেখা টানা হয়েছে। মৃত্যুর বা মৃতদেহ-দহনের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধের ফলে তিনি পিতৃলোকে আহুতি বহন ক'রে নিয়ে যান ; তখন 'স্বাহা' শব্দের পরিবর্তে 'স্বধা' শব্দটি তাঁর উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়। উজ্জ্বল আলোকদীপ্ত দেবতারূপে অগ্নিকে বৃহস্পতি ও ব্রহ্মণস্পতির সমতুল্য ব'লে গণ্য করা হয় ; এঁরা তাঁর সঙ্গে পুরোহিতের দায়িত্ব ভাগ করে নেন। অগ্নি যখন উচ্চতম স্বর্গে বিরাজ করেন তখন তাঁকে মাতরিশ্বা ব'লে বর্ণনা করা হয় ; আকাশে তিনি বিদ্যুৎ, পৃথিবীতে সমিধ্ সমূহে তিনি তনূনপাৎ এবং জলমধ্যে তিনি বাড়বাগ্নি। পরবর্তী সাহিত্যে অগ্নি ধীরে ধীরে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি হারিয়ে ফেলেন এবং ক্রমশ রুদ্রের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা এসে যায়। বস্তুত, ঋগ্বেদের পর্যায়েই তাঁর সর্বাধিক সক্রিয় অবস্থা অক্ষুণ্ণ ছিল ; কিন্তু তারপর থেকে ক্রমে ক্রমে তিনি প্রত্নপৌরাণিক স্তরের পূর্ববর্তী নৈসর্গিক উপাদানের অবস্থানে প্রত্যাবর্তন করেন। আর্যগণ যখন নিশ্চিত নিরাপত্তার প্রয়োজনে প্রাচীর-বেষ্টিত নগরী নির্মাণে পারঙ্গম হয়ে উঠলেন, মানুষের প্রথম মিত্র ও রক্ষকরূপে অগ্নির মৌলিক মর্যাদা ধিরে ধিরে ম্লান হয়ে গেল। অবশ্য প্রত্নকথাগুলির মধ্যে অগ্নির আবিষ্কারজনিত প্রাথমিক ভীতি ও বিস্ময়ও অমরতা পেয়ে গেছে। প্রতিদিন নতুনভাবে জন্ম নেওয়ার ফলে রক্তিম অগ্নি দেবতাদের মধ্যে তরুণতম ও সবচেয়ে সুদর্শন রূপে পরিচিত।

অগ্নির পরেই পৃথিবীবাসী দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সোমদেব। সম্পূর্ণ নবম মণ্ডলে শুধুমাত্র একজনই দেবতা ঃ সোম। এক ধরনের বিশিষ্ট উদ্ভিজ্জ নিষ্কাশন ক'রে তার রস সংগ্রহ করা হত ; বৈদিক আর্যদের সবচেয়ে প্রিয় উত্তেজক পানীয় ছিল এই সোমরস। এই রসপানের তৃপ্তি ও উন্মাদনাতেই ক্রমে ক্রমে তার উপর দেবত্ব আরোপিত হয়েছিল। সোমসূক্তগুলি প্রাথমিক অবস্থায় প্রথম আটটি মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ছিল ; কিন্তু সোমচর্যার গুরুত্ব ও জটিলতা ক্রমশ বর্ধিত হওয়ার ফলে পুরোহিতরা সোমযাগে প্রয়োগের সুবিধার্থে সমস্ত সোমসূক্ত একত্রে পৃথকভাবে সংকলন ক'রে আনুষ্ঠানিক যজ্ঞে প্রযোজ্য স্তব ও প্রার্থনার একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। নিঃসন্দেহে ঋগ্বেদ-সংহিতার শেষ পর্যায়ে এই সম্পাদকীয় প্রচেষ্টাটি হয়েছিল ; দশম মণ্ডলে যেহেতু কোনো সোমসূক্ত নেই, আমরা স্বভাবতই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, দশম মণ্ডল রচিত হওয়ার সময় কিংবা পরবর্তীকালে সোমমণ্ডলটি সংকলিত হয়েছিল। অবেস্তায় যে 'হওম'-এর উল্লেখ আছে তাকে সোমযাগের ইন্দো-ইরানীয় প্রতিরূপ ব'লেই গ্রহণ করা হয়। ঋগ্বেদ-সংহিতার শেষ পর্যায়ে বহু নতুন যজ্ঞ আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সোমযোগও ক্রমান্বয়ে বিস্তারিত এবং গ্রন্থিল হয়ে উঠল—অনেক পুরোহিত এর সঙ্গে যুক্ত হলেন, অসংখ্য অনুপুঙ্খ দেখা দিল এবং দ্বাদশবর্ষব্যাপী সত্রে তা পরিণতি লাভ করল। বস্তুত সংহিতা ও ব্রাহ্মণ যুগের মধ্যবর্তীকালে সোমদেবের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। সোম ইন্দ্রের মিত্র এবং অন্যান্য দেবতাদের মতোই তাঁর নামের সঙ্গে অস্পষ্ট কিছু বীরত্বপূর্ণ কাহিনী সংযোজিত হয়েছে, তবে সোমসূক্তের সর্বাধিক কাব্যগুণমণ্ডিত অংশে পানোন্মত্ত পুরোহিতদের অবস্থা বিশদ বর্ণনায় বিবৃত। ইন্দ্রের এই মাদক পানীয়ের প্রতি আসক্তি যেহেতু কিংবদন্তীতে পরিণত সেহেতু সোমের স্বাভাবিক মিত্ররূপে তিনি সেই সেনাপতির ভাবমূর্তিকে স্পষ্ট করে তুলেছেন, জয়লাভ করার উপযোগী শক্তি অর্জন করার জন্য যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করার পূর্বে উত্তেজক পানীয় আকণ্ঠ পান করে নিতেন। অনুরূপভাবে অগ্নি সোমের সঙ্গে দু'ভাবে অন্বিত হয়েছেন ; প্রসন্ন মূর্তিতে তিনি ইন্দ্রের মাধ্যমে এবং ভয়ঙ্কর মূর্তিতে তিনি পিতৃগণের মাধ্যমে সোমের সঙ্গে যুক্ত। তাই সোমকে পিতৃমৎ এবং পিতৃগণকে সোমবৎ বলা হয়ে থাকে। সোমদেবের সঙ্গে অশ্বীদের কৌতূহলজনক দ্বৈত সম্পর্ক রয়েছে। দশম মণ্ডলের অন্তর্গত সূর্যাসূক্তে যে কাহিনীর আভাস রয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, সূর্যার পিতা সবিতা প্রথম সোমদেবকেই কন্যাদান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অশ্বীরাই সূর্যাকে সঙ্গে ক'রে রথে পতিগৃহে নিয়ে যান অথবা হয়ত সূর্যাকে তাঁরাই লাভ করেন। একদা সোমপানে বঞ্চিত হয়েছিলেন বলেই তাঁরা যেন সোমের জন্য নির্দিষ্ট বধূকে গ্রহণ ক'রে প্রতিশোধ নিলেন। এই প্রত্নপৌরাণিক বিবাহ-কাহিনীতে সোম যেন প্রার্থিব উদ্ভিদ ও আকাশবিহারী চন্দ্রের রূপে তাঁর অবস্থানের মধ্যবিন্দুতে বিরাজ করছেন। বস্তুত

সূর্য ও চন্দ্রের বিবাহ বিষয়ক সুপ্রাচীন ইন্দো-ইয়োরোপীয় প্রত্নকথার পরিপ্রেক্ষিতেই প্রাগুক্ত কাহিনীর তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে উঠে।

যজ্ঞের অনুষ্ঠানচর্যার ইতিহাসের পরবর্তী স্তরে আমরা এক ধরনের যান্ত্রিক প্রবণতা লক্ষ্য করি ; স্তোত্রে আহুত যে কোনো বস্তুই সেই সূক্তের দেবতারূপে গৃহীত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, সংহিতা সংকলনের সম্পাদকীয় প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্যায়েই এই বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয় যখন প্রত্যেকটি সূক্ত—এমন কি প্রত্যেকটি মন্ত্রের জন্য নির্দিষ্ট ঋষি, ছন্দ ও দেবতা নির্দেশিত হ'ত। যে সমস্ত ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে কোনো দেবতা নির্দেশিত হয় নি, সম্পাদকরা যান্ত্রিকভাবে ঋকে উল্লিখিত প্রাণহীন বস্তুর উপরও দেবত্ব আরোপ করতেন। এই চূড়ান্ত কৃত্রিম আনুষ্ঠানিকতার যুগে দেবতার বিশেষণগুলিও মধ্যে মধ্যে যে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব অর্জন ক'রে দেবতারূপে পরিগণিত হয়েছিল। যাস্কের মতে এইরূপ যাজ্ঞিক পক্ষের চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট হয়ে যখন অসংখ্য উপবিভাগে বিন্যস্ত হচ্ছিল তখন যেন কোন কিছুরই দেবতা হয়ে ওঠার বা দেবতারূপে পরিগণিত হওয়ার আর বাধা রইল না। যজ্ঞে বলি-প্রদত্ত অশ্ব, বৃষ এবং অন্যান্য জন্তুতে যেমন দেবত্ব আরোপিত হয়েছিল, তেমনি নতুন প্রবণতার বিচিত্র অভিব্যক্তি 'অজ একপাদ' বা 'অহির্বুধ্ন্য'রূপ কল্পনার মধ্যে দেখা গেল।

ঋগ্বেদের সময়কার দেবগোষ্ঠী যখন সংসার দিক দিয়ে প্রায় নিয়ন্ত্রণাতীত হয়ে উঠল তখন বিশ্বে দেবাঃ নামে নতুন একটি ধারণার জন্ম হল ; এদের উদ্দেশে বহু সূক্তও গ্রথিত হল। প্রাথমিক স্তরে প্রাগুক্ত শব্দবন্ধটি যদিও সমগ্র দেবসঙ্ঘকে সামূহিকভাবে নির্দেশ করেছে, পরবর্তীকালে তা নিজস্ব স্বতন্ত্র অস্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে একটি নতুন ও অস্পষ্ট সাংকেতিক রূপ পরিগ্রহ করে—তার মধ্যে নতুন এক অস্পষ্ট অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনাও অনুভূত হয়। অন্যান্য ভূস্থান দেবতাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। অবশ্য পৃথিবী এবং সিন্ধু, বিপাশ্, শুতুদ্রী, ইলা, ভারতী ও সরস্বতীর মতো নদীদের পরিচয়ও সংশয়ের উর্ধ্বে নয়। দেবতাদের দ্বারা গৃহীত হওয়ার পর আহুতির অবস্থাকে ইলা বলে অভিহিত করা হয়েছে ; তবে সরস্বতী নদী হ'লেও ভারতী নিশ্চিতভাবে বিমূর্ত। ভারতী সম্ভবত ভারতের আর্যবসতিসমূহের কিংবা ভরতকৌমের নাম; তেমনি যে সরস্বতী নদীর তীরে প্রথম আর্যবসতিগুলি গড়ে উঠেছিল, তারই সমুন্নত নাম সরস্বতী। যখন যজ্ঞানুষ্ঠান প্রকৃতপক্ষে দেবতাদের প্রাধান্যই আত্মসাৎ ক'রে নিচ্ছিল, সেই সময় যজ্ঞের গৌণ উপকরণ ও অংশসমূহে দেবত্ব আরোপিত হচ্ছিল। ফলে যূপ, ক্ষুর কিংবা গ্রাবাণৌ (শিলনোড়া) যে দেবত্ব মণ্ডিত হয়ে উঠল তাদের মধ্যে যথার্থ দেবতার পরিচয় না থাকলেও নিশ্চিতভাবে যজ্ঞচর্যার গৌরবের লক্ষণটুকুই ফুটে উঠেছিল। বিশঃ, প্রজা, অর্থাৎ জনসাধারণ ও কৃষকগণ তখন এক নামহীন জনগোষ্ঠীরূপে বিদ্যমান ছিল ; ফলে তাদের আদর্শায়িত

উপস্থাপনা যে সব পৃথিবী-নিবাসী দেবতাদের মধ্যে ঘটেছিল তার কোনও স্পষ্ট অবয়ব ফুটে ওঠেনি।

ঋগ্বেদে রচনা ও সংকলনের অন্তিম পর্যায়ে অর্ধবিমূর্ত দেবতাদের একটি নতুন গোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়। এদের মধ্যে প্রজাপতি, ব্রহ্মা, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি, হিরণ্যগর্ভ ও বিশ্বকর্মার নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; সাধারণভাবে এঁরা তখন যজ্ঞ এবং পুরোহিতদের কার্যাবলীর বিমূর্ত সৃজনশীল ক্ষমতার প্রতীক। লক্ষণীয়, যে এইসব দেবতাদের প্রতি নিবেদিত অধিকাংশ সূক্তে মানুষের উপর দেবত্ব আরোপের কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই বা যজ্ঞে বিনিয়োগের জন্য কোন নির্দেশও নেই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদিও বিনিয়োগের উল্লেখ রয়েছে, নিশ্চিতভাবেই সেইগুলি সংহিতা-যুগের শেষ পর্যায়ে আবিষ্কৃত যজ্ঞানুষ্ঠানগুলির সঙ্গেই সম্পৃক্ত। বিমূর্ত দেবতাদের প্রতি সূক্তসমূহ যেহেতু মূলত সংহিতাযুগের অন্তিম পর্যায়েই পাওয়া যায়, এতে সম্ভবত এই ইঙ্গিতই রয়েছে যে এইসব সূক্তের মধ্যে প্রচ্ছন্ন একেশ্বরবাদী প্রবণতা আর্য ও প্রাগার্য গোষ্ঠীগুলির পার ্পরিক সংমিশ্রণেরই বিলম্বিত ফলশ্রুতি।

পৃথিবীর ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার আচরণের মধ্যে পিতৃপুরুষদের উপাসনা একটি সর্বজনগ্রাহ্য উপাদান ; তা নিশ্চিতভাবে আর্যদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। দশম মণ্ডলে 'পিতরঃ' এর উদ্দেশে কয়েকটি সূক্ত রচিত হওয়ায় আমরা প্রমাণ পাচ্ছি যে সংহিতার শেষ পর্যায়ে এইসব রচনা প্রথম প্রকাশ্য স্বীকৃতি লাভ করে। এর কারণ সম্ভবত এই, যে বিষয়টি মূলত গার্হস্থ্য জীবনের সঙ্গে জড়িত এবং আক্রমণকারীরা বসতি বিস্তার ক'রে দৃঢ়ভিত্তি অর্জন করার পরই সামূহিক পিতৃ-উপাসনার সূত্রপাত হয়।

অনৈসর্গিক অস্তিত্বের মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট বিভাজন রয়েছে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে। যে সমস্ত প্রাগার্য গোষ্ঠীপতি ও তাদের অনুচররা আর্যদের আক্রমণ প্রতিহত ক'রেও শেষ পর্যন্ত পর্যুদস্ত হয়েছিল, তাদেরই অসুর রাজা ও অসুর গোষ্ঠীপতিরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি প্রত্নপৌরাণিক উপাখ্যানেই বিজয়ী আক্রমণকারীদের শত্রুপক্ষকে এভাবে মসীলিপ্ত করা হয়েছে। আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে আত্মা সম্বন্ধে বিশ্বাস খুবই সাধারণ। প্রাচীন মানুষের বিশ্ববীক্ষায় জীবিত মানুষের পৃথিবী প্রায়ই মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মার দ্বারা আক্রান্ত অথবা লালিত হয়ে থাকে। বৈদিক আর্যদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি।

আর্যরা প্রকৃতপক্ষে অনার্যগোষ্ঠীভুক্ত শত্রুদেৰ অমরতা দান করেছেন। দীর্ঘকালব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধকে অতিজাগতিক তাৎপর্যে আধ্যাত্মিকতায় উত্তীর্ণ ক'রে কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যে সংঘর্ষ রূপে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। প্রাগার্য গোষ্ঠীপতিদের প্রথম প্রজন্মকে সম্ভবত আর্যদের বিজয় লাভের এক শতাব্দী বা আরও

কিছুকাল পরে মায়া শক্তিধারী অশুভ বাহিনীরূপে চিহ্নিত করা হল, পরবর্তীকালেও আর্যদের যে কোনো ধরনের বিপদের জন্য তাদেরই দায়ী করা হ'ত। কালক্রমে এইসব শত্রু অন্তরীক্ষচারী বা পাতালনিবাসী অদৃশ্য শক্তিরূপে চিহ্নিত হ'ল। আঞ্চলিক বা পারিবারিক প্রত্নকথা ও আখ্যান অনুযায়ী এদের নাম, চরিত্র ও ক্রিয়াকলাপ হ'ল ভিন্ন ভিন্ন। এইসব আর্যশত্রুগণ যথাসময়ে অসুর, রক্ষঃ (পরবর্তীকালে এরাই রাক্ষস) যক্ষ ও পিশাচ রূপে পরিচিত হ'ল ; উল্লেখ্য যে, এরা সর্বদাই যূথবদ্ধ (গণ), তবে প্রত্নপৌরাণিক বিশ্বকল্পনায় ভাল ও মন্দের মধ্যে দ্বিমেরু কোনও বিষম বিভাজন নেই ; বহু দেবতার চরিত্র ও কার্যাবলী বিশ্লেষণ ক'রেও আমরা তাই দেখি। প্রেত ও পিশাচশক্তি সমন্বিত হয়ে যেমন রুদ্র ও মরুদ্‌গণে পরিণত হয়েছে, তেমনি বিপরীত ক্রমে এরাই অসুর, রক্ষ প্রভৃতিতে বিবর্তিত হয়েছে। বস্তুত মূলগতভাবে এরা পরস্পর ভিন্ন নয়, শুভশক্তির দিকে প্রবণতা থাকলে একই শক্তি দেবতা হয়ে ওঠে কিন্তু ভারসাম্য বিপরীত দিকে ঝুঁকে পড়লেই জন্ম নেয় অসুরেরা। প্রকৃতপক্ষে অসুর কল্পনার মধ্যেই ঐতিহাসিক সত্য অধিক মাত্রায় প্রচ্ছন্ন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সামবেদ সংহিতা

সামবেদ সংহিতার তিনটি প্রধান পাঠভেদ রয়েছে—জৈমিনীয়, রাণায়নীয় এবং কৌথুম। শেষোক্ত পাঠটি গুজরাট ও বাংলায় প্রচলিত ছিল ; রাণায়নীয় শাখা, বিশেষত তাদের কল্পসূত্রগুলি, প্রধানত মহারাষ্ট্রে পরিচিত ছিল—অবশ্য এই শাখা কৌথুম শাখার সংহিতা ও ব্রাহ্মণগুলি ব্যবহার ক'রে থাকে। জৈমিনীয় শাখার সমস্ত ভাগই সম্পূর্ণত কর্ণাটকে প্রচলিত।

সামবেদে দু'টি মূল পাঠ রয়েছে :
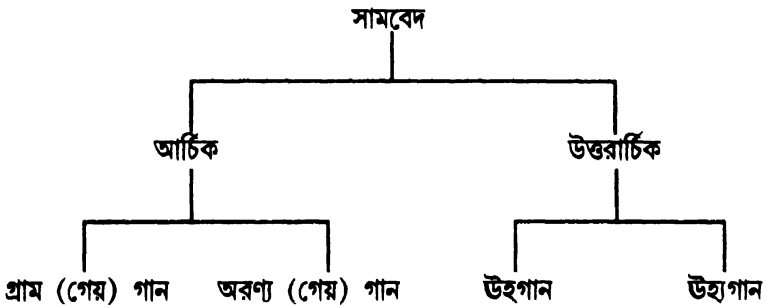
মূল পাঠের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বৈদিক সাহিত্যে সামবেদের তাৎপর্য সবচেয়ে গৌণ। মোট ১৮১০ টি মন্ত্রের মধ্যে (পুনরাবৃত্তিগুলি গ্রহণ না করলে ১৫৪৯) ১৭৩৫টি মন্ত্র (বা ১৪৭৪) প্রধানত ঋগ্বেদের অষ্টম ও নবম মণ্ডল থেকে অবিকৃত পাঠে সরাসরি নেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ৭৫টি মন্ত্রের অধিকাংশ পঙ্‌ক্তিই যজুর্বেদ বা অথর্ববেদ থেকে অংশত গৃহীত হয়েছে ; যজ্ঞানুষ্ঠানবিষয়ক পুস্তক বা লুপ্ত শাখা থেকে কিছু কিছু পঙ্‌ক্তি নেওয়া হয়েছে। এগুলিকে কৃত্রিমভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ক'রে অর্থহীন বিশৃঙ্খল পঙ্‌ক্তি বিন্যাসে পরিণত করা হয়েছে। আবার কিছু কিছু মন্ত্র প্রত্যক্ষভাবে ঋগ্বেদ থেকে গ্রহণ করা হলেও সামবেদে তাদের পাঠ ভিন্ন। সংহিতা পাঠের এই পরিবর্তন সম্ভবত পুরোহিতদের ইচ্ছাকৃত পুনর্বিন্যাসের ফলেই হয়েছিল ; এই পাঠ প্রাচীনতর ব'লেই ঋগ্বেদের প্রচলিত পাঠ অপেক্ষা বহু পূর্ববর্তী। আবার কোনো সমালোচকের মতে সামবেদ সংহিতা ঋগ্বেদের পরে সংকলিত হয়েছিল ব'লেই তাতে ভাষাগত বিকাশের পরবর্তী স্তরটি প্রতিফলিত হয়েছে। সামবেদের

পুরোহিত উদ্‌গাতা, যজ্ঞে গায়ক ছিলেন ব'লেই সাংগীতিক বা সুরবিন্যাসের প্রয়োজনে মূলপাঠে পরিবর্তন করতে হয়েছিল ; অবশ্য কোনো কোনো গবেষকের মতে এই জাতীয় পরিবর্তনে কোনো পারম্পর্য রক্ষিত হয় নি।

সামবেদের পুরোহিতের সহায়ক গ্রন্থরূপেই এই নূতন পাঠ সংকলনটি প্রস্তুত হয়েছিল ; নবীন গায়কদের প্রশিক্ষণের জন্য এবং সেই সঙ্গে যজ্ঞানুষ্ঠানে সংগীতের প্রয়োজনে এই পাঠ আদর্শ রূপে গণ্য হ'ত। সামবেদ সংহিতা আর্চিক (বা পূর্বার্চিক) এবং উত্তরার্চিক নামে দুটি ভাগে বিন্যস্ত। আর্চিক অংশে ১৮৫৩টি মন্ত্র রয়েছে যার মধ্যে প্রত্যেকটি প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক সুরে গীত হতে পারত। এই সংকলন ছটি প্রপাঠকে বিভক্ত (অথবা বারোটি অর্ধ বা অর্ধ-প্রপাঠকে)। মোটামুটিভাবে প্রপাঠকগুলি আবার ৫৯টি দশৎ-এ বিভক্ত। এদের সঙ্গে আরও দশটি অতিরিক্ত একটি দশৎ সংযোজিত হয়েছে। অন্যদিকে উত্তরার্চিকে সংকলনের চারশটি সূক্তে ১২২৫টি মন্ত্র ৯টি প্রপাঠকে বিন্যস্ত ; এগুলিও আবার ২টি (ভিন্ন একটি গণনায় ৩টি) দশৎ-এ উপবিভক্ত—প্রতিটি ক্ষেত্রে ঋগ্বেদের মন্ত্র সামবেদের স্বরন্যাস অনুযায়ী পরিকল্পিত। পূর্বার্চিকের শ্লোক সংখ্যা ৫৮৫।

আর্চিক সংকলন ভাবী উদগাতা শ্রেণীর গায়ক বা তার কোনো সহায়কের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনে প্রস্তুত হয়েছিল ব'লে প্রত্যেকটি সূক্তের প্রথম অংশ সুর-সৃষ্টিতে স্মৃতির অনুষঙ্গরূপে ব্যবহৃত—উত্তরার্চিকে সংকলিত মন্ত্রসমূহ কিন্তু স্তোত্ররূপে বিন্যস্ত। মাত্র ৩১টি মন্ত্র ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত মন্ত্রই ঋগ্বেদে খুঁজে পাওয়া যায়, অর্থাৎ প্রধান শ্রৌত যজ্ঞসমূহে যে ক্রম অনুযায়ী সেগুলি গীত হ'ত তা উত্তরার্চিকেই রক্ষিত হয়েছে। মন্ত্রসমূহে প্রযুক্ত সুরের কাঠামো ইতোমধ্যে সর্বজনপরিচিত হয়ে গিয়েছিল, এই পূর্বসিদ্ধান্ত থেকেই যেন উত্তরার্চিক যজ্ঞানুষ্ঠানগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় সম্পূর্ণ সূক্ত সংগ্রহরূপে গড়ে উঠেছে। সুতরাং আর্চিক অংশে যেখানে প্রশিক্ষার্থীদের সংগীত বিষয়ে পাঠ দেওয়া হ'ত, উত্তরার্চিক সেই সমস্ত গানের ব্যবহারিক ও যজ্ঞানুষ্ঠানে সহায়ক গ্রন্থরূপে সংকলিত ও বিন্যস্ত হয়েছিল। আনুষ্ঠানিক প্রয়োজন অনুযায়ী উত্তরার্চিকের মন্ত্রগুলি বিন্যস্ত। পূর্বার্চিকে প্রথম পর্যায়ে তৃচগুলি উপস্থাপিত হয়েছে। পূর্বার্চিক এবং অরণ্যসংহিতা একত্রে দ্বিবিধগান অর্থাৎ গ্রাম-গেয় এবং অরণ্য-গেয় গানের মূল পাঠ নির্মাণ করেছে ; তবে যে গানটি একবার গ্রাম-গেয় গানে উল্লিখিত হয়েছে, তা অরণ্য-গেয় গানে নতুন সুরে গীত হলেও অরণ্য সংহিতায় দ্বিতীয়বার আর বিধৃত হয় নি।

যজ্ঞানুষ্ঠানসমূহ জটিলতর ও দীর্ঘায়ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায়োগিক সমস্যাগুলিও বহুগুণ বর্ধিত হয়েছিল ; ঐতিহ্যকে বিশ্বস্তভাবে পরিস্ফুট করার প্রয়োজনে শিক্ষানবীশদের স্পষ্ট প্রশিক্ষণ অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। ফলে দুটি আর্চিকের

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চারটি গীতিসংকলন তৈরি হল ঃ (১) (গ্রাম) গেয় গান বা প্রকৃতি গান (২) অরণ্য (গেয়) গান (৩) উহগান এবং (৪) উহ্যগান। এদের মধ্যে প্রথম দুটি যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সংকলিত গান পূর্বার্চিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং সাধারণভাবে সোমযাগেই ব্যবহৃত। গ্রামে গুরুগৃহে প্রকাশ্যে যা শেখা যায়, তারই নাম দেওয়া হয়েছে গ্রাম গেয় গান, অন্যদিকে অরণ্যের নির্জনতায় যা শেখানো হয়, তাকেই বলে অরণ্য গেয় গান। গ্রামগীতির কিছু কিছু পাঠ ভিন্ন সুরে অরণ্যগীতিতেও পরিবেশিত হয়ে থাকে ; কিন্তু নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানবিষয়ক গীতি-সংকলন যে অরণ্য সংহিতা তাতে সে সব পাওয়া যায় না। গ্রামগীতি ও অরণ্যগীতি একত্রে পূর্বগানরূপে পরিচিত। উত্তরার্চিকটি উহগান ও উহ্যগানের সমন্বয়ে গঠিত। এদের মধ্যে উহ্যগান স্পষ্টতই অগ্নিষ্টোম অনুষ্ঠান সম্পর্কে সুপরিকল্পিত প্রশিক্ষণ-দানের উদ্দেশে রচিত হয়েছিল ; উদ্গাতার ব্যহৃত প্রধান গানগুলি এতে পাওয়া যায়—সাধারণত প্রস্তোতা ও প্রতিহর্তা শ্রেণীর পুরোহিতরা এতে উদ্গাতার সহায়ক হয়ে থাকেন। আর্যেয়কল্প গ্রন্থে অগ্নিষ্টোমে ব্যবহৃত উহ ও উহ্যগান সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ আছে। পূর্বার্চিকে প্রযুক্ত উত্তরার্চিকের প্রতিটি ঋক্ "যোনি" অর্থাৎ উৎস ব'লে পরিচিত ছিল, কেননা তখনকার যুগে এই বিশ্বাস ছিল যে শব্দ থেকেই সুরের জন্ম হয়। অতএব গানের কথাই গানের "যোনি"। প্রশিক্ষার্থীদের সহায়কগ্রন্থরূপে পূর্বার্চিক এই সমস্ত 'যোনি'কে আনুষঙ্গিক সুরের সঙ্গে উপস্থাপিত করেছে। উত্তরার্চিক যেহেতু আনুষ্ঠানিক প্রয়োগের ক্রম অনুযায়ী এদের বিন্যস্ত করেছে, তাই এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে উঠেছে যে, প্রাগুক্ত গানসমূহের সঙ্গে পাঠকের পূর্ব-পরিচিতি স্বতঃসিদ্ধ। তবে উত্তরার্চিকের ২৮৭টি তৃচের মধ্যে পূর্বার্চিকে কেবলমাত্র ২২৬টিই পাওয়া যায় ; অন্য ৬১টি না পাওয়ার কারণ এই যে, এইগুলি গায়ত্রীসুরে সন্নিবিষ্ট হয়ে প্রাতঃসবনে প্রযুক্ত হ'ত। সম্ভবত এই প্রাতঃসবন ছিল মৌলিক ও সংক্ষিপ্ততম সোমযাগের প্রথম স্তর, অন্য দুটি সবন পরবর্তীকালে সংযুক্ত হয়। পূর্বোক্ত ২২৬টি তৃচ মাধ্যন্দিন ও সান্ধ্য সবনে ব্যবহৃত হ'ত। অবশ্য গীতি প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বহুলাংশে অনুমান-নির্ভর ; বহু পরবর্তীকালের পুস্তকসমূহে প্রাপ্ত পরস্পরবিচ্ছিন্ন নির্দেশগুলি একত্র ক'রেই আমরা কিছু ধারণা তৈরি করেছি।

সামবেদীয় গায়কদের প্রধান কর্তব্যই ছিল ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলিকে সংগীতের প্রয়োজনে পুনর্বিন্যস্ত করা। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা নিম্নোক্ত ছ'টি পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছিলেন—(১) বিকার (একক শব্দগুলির পরিবর্তিত উচ্চারণ) (২) বিশ্লেষণ (শব্দসমূহের বিভাজন) (৩) বিকর্ষণ (কোন শব্দের বিশ্লিষ্ট অক্ষরসমূহের মধ্যে দীর্ঘায়িত স্বরবর্ণের সন্নিবেশ) (৪) অভ্যাস (পুনরুক্তি) (৫) বিরাম (পরবর্তী শব্দের বিভাজন ক'রে তার প্রথম অক্ষরকে পূর্ববর্তী শব্দসমূহের প্রথম অক্ষরের সঙ্গে সংযোগ—তবে শব্দসমূহের মধ্যে বিরাম চিহ্নদানের পূর্বে তা করণীয়।) (৬) স্তোভ

(ঋগ্বেদীয় পাঠে অনুপস্থিত অক্ষরসমূহের সন্নিবেশ)। এই স্তোভগুলি কেন এবং কখন সামগানগুলির সঙ্গে সংযোজিত হয়েছিল—তা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ; কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় উৎস সুদূর অতীতে। তখন এইসব অর্থহীন অক্ষরগুলির মধ্যে উদগাতার প্রধান গান ও যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রতি সমগ্র সমাজের আনন্দিত, গভীর ও উত্তেজিত প্রতিক্রিয়া বা সম্মতি বা সক্রিয় অংশগ্রহণ পরিস্ফুট হ'ত—হয়ত বা কোনো ধরনের ঐন্দ্রজালিক ফললাভের প্রত্যাশাও তাতে অভিব্যক্ত হ'ত।

অরণ্যগেয় গান ছ'টি প্রপাঠকে বিভক্ত। অরণ্যগেয় গানের নামকরণেই, গ্রামগেয় গানের সঙ্গে তার মূলগত পার্থক্য স্পষ্ট—এই গূঢ়ার্থপূর্ণ সংকলন নির্জনে শিক্ষাদান ও অভ্যাস করানো হ'ত ; সম্ভবত এইসব গানের রহস্যময় সম্ভাবনা ও বিপজ্জনক শক্তি আর্যদের কল্পনায় উদ্বোধিত হ'ত। উত্তরার্চিকের সঙ্গেও উহগান ও উহ্যগান সংযোজিত হয়েছিল। উত্তরার্চিকে প্রাপ্ত ঋক্‌বিন্যাস রীতি অনুসরণ ক'রে উহগান ২৩টি প্রপাঠকে বিন্যস্ত হয়েছিল ; অন্যদিকে উহ্যগানে ছিল মাত্র ৬টি প্রপাঠক।

ঐতিহ্য অনুযায়ী সামবেদের ১০০০টি শাখা ছিল ; সম্ভবত এতে এই প্রতীকী বক্তব্যই পরিস্ফুট হয়েছে যে, সুরসৃষ্টি করতে গিয়ে এবং পরবর্তী কালে গানের উপস্থাপনায় সংগীত রচয়িতারা ঐতিহ্যগত পাঠ ব্যবহার গীতস্রষ্টার স্বাধীনতার পরিচয় রেখেছেন। যাই হোক, আমাদের কাছে মাত্র ৩টি শাখা উপস্থিত হয়েছে—জৈমিনীয় (কেরল, তামিলনাড়ু, কর্ণাটকে প্রচলিত) কৌথুম (গুজরাট প্রচলিত—বর্তমানে অবশ্য বাংলা এবং উত্তরপ্রদেশের কিছু কিছু অঞ্চলেও পাওয়া যায়) ও রাণায়নীয় (মহারাষ্ট্রে প্রচলিত, বর্তমানে মথুরাতেও লভ্য)। সামবেদের ভাষ্যকারদের মধ্যে অধিক খ্যাতি অর্জন করেছেন মাধব (দ্বাদশ শতাব্দী), ভরতস্বামী (চতুর্দশ শতাব্দী) এবং শোভাকর ভট্ট (পঞ্চদশ শতাব্দী)।

সামবেদ যে ঋগ্বেদের চূড়ান্ত পর্যায়ের রচনা থেকে কোনো ঋণ গ্রহণ করে নি তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সামগানগুলি মুখ্যত দু'ধরনের ; প্রথম গুচ্ছ পবমান সোমের উদ্দেশে নিবেদিত—অন্যান্য মণ্ডল থেকে কিছু কিছু গৃহীত হলেও প্রধানত ঋগ্বেদের নবম মণ্ডল থেকেই এইগুলি সংকলিত হয়েছে। দ্বিতীয় গুচ্ছটি নিবেদিত হয়েছে সেই সব দেবতার প্রতি যাঁরা তিনটি সবনে সোমের আহুতি গ্রহণ করেন। বস্তুত গ্রন্থ-বিচারে ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের সঙ্গে সামবেদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান। আর্থিক বিশ্লেষণ ক'রে আমরা দেখি যে কয়েকটি মাত্র বিশিষ্ট দেবতার উদ্দেশে মন্ত্রগুলি নিবেদিত ; অগ্নির প্রতি ৩৫২টি (আগ্নেয় কাণ্ড), ইন্দ্রের প্রতি ১১৯টি (ঐন্দ্র), পবমান সোমের প্রতি ১০টি। প্রজাপতি (মহানাম্নী আর্চিক) ও অন্যান্য দেবতার প্রতি বিবিধ-বিষয়ক অরণ্য কাণ্ডে যে ৫৫টি মন্ত্র রয়েছে তাতে উদ্দিষ্ট দেবতাদের মধ্যে রয়েছেন ইন্দ্র, বরুণ, পবমান সোম, বিশ্বেদেবাঃ ও অগ্নি। উত্তরার্চিকে যে ২১টি অধ্যায় রয়েছে,

তাতে শেষতম অধ্যায় ছাড়া সর্বত্রই অগ্নি, পবমান সোম ও ইন্দ্রকে আহ্বান করা হয়েছে। তাছাড়া, দ্বিতীয় অধ্যায়ে উষা এবং অশ্বীদের পাওয়া যায়। মিত্রাবরুণকে পাওয়া যায় প্রথম তিনটি ও দ্বাদশ অধ্যায়ে। দশম অধ্যায়ের পর থেকে অন্যান্য দেবতাদের পাওয়া যাচ্ছে ঃ—পবমান সোম (দশম), আদিত্য, আত্মা বা সূর্য (একাদশ), সরস্বত, সরস্বতী, সবিতা, ব্রহ্মণস্পতি, দ্যাবাপৃথিবী বা হবীংষি, সূর্য (ত্রয়োদশ), বিশ্বেদেবাঃ, অগ্নি পবমান (চতুর্দশ), ইন্দ্রাগ্নী বরুণ, বিশ্বকর্মা, পূষা, মরুৎ, ইন্দ্রাণী (ষোড়শ), বিষ্ণু, বায়ু, ইন্দ্রাবায়ু (সপ্তদশ), বিষ্ণু বা দেব, ইন্দ্রাগ্নী (অষ্টাদশ), উষা ও অশ্বীরা (উনবিংশ), মরুদ্‌গণ, সূর্য বা আপঃ, বায়ুবাত (বিংশ), মরুদ্‌গণ, বৃহস্পতি, আপব্দেবী, ইষবঃ, সংগ্রামাশিষঃ, ব্রহ্মণস্পতি ও অদিতি (একবিংশ)। সমগ্র পঞ্চদশ অধ্যায়টি অগ্নির প্রতি উদ্দিষ্ট।

আহূত দেবতাদের পরিচয় অনুযায়ী সামবেদের বিষয়বস্তুকে বর্গীকরণ ক'রে আমরা দেখি যে গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র সর্বাগ্রগণ্য কেননা দুটি আর্চিক মিলিয়ে তাঁর উদ্দেশে ৩৭৫টি মন্ত্র নিবেদিত। গুরুত্ব অনুযায়ী এরপর আমরা যথাক্রমে পবমান সোম (১৪০), অগ্নি (১৩৪), প্রজাপতি (১০) ও মিত্রাবরুণ (৬) এর নাম করতে পারি। বৈদিক দেবগোষ্ঠীর মধ্যে ইন্দ্রের সর্বাধিক গুরুত্ব ছিল ব'লেই ঋগ্বেদের এক-চতুর্থাংশেরও বেশি মন্ত্রে তাঁর স্তুতি করা হয়েছে ; সামবেদেও যে এই গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল, তা মোটেই বিস্ময়ের ব্যাপার নয় ; কেননা সামবেদ ঋগ্বেদের প্রাচীনতর অংশকেই বিশেষভাবে অনুসরণ করেছে। দ্বিতীয়তঃ, সোমযাগের সঙ্গেই তার প্রাথমিক সম্পর্ক এবং ইন্দ্র সোমপায়ীদের মধ্যে প্রধান। পবমান সোম এবং অগ্নি যে গুরুত্বের দিক দিয়ে ইন্দ্রের নিকটতম অনুগামী তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যেহেতু সোমযাগে পবমান সোম প্রধান দেবতা আর অগ্নি স্বাভাবিকভাবেই যে কোনও যজ্ঞে প্রাধান্য পেয়ে থাকেন। লক্ষণীয় যে, ঋগ্বেদের কিছু কিছু প্রধান দে তা যেমন উষা, অশ্বীরা, সূর্য, পূষা ও সরস্বতী সামবেদে তাদের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছেন এবং অদিতি, সবিতা, ভগ, অংশ, দক্ষ অর্যমা, মার্তণ্ড, ইলা, ভারতী, পর্জন্য, রুদ্র, বাতাঃ যম ও বৃহস্পতি একেবারেই বর্জ্জিত। আবহ-মণ্ডলের দেবতা এবং অধিকাংশ সৌরদেবতাই অনুপস্থিত। এই তথ্যটি সম্ভবত চরিত্রগতভাবে সোমযাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেহেতু সোম এবং অগ্নি—এই উভয়েই ভূস্থান বা পৃথিবীনিবাসী দেবতা। অনুমান করা যায় যে, কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছুকাল পরেও একান্তভাবে পুরোহিতের পদ বংশগতভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে তাঁরা প্রাচীনতর সংক্ষিপ্ত সোমচর্যাকে বিস্তৃত করে ব্যাপকতর ও জটিলতর অনুষ্ঠানের সৃষ্টি করেন। তিনটি প্রধান যজ্ঞরীতি অর্থাৎ পশু, সোম ও ইষ্টির মধ্যে শুধু সোম ও ইষ্টিযাগে সাম-গান করা হ'ত ; পশুযাগে সামগানের কোনো রীতি ছিল না। যেহেতু পশুপালক জনগোষ্ঠীর পক্ষে পশুযাগই স্বাভাবিক, মনে হয় যে, এটাই ছিল যজ্ঞের প্রাচীনতম

রীতি। সেই সঙ্গে এ-ও প্রতীয়মান হয় যে সামবেদের মধ্যে যেহেতু ঋগ্বেদের দ্বিতীয় থেকে নবম মণ্ডল পর্যন্ত অংশের অস্তিত্ব প্রমাণিত, পরবর্তী দুই যজ্ঞ-রীতি যাতে সামগান গাওয়া হ'ত—তার প্রয়োজন অনুসারে সামবেদ সংকলিত হয়েছিল। ইষ্টিযাগ এরই কাছাকাছি সময়ে প্রাথমিকভাবে কৃষিজীবী জনসাধারণের নিজস্ব অনুষ্ঠান রূপে আবিষ্কৃত হয়েছিল। সোমযাগের সঙ্গে সামবেদের সম্পর্ক কিছুটা বিস্ময়কর। ইরানীয় 'হওম' অনুষ্ঠানের সাক্ষ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে সোমযাগের সুদীর্ঘ ইতিহাসের উৎস সুদূর অতীতে ইন্দো-ইরানীয় অধ্যায় অর্থাৎ অন্ততপক্ষে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে। তবে যতদিন পর্যন্ত আর্যগণ যাযাবর গোষ্ঠীজীবন যাপন করতেন ততদিন যজ্ঞ নিশ্চয়ই অত্যন্ত সরল, অসংস্কৃত, আদিম পর্যায়েই রয়ে গিয়েছিল। খুব সম্ভবত প্রত্নভারতীয় আর্যরা এমন সমস্ত অঞ্চল অতিক্রম করছিলেন সোম যেখানে খুবই পরিচিত ও সহজলভ্য ছিল। উত্তেজক, নেশাপ্রদ ও বিভ্রমউৎপাদক বৈশিষ্ট্যের জন্যই সম্ভবত এই পানীয় যুদ্ধরত আর্যদের নিকট খুবই প্রিয় হ'য়ে উঠেছিল। এই সোমের সঙ্গে যে ভীতি ও সম্ভ্রমের মনোভাব জড়িত রয়েছে, নিঃসন্দেহে এর মধ্যে নিহিত উন্মাদনা সৃষ্টির ক্ষমতাই এ জন্য দায়ী। কালক্রমে আর্যরা মূল ভারতীয় ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন করায় সেই পার্বত্য ভূমি থেকে অনেক দূরে তাঁরা উপস্থিত হলেন সোম যেখানে স্বাভাবিকভাবেই উৎপন্ন হ'ত। আনুষ্ঠানিকভাবে একজন শূদ্রকে যজ্ঞের প্রয়োজনে সোম সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করা হ'ত ; এতে মনে হয়, দুর্লভতার ফলে সোম অতিরিক্ত মর্যাদা লাভ করেছিল। পরবর্তী কালে সোম যে 'অতিথি' বিশেষণটি লাভ করে তাতেও এই তথ্য প্রচ্ছন্ন যে তৎকালীন আর্যাবর্তে সোম স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন হ'ত না। বহুদূর থেকে নিয়ে আসতে হ'ত ব'লেই সোম 'অতিথি' ও 'রাজা' বিশেষণে ভূষিত হয়। সোমপানজনিত আনন্দের প্রেরণায় সোমযাগ ক্রমশ প্রলম্বিত ও জটিলতর হয়ে শেষপর্যন্ত দ্বাদশবর্ষব্যাপী সত্রে পরিণত হয়। নির্দিষ্ট কিছু কিছু পুরোহিত পরিবার সোমযাগে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন ; অনুক্রমণী গ্রন্থ-সমূহের মতে কশ্যপ পরিবারভুক্ত ঋষিরা সর্বাধিকসংখ্যক সূক্ত সোমদেবের উদ্দেশে রচনা করেছিলেন। এছাড়া আমরা অঙ্গিরা (২৩টি সূক্ত), ভৃগু (১২) এবং কণ্ব-বংশীয় পুরোহিতদের কথাও রচয়িতার তালিকায় উল্লেখ করতে পারি। আরও অনুমান করা যায় যে কিছু কিছু পুরোহিত পরিবার বিশেষ কয়েকটি সুরে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন ব'লে সামগানের বিশেষ নামকরণ হয়েছে। যেমন বৃহৎ, রথন্তর, বৈরাজ, বৈরূপ, বৈখানস, বামদেব্য, যজ্ঞযজ্ঞীয়, শাক্বর, রৈবত, গায়ত্র, গৌরীবিত, অভিবর্ত, ক্রোশ, সত্রস্যর্ধি, প্রজাপতের্হৃদয়, শ্লোক, অনুশ্লোক, ভদ্র, রাজা, অর্কৎ, ইলান্দ, শ্বেত, নৌধস, রৌরব, যৌধজয়, অগ্নিষ্টোমীয়, ভাস, বিকর্ণ প্রভৃতি।

সামবেদের কিছু কিছু ঋষির নাম বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঃ মেধাতিথি, দেবাতিথি, উপস্তুত, বৃহদুক্থ, ত্রিমতি, সূক্তি, প্রগাথ, প্রিয়মেধ, নৃমেধ, প্রমেধ, সুমেধ, শোক,

সশোক, ত্রিশোক প্রভৃতি। এই নামগুলির অধিকাংশই সোমের সঙ্গে সম্পর্কিত বুদ্ধিমত্তা, প্রশংসা ও প্রতিভাদীপ্ত—এই বিশেষণগুলি অবলম্বন ক'রে গড়ে উঠেছে। প্রাচীনতম পারিবারিক মণ্ডলগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত কাণ্ব, গৌতম, মধুচ্ছন্দা, বামদেব, অত্রি ও ভরদ্বাজ প্রমুখ পরিচিত ঋষিদের নাম যেমন পাওয়া যায় তেমনি কিছু কিছু নাম স্পষ্টতই আর্যবৃত্তবহির্ভূত—ইরিমিরি, ইরিঞ্চি, ইরিমি. মিরি ও রিণু। সম্ভবত কোনো কোনো ঋষি পরিবার স্বতন্ত্রভাবে সংগীত রচনায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে সেই সব গানও সামবেদে সংকলিত হয়েছিল। এঁদের রচনার ইতিহাস যাই হোক, অন্তত একটি ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত যে, যজ্ঞানুষ্ঠানগুলি যখন পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠছিল, তখন পুরোহিতদের ভিন্ন ভিন্ন কার্যকলাপের অংশগুলি বিশেষ মর্যাদা অর্জন করেছিল এবং তার ফলে পুরোহিতদের প্রত্যেকটি শাখাই যথোপযুক্তভাবে বিশেষজ্ঞতা অর্জনের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। প্রাতিশাখ্য গ্রন্থসমূহ এবং ব্যাকরণের স্বরন্যাসবিষয়ক অধ্যায়গুলি এই তথ্য জানায় যে হোতা ও তার তিন সহকারী পুরোহিত স্বরবিন্যস্ত আবৃত্তির পদ্ধতি যত্নের সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ ক'রে পরবর্তী [illegible]কেও একই ভাবে প্রশিক্ষণ দিতেন। অনুরূপভাবে উদগাতা এবং তার তিন সহগায়ক—প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা এবং সুব্রহ্মণ্য—আনুষ্ঠানিক সংগীতের ঐতিহ্য নির্মান ক'রে তাকে সতর্কভাবে লালন করতেন। শুধু শিল্পকলার প্রয়োজনেই যত্ন ও দক্ষতা প্রদর্শিত হয় নি ; জীবিকার প্রয়োজনে পৃষ্ঠপোষকদের প্রশংসা অর্জনের জন্যও গায়কগণ পরস্পরের মধ্যে চারুতা ও দক্ষতা প্রদর্শনের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতেন। যেহেতু কিছু কিছু প্রধান ঋগ্বেদীয় দেবতার গুরুত্ব খর্ব হয়েছিল এবং কেউ কেউ সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে গিয়েছিলেন—বিষয়বস্তুরূপে দেবতাদের পূর্বগুরুত্ব আর বজায় ছিল না ; তার পরিবর্তে গায়ক পরিবারগুলি দ্বারা আবিষ্কৃত, অভ্যস্ত, পরিশীলিত, পরিবর্ধিত, বিশেষীকৃত এবং পরবর্তী প্রজন্মগুলিতে সঞ্চারিত [illegible]তিমূর্ছনার গ্রহণ ও বর্জনই মুখ্য গুরুত্ব লাভ করল।

ছন্দ ও ভাষা

সামবেদের ছন্দ ও ভাষার কিছু কিছু অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। সমালোচক ফ্যাডেগান লক্ষ্য করেছেন যে সামবেদের স্বরপদ্ধতি দৈনন্দিন জীবনের ভাষা থেকে বহুলাংশে পৃথক। আধুনিক পাঠক যখন ধর্মীয় ঐতিহ্যের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ওঠেন তখন উপভাষাগত বৈচিত্র্যের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি ইদানীং আকৃষ্ট হয়েছে। বহু শতাব্দী ধরেই ঋগ্বেদের বিপুল সম্ভার অবিশ্বাস্য যথার্থতার সঙ্গে শ্রুতি-শিক্ষণের মাধ্যমে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে হস্তান্তরিত হয়েছিল। অথচ সামবেদের গীতিপদ্ধতির সুরবিন্যাস ও মধ্যবর্তী বিরতি সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণভাবে অনিশ্চিত,

অজ্ঞ—কালের প্রবাহে এ স্বরন্যাস চরিত্রগতভাবে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছিল। সাধারণভাবে অবশ্য কাব্য-ছন্দের উপরই সাংগীতিক ছন্দ নির্ভর করে; তবে কিছু কিছু পার্থক্যও রয়েছে, কেননা গানের ছন্দে শুধুমাত্র দীর্ঘস্বর হ্রস্বস্বরের মধ্যেই পার্থক্য রয়েছে—দুটি স্বরবর্ণমধ্যবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের চরিত্র বা সংখ্যায় কোনও তাৎপর্য নেই। কথ্য বৈদিক ভাষা মূলত তিন প্রকার স্বরে বিন্যস্ত প্রযোজ্য এবং সেই সঙ্গে স্মৃতিতে বিধৃত স্তুতি ও প্রার্থনাগুলি মৃদুস্বরে পুনরাবৃত্তি করার জন্যও এই নিয়মই গ্রাহ্য। যেসব পুরোহিত মন্ত্র আবৃত্তি করতেন, একটি নির্দিষ্ট স্বরের বিন্যাসের মধ্যেই তাঁদের সীমাবদ্ধ থাকতে হ'ত ; কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত এই স্বরবিন্যাস পদ্ধতির সঙ্গে প্রাকৃতভাষার উচ্চারণরীতির বেশ কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য ছিল।

ধ্বনি ও স্বরগ্রাম

ঋগ্বেদের সূক্তগুলি হোতা ও তাঁর সহকারীরা তিন প্রকার শ্বাসাঘাত-সহ উচ্চস্বরে আবৃত্তি করতেন, সামবেদের সূক্তগুলি উদ্গাতা ও তাঁর সহায়করা বহুবিধ ভিন্ন ভিন্ন সুরে সংযোজিত হয়ে উচ্চস্বরে গীত হ'ত—তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে উপগাতাগণ কিছু একক একাক্ষর স্তোভের সঙ্গে যুক্ত ক'রে সেই গানে অংশ নিতেন। অন্যদিকে সংক্ষিপ্ত যজুঃসূক্তগুলি অধ্বর্যু ও তাঁর সহায়করা আনুষ্ঠানিক যজ্ঞকর্মের অঙ্গ হিসাবে উপাংশু রীতিতে অর্থাৎ মৃদুস্বরে, প্রায় গুণ্‌গুণ্ ক'রে করতেন। স্পষ্টতই তৎকালীন সমাজের কাছে কণ্ঠস্বর ও স্বরগ্রামের বৈচিত্র্য কিছু প্রতীকী তাৎপর্যে গৃহীত হ'ত। ঋগ্বেদের আবৃত্তিতে শ্বাসাঘাত ও স্বরগ্রাম সূক্তের বিষয়বস্তুতে কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নতুন গুরুত্ব যোগ করত এবং এভাবেই দৈনন্দিন জীবনের একমাত্রিক কথ্য ভাষার তুলনায় তার মধ্যে নতুনতর কিছু বৈশিষ্ট্য আরোপিত হয়েছিল। নিম্নগ্রামে উচ্চারিত ধ্বনির সূত্রগুলিতে স্পষ্টতই এক ধরনের ঐন্দ্রজালিক তাৎপর্য ছিল। তাছাড়া স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যজ্ঞে বিঘ্ন-উৎপাদনকারী হিংস্র দানব ও পিশাচরা অর্থাৎ আর্যদের শত্রু প্রাগার্যগোষ্ঠীর মানুষরা যজ্ঞভূমির নিকট বিচরণ করত ব'লেই মন্ত্রের কিছু কিছু অংশ দুর্বোধ্য ক'রে রাখারও প্রয়োজন ছিল। এ প্রয়োজন প্রাচীন যুগের সমস্ত ধর্মাচরণের মন্ত্রেরই ছিল যাতে পুরোহিতের গূঢ় জ্ঞানের সম্বন্ধে জনতা শ্রদ্ধাশীল থাকে। এভাবে আগত বৃহত্তর আর্যজনগোষ্ঠীর দর্শকদের কাছেও এইসব মন্ত্র গুপ্তই থেকে যেত যেহেতু এভাবেই তাদের বিশ্বাস উৎপাদন করা হ'ত যে, অনুষ্ঠান পরিচালক পুরোহিতদের কাছেই শুধু তাদের তাৎপর্য বোধগম্য। একদিকে প্রার্থী ও তার উদ্দিষ্ট দেবতা, এবং অন্যদিকে জাদুকর ও শক্তিশালী অতিজাগতিক শক্তিসমূহের মধ্যে বহু বিচিত্র পার্থিব আকাঙ্ক্ষাপূরণের প্রয়োজনে মন্ত্রের মাধ্যমে যেন গোপন যোগাযোগ গড়ে তুলত পুরোহিতরা। অধ্বর্যু প্রকৃতপক্ষে আদিম সমাজের জাদু-পুরোহিত বা শামানদের প্রধান

কার্যকলাপের উত্তরাধিকারী হিসাবে এইসব ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ; প্রাথমিক ধর্মীয় কার্যাবলীর কিছু অংশ অধ্বর্যু পরিশীলিত ক'রে বৈদিক অনুষ্ঠানের মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন। বাকি অংশ রয়ে গেল জনজীবনের জাদুকর, প্রাচীন অগ্নি-পূজক পুরোহিত অর্থাৎ অথর্বাদের কাছে এবং বহু পরবর্তীকাল পর্যন্ত বৈদিক বাঙ্ময়ে তার কোনো স্থান হয় নি। সংগীত বস্তুত বহুবিধ স্তরে যজ্ঞানুষ্ঠানে নূতন শক্তি যুক্ত করেছিল। নান্দনিক স্তর সম্পর্কে অবশ্য যথেষ্ট সংশয় রয়েছে ; কেননা আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না, সেই সুদূর অতীতে শব্দসমূহের জন্য অতিরিক্ত শক্তি জোগান দেওয়া ছাড়া সুরমূর্ছনার অন্য কোনো ভূমিকা ছিল কি না। বিখ্যাত সমালোচক সি. এম. বাওরা বলেছেন, 'অলৌকিক শক্তিগুলিকে প্রভাবিত করাই ধর্মীয় সংগীতের লক্ষ্য।' ইন্দ্রজালের মাধ্যমে তা পরোক্ষভাবে আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে কিংবা প্রত্যক্ষভাবে সূক্ত ও প্রার্থনার মাধ্যমেও সেটা করা যেতে পারে ; তবে উভয়ক্ষেত্রেই বাস্তব ফল লাভই তার অভীষ্ট। সঙ্গীত ইতিবাচক ও কার্যকরী ফললাভের জন্য উদ্দিষ্ট ব'লেই শিল্পকলাকে পরিশীলিত ক'রে উচ্চস্তরে উন্নীত করে, কেননা তা না হলে প্রার্থীর প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হলেও সংগীতের সম্মোহন তাকে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন থেকে দূরে নিয়ে যেতে পারে। বহির্জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করার আকাঙ্ক্ষা থেকে ঐন্দ্রজালিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে দেখা দেয়—শব্দ-সমবায়ের মাধ্যমে ঐ পার্থিব বা অতিলৌকিক জগৎকে আয়ত্তাধীন করতে হয় ব'লে অত্যন্ত অনন্যসাধারণ কোনো শক্তি দিয়ে শব্দকে অন্তর্দীপ্ত ক'রে তোলা জরুরি হয়ে পড়ে। এই 'অনন্যসাধারণ শক্তি'ই হল পবিত্র গীতির ঐন্দ্রজালিক উপাদান। আনুষ্ঠানিকভাবে সমগ্র সমাজকে স্বতঃসম্মোহিত করে ব'লেই এ ধরনের ধর্মীয় গীতির প্রকাশশৈলী ও গায়নরীতি লোকায়ত সংগীতের তুলনায় স্বরূপত ভিন্ন। ফিন্‌ল্যান্ডের জাতীয় মহাকাব্য কালেহ্বালার মধ্যেও অনুরূপভাবে সৃষ্টিশীল ইন্দ্রজাল পরিস্ফুট হয়েছে। সংগীতের সম্মোহনী শক্তির তাৎপর্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আমরা সামবেদের সঙ্গে সোমযাগের নিবিড় সম্পর্কের কথা স্মরণ করি ; এই সোমযাগে শামান বা জাদু-পুরোহিতসুলভ সম্মোহনী সংগীতের প্রয়োগ ছাড়াও সম্মোহন বা উন্মাদনার দ্বিতীয় সহায়করূপে সোমরস ব্যবহার করা হ'ত। পরিশীলিত, লোকায়ত সুরকে ঋগ্বেদীয় শব্দ-বিন্যাসে সন্নিবেশিত ক'রে যে ফলাফল পাওয়া গিয়েছিল, তাই সামগানরূপে পরিচিতি লাভ করে—উদ্গাতা ও তাঁর সহায়ক পুরোহিতগণ আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনে সেই সব সংগীত যজ্ঞকালে পরিবেশন করতেন। এদের মধ্যে শামান বা জাদু-পুরোহিত-সুলভ যে অর্থহীন চীৎকার রয়েছে, সেগুলি সম্ভবত অনুষ্ঠানে নিহিত ঐন্দ্রজালিক শক্তি উদ্‌বোধনের জন্য অনুষ্ঠানে একাত্ম হওয়ার মুহূর্তে সমগ্র সমবেত জনতা একসঙ্গে উচ্চারণ করত। এই সব চীৎকারকেই 'স্তোভ' বলা হ'ত ; এরা মুখ্যত দুই জাতীয়—পদ ও বাক্য। মূল পাঠে যা সন্নিবিষ্ট হ'ত, তা কখনও

ছিল বিচ্ছিন্ন পদ, কখনও বা সংক্ষিপ্ত বাক্য—সাধারণত দ্বিপদী শব্দ প্রযুক্ত হ'ত। যেমন ঃ হুব, হৌ, হোই, হোবি, হাবু প্রভৃতি। স্পষ্টতই শ্রোতৃবর্গের সমবেত যোগদান বিশেষ প্রশিক্ষণলব্ধ পরিশীলিত সংগীতের অংশে সম্ভব হ'ত না ; আনুষ্ঠানিক সংগীত যেহেতু ঐন্দ্রজালিক ভীতি ও আশঙ্কার সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই সাধারণ মানুষ জাদু-পুরোহিতদের কার্যকলাপের প্রত্ন-স্মৃতি দ্বারা তাড়িত হয়েই একই সুরে উচ্চ-গ্রামে চীৎকার করত। স্তোভের রহস্যময় উপাদান সম্পর্কে বিদেশী সমালোচকগণ কৌতূহলজনক মন্তব্য করেছেন। বস্তুত সামবেদের অধিকাংশ সংগীতের মূলে রয়েছে অতিলৌকিক উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য সুরমূর্ছনায় নিহিত ইন্দ্রজাল সম্পর্কে মানুষের স্বাভাবিক বিশ্বাস ও তার শক্তির উপর অন্ধ নির্ভরতা। প্রত্নকথাগুলি আবৃত্তি ক'রে ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি যা অর্জন করতে চাইত বা মহাকালের প্রেক্ষিতে পরিস্ফুট ঘটনাপ্রবাহের পার্থিব নবরূপায়ণের মাধ্যমে যজুর্বেদ যেখানে উপনীত হ'তে চাইত—সামবেদ সুরের ঐন্দ্রজালিক শক্তি দিয়ে তাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী ছিল।

সংগীত বিক্ষুব্ধ মনকে শান্ত করে—দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে এটা লক্ষ্য ক'রে প্রাচীন মানুষ তার মধ্যে রোগপ্রশমনের ক্ষমতা কল্পনা ক'রে নিয়েছিল। সামবেদে সংগীতের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানের সাফল্য সুনিশ্চিত করা অর্থাৎ যজ্ঞের ভিত্তিস্থানীয় প্রার্থনাসমূহের পূরণ—এদের লক্ষ্য হিসাবে অতিজাগতিক শক্তিসমূহের নির্বিঘ্ন সক্রিয়তা বা সমাজগোষ্ঠীর জয়লাভ, স্বাস্থ্য বা সমৃদ্ধি—যা-ই থাক না কেন। যজমানের উদ্দেশ্যকে বিঘ্নিত করার জন্য সক্রিয় বহুবিধ অপশক্তির মধ্যে রয়েছে শত্রু, দানব, ভূতপ্রেত ও পিশাচ। কতকটা তাদের এই অপশক্তিকে প্রতিরোধ করার জন্যই যেন সামবেদের স্তোত্রগীতি উদ্ভাবিত হয়েছিল। শুধু দেবতাদের সন্তুষ্ট করার জন্যই নয়, অশুভশক্তিকে পরাহত করার জন্য এবং আরও কিছু ঐন্দ্রজালিক উদ্দেশ্য উদ্গাতা অত্যন্ত রহস্যনিবিড় আঙ্গিকে আপন সঙ্গীতাংশ যজ্ঞকালে পরিবেশন করতেন। নির্দিষ্ট কিছু অক্ষরের পৌনঃপুনিক ব্যবহারে যে প্রত্ন-তান্ত্রিক গূঢ় বিদ্যার উপাদান রয়েছে, তার উৎস শামান বা জাদু-পুরোহিতের সৃষ্ট আনুষ্ঠানিক গীতির মধ্যেই নিহিত। এর সঙ্গে তুলনীয় অধ্বর্যু কর্তৃক ওম্, বট্, বেট্ বা বষট্-এর মতো অর্থহীন অক্ষর-প্রয়োগ, যাতে যজ্ঞানুষ্ঠান গোষ্ঠীবহির্ভূত ব্যক্তিদের নিকট রহস্যময় হয়ে ওঠে ; এতে সুচারুভাবে এই বিশ্বাসটিও প্রকাশিত হ'ত যে, যজ্ঞনিষ্পাদক পুরোহিত এবং অতিলৌকিক ক্ষমতার মধ্যে এমন এক নিগূঢ় দুর্জ্ঞেয় সম্বন্ধ রয়েছে যা অদীক্ষিতদের নিকট একান্তই অনধিগম্য।

লক্ষ্যণীয় যে, ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি 'যোনি' ব'লে অভিহিত হ'ত অর্থাৎ এই উৎস থেকেই সুরের জন্ম হয়েছিল। সম্ভবত এখানে এই ঐতিহাসিক তথ্য আভাসিত যে সুরে সংযোজিত হওয়ার বহু পূর্বে ঋগ্বেদের সূক্তগুলি আবৃত্তির প্রয়োজনে রচিত

হয়েছিল। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে উচ্চারিত শব্দের অতিলৌকিক শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রাধান্য পেয়েছে কেননা তা সৃজনশীল, অন্তর্গূঢ় শক্তিসম্পন্ন এবং 'নাস্তি'র গর্ভ থেকে তা অস্তিত্বের উৎপত্তি সূচিত করছে। সুর এই শব্দকেই সমুন্নীত ক'রে এমন এক রহস্য-নিবিড় উচ্চতায় স্থাপিত করত যে তা শ্রোতার কাছে বহুগুণে শক্তিসম্পন্ন ব'লে প্রতিপন্ন হ'ত।

সামবেদ ও সোমযাগ

সামবেদের অন্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সোমযাগের সঙ্গে তার সম্পর্ক। ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি যে, পূর্বার্চিকের দীর্ঘতম অংশ অগ্নি, ইন্দ্র ও পবমান সোমের প্রতি নিবেদিত তিনটি প্রধান অধ্যায় ; আর উত্তরার্চিকের কেন্দ্রস্থলে এই তিনজন দেবতাই বিরাজ করছেন। এঁদের মধ্যে অগ্নি, ধন ও গোসম্পদের ঐতিহ্যগত দাতা এবং দানব ও পিশাচের বিরুদ্ধে আর্য গোষ্ঠীগুলির রক্ষাকর্তা—সেই সঙ্গে তিনি যজ্ঞের ধারক বা দেবতাদের আহ্বানকারী ব'লেই যে কোনো যজ্ঞে সম্পূর্ণ অপরিহার্য। আক্রমণকারী আর্যবাহিনীর সেনাপতিরূপে যুদ্ধজয়ের গৌরবজনক নিদর্শনের অধিকারী ছিলেন ব'লেই ইন্দ্র আর্যদেবগোষ্ঠীর সর্বপ্রধান নেতা হিসাবে গণ্য হয়েছিলেন। কিন্তু সোমযাগে তাঁর এক স্বতন্ত্র ভূমিকা—সোমরসপায়ীদের প্রধান-রূপে তিনি যেন যজ্ঞকারী সোমপায়ী পুরোহিতদের দৈব প্রতিভূতে পরিণত হয়েছিলেন। অন্যভাবে বলা যায় যে, সোমযাগে তিনি প্রধান অতিথি এবং এইজন্য তাঁর প্রাধান্যও তর্কাতীত।

সোম একজন গুরুত্বপূর্ণ দেবতা। প্রাচীনতর পর্যায়ে সোমকে যজ্ঞের অন্যতম উপকরণরূপে নিছক উদ্ভিদ ব'লে মনে করা হ'ত ; কিন্তু পরবর্তীকালে সংঘটিত দৈবীকরণ প্রক্রিয়ার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। সোমযাগে মোট [illegible] ধরনের পুরোহিত সম্প্রদায় অংশগ্রহণ করতেন ঃ মন্ত্র আবৃত্তিকারী ঋগ্বেদীয় হোতা ও তাঁর সহকারীরা, সামগায়ক উদ্‌গাতা, আহুতি-প্রস্তুতিকারী পোতা, যজ্ঞাগ্নিতে সোমরস ও ঘৃত নিক্ষেপকারী নেষ্টা, সমগ্র যজ্ঞানুষ্ঠান পরিদর্শক ও পরিচালক ব্রহ্মা বা উপদ্রষ্টা এবং বজ্র অর্থাৎ পলাশকাষ্ঠে তৈরি দণ্ড হাতে যজ্ঞভূমির তোরণের কাছে দণ্ডায়মান রক্ষঃ। এইসব পুরোহিত যজমানের সঙ্গে একত্রে সোমযাগের কেন্দ্রে বিরাজ করতেন। বস্তুত সোমযাগ যত জটিল ও দীর্ঘায়ত হয়েছে, বিভিন্ন শ্রেণীর পুরোহিতের মধ্যে দায়িত্বভার বণ্টনও তত অনিবার্য হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে ঋগ্বেদের সোমমণ্ডল সঙ্কলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক ধর্মের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্বান্তরের সূচনা হয়। ক্রমশ সোম রাজকীয় ক্ষমতা ও পুরোহিত শ্রেণীর গুরুত্বের সঙ্গে প্রায় অবিচ্ছেদ্য হয়ে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়ে ওঠেন। এই সময় আর্যবসতিগুলিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ও সুসংগঠিত রাজকীয় ক্ষমতার ক্রমিক উত্থানেরও

সূচনা হয়। ফলে সোমযাগ ক্রমশ বহুধাব্যাপ্ত ও ব্যয়বহুল হতে শুরু করে ; বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুপ্রতিষ্ঠিত পুরোহিতসম্প্রদায় জটিল অনুষ্ঠানপ্রক্রিয়ার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। এর ঐতিহাসিক সময়সীমা সম্ভবত ৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। ইতোমধ্যে আক্রমণকারী আর্যরা প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত জয় করে ফেলেছিলেন ; কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়ে তাঁরা প্রাগার্য সিন্ধুসভ্যতার মানুষের কাছে ইঁটের বাড়ি তৈরি করতে শিখে নিয়েছিলেন। তাছাড়া আদি প্রাগার্য জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি থেকে কিছু কিছু চারুকলাও আয়ত্ত করে তাঁরা ধীরে ধীরে আর্যাবর্তের দক্ষিণ-পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে সেখানকার ভিন্ন ভিন্ন ভারতীয় জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসেছিলেন। কৃষিকার্য খুবই সহজসাধ্য, ভূমি উর্বরা ও সহজে কর্ষণযোগ্য হওয়ার ফলে আর্যরা অল্প আয়াসে সমৃদ্ধি অর্জন করতে পেরেছিলেন। তাদের উন্নতির অন্যান্য কারণের মধ্যে ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণে গোধন এবং ব্যাবিলন ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে নৌবাণিজ্যের পুনর্যোগস্থাপন যা সিন্ধুসভ্যতার সময় প্রচলিত থাকলেও আর্যদের বসতিবিস্তারের প্রথম পর্বে কিছুকালের জন্য বিপর্যস্ত হয়ে স্থগিত ছিল। এই সমস্ত কারণে আর্যদের দৈনন্দিন বাস্তবজীবন ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ায় তাঁদের সামাজিক অস্তিত্ব ও তজ্জনিত সামাজিক চেতনা আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেল। রাজনৈতিক দিক দিয়ে তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে উদীয়মান স্বতন্ত্র গোষ্ঠীপতিদের শাসন প্রবর্তিত হচ্ছিল এবং প্রত্যেক শাসকেরই কিছু নিজস্ব ধর্মীয় ও প্রশাসনিক কার্যবাহক ছিলেন। এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে, এইসব রাজন্যগণ সম্পূর্ণ শান্তি ও মৈত্রীর বাতাবরণে বাস করতেন। এই পর্যায়ে আমরা প্রায়ই যে রাজসূয় বা বাজপেয়, সৌত্রামণী ও অশ্বমেধ যজ্ঞের উল্লেখ দেখতে পাই, তা অভ্রান্তভাবে ইঙ্গিত করছে যে, তখন প্রতিবেশী শাসকদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবর্তে ছিল রক্তাক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কারণ প্রত্যেকেই তার প্রতিবেশীর রাজ্য অধিকার করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করত। তাই অসংখ্য গৌণ অনুষ্ঠানের নির্দেশ সেই সময়কার রচণাগুলিতে পাওয়া যায় যার মধ্যে সমৃদ্ধি ও রাজ্যবিস্তারে অভিলাষী শাসকদের জন্য পালনীয় বিধিসমূহ যেমন উল্লিখিত হয়েছে তেমনি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশীর জাদুবিদ্যাকে প্রতিহত করার জন্যও বিভিন্ন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। "রাজকর্মাণি" নামক রাজকীয় কর্তব্য-বিষয়ে অথর্ববেদের একটি বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজকীয় শত্রুর উপর প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য শাসকদের পক্ষে পালনীয় নির্দিষ্ট কিছু অনুষ্ঠান বর্ণিত হয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটেই সুনির্দিষ্ট পুরোহিত শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে—রাজপুরোহিতরা অমাত্যদের সঙ্গে রাজকীয় কার্যকলাপ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতেন। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, লোকায়ত বিষয়ে উপদেশদাতা ব্রাহ্মণ-বংশজাত অমাত্যদের সঙ্গে

আধ্যাত্মিক বিষয়ে উপদেষ্টা রাজপুরোহিতদের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ-খুব বিরল ছিল না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরোহিতরা যে জাগতিক বিষয়েও শাসককে সহায়তা করতেন, তার প্রমাণ রয়েছে শতপথ ব্রাহ্মণে, যেখানে রাজা বিদেঘমাথব তাঁর পুরোহিত অগ্নি-বহনকারী গৌতম রহুগণকে সঙ্গে নিয়ে প্রাচ্য দেশের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন, উদ্দেশ্য প্রাগার্য অধিবাসীদের বাসভূমি, ঊষর জমি ও আরণ্য অঞ্চল দগ্ধ ক'রে অধিকার করা। সন্দেহ নেই যে, পুরোহিত শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ তুলনামূলকভাবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অবস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যখন সমৃদ্ধতর সমাজের ধন রাজকোষগুলিতে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হচ্ছিল, সমুদ্রপথে বাণিজ্য ক্রমবর্ধিষ্ণু ছিল, সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে ক্রমাগত শাসক পরিবর্তন ঘটছিল এবং অধিক শক্তিশালী রাজন্যরা প্রতিবেশী ভূখণ্ডগুলির উপর অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ণ রাখতে সচেষ্ট ও সমর্থ ছিলেন—সেই সময়ে পুরোহিতশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের পক্ষে দীর্ঘায়ত ও সুবিস্তৃত যজ্ঞানুষ্ঠান পালন করার জন্য রাজন্যদের প্রভাবিত করা কিছুমাত্র কষ্টসাধ্য ছিল না। অজ্ঞাত বিপদের ভয়—বিশেষত বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও অন্তর্বিপ্লবের আশঙ্কা, অধিকতর সমৃদ্ধিলাভের আকাঙ্ক্ষা এবং নিরবচ্ছিন্ন নিরাপত্তার প্রত্যাশা—স্বভাবতই শাসকদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে বিবেচিত হ'ত ব'লে তাঁরা জটিল ও ব্যয়বহুল সোমযাগ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হতেন। স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, সোমযোগে যে বর্ণনা পাই তা থেকে এটা সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এটি অগ্নিহোত্র, চাতুর্মাস্য বা দর্শপূর্ণমাসের মতো একটি সহজে নিষ্পাদ্য স্বল্প ব্যয়ের যজ্ঞ নয়। এর জটিলতা, পুরোহিতবাহুল্য, আনুষঙ্গিক আড়ম্বর, দক্ষিণা ও যজ্ঞকর্মের ব্যয় এবং ব্যাপ্তি এমনই ছিল যে, অত্যন্ত ধনী রাজা বা রাজন্য ভিন্ন কেউই এ যজ্ঞ করতে পারতেন না। শাস্ত্রে দীর্ঘতম সত্র, সোমযাগ, দ্বাদশবর্ষ ধরে' অনুষ্ঠিত হ'ত ; প্রত্নলেখা অনুযায়ী সহস্রবৎসরব্যাপী সোমযাগেরও নির্দেশ আছে। এই সময় থেকেই সোমযাগ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞরূপে গণ্য হতে থাকে এবং সোম নিতান্ত উদ্ভিদ থেকে দেবতা এবং রক্ষক রূপে ব্রাহ্মণদের প্রতিরূপ হয়ে ওঠে। সোমমণ্ডল সংকলনের কাজও এ সময় শুরু হয়, যেহেতু বিষয়বস্তুরূপে সোমযাগের অবিসংবাদিত প্রাধান্য তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। সোমের উত্থান ও দৈবীকরণের সঙ্গে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসে ব্রাহ্মণদের উত্থান অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। ব্রাহ্মণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের আধিদৈবিক প্রতিরূপ রাজা সোমকে খুবই সুবিধাজনকভাবে জাগতিক শাসনের সীমার বাইরে স্থাপিত করা হ'ল। কারণ রাজসূয় যজ্ঞের সময়ে স্পষ্ট বলা হ'ত, রাজা প্রজাদের নিয়ন্তা, কিন্তু ব্রাহ্মণদের রাজা সোম ; অর্থাৎ শ্রেণীগতভাবে ব্রাহ্মণ পার্থিব রাজার ক্ষমতার সীমার বাইরে রইল, তাদের ওপর রাজার প্রত্যক্ষ আধিপত্য অস্বীকার করা হল। সোমের একটি বহু ব্যবহৃত বিশেষণ 'রাজা'।

সামবেদের খাদ্য, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনাই অধিক মাত্রায় পাওয়া যায়। সেই সময়ের প্রধানতম যজ্ঞানুষ্ঠান সোমযাগটি যেহেতু বহু অনুপুঙ্খযুক্ত ও বিপুল ব্যয়-সাধ্য ছিল, প্রচুর খাদ্যসামগ্রী তাতে ব্যবহৃত হ'ত। সেজন্যে যজ্ঞধর্মহীন আদিম অধিবাসীদের মধ্যে জীবিকাহীন ব্যক্তি লুণ্ঠনের জন্য প্রায় নিকটবর্তী অঞ্চলগুলি থেকে অতর্কিত আক্রমণ চালাত। তাই সেই সময়ের সূক্তগুলিতে অনেক বেশি পরিমাণে শত্রুতাপরায়ণ শক্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা রচিত হয়েছে। আবার ঐশ্বর্যের সঙ্গে একটু ভিন্ন ধরনের নিরাপত্তার অভাববোধও দেখা দিয়েছিল ; সেই সময়ে পৃথিবীর সর্বত্র সমুদ্র-বাণিজ্য বিঘ্ন-সংকুল ছিল, খরা ও বন্যায় শস্যের ফলন মাঝেমাঝেই ব্যাহত হ'ত, প্রাথমিকভাবে সমাজে যা ছিল শ্রমবিভাগ ইতোমধ্যে তা বংশাক্রমিক বর্ণবিভাগে পরিণত হ'ল, অভাবে ও সামাজিক বর্ণগত অবদমনে সমাজের নিম্নবর্গীয় জনতার মধ্যে অসন্তোষ ক্রমেই ধূমায়িত হয়ে উঠছিল। ফলে সমাজের উচ্চস্তরের পুরোহিত ও রাজন্যদের মধ্যে অনিশ্চয়তা ও সংস্কারাচ্ছন্ন ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। প্রধান ব্যয়বহুল শ্রৌত যজ্ঞগুলির উদ্ভাবন বৈদিক সমাজের জনসমূহকে স্পষ্ট দুটি ভাগে বিভক্ত ক'রে দিয়েছিল ঃ একদিকে ছিল যজ্ঞ-আবিষ্কারক ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত পৃষ্ঠপোষক ও পুরোহিতবর্গ, রাজা অমাত্য ও গোষ্ঠীপতিরা, রাজন্য ও অভিজাতবর্গ ; অন্যদিকে রয়ে গিয়েছিল সমাজের বিপুল জনতা যারা নিতান্ত গৌণ ও তুচ্ছ ভূমিকায় পরোক্ষভাবে হয়ত বা অধিকাংশই কেবলমাত্র নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা হয়ে দূর থেকে অনুষ্ঠানে যোগ দিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা অনুষ্ঠানের পক্ষে সর্বতোভাবে নিষ্প্রয়োজন, যেন বহিরাগত। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই সময়ে সোমচর্যা শীর্ষবিন্দুতে উপনীত হয়েছিল ; সোমযাগের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকার ফলে একদিকে সামবেদ প্রাধান্য অর্জন করল এবং অন্যদিকে শাসকগোষ্ঠী প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ-শ্রেণীভুক্ত রাজপুরোহিত ও অমাত্যদের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হতে থাকল। ঐশ্বর্যবান ও ক্ষমতাশালী রাজন্যরা যজ্ঞানুষ্ঠানের জাঁকজমক দেখানোর জন্য পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হতেন ব'লে পুরোহিতশ্রেণী দক্ষিণা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যাপারে বিস্তর দানদক্ষিণা পেয়ে প্রভূতভাবে লাভবান হতেন। সুতরাং তাঁদের সোৎসাহ প্রচেষ্টায় সোমচর্যা ও সামবেদ যেমন সর্বাধিক প্রাধান্য অর্জন করে, তেমনি উত্তেজক পানীয় সোমরসের ব্যবহারের ফলেও সোমযাগ পুরোহিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু একসময় এই সোমচর্যা যেমন চূড়ান্ত বিন্দুতে উপনীত হল তেমনি সোমবস্তুটি বিরল হয়ে যাওয়ায় এবং সেই সঙ্গে বিকল্পরূপে উপস্থাপিত অন্যান্য উদ্ভিজ্জগুলি উত্তেজক পানীয়রূপে আকাঙ্ক্ষিত ফলদানে অসমর্থ হওয়ায় সোমযাগের আবেদন ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে এল। তাছাড়া দীর্ঘস্থায়ী সোমযোগে এত বেশিসংখ্যক পশু নিহত হ'ত যে কিছুকাল

পরেই এই সম্পর্ক বেশ কিছু আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। বস্তুত, বহু অনুপুঙ্খযুক্ত ব্যাপ্তির আতিশয্য, জটিলতা ও অনুষ্ঠানের পৌনঃপুনিকতা থাকার ফলে সোমযাগের মধ্যেই যজ্ঞধর্মের ক্রমাগত অধোগতি সূচনা হয়েছিল। যদিও খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্পষ্টভাবে শ্রুতিগোচর হয় নি, আমরা সহজেই অনুমান করে নিতে পারি যে, সোমচর্যা ও সামবেদের চূড়ান্ত সিদ্ধির দিনেই ক্ষয়প্রক্রিয়ারও সূচনা হয়ে গিয়েছিল।

চন্দ্ররূপে সোম

ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের সাক্ষ্য অনুযায়ী নৌ-বাণিজ্য সে সময়ে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছিল এবং সেই সঙ্গে যে সমস্ত গ্রহ ও নক্ষত্র নাবিকদের সমুদ্রযাত্রাকে পরিচালিত করত— সেই সব গ্রহনক্ষত্র জনসাধারণের কাছে অতিরিক্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠল। ব্যাবিলন থেকে অর্জিত জ্যোতির্বিদ্যা ভারতীয়দের চিত্তলোকে সুদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করায় ভারতবর্ষে তার চর্চা শুরু হল এবং তারকাপুঞ্জকে বিভিন্ন দেবতার সঙ্গে সম্পর্কিত করে তোলা হল। সোমের দৈবীকরণ এবং আকাশের চন্দ্রের সঙ্গে তার একাত্মীকরণ এই প্রেক্ষিতেই বিবেচ্য। আর্যদের দেব-সঙ্ঘে বহু সৌর-দেবতা থাকলেও তখনও পর্যন্ত কোনো চান্দ্র দেবতা ছিল না, যা মধ্যপ্রাচ্যে সর্বত্রই ছিল। সোমকে চন্দ্ররূপে উপস্থাপিত করে এই শূন্যতা পূরণের চেষ্টা হল। তারকা-পরিবৃত চন্দ্র যেন সামন্ত অভিজাতবর্গ ও সভাসদ-পরিবেষ্টিত পার্থিব রাজারই দৈবপ্রতিরূপ হয়ে উঠল। তাছাড়া, পাত্রে ঢেলে দেওয়ার সময় ফেনিল শুভ্র সোমরসে শ্বেত শুভ্র চন্দ্রালোকের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা হ'ল। রাজা সোম ও উদ্ভিদ সোম আকাশ-বিহারী চন্দ্ররূপে নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত হ'ল।

সামবেদের উৎস

সামবেদের সূক্তসমূহের উৎস রহস্যাবৃত, যেহেতু তা পরিচিত ইতিহাসের সীমাকে অতিক্রম করেছে। প্রত্ন-প্রস্তর যুগের শেষ পর্যায়ে মানুষ গান গাইতে শিখেছিল। সমালোচক সি. এম. বাওরা বলেছেন যে, একদিকে নৃত্য থেকে গান সংগ্রহ করেছে ছন্দ এবং অন্যদিকে বাক্ থেকেও সংগীত ভাষাগত উপাদানে নিজেকে সৃষ্টি করেছে। সুর সন্নিবেশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যছন্দ গীতছন্দে রূপান্তরিত হ'ল ; শব্দ সন্নিবেশিত হওয়ার পরে অর্থহীন একাক্ষর-কেন্দ্রিক সুর পূর্ণ—বিকশিত গানে পরিণত হ'ল। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্বিংশতি শতাব্দীতে প্রথম নৃত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় ; কোনও-না-কোন-ভাবে গান নিশ্চয়ই নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ভূত হয়েছিল।

পরবর্তীকালে শামান বা জাদু-পুরোহিতরা অলৌকিক লক্ষ্য পূরণের জন্য গানের ব্যবহার করতেন। ধর্মীয় উদ্দেশ্যে গানের প্রয়োগ বহু প্রাচীনকালেই আরম্ভ হয়েছিল—ঐন্দ্রজালিক এবং জাদু-পুরোহিতসুলভ কার্যকলাপ কিংবা দেবতার প্রতি প্রার্থনারূপেও গান ব্যবহৃত হ'ত। গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাবনার অভিব্যক্তির প্রয়োজনে গানে লঘু-গতির ছন্দ বর্জন করা হ'ত ; তবে গোষ্ঠীগত সম্মোহনের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে পরিকল্পিত দ্রুতগতির ছন্দ প্রযুক্ত হ'ত যাতে এক ধরনের আবেশের সৃষ্টি হয়।

সমস্ত ধর্মীয় সংগীতের প্রাথমিক উৎস হ'ল সাধারণ লোকগীতি, গোষ্ঠীজীবনে যে সুর নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া তৈরি করে ; তবে এই সব সুর সূক্তে সন্নিবেশিত হওয়ার সময় অধিকতর ফলপ্রসূ হওয়ার প্রয়োজনে বহুলাংশে পরিমার্জিত হয়েছিল। সামবেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রৌতসূত্রগুলি বিশ্লেষণ করে আমরা বুঝতে পারি যে, বিভিন্ন চারণকবিদের পরিবারের নিজস্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী পরিমার্জনের প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন ও কালে কালে ক্রমশ জটিল হয়ে উঠেছিল। তবে, লোকগীতির সঙ্গে সম্পর্ক থাকার ফলে দূরে থেকে যারা নিষ্ক্রিয়ভাবে যজ্ঞে যোগ দিতে সমাজের সেই সব লোকের মনে গানের সুর নিশ্চিত একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত ; বিধিবদ্ধ স্বরভঙ্গি যখন পরিমার্জিত সুর ও আঙ্গিকগত সিদ্ধিসহযোগে নিরন্তর প্রচেষ্টায় ও পরিমার্জনে নান্দনিক স্তরে উন্নীত হয়ে শিল্পকুশলতা অর্জন করল, তখন পূর্বোক্ত সামাজিক প্রতিক্রিয়াকে বিষয়বস্তু ও পরিস্থিতি অনুযায়ী একটি, বিশেষ মহত্ত্বপূর্ণ পর্যায়ে তা উন্নীত করতে পেরেছিল। এই প্রক্রিয়া বহুকাল ধ'রে চলেছিল এবং ক্রমবর্ধমান সোমচর্যার সঙ্গে এর সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। সুতরাং, সামবেদ নিছক প্রাচীনতর বৈদিক চারণকবিদের স্বতঃস্ফূর্ত উন্মাদনার অভিব্যক্তি নয় ; নির্দিষ্ট রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্য থেকে উদ্ভূত ধর্মীয় চর্যার ফলশ্রুতি এই বেদ, এবং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত যজ্ঞানুষ্ঠান। ঋগ্বেদের সূক্ত সমাজকে বাচনিক প্রত্নকথা ও স্বতঃস্ফূর্তি যোগান দিয়েছিল, অন্যদিকে আদিম গীতি তাদের সামনে মূল সুরের কাঠামোটি উপস্থাপিত করেছিল। এই সব সূক্ত ও গীতি সোমচর্যার সঙ্গে সমন্বিত হয়ে যখন প্রত্নকথা, ধর্মচর্যা, সংগীত, ছন্দ, লয়, উত্তেজক পানীয় এবং তার আনুষঙ্গিক উন্মাদনা, ইচ্ছাপূরণের প্রত্যাশা ও সামাজিক কল্যাণের স্বকল্পিত ধারণার এক জটিল আবহ নির্মাণ করল, তখন মূলগত রূপান্তরের মাধ্যমে এই সব সূক্ত ও গীতি তাদের আদিম অসংস্কৃত উৎস থেকে গুণগতভাবে প্রায় সম্পূর্ণ পৃথক একটি অভিব্যক্তি লাভ করেছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

যজুর্বেদ সংহিতা

বস্তুগত সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে যজুর্বেদে প্রতিফলিত যে সমাজচিত্র তা ঋগ্বেদের সমাজচিত্র থেকে খুব বেশি ভিন্ন নয়। আর্যরা যখন নিজেদের বসতিতে সুস্থিত হয়ে যুদ্ধ ক'রে আশপাশের অঞ্চলগুলি অধিকার করতে শুরু করলেন এবং উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে ধীরে ধীরে কিছু কিছু পরিবর্তনের সূচনা হ'ল—গোষ্ঠীজীবন কিন্তু তখনও মূলত অপরিবর্তিতই রয়ে গেল। সিন্ধুসভ্যতা ধ্বংস হওয়ার সময়ে সাময়িকভাবে যে বাণিজ্যব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছিল, যজুর্বেদের সময়ে তা আবার আরম্ভ হ'ল। তামা, ব্রঞ্জ, সীসা, টিন এবং লোহাজাতীয় ধাতু দূরবর্তী অঞ্চল থেকে আনীত হয়ে আর্য-অধ্যুষিত সেই সব অঞ্চলে কাজে ব্যবহৃত হ'ত, সেগুলি উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব অভিমুখে এই বাণিজ্য পথের কাছাকাছি অবস্থিত ছিল। যজুর্বেদীয় সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু তখন স্পষ্টতই উত্তর-পশ্চিম ও পাঞ্জাব অঞ্চল থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকায় সরে গিয়েছিল। কৃষিব্যবস্থা তখন উন্নততর পর্যায়ে। দিনপঞ্জীর সাহায্যে মৌসুমি বৃষ্টিপাত তখন মোটামুটি অনেকটা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা যেত, ফলে উপযুক্ত ঋতুতে কৃষিকর্মের ব্যবস্থাপনা সম্ভবপর হয়েছিল। লোহার লাঙল তখনও পর্যন্ত প্রচলিত হয় নি, লম্বা বাঁটযুক্ত কোদাল বা কাঠের তৈরি আদিম পর্যায়ের লাঙল দিয়ে চাষ হ'ত ব'লে কৃষকের কঠোর পরিশ্রমের তুলনায় স্বল্প প[রিমা]ণ ফসলই উৎপন্ন হ'ত। সমস্ত অনুষ্ঠান এবং প্রার্থনায় যেহেতু শস্য, পশু ও ধনের প্রাচুর্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হ'ত। তাই সহজেই অনুমান করা চলে যে, তাদের মধ্যে খাদ্যলাভের অনিশ্চয়তা ও খাদ্যের স্বল্পতাই আভাসিত হয়েছে। রাজা ও গোষ্ঠীপতিদের শাসন ও অধিকার বিস্তৃত ছিল কিছু গ্রামপুঞ্জের ওপরে। গ্রাম শব্দটি যদিও প্রাথমিকভাবে বিচরণশীল পশুপালক গোষ্ঠীর সমবায়কেই সূচিত করত, যজুর্বেদে তার তাৎপর্য হ'ল, মোটামুটিভাবে সুনির্দিষ্ট জনবসতি। অর্থাৎ বীজ বপন ও ফসল সংগ্রহের মধ্যবর্তী মাসগুলিতে কোনো জনগোষ্ঠী যে নির্দিষ্ট অঞ্চলে বাস করত, তাই গ্রামরূপে পরিচিত ছিল—কেননা সেই সময়ের পরে ঐ জনগোষ্ঠী সমৃদ্ধতর কর্ষণযোগ্য ভূমির সন্ধানে পূর্বদেশের দিকে পুনরায় যাত্রা করত। কৃষির পরিপূরক রূপে খাদ্যসংগ্রহ, মৃগয়া ও গোপালনের দ্বারা সম্পদবৃদ্ধিও প্রচলিত ছিল। আচার-অনুষ্ঠান এবং পুরোহিতদের কার্যকলাপের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভাজন যদিও খাদ্য-

সরবরাহের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রাচুর্যের ইঙ্গিত বহন করছে, কিন্তু যর্জুবেদে সাধারণভাবে সমাজের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা সাধারণ মানুষের খাদ্য যোগানের ক্ষেত্রে বিরলতা ও অনিশ্চয়তারই প্রমাণ দেয়। তুলনামূলকভাবে সমাজের সমৃদ্ধতর অংশ যদিও বিবিধ কুটিরগত কারুশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করত তবুও দরিদ্রতর বৈশ্য, দেশিয় আদি কৃষক, পশুপালক, ক্ষুদ্র শিল্পী এবং শূদ্রদের জন্য খাদ্যের যোগান নিরতিশয় স্বল্প ছিল।

ঋগ্বেদের শেষ পর্যায়ে রচিত একটি মন্ত্রে যে জাতিভেদ উল্লিখিত হয়েছিল, যর্জুবেদে এসে সে জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত সত্য ; খাদ্য বণ্টন ও সম্পদ সংগ্রহে গুরুতর অসাম্য যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের গোড়াপত্তন করেছিল, যজুর্বেদে তা তর্কাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত ব'লে সমাজ ক্রমশ স্পষ্ট কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেল। শ্রেণীগত ভিন্নতার ফলেই সমাজের একটি বিশেষ অংশ পাদপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হ'ল যাদের শ্রেণী-স্বার্থ সাধারণ জনতার বৃত্ত থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে গেল। যজুর্বেদ রচনার অন্তিম পর্যায়ে এই প্রবণতা আনুষ্ঠানিক ধর্মগ্রন্থ রচনার সৃজনশীল পর্যায় অর্থাৎ প্রধান 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থসমূহ প্রণয়নের সঙ্গে সমান্তরালভাবে বিদ্যমান ছিল। তখন আমরা রাজা, বিজয়ী বীর, সম্পদশালী ব্যক্তি এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন পৃষ্ঠপোষকদের প্রয়োজনে বহু নূতন যজ্ঞানুষ্ঠান উদ্ভাসিত হতে দেখি। আবার এখানে আরও একবার প্রমাণিত হচ্ছে যে, সংখ্যাগত দিক দিয়ে সাধারণ জনতার সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ অর্থাৎ প্রাথমিক উৎপাদকরা ও ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পে ব্যাপৃত কারিগররা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নিষ্পেষিত। যখন মুষ্টিমেয় ক্ষমতাসম্পন্ন ও সম্পদশালী ব্যক্তির হাতে সামাজিক ধন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল সে সময়ে যজুর্বেদের অনুষ্ঠানগুলি বহুধা বিভাজিত ও বর্ধিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের অধিকাংশই অতি তুচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে সেই খাদ্য-বিরলতার দিনগুলিতে নিজেদের শ্রম বিক্রয় করতে বাধ্য হ'ত ব'লে তারা ক্রমশ অতিদরিদ্র নিঃসম্বল জনতায় পরিণত হচ্ছিল। সার্বিক বিশ্লেষণে আমরা লক্ষ্য করি যে, পরবর্তী বৈদিক যুগের সমাজ ও সাহিত্য পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় মূলগতভাবেই ভিন্ন, কেননা অর্থনৈতিক অন্তর্বিন্যাস ও সাংস্কৃতিক উর্ধ্ববিন্যাস—দুটোই প্রাথমিক বৈদিক যুগ থেকেই চরিত্রগতভাবে পৃথক্ হয়ে পড়েছিল।

সায়ণাচার্য যে ঋগ্বেদের আগেই যজুর্বেদের ভাষ্য রচনা করেছিলেন, তার কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন যে, যজ্ঞে যজুর্বেদের গুরুত্বই সর্বাধিক। ঋগ্বেদের পুরোহিত হোতা যেখানে ঋগ্বেদের মন্ত্র আবৃত্তি করতেন এবং সামবেদের পুরোহিত উদ্‌গাতা সামগান করতেন, সেখানে যজুর্বেদের পুরোহিত অধ্বর্যু প্রকৃতপক্ষে অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন এবং সেই সঙ্গে নির্দিষ্ট কিছু মন্ত্রও উপাংশু স্বরে উচ্চারণ করতেন।

যজুর্বেদ-সংহিতা দুটি স্পষ্ট শাখায় বিভক্ত—শুক্ল ও কৃষ্ণ। অনুষ্ঠান পরিচালনার সময় যজুর্বেদের পুরোহিত যে সমস্ত মন্ত্র উচ্চারণ করতেন, শুক্ল যজুর্বেদে শুধু সেইগুলিই পাওয়া যায়। তাই শুক্ল যজুর্বেদের 'ব্রাহ্মণ'সমূহ স্বতন্ত্র রচনারূপে প্রতিষ্ঠিত হলেও কৃষ্ণ যজুর্বেদের 'ব্রাহ্মণ'গুলি প্রকৃতপক্ষে পরবর্তীকালে গ্রথিত, গদ্যে রচিত নির্দেশমালা ও ব্যাখ্যাসমূহের ধারাবাহিক সংযোজন। কৃষ্ণ-যজুর্বেদে অনুষ্ঠানের বর্ণনা ও তার বিধিবদ্ধ ব্যাখ্যার সঙ্গে যজ্ঞানুষ্ঠানের সূত্রগুলিও রয়েছে। মন্ত্র-বহির্ভূত অন্যান্য অংশে গদ্যে রচিত এবং ব্রাহ্মণ-গ্রন্থসমূহের পূর্বগামী।

শুক্ল যজুর্বেদের একমাত্র সাহিত্যকর্ম বাজসনেয়ী-সংহিতাটি দুটি শাখায় ঈষৎ ভিন্ন পাঠে পাওয়া যায়—কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন ; এই বিভাজন 'ব্রাহ্মণ'-গ্রন্থগুলির মধ্যেও রয়েছে। অবশ্য শুক্ল যজুর্বেদ প্রাতিশাখ্য এই দুটি ভাগকেই একসঙ্গে উল্লেখ করেছে। আলোচ্য শাখা দুটির মধ্যে কাণ্বই প্রাচীনতর। দুটি শাখার মধ্যে পাঠগত ভিন্নতার মূল কারণ ভৌগোলিক ; যখন এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে এই শ্রুতি-সাহিত্য মৌখিকভাবে সম্প্রাবিত হত, স্থানগত ভিন্নতায় স্বাভাবিকভাবেই পাঠও ভিন্ন হয়ে পড়ছিল। মাধ্যন্দিন শাখায় বাজসনেয়ী সংহিতা মোট ৪০টি অধ্যায়, ৩০৮ অনুবাক্ ও ১৯৭৫ কণ্ডিকায় বিভক্ত। প্রথম ২৫টি অধ্যায়ে সাধারণভাবে প্রচলিত যে সব যজ্ঞের অনুষ্ঠানবিধি সূত্রবদ্ধ হয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছে—দর্শপূর্ণমাস (১-২), অগ্নিহোত্র অর্থাৎ প্রাতঃকালীন ও সায়ংকালীন সংক্ষিপ্ত যজ্ঞানুষ্ঠান (৩), সাধারণ সোমযাগ (৪-৭),, সোমযাগের দুটি বিশেষ ধনন (৯-১০), যজ্ঞবেদী নির্মাণ ও যজ্ঞাগ্নিসমূহের আধান (১১-১৮), সৌত্রামণী যাগ, ইন্দ্রের প্রতি নিবেদিত বিশেষ কিছু কিছু অনুষ্ঠান ও প্রায়শ্চিত্তের নানা যাজ্ঞিক অনুষ্ঠানবিধির বিবরণ (১৯-২১) এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের আনুষ্ঠানিক বিবৃতি (২২-২৫)। এদের মধ্যে প্রথম আঠারোটি অধ্যায় পরবর্তী সাতটি অধ্যায়ের তুলনায় প্রাচীনতর। সংহিতার দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ ২৬-৩৫তম অধ্যায় পরবর্তীকালে সংযোজিত ; তাই ভাষ্যকার মহীধর এই অংশকে 'খিল' ব'লে অভিহিত করেছেন। শেষ পাঁচটি অধ্যায় অর্থাৎ ৩৬-৪০ অধ্যায়সমূহে পুরুষমেধ, সর্বমেধ, পিতৃমেধ ও পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত প্রবর্গ্য যজ্ঞের বিধি সূত্রবদ্ধ হয়েছে। এই সমস্ত অধ্যায়ের কোনো কোনো অংশ স্পষ্টতই দার্শনিক ব্যঞ্জনাগর্ভ ; যেমন শতরুদ্রীয় নামক রুদ্রদেবের প্রতি নিবেদিত বিখ্যাত সূক্তটি (১৬শ অধ্যায়) ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্ত (৩১তম অধ্যায়) এবং 'তদেব' সূক্ত (৩২তম অধ্যায়)। এছাড়া ৩৪তম অধ্যায়ে 'শিবসংকল্প' নামক সুপরিচিত সূক্তটিতে নতুন এক ধরনের দেববাদী ভাবনার উন্মেষ ঘটেছে। সংহিতার শেষ অধ্যায়টিই (৪০) ঈশোপনিষদ।

শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনে যজ্ঞবিধি সম্পর্কিত রচনারূপে কৃষ্ণ-যজুর্বেদ সংকলিত হওয়ার ফলে তাতে বহু শাখার বিকাশ ঘটেছে ; কখনও অঞ্চল এবং

কখনও পরিবারভেদে এই সংহিতায় পাঠগত ভিন্নতা দেখা দিয়েছে। এদের মধ্যে অন্তত পাঁচটি বা ছয়টি শাখার স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে—তৈত্তিরীয়, কাঠক, আত্রেয়, হরিদ্রাবিক, মানব এবং মৈত্রায়ণীয়। এদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তৈত্তিরীয় শাখা আপস্তম্ব ও বৌধায়নের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ; মধ্যদেশে তার উৎপত্তি হয়েছিল।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাজসনেয়ী শাখা উত্তর পূর্ব কাশ্মীরে এবং কাঠক ও কপিষ্ঠল পাঞ্জাবে, মৈত্রায়ণীয় গুজরাট, বিন্ধ্য পর্বত ও নর্মদা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে এবং মানবশাখা ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে উদ্ভূত হয়েছিল ব'লে অনুমান করা হয়।

কাঠক ও কপিষ্ঠল সংহিতা চারায়ণীয় (সাধারণভাবে চরকের সঙ্গে সম্পর্কিত) শাখার অন্তর্ভুক্ত। এই পাঠ বিশ্লেষণ ক'রে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, এটি কৃষ্ণ ও শুক্ল যজুর্বেদের মধ্যে কিছুটা সমন্বয় করতে চেয়েছে। স্বভাবত স্বতন্ত্র এই পাঠ মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত ; প্রথম তিনটি অধ্যায় আবার চল্লিশটি স্থানক বা উপবিভাগে বিভক্ত। চতুর্থ অধ্যায়টি বিভিন্ন ধরনের যে সমস্ত সম্পদের বিবরণ দিয়েছে, সে সব মূলত তাৎপর্যহীন। পঞ্চম বা শেষ অধ্যায়টি অশ্বমেধ যজ্ঞের বিবরণ দিয়েছে।

আত্রেয়-সংহিতা মোটামুটিভাবে তৈত্তিরীয় শাখারই ভিন্ন পাঠ ; এতে কয়েকটি কাণ্ড রয়েছে—প্রত্যেকটি কাণ্ড কয়েকটি 'প্রশ্নে' এবং প্রত্যেকটি 'প্রশ্ন' কয়েকটি অনুবাকে বিন্যস্ত। মৈত্রায়ণীয় বা কলাপ শাখার পাঠ হরিদ্রাবিক ব'লে অভিহিত। যাস্কাচার্য যজুর্বেদের ব্রাহ্মণরূপে একমাত্র মৈত্রায়ণীয় শাখারই উল্লেখ করেছিলেন, এতে মনে হয় তিনিই যজুর্বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণগুলিকে সুবিন্যস্ত ক'রে চূড়ান্ত রূপ দিয়েছিলেন।

রচনাকাল

'কাণ্ডনুক্রমণ' গ্রন্থে আমরা একটি সময়ানুক্রমণীর সন্ধান পাই, তবে তা তথ্যভিত্তিক কি না সে সম্পর্কে কোনো নিশ্চয়তা নেই। এতে কথিত হয়েছে, বৈশম্পায়ন যজুর্বেদীয় শ্রৌত ঐতিহ্যের সূত্রপাত করেছিলেন ; পরে ঐ ঐতিহ্য যথাক্রমে যাস্ক, পৈঙ্গী, তিত্তিরি, উখ ও আত্রেয়ের নিকট উপনীত হয়। সমালোচক কীথ্ ব্যাকরণগত প্রয়োগগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ক'রে প্রমাণ করেছেন যে, যজুর্বেদ সংহিতা ও ঋগ্বেদ একই ভাবাগত স্তর ও কালগত পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে মনে হয় যে, সমগ্রভাবে ঋগ্বেদের তুলনায় যজুর্বেদ সামান্য পরবর্তীকালের রচনা। যদিও ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল ও প্রথম মণ্ডলের প্রথমাংশ সম্ভবত যর্জুবেদ সংকলনের সমকালীন।

তৈত্তিরীয় সংহিতার পাঠ যেহেতু সবচেয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সর্বজনপরিচিত, তাই তাকে বিশ্লেষণ করে আমরা যজুর্বেদের বিষয়বস্তু ও চরিত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা করতে পারি। পাঁচটি কাণ্ডের রচয়িতা রূপে যথাক্রমে প্রজাপতি, সোম, অগ্নি, বিশ্বেদেবাঃ এবং স্বয়ম্ভুর নাম উল্লিখিত হয়েছে। এদের মধ্যে পরবর্তী কালের দুজন দেবতা—প্রজাপতি ও স্বয়ম্ভুর উল্লেখ থাকায় একথাই প্রতিপন্ন হচ্ছে যে, এই সংহিতা অনেক পরেই রচিত হয়েছে। বিভিন্ন কাণ্ডে বিন্যস্ত বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করে আমরা অত্যন্ত অপটু সম্পাদনার নিদর্শন পাই। বিভিন্ন যজ্ঞ ও অনুষ্ঠানের বর্ণনা এতই অসংলগ্নভাবে পাঠে নিবেশিত হয়েছে যে, কোথাও কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা সুশৃঙ্খল বিন্যাসের পরিচয় পাওয়া যায় না।

বিষয়বস্তু

যর্জুবেদ-সংহিতা সাধারণভাবে প্রধান সামূহিক যজ্ঞ অর্থাৎ শ্রৌতযাগগুলির বিবরণ দিয়েছে · তবে, এছাড়াও এতে সামাজিক উৎপাদন ও গার্হস্থ্য আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কিত বিবরণও কিছু রয়েছে। সংহিতার দুই-তৃতীয়াংশ সুনির্দিষ্ট যজুর্বেদীয় মন্ত্রের উদাহরণ ; অবশিষ্ট অংশের প্রায় অর্ধেক প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণত বা আংশিকভাবে ঋগ্বেদ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। তবে, ঋগ্বেদের বিন্যাসক্রম সেখানে অনুসৃত হয় নি, বিশৃঙ্খলভাবে মন্ত্রগুলি একত্র সংকলিত হয়েছে মাত্র। উল্লেখ্য যে, কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতা এবং শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতায় ঋগ্বেদের উদ্ধৃতিগুলি বিশুদ্ধতমভাবে সংরক্ষিত হলেও মৈত্রায়ণী এবং কাঠক-কপিষ্ঠল সংহিতায় কিন্তু এক ধরনের উদ্বৃতি যথেচ্ছভাবে পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে। কখনও কখনও ঋগ্বেদ-সংহিতাকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করা হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক প্রসঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবেই সেই সব মন্ত্রাংশকে পরিবর্তিত করা হয়েছে। স্পষ্টতই সংহিতা-রচনার সৃজনশীল পর্যায় শেষ হয়ে যাওয়ার পরও যখন নূতন নূতন যজ্ঞানুষ্ঠান আবিষ্কৃত হচ্ছিল, তখন আবৃত্তি বা গানের জন্য নূতন সংহিতার যোগান দেওয়া সম্ভবপর ছিল না। তাই পূর্ব-প্রযুক্ত প্রাচীনতর উপাদান এই সব নবোদ্ভাবিত যজ্ঞের ক্ষেত্রে পুনরায় ব্যবহৃত হতে লাগল, কখনও কখনও প্রসঙ্গের সঙ্গে তার সম্পর্কও আর রইল না। ফলে, এই পর্যায়ে সংহিতার পাঠ ও প্রয়োগের মধ্যে প্রচুর অসামঞ্জস্য দেখা দিয়েছে।

যজুর্বেদ-সংহিতায় নিম্নোক্ত যজ্ঞসমূহ বিবৃত হয়েছে—দর্শপূর্ণমাস, হবির্যজ্ঞ, পশুযাগ, বাজপেয়, রাজসূয়, দীক্ষণীয়েষ্টি, সোমযাগ, সৌত্রামণী, প্রবর্গ্য, অগ্নিচয়ন, অশ্বমেধ ও পুরুষমেধ। এদের মধ্যে অধিকাংশই আর্যদের ভারতভূমিতে বসতি স্থাপনের পরবর্তীকালে পরিকল্পিত হয়েছিল বলে এতে বহুতর পুরোহিতের অংশগ্রহণের

অবকাশ আছে। পরিশীলিত সূক্ষ্মতা এবং সীমাহীন প্রায়োগিক জটিলতাও তাই এগ্রন্থে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। যজুর্বেদ সংহিতা রচনার পশ্চাতে সক্রিয় প্রেরণা সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই ; যজ্ঞের সংখ্যা যখন বহুগুণ বর্ধিত হ'ল তখন আনুষ্ঠানিক অনুপুঙ্খগুলির বিস্তার অনিবার্য হয়ে উঠল যাতে তৎকালীন নির্দিষ্ট সামাজিক পরিস্থিতিতে এরা শুধু গ্রহণযোগ্যই নয়, অবশ্যপালনীয়ও হয়ে উঠে। আবার কাহিনী বা বিবৃতিমূলক সূক্তগুলি স্পষ্টতই সংহিতা সম্পর্কে আমাদের ধারণার সঙ্গে মেলে না। বস্তুতঃ, কৃষ্ণ-যজুর্বেদ এজন্যই অনন্য কেননা অন্য তিনটি সংহিতায় প্রার্থনা ও প্রশস্তিবাচক মন্ত্র থাকলেও কৃষ্ণ-যজুর্বেদে আমরা প্রথম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের নিকট যজ্ঞের তাৎপর্য ঠিক কি এবং কেন সেগুলি অনুষ্ঠেয় তার ইঙ্গিত পাই। ফলে, আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর বিচারে কৃষ্ণ-যজুর্বেদ স্পষ্টতই ব্রাহ্মণ-গ্রন্থসমূহের পূর্বগামী।

অনুষ্ঠান চর্যা

যজুর্বেদে বর্ণিত যজ্ঞগুলির মধ্যে অশ্বমেধ, অগ্নিচয়ন ও সোমযাগ সবচেয়ে দীর্ঘকাল ব্যাপী যজ্ঞ। লক্ষণীয় যে, সম্পাদনার প্রক্রিয়ার যে বিবরণ যজুর্বেদে পাই তা রচনার দিক থেকে কতকটা শিথিল। অশ্বমেধের বিবৃতিতে অন্তত দুবার ছেদ পড়েছে। একটানা বিবৃতির পরিবর্তে কখনও আপ্রীসূক্ত, কখনও বা 'অশ্ব'শব্দের প্রত্ন-পৌরাণিক ব্যাখ্যা, কখনও বা সোমযাগ, কখনও বা যজ্ঞের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রভৃতি যথেচ্ছ যজ্ঞপ্রক্রিয়ার বিবরণের মধ্যেই সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে বিচিত্র অর্থযুক্ত বহুবিধ মন্ত্রের বর্ণনা। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : আপ্তি, পর্যাপ্তি, অভূ, অনুভূ, অপাব্য, যব্যহোম, সন্ততিহোম, প্রসুক্তিহোম, অন্নহোম, শারীরহোম ইত্যাদি।

স্পষ্টতই যজুর্বেদে যে প্রবণতাকে আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই, তা হ'ল যজ্ঞকে ক্রমশ জটিলতর, ব্যাপকতর, অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনাযুক্ত ও গূঢ়ার্থবহ ক'রে তোলার প্রবণতা। অশ্বমেধের সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ : কোনও ক্ষমতাশালী স্থানীয় গোষ্ঠীপতি ধীরে ধীরে রাজার পদবীতে সার্বভোম সম্রাটের পর্যায়ে উন্নীত হয়ে তবেই অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করতেন। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যজমানের, রাজাটির দুর্বলতর প্রতিবেশী এবং শত্রুগণের ওপরে আধিপত্য আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি পেত। মূল যজ্ঞের বর্ণনা যে বারবারই অগ্নিচয়ন ও সোমযাগের মতো সুস্পষ্ট ব্রাহ্মণ্য-ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দ্বারা বিঘ্নিত হয়েছে, এতেই পুরোহিত শ্রেণীর বিশেষ গুরুত্ব অভিব্যক্ত। অশ্বের বিভিন্ন প্রতিশব্দের মধ্যে সম্ভবত বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত বিচিত্র ধরনের, অনুষ্ঠানগুলির সমন্বয় প্রচেষ্টা আভাসিত হয়েছে। অনুরূপভাবে সংখ্যার, আঙ্গিকের ও বর্ণের রহস্যময় ব্যাখ্যার দ্বারা বিভিন্ন দেশের প্রচলিত নিগূঢ় প্রক্রিয়ার প্রতীকগুলিকে যজ্ঞের দ্বারা ব্যাখ্যা ক'রে যজ্ঞকে

গূঢ় ব্যঞ্জনা দেওয়ার চেষ্টা স্পষ্টতই প্রতীয়মান। এই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের উর্বরতা-চর্যা ও আঞ্চলিক উৎসব এবং প্রহেলিকাপূর্ণ গূঢ় বিদ্যার সংযোগে অশ্বমেধযজ্ঞ সর্বতোভাবে মূল বিশ্ব-প্রক্রিয়ার গ্রন্থিল প্রতীকী অভিব্যক্তি অর্জন করতে চেয়েছে। অগ্নিচয়ন অনুষ্ঠানে প্রচুর প্রত্নপৌরাণিক উপাদান রয়েছে, যার অধিকাংশই দুরধিগম্য, গূঢ়ার্থবহ ও অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনাময়—সংস্কৃতির অপরিশীলিত আদিমতর কোনও অধ্যায়ের স্মৃতি তার মধ্যে নিহিত। বস্তুত, এই অনুষ্ঠানে আদিমতম ও নবীনতম এবং এ উভয়ের অন্তবর্তী নানা পর্যায়ের কৃষ্টি ও চিন্তার বিচিত্র সহাবস্থান ঘটেছে। মনে হয়, ভারতভূমিতে নবাগত আর্যজাতির প্রতীকী প্রতিষ্ঠা যজ্ঞের বিভিন্ন অনুপুঙ্খের মধ্য দিয়ে স্বীকৃতি অর্জন করতে প্রয়াসী হয়েছিল। বহুস্তরে বিন্যস্ত, দীর্ঘকালব্যাপী জটিল যজ্ঞপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে আর্যদের কঠোর ও দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম অভিব্যক্ত। অগ্নিচয়নে বেদী নির্মাণকালে ইঁটের জটিল বিন্যাসের মধ্যে নিবেশিত তিনটি মৌলিক প্রতীক—পদ্মপত্র, ভেক ও স্বর্ণনির্মিত মানব-মূর্তি—সম্ভবত ভারতবর্ষের স্থল ও জলভূমির উপর আর্যদের প্রভূত্বেরই দ্যোতক। কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীর পক্ষে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বস্তু যে বৃষ্টিপাত, তার প্রতীক যেমন পদ্মপত্র ও ভেক, তেমনি স্বর্ণমানব একদিক দিয়ে সূর্য ও অন্যদিক দিয়ে কর্ষণরত মানুষের প্রতীক। আমরা জানি যে, সোনার তৈরি একটি থালা সূর্যাস্তের পর যজ্ঞীয় জলকলসের উপরে ঢাকা থাকত ; এটি সূর্যের প্রতীকরূপে পরিগণিত হ'ত। অর্থাৎ মূলত স্বর্ণ উর্বরতাচর্যারই একটি মৌলিক প্রতীক।

দ্বাদশ-বর্ষব্যাপী যে সোমযাগ, সত্র, তা স্পষ্টতই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ; তৈত্তিরীয়-সংহিতায় অশ্বমেধ যজ্ঞের অংশ হওয়া ছাড়াও ষষ্ঠ ও অষ্টম কাণ্ডে এই যজ্ঞটিই প্রধান বিষয়বস্তু। সোমের প্রকৃত পরিচয় নিয়ে যদিও বিতর্ক রয়েছে, তবু এটা অন্তত স্পষ্ট যে, সোমরসের উত্তেজক গুণের জন্য সোমযাগ একাহ যজ্ঞ থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে কালের ব্যাপ্তিতে বাড়তে বাড়তে (দ্বাদশাহ, বর্ষব্যাপী গবাময়ন সত্র) শেষ পর্যন্ত দ্বাদশবর্ষব্যাপী দীর্ঘস্থায়ী অনুষ্ঠান সত্রে পরিণত হয়েছিল। দীর্ঘকালব্যাপী সোমপানের অভ্যাস মত্ততা ও আতিশয্য আনে। সোম যখন দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছিল তখন শেষপর্যন্ত মূল সোমের পরিবর্তে ভিন্ন জাতীয় বিকল্প নানা উদ্ভিজ্জ ব্যবহারের নির্দেশ অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু এইসব উদ্ভিজ্জের যেহেতু কোনও মাদকতা ছিল না, তাই বহু অনুপুঙ্খযুক্ত সোমযাগের অনুষ্ঠান ক্রমে নিষ্প্রভ হয়ে, ক্রমশ জনপ্রিয়তা হারিয়ে ধীরে ধীরে বাহুল্যে পর্যবসিত হয়ে গেল। সোমকে যেহেতু বারবার 'রাজা' ও 'অতিথি' বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে, এতে মনে হয় যে, অবচেতনায় বহিরাগত আর্যদের শাসকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভই এই অভিধাগুলির মধ্যে নিহিত ছিল। সঙ্গীত ও নৃত্য-মুখর আনন্দ উৎসবে বহু দেবতার প্রতি নানাভাবে পানীয় নিবেদন বিজয়োৎসবের চিত্রকে সম্পূর্ণতা দিয়েছে। সোম সম্ভবত অনার্য জনগোষ্ঠী দ্বারা অতিযত্নে সুরক্ষিত

ছিল ; আর্যরা যে প্রবঞ্চনার দ্বারা তা সংগ্রহ করতেন তার ইঙ্গিত রয়েছে একটি বিশেষ প্রত্নকথায়—গন্ধর্বদের দ্বারা সুরক্ষিত সোমকে বিষ্ণু, চাতুর্যের দ্বারা সংগ্রহ করেছিলেন।

রুদ্রকে সোমযাগের অংশভাগী করা হয় নি, কারণ তাঁর কল্পনার সঙ্গে স্বভাবত ভয় ও অমঙ্গলের নানা অনুষঙ্গ সম্পৃক্ত ছিল। ঋগ্বেদের প্রধান দেবতা অগ্নি এই যজ্ঞের বিশেষ প্রকৃতির জন্যই অপেক্ষাকৃত স্বল্প গুরুত্বের অধিকারী। পরবর্তী সাহিত্যে অশ্বীরা সোমরসের অংশ লাভে বঞ্চিত হলেও এখানে তিনটি সবনেই তাঁদেরকে প্রাপ্য হব্যের সোমরসে অংশ দেওয়া হয়েছে। প্রাতঃসবনটিই সম্ভবত আদি ও মৌলিক অনুষ্ঠান, যেহেতু ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রাচীনতম পর্যায় থেকেই তার অস্তিত্ব রয়েছে। মাধ্যন্দিন সবন প্রায় সম্পূর্ণতই ইন্দ্র ও মরুদ্‌গণের উদ্দেশে নিবেদিত। তৃতীয় সবন স্পষ্টতই পরবর্তীকালে সংযোজিত—সবিতা, আদিত্যগণ, বিশ্বেদেবাঃ ও অগ্নি তার অংশভাক্। প্রাতঃকালে সোম সংগৃহীত হ'ত, প্রাতঃসবন ও মাধ্যন্দিন সবন পর্যন্ত উদ্ভিজ্জটি সতেজ থাকত এবং স্বভাবতই সন্ধ্যায় শুকিয়ে উঠত। তাই, তখন সেই শুকনো সোমকে জলে ভিজিয়ে ফুলিয়ে আপ্যায়ন করা (অর্থাৎ পীন করে তোলা) হ'ত, যাতে তার থেকে রস নিষ্কাশন করা যায়। লক্ষণীয়, এ সবনের নাম কাল দিয়ে নির্ণীত নয়, পরবর্তী সংযোজন, তাই একে শুধু তৃতীয়-সবনই বলা হয়েছে। সোমযাগকে সর্বব্যাপী করার উদ্দেশ্যে তৃতীয় সবনে অপ্রধান দেবতাগণও উল্লিখিত হয়েছেন ; এমনকি, দেবায়িত পিতৃগণকেও তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর্যদের ধর্মীয় জীবনে পিতৃ উপাসনা যে অন্যতম প্রধান দিক ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ অনুষ্ঠানে।

অন্যান্য যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্যে দর্শপূর্ণমাস, রাজসূয়, সৌত্রামনী ও পশুযাগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞ নিশ্চয়ই অনেক প্রাচীন কালেই পরিকল্পিত হয়েছিল—আর্যরা যখন যাযাবর পশুপালক জীবনে সময়-স্মারক রূপে আকাশ পর্যবেক্ষণ করে পূর্ণিমা ও অমাবস্যাকে অর্থাৎ কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষের চূড়ান্ত পরিণতির তিথি দুটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন, সেই সময়কার স্মৃতি এই অনুষ্ঠান দুটিতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। তাছাড়া, আহুতিতে দুগ্ধজাত দ্রব্যের ব্যবহার পশুপালক জীবনেরই ইঙ্গিত বহন করে। পরবর্তী পর্যায়ে পরিকল্পিত চাতুর্মাস্য যজ্ঞে চারটি ঋতুর উপযোগী আহুতি প্রদান করা হ'ত—বৈশ্বদেব, বরুণপ্রঘাস, সাকমেধ ও শুনাসীর। কৃষিজীবী আর্যদের জীবনযাত্রার সঙ্গে চাতুর্মাস্য যাগের এই অংশটি নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। নির্ঋতি, রুদ্র, বরুণ ও ত্র্যম্বকের প্রতি নিবেদিত কিছু কিছু প্রতিবেধক ও প্রায়শ্চিত্তমূলক অনুষ্ঠান আর্যদের তৎকালীন জীবনধারার সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ, যেহেতু শস্য ও পাতালের অধিষ্ঠাতা দেবতাদের অশুভ ক্ষমতা সম্বন্ধে ভীতিই তাঁদের উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদনের

মূল প্রেরণা। লক্ষণীয় যে, এই সব আহুতি রয়েছে যজ্ঞের সূচনায় অর্থাৎ নেতিবাচক ভয়ংকর শক্তিগুলিকে কোনরকমে প্রশমিত ক'রে তবেই যজ্ঞ ইতিবাচক ও কল্যাণপ্রসূ হয়ে উঠতে পারে। পরবর্তীকালে সংযোজিত এ ধরনের আরও কিছু স্তোত্রে বিভিন্ন গৌণ দেবতা এবং রাক্ষস, অনুমতি, রাকা, সিনীবালী ও কুহূকে সন্তুষ্ট করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। রাজার প্রকৃত অভিষেক-বিষয়ক অনুষ্ঠান শুরু হয় একাদশ রত্নী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, রাজন্য, মহিষী, পরিবৃক্তি, সেনানী, সূত, গ্রামণী, ক্ষত্তা, সংগ্রহীতা, ভাগদুঘ ও অক্ষাবাপ-এর গৃহে একাদশ রত্ন হব্য নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে। এই সমস্ত ব্যক্তি যেহেতু রাজকীয় ক্ষমতার স্তম্ভ-স্বরূপ যজ্ঞে তাই আনুষ্ঠানিকভাবে এঁদের গুরুত্ব স্বীকার করা হ'ত। পরবর্তী দেবাসূ নামক বিভাবে বৃহস্পতির মতো নবীন দেবতার প্রাধান্য থাকায় সহজেই অনুমান করা যায় যে, অভিষেক-অনুষ্ঠানটি পরবর্তীকালেই পরিকল্পিত হয়েছিল, যখন গোষ্ঠী ও কৌমগুলি ছোট ছোট সামন্তরাজার অধীনে সংগঠিত হয়ে রাজ্যের সৃষ্টি করছিল। তাছাড়া, কোনও সুপ্রতিষ্ঠিত জনগোষ্ঠীর পক্ষেই শুধু রাজকীয় ক্ষমতার প্রতি এইরূপ সম্মান প্রদর্শন করা স্বাভাবিক। সমাজে তখন অন্তত বৃত্তিগত জাতিভেদ প্রথা যে সুস্পষ্ট চরিত্র পেয়ে গেছে, তারও নিদর্শন আমরা পাই। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজন্য ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেণীস্বার্থজনিত দ্বন্দ্বের আভাসও পাওয়া যায়। অভিষেকের প্রয়োজনে যে সমস্ত স্থান থেকে পবিত্র জল আহরণের উল্লেখ রয়েছে, তা আর্যদের প্রাথমিক বসতিগুলির ভৌগোলিক অবস্থানের নিদর্শন। রাজার একাধিপত্যসূচক যে সমস্ত অনুষ্ঠান অভিষেকের অঙ্গ ছিল, তা তৎকালীন ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের স্বল্পালোকিত দিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাজাকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে সর্বসমক্ষে অতিজাগতিক ও নৈতিক গুণযুক্ত দেবতারূপে বর্ণনা করা হ'ত ; বিভিন্ন দেবতার সঙ্গে তাঁকে একাত্ম ক'রে তোলার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সঙ্গেও তাঁর তুলনা করা হ'ত। অভিষেকের অন্তিম পর্যায়ে বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে বিশেষভাবে নিবেদিত দশপেয় অনুষ্ঠানে দশজন ব্রাহ্মণ একই পাত্র থেকে যুগপৎ সুরাপানের মাধ্যমে সদ্য অভিষিক্ত নূতন রাজা ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করতেন। সম্ভবত, আরও পরবর্তীযুগে উদ্ভাসিত প্রবর্গ্য যাগের অনুষ্ঠানে সূর্যদেবের শক্তি বৃদ্ধির জন্য অশ্বীদের উদ্দেশে 'মহাবীর' নামক উত্তপ্ত রক্তবর্ণ পাত্রে দুগ্ধ অর্পণ করা হ'ত।

অশ্বমেধ যজ্ঞে বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত কৌম ও জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস ও আচার ব্যবহার একত্রে সমন্বিত হয়েছিল—তবে রাজনৈতিক বিজয়লাভের প্রতীকী ঘোষণাই এর যজ্ঞের উদ্দেশ্য। বিবিধ প্রকারের ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান, গূঢ়ার্থবহ অক্ষক্রীড়া, প্রকৃত অতীত ইতিহাস থেকে সামূহিক অবচেতনায় সংকলিত লুণ্ঠন-অভিযানের

কাহিনীগুলিকে কেন্দ্র ক'রে প্রত্নকথা নির্মাণ ও গোষ্ঠীগতভাবে আনুষ্ঠানিক মদ্যপান—এই সমস্ত আদিপর্বে সম্ভবত অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল না। খুব সম্ভব, প্রাথমিক পর্যায়ে মূল অনুষ্ঠানটি সংক্ষিপ্ত ও সরল থাকলেও ঐতিহাসিক কারণে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বিচিত্র আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য বহুবিধ প্রতীকী অনুষ্ঠানকলাপের সমন্বয়ে তা শেষ পর্যন্ত জটিল ও বিচিত্র আকার ধারণ করে।

বাজপেয় যজ্ঞের বিভিন্ন অনুপুঙ্খগুলি বিশ্লেষণ ক'রে আমাদের মনে হয় যে, মূলত সোমযোগেরই সামান্য একটু ভিন্ন অভিব্যক্তির সঙ্গে বিভিন্ন জনপ্রিয় উৎসব ও অনুষ্ঠান সংমিশ্রিত হয়ে আলোচ্য অনুষ্ঠানটিকে গড়ে তুলেছিল। শরৎকালে অনুষ্ঠিত এই যজ্ঞটির বিভিন্ন পানপাত্রের বিশেষ গুরুত্ব লক্ষণীয় ; এদের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে 'ঐন্দ্র' বা 'বাজপেয়' নামক পান-পাত্রে। স্পষ্টতই ইন্দ্র এখানে প্রধানতম দেবতা এবং যজ্ঞের নামকরণেও সেই ইঙ্গিত। বর্ষা শেষের পৃথিবীতে শরৎকালেই রাজারা বিজয় অভিযানে বেরোতেন। এই বিজয়কামী রাজাদের আদি প্রতিভূ ইন্দ্র, যিনি ক্ষত্রিয়শক্তির প্রতীক ; সোম এবং সুরাপানে যিনি অভ্যস্ত। তাই, বাজ (শক্তি) পানের জন্য নির্দিষ্ট এই শারদ যজ্ঞে ইন্দ্র ও তাঁর সহযোগী মরুদ্‌গণ অনুরূপ গৌরবের অধিকারী। এই যজ্ঞে প্রজাপতির উপস্থিতি কিছু কিছু অংশের তুলনামূলক নবীনতাই প্রমাণ করে। প্রজাপতি এখানে রাজার রক্ষা ও শাসকশক্তির প্রতিভূ। মাধ্যন্দিন-সবনে ইন্দ্রের অবিসংবাদিত প্রাধান্য এবং সামগ্রিকভাবে বাজপেয় যজ্ঞে ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব এই ইঙ্গিতই বহন করে যে, প্রধানত এটি ক্ষত্রিয়দের যজ্ঞ। বস্তুত, পরবর্তীকালের রাজারাও এই শরৎকালেই ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত সামরিক অভিযানের উদ্যোগ করতেন। বাজপ্রসবীয় বা শক্তিপ্রদ আহুতিদান এবং যজ্ঞের সমাপ্তিতে 'উত্তেজিত' বা বিজয়প্রশস্তি গানের সঙ্গে আহুতিদান এই প্রসঙ্গে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এই যজ্ঞের বিভিন্ন অনুপুঙ্খের মধ্যে উর্বরতা ও সৌর উপাসনার অবশেষ অনেক পণ্ডিত লক্ষ্য করেছেন।

সৌত্রামণী নামক যজ্ঞেও সুরা নিবেদিত হয় ; সেখানে আহুতি মূলত দুই ধরনের—স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান হিসাবে তাকে 'কৌকিলী' ব'লে অভিহিত করা হয়েছে, আবার গৌণ অনুষ্ঠানরূপে তা সুরাসক্ত ব্যক্তির জন্য পরিকল্পিত। এই যজ্ঞে ইন্দ্রের উদ্দেশে বৃষ, সরস্বতীর উদ্দেশে মেঘ, অশ্বীদের উদ্দেশে ছাগ এবং অগ্নির উদ্দেশেও বৃষ বলিদান করা হ'ত। রাজার প্রাধান্য ও আধিপত্যের প্রতীকী ঘোষণারূপে এ অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট কিছু অনুপুঙ্খ পরিকল্পিত হয়েছিল।

বাজসনেয়ী সংহিতার তেত্রিশ অধ্যায়ে আলোচিত পুরুষমেধ যজ্ঞটি পরবর্তীকালে সংকলিত হলেও বহু প্রাচীনকালে তার উৎস সন্ধান করা যেতে পারে, যখন পরাজিত শত্রুকে বধ করা হ'ত। কারণ খাদ্য উৎপাদনের সেই স্তরে অর্থাৎ শিকারের পর্যায়ে জীবন্ত শত্রু সমস্যার সৃষ্টি করত, তার জন্য খাদ্য যোগানো উৎপাদনের সেই স্তরে অন্যায় অপচয় ব'লে বিবেচিত হ'ত। নিহত শত্রুর মৃতদেহ বিজেতা কর্তৃক

আনুষ্ঠানিকভাবে ভক্ষিত হওয়ার পিছনে এই বিশ্বাস সক্রিয় ছিল যে, শত্রুর শক্তি এভাবেই আত্মীকরণ করা সম্ভব। পরবর্তীকালে অবশ্য পরাজিত শত্রুকে পশুপালন বা কৃষিকাজে নিযুক্ত ক'রে অর্থনৈতিক উৎপাদনের অঙ্গীভূত করা হ'ত। শত্রুকে বধ ও ভক্ষণ করার প্রাচীন রীতি লাভজনক নয় বলেই তা ক্রমে পরিত্যক্ত হয়েছিল। তবে তার স্মৃতি সামূহিক নির্জ্ঞানে গ্রথিত ছিল ; বাস্তব জীবনে পরাজিত শত্রুকে যেহেতু আর তখন হত্যা করা হ'ত না, তাই পুরুষমেধ যজ্ঞ তখন বিশুদ্ধ প্রতীকী অনুষ্ঠানেই পর্যবসিত হ'ল। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অন্তর্গত বিখ্যাত পুরুষসূক্তের সঙ্গে এর সম্পর্ক প্রকৃতই তাৎপর্যপূর্ণ। অতিজাগতিক স্তরে ঈশ্বরের প্রতিভূ 'পুরুষে'র আনুষ্ঠানিকভাবে বলিদান ও আহুতি প্রদানের প্রক্রিয়া বিশ্বসৃষ্টির মৌল কারণরূপে এ সূক্তে বর্ণিত। প্রতীকী প্রত্নকথার মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন বৃত্তিধারী শ্রেণীকে এই সূক্তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্যান্য দেবকল্পনাতেও একটি মহাজাগতিক শক্তির প্রতিভূরূপে কল্পিত আদিমতম দেবতার বলিদান বা আত্মবলিদানের দ্বারাই বিশ্বসৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল, এমন কল্পনা মাঝেমাঝেই পাওয়া যায়। এটি একান্তভাবে বেদেরই বৈশিষ্ট্য নয়।

সর্বমেধ নামক কল্পনাসমৃদ্ধ অনুষ্ঠানটিকে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ ব'লে অভিহিত করা হয়েছে। এ অনুষ্ঠানের শেষে যজমান তাত্ত্বিকভাবে তাঁর সমস্ত কিছুই দক্ষিণারূপে প্রার্থীদের অর্পণ করেন। এই ভাবনার সার্বিক বাস্তবায়ীত বিমূর্ত কল্পনা থেকেই আধ্যাত্মিক প্রতীকায়নের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আনুষ্ঠানিক কর্মের দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হতে থাকে ও যজ্ঞের অন্তর্নিহিত মূল আদর্শরূপে আত্মদানের প্রশংসা প্রাধান্য পায়। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, সর্বমেধ যজ্ঞ বর্ণনার মধ্যেই আসন্ন অধ্যাত্মবাদী যজ্ঞ-ব্যাখ্যার ধারক 'ব্রাহ্মণ' ও 'আরণ্যক' অংশের প্রাথমিক সূচনা হয়েছিল। বৈদিক সমাজ তখন প্রকৃত যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রাথমিক অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত পর্যায় থেকে ক্রমশ সরে গিয়ে সংহিতার শেষ অধ্যায়ে অভিব্যক্তি ঈশোপনিষদের আধ্যাত্মিক প্রতীকায়িত অবস্থানে উপনীত হচ্ছিল। এতে স্পষ্টতই সর্বমেধের মৌল আদর্শ অর্থাৎ সর্বব্যাপী পরমাত্মার প্রকাশ স্বীকৃত হয়েছে।

সরলতম ও সংক্ষিপ্ততম অনুষ্ঠান অগ্নিহোত্রে অবশ্য প্রতীকী দিক দিয়ে মহত্তম যজ্ঞ-ভাবনারই এক অভিব্যক্তি নিহিত আছে, যেহেতু তা প্রাচীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিরাজিত সাধারণ বিশ্বাস অর্থাৎ বিশ্বজগতে সূর্যদেবের অপরিহার্যতা ও শ্রেষ্ঠতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে।

সমাজ

যজুর্বেদের মধ্যে উপযুক্ত উপাদানের অভাব থাকার ফলে এর থেকে সমসাময়িক ইতিহাস সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন, যদিও এতে মাঝে মাঝে

শুচিবৃক্ষ, গোপালায়ন বা ক্ষিপ্রতারীর মতো ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের নাম উল্লিখিত। বাস্তব ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরবর্তী বৈদিক যুগে কিছু কিছু মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা হওয়াতে সামাজিক জীবনের বহুদিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। কৃষিব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে সমাজের পুরুষশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে এসে গিয়েছিল এবং এই সময় থেকেই যেহেতু সমাজে নারী অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পুরুষের উপর একান্ত নির্ভরশীল হতে শুরু করল, তাই সমাজে ক্রমশ তার মর্যাদা হ্রাস পেল। তাছাড়া, আর্য পুরুষেরা প্রায়ই অনার্য গোষ্ঠীভুক্ত যে সব নারীদের বিবাহ করত, সমাজে তাদের পরিপূর্ণ স্বীকৃতি না থাকার ফলেও সাধারণভাবে নারীর সামাজিক অবমূল্যায়ন শুরু হয়েছিল। বারাঙ্গনাদের সাহচর্যলাভে পুরুষেরা যেমন অভ্যস্ত ছিল, তেমনি পরস্ত্রীগমনেও কোনো বাধা ছিল না ; একমাত্র নির্দিষ্ট কিছু অনুষ্ঠানের দিনে এই ধরনের সম্পর্কে কিছু বাধা ও নিষেধ নির্দেশিত ছিল। যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হওয়ার পর প্রথম দিবসে যজমানের পক্ষে বারবধূর সঙ্গ নিষিদ্ধ ছিল, দ্বিতীয় দিবসে পরস্ত্রী এবং তৃতীয়ে নিজের স্ত্রীর সাহচর্য নিষিদ্ধ ছিল। স্ত্রীকে যদিও অর্ধাঙ্গিনী বলা হয়েছে, তবুও বারে বারে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পুরুষের তুলনায় নারী সমাজে সর্বপ্রকারে হীন ব'লেই বিবেচিত ; জনসমাবেশে যোগদানের কোনো অধিকার তার ছিল না, তেমনি সম্পত্তির অধিকারেও সে বঞ্চিত ছিল। পুরুষের বহুবিবাহকে সমর্থন করা হলেও নারীর বহু বিবাহের উপর কঠোর বাধা-নিষেধ নেমে এসেছিল।

যজুর্বেদের সময়েই জাতিভেদ প্রথা স্পষ্টভাবে নিরূপিত হয় ও চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ; বিভিন্ন বর্ণের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ ধীরে ধীরে কঠোর ও অলঙ্ঘ্যভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। বুদ্ধি ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য ব্রাহ্মণরা সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার অর্জন করে ; এবং এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ক্রমে জন্মগতভাবে এসব অধিকার আত্মসাৎ ক'রে নেয়। আবার ব্রাহ্মণদের মধ্যেও পুরোহিতরা সমাজের কাছে সর্বাধিক সুবিধা লাভ বা আদায় ক'রে নিয়েছিল, কেননা যজ্ঞনিষ্ঠ সমাজে যে সমস্ত অনুষ্ঠান অদীক্ষিত জনসাধারণের পক্ষে সর্বতোভাবে রহস্যাবৃত ছিল, সেইসব অনুষ্ঠানের পরিচালক ব্রাহ্মণরা ত স্বাভাবিকভাবেই সর্বাধিক সম্ভ্রমের আসনে অধিষ্ঠিত হবে। পুরোহিতদের কর্তব্যের বিভাজন এবং যজ্ঞের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুরোহিতদেরও সংখ্যা চক্রবৃদ্ধিহারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রত্যেক বেদের জন্য পৃথক ও সুনির্দিষ্ট পুরোহিত-মণ্ডলী বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ পেয়ে তখনকার সমাজে পুরোহিতের বৃত্তিকেই চূড়ান্ত মর্যাদা ও লাভের বৃত্তিতে পরিণত করে।

অধ্বর্যু-শ্রেণীর পুরোহিত যজুর্বেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। যুদ্ধবিজয়ী রাজাদের হাতে সম্পদ যত পুঞ্জীভূত হতে লাগল ততই পুরোহিতরা নিত্য নূতন যজ্ঞ উদ্ভাবন ক'রে ক্রমশ অধিক-সংখ্যক পুরোহিতের প্রয়োজনকে অনিবার্য ক'রে তুলল। যজুর্বেদে উল্লিখিত বহু-অনুপুঙ্খযুক্ত শ্রৌতযজ্ঞগুলির মধ্য দিয়ে নানা গুরুত্বপূর্ণ সমাজ সংস্কার সূচনা হয়েছিল, যা দুই সহস্রাব্দেরও অধিক সময় ধ'রে ভারতীয় সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই সঙ্গে জাতিভেদ প্রথা যুক্ত হয়ে পরবর্তী বৈদিক যুগের ধর্মাচরণকে একটি নূতন চরিত্র দান করে। উল্লেখযোগ্য যে, প্রাগার্য সিন্ধুসভ্যতায় আচরিত ধর্ম থেকেই সম্ভবত তিনটি ভিন্ন আকৃতির (গোলাকৃতি, ত্রিভুজ ও অর্ধচন্দ্রাকৃতি) যজ্ঞবেদীর ধারণারূপ লাভ করেছিল। অনুষ্ঠানের নির্দেশাবলী থেকে আমরা তখনকার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। গায়ক এবং চিকিৎসকদের সেই সমাজে হীন ব'লে গণ্য করা হ'ত। জাতিভেদজর্জরিত সমাজে ব্রাহ্মণদের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হওয়ার কারণ এই যে, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর্ব-শেষে আর্যরা বিজয়ীরূপে আর্যাবর্তে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে সামাজিক শ্রেণীরূপে যোদ্ধাদের গুরুত্ব স্বভাবতই খর্ব হয়ে যায়। সেই কৃষিজীবী ভূমিনিষ্ঠ স্থিতিশীল সমাজে ক্ষত্রিয়দের তুলনায় ব্রাহ্মণরা তখন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা সমাজের মঙ্গলবিধান করার দাবিতে সামাজিক গৌরব অর্জন করে ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠে। তবে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে জাতি-বিভাগের মধ্যে সামাজিক স্থিতিস্থাপকতা ও চলিষ্ণুতা অবশিষ্ট ছিল বেশ কিছুকাল পর্যন্ত এবং যে কোনও জাতিভুক্ত কর্মক্ষম সৎ বা বিদ্বান ব্যক্তি সমাজে তার প্রাপ্য সম্মান লাভ করত।

বেদ-রচনার এই পর্যায়েও শতায়ু হওয়াই ছিল মানুষের প্রত্যাশিত সার্থকতা। কৃষি-ব্যবস্থায় লব্ধ উদ্বৃত্ত ধন, গোসম্পদ, কুটীর শিল্প, বাণিজ্য এবং সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি হয়ে উঠল। তৎকালীন মানুষের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কেও কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। প্রাচীন আর্যরা দিনে তিনবার আহার করতেন। কৃষির প্রসারের যুগে মাংস, দুধ ছাড়াও শস্যজাত ও দুগ্ধজাত খাদ্য, মধু, সুরা ও সোম আহার্য ও পানীয়ের তালিকায় স্থান পেয়েছিল। তখনকার মানুষ জীবনযাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছিল, তারও বেশ কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সময় থেকেই তপস্যার বিশেষ গুরুত্ব স্বীকৃত হতে থাকে। বৈদিক যুগের প্রথম পর্যায়ে যেমন যজ্ঞই ধর্মাচরণের ও প্রকৃতির ওপর জয়লাভ করার একমাত্র উপায় ছিল, এখন আর ঠিক তেমন নয় ; তপস্যাও একটি বিকল্প শক্তিরূপে পরিগণিত হতে শুরু করেছে উত্তর বৈদিক যুগের শুরু থেকেই, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল ও যজুর্বেদেই এই নূতন বোধের সূচনা। তপস্যা এখন একটি প্রবল সৃষ্টিশীল শক্তি, মহাবিশ্বে সৃষ্টির অন্তরালে নিহিত এ শক্তি।

আঙ্গিক ও ভাষা

তৈত্তিরীয় সংহিতায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিবৃতি ও ব্যাখার ধরন ভিন্ন ভিন্ন। কখনও কখনও একাদিক্রমে অনুষ্ঠানগুলি বিবৃত হয়েছে, কখনও বা একই অনুষ্ঠান পর্যায়ক্রমে ব্যাখ্যাত হয়েছে। প্রচলিত ভাষার বিশেষ ধরনের প্রয়োগে দৈনন্দিন ভাষার যুক্তি-পারম্পর্য পরিবর্তিত হয়ে আকৃতি ও তাৎপর্যের মধ্যে গূঢ়ার্থবহ প্রতীকী ব্যঞ্জনা দেখা দিয়েছে। অনুষ্ঠানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুপুঙ্খেও প্রতীকধর্মিতা যুক্ত হওয়ার ফলে যজ্ঞধর্ম ক্রমশ দৈনন্দিন জীবনবৃত্ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিশেষ ধরনের গূঢ় এক বিদ্যায় পরিণত হয়েছে। অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিচিত্র সব প্রত্নকথাও ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত ও ব্যাখ্যাত হওয়ায় ভাষা অনিবার্যভাবেই বিমূর্তায়িত হয়ে পড়েছে। এই ভাষা প্রকৃতপক্ষে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ রচনার মধ্যবর্তী যুগসন্ধিক্ষণের ভাষা। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, ঋগ্বেদের তুলনায় যজুর্বেদের শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধতর ও উন্নততর ; আর্য উৎস ছাড়াও অনার্য উৎস থেকেও সম্ভবত বিচিত্রতর প্রতিশব্দ গৃহীত হয়েছিল। ঋগ্বেদের ক্রিয়া-বৈচিত্র্য কিছুটা হ্রাস পেলেও যজুর্বেদের পর্যায়ে ক্রিয়াপদের সমৃদ্ধি প্রায় সমতুল্যই রয়ে গেছে। অবশ্য কিছু কিছু নূতন ক্রিয়াপদের সন্ধানও এই যুগেই প্রথম পাওয়া যাচ্ছে। তার কিছু-বা আহৃত হয়েছে প্রাগার্য অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় প্রতিবেশীদের শব্দভাণ্ডার থেকে। অন্তর্বিবাহ, বাণিজ্য ও দৈনন্দিন নানা সম্পর্কের মধ্যে প্রতিবেশীদের শব্দভাণ্ডার থেকে ইন্দো-আর্য ভাষা শব্দ সংগ্রহ করতে শুরু করেছে এই উত্তর বৈদিক পর্যায়ে বিশেষভাবে। ভাষার দিক থেকেও অনার্য জাতি গোষ্ঠীর কাছে আর্য বৈদিক ভাষার ঋণ নূতন নূতন বৃক্ষ, লতা কিংবা পরাজিত শত্রুর ও যজ্ঞীয় পশুর শারীরিক বর্ণনায় এবং সমাজসংস্থার জ্ঞাপক নানা শব্দে সুস্পষ্ট। মন্ত্রের যে অংশগুলি নিশ্চিতভাবে যজুর্বেদের নিজস্ব, সে সবই সংক্ষিপ্ত ও সূত্রবদ্ধ উচ্চারণ— খুব কম ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ শ্লোক আমরা পাই। অনুষ্ঠান সম্পর্কিত গদ্যে-বচিত নির্দেশাবলীতেই প্রকৃত পুরোহিত-তন্ত্রের রচনার পরিচয় পাই, যা ঋগ্বেদে প্রাপ্ত কাব্যশৈলী থেকে স্বরূপত ভিন্ন। তাই, ইচ্ছাকৃতভাবে নিগূঢ় রহস্য-বিদ্যা নির্মাণের প্রয়াস স্পষ্টতই পরিস্ফুট হয়েছে তির্যক অর্থ-সম্পন্ন বাক্যাংশে, উদ্ভট সমীকরণে ও আপাত অর্থহীন শব্দ দিয়ে রচিত সূত্রগুলিতে। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরলতর প্রার্থনাও গ্রথিত হয়েছে। সংখ্যা ও ছন্দের পুনরাবৃত্তির মধ্যে একটি রহস্যের বাতাবরণ নির্মাণের প্রচেষ্টা পরিস্ফুট।

ঋগ্বেদের বহু পরিচিত বাক্যাংশে ও মন্ত্রবিন্যাস ইতোমধ্যে স্তোত্র ও প্রার্থনাগুলির জাদুকরী প্রভাব অর্জন করে নিয়েছে। যজুর্বেদ সংহিতায় এই নতুন মন্ত্রবিন্যাসকে অনুসরণ করা হয়েছে। মৌখিকভাবে রচিত সাহিত্যে এই ধরনের পুনরাবৃত্তি মন্ত্রের আঙ্গিক ও বিষয়গত তাৎপর্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে বিশেষ একটি ভূমিকা অর্জন করেছে

তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই নির্দিষ্ট বিন্যাস বার বার অনুসৃত ও সচেতনভাবে পুনরাবৃত্ত হওয়ার ফলে পুরোহিতদের অনেক শ্রম লাঘব হ'ত ; মূলত বিশুদ্ধ আনুষ্ঠানিক কার্যপদ্ধতি ও মন্ত্র উচ্চারণের প্রয়োজনে শ্রোতাদের মনোযোগ যাতে বিক্ষিপ্ত না হয়, বহু পরিচিত মন্ত্রাংশের পুনরাবৃত্তি সেক্ষেত্রে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। এই যুগে ইন্দ্রের প্রাধান্য ধীরে ধীরে খর্ব হতে থাকে এবং আনুপাতিকভাবে প্রজাপতির মর্যাদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। সমাজে নূতন চেতনার উন্মেষের ফলে পুরাতন যজ্ঞে নূতন অনুপুঙ্খ যুক্ত হয় কিংবা সম্পূর্ণ নূতন যজ্ঞ এবং তৎসম্পর্কিত প্রত্নকথা উদ্ভাবিত হতে থাকে। লোকধর্মের অনেক উপাদান বিভিন্ন অনুপুঙ্খে আবিষ্কার করা যায়। বহুক্ষেত্রে আদিম ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাসের অবশেষও খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তৎকালীন ভাষায় আধ্যাত্মিক প্রতীকধর্মিতা ও রূপকধর্মী প্রয়োগ বিশেষ লক্ষণীয়। গভীর দ্যোতনা-যুক্ত বিশিষ্ট বাক্যাংশ আনুষ্ঠানিক পবিত্রতায় মণ্ডিত হয়ে সমগ্র সমাজের নিকট ধর্ম সাহিত্য-রূপে সম্মানিত হ'ত। পুরোহিত রচয়িতাদের প্রজন্ম-পরম্পরা যজ্ঞধর্মে কার্যকরী ও স্মৃতিতে ধারণ করার যোগ্য যে নির্দিষ্ট সূত্রবদ্ধ ও সংক্ষিপ্ত ভাষারীতির বিকাশ ঘটিয়েছিলেন, তা সমগ্র জনগোষ্ঠীর নিকট আদরণীয় হয়ে উঠেছিল। মৌখিক সাহিত্যের বিশিষ্ট চরিত্র-লক্ষণ বাচনিক কাঠামাতো পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। পুনরাবৃত্তি যেমন স্মৃতিসহায়ক ও ঐন্দ্রজালিক প্রভাবযুক্ত বাক্‌রীতি রূপে বিবেচিত হয়েছে, তেমনি তাদের মধ্যে স্থাপত্যসুলভ অন্তর্লীন গঠনগত ঐক্যের বোধও অভিব্যক্ত। একই ধর্মবিশ্বাসগত উত্তরাধিকারের প্রতি সমাজের আনুগত্য যেমন ফুটে উঠত, তেমনি প্রত্নকথার বিচিত্র ঐতিহ্যের সম্বন্ধেও জনগোষ্ঠীর সচেতনতাও স্তোত্রের পুনরাবৃত্ত অংশগুলির মধ্যে আভাসিত হ'ত।

ঋগ্বেদীয়পদ্যের মতোই যজুর্বেদের গদ্যভাষা শ্বাসাঘাতযুক্ত স্বরে গ্রথিত, ফলে তা কানে শুনে স্মৃতিতে ধারণ করার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। শুধু শ্বাসাঘাতের জন্যই নয়, গদ্য কাঠামোটি বহু ক্ষেত্রেই পদ্যের আঙ্গিকেরই অনুকরণ। অনুপ্রাসযুক্ত শব্দ ও বাক্যাংশ নির্দিষ্ট দূরত্বে সন্নিবেশিত হওয়ার ফলে ছন্দোময়তা সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ ভঙ্গিতে ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বাচনিক পুনরাবৃত্তি সুনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রযুক্ত হওয়ার ফলে অভিনব সূত্রাকৃতি রচনাশৈলীর সৃষ্টি হয়েছে। এতে সর্বপ্রকার বাহুল্য বর্জিত হয়, যাতে কণ্ঠস্থ করা ও স্মরণে রাখা সহজ হয় ; ফলে, যজ্ঞে প্রয়োগও অনায়াসে বা স্বল্পতর আয়াসে সাধিত হয়। এ ধরনের গদ্যভাষার বিষয়বস্তু মোটামুটি দুই ধরনের : (১) ক্রিয়াপদহীন, সংক্ষিপ্ত, প্রায় গূঢ়ার্থযুক্ত, ছন্দযুক্তিবদ্ধ সূত্রায়িত মন্ত্রসমূহের আনুষ্ঠানিক উচ্চারণ—আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন বাক্‌বিস্তার ব'লে মনে হলেও আনুষ্ঠানিক আচার ও ভঙ্গির সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার ফলে তাতে কিছুটা তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া সম্ভবপর। শৈলীগত বিচারে নিরলংকার ও ব্যবহারিক হলেও এর মধ্যেই

আমরা সংস্কৃত গদ্যের প্রাথমিক নিদর্শন খুঁজে পাই। (২) প্রত্নকথাগুলি যে ধরনের গদ্যরীতিতে বিবৃত হয়েছে তা কতকটা ভিন্ন। শৈলীগত বিচারে স্বল্প শব্দ প্রয়োগের প্রবণতা এর মধ্যেও লক্ষণীয়, যদিও এতে ক্রিয়াপদ একেবারে অনুপস্থিত নয় এবং বাচনিক কাঠামোও কিছুটা কম গ্রন্থিল। ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ-যোগ্যতা পরীক্ষা করার সুযোগ থাকায় এবং একই সংস্কার ও ধর্মীয় বিশ্বাসের উত্তরাধিকারকে গ্রহণ করার ফলে যজুর্বেদের গদ্যভাষার মধ্যে উপলব্ধির প্রত্যক্ষতা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বস্তুত, প্রাথমিক গদ্যের মাত্র দুটি উদ্দেশ্যই ছিল : যজ্ঞানুষ্ঠানের নির্দেশাবলী প্রণয়ন এবং তৎসম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত ভাষ্য রচনা। ভাষ্যে অন্যান্য বিষয়ও যুক্ত হয়েছে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পক্ষে যাদের গুরুত্ব অনেক। কখনও কখনও যজ্ঞে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ বা আনুষ্ঠানিক কার্যপদ্ধতিকে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করার সচেতন প্রচেষ্টা হয়েছে। ফলে, অনেক ক্ষেত্রেই রচনাশৈলী আপাতদৃষ্টিতে অনাবশ্যকভাবে ও অত্যধিক পরিমাণে কর্কশ, উচ্চাবচতাহীন, একঘেয়ে, নিষ্প্রাণ ও অনাকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। আকস্মিকভাবে কখনও কখনও দু একটি শ্লোক সন্নিবেশিত হওয়ার ফলে দীর্ঘস্থায়ী অনুষ্ঠানসর্বস্ব গদ্যের একঘেয়ে গতানুগতিকতায় স্বল্প-পরিমাণ বৈচিত্র্যের সঞ্চার হয়েছে ; কিন্তু এই সব শ্লোকও কাব্যের প্রয়োজনে আসে নি, এসেছে পুরোহিতের আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনে। অধিকাংশ শ্লোকই ঋগ্বেদ থেকে সরাসরি ঋণরূপে গৃহীত হয়ে যাজ্যা বা অনুবাক্যা বা অন্য কোনও যজ্ঞকর্মের অঙ্গরূপে প্রযুক্ত হয়েছে।

রচনাশৈলীর মূলগত কর্কশতা সত্ত্বেও কিছু পদ্যাংশে যৎসামান্য কাব্যিক অভিব্যক্তির নিদর্শন রয়েছে। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলি অতি সাধারণ আলংকারিক অনুপুঙ্খ, প্রাথমিক স্তরের উপমা ও রূপকের স্তর থেকে উন্নততর কোনো পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে নি। ফলে, প্রায় সম্পূর্ণতই প্রকৃত কাব্যিক আবেদন সৃষ্টির ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অধিকাংশ উপমা ও রূপকের উদ্দেশ্য কোনও একটি আনুষ্ঠানিক অনুপুঙ্খের উপর গুরুত্ব আরোপ করা। তবুও এদের মধ্যেই দৈনন্দিন জীবন থেকে সংকলিত উপমার পরিচ্ছন্নতা ও অন্তর্লীন শক্তি আমাদের মুগ্ধ করে। কিছু কিছু চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে আমরা সহসা তৎকালীন জনসমাজের ব্যবহারিক বাস্তব জীবন সম্পর্কে ধারণা করে নিতে পারি। উপমা, রূপক এবং চিত্রকল্পের প্রয়োগে হয়ত ঋগ্বেদের মন্ত্রের তুলনায় কল্পনাসমৃদ্ধির অভাব আছে ; তবুও, অনুষ্ঠান-নির্ভর সাহিত্যে ব্যবহারিক প্রয়োগের মধ্যে যথেষ্ট কার্যকরী বাক্‌কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। অনুপ্রাসযুক্ত মন্ত্রের অধিকাংশ ঋগ্বেদ থেকে সরাসরি উদ্ধৃত হয়েছে, 'যহেতু সেগুলি সহজেই কণ্ঠস্থ করা যায়। যে সমস্ত ক্ষেত্রে যজুর্বেদের নিজস্ব অনুপ্রাস নির্মাণের নিদর্শন পাওয়া যায়, সেখানে সে সব শুষ্ক

ব্যবহারিক এবং সম্পূর্ণত আনুষ্ঠানিক রচনার তাৎপর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হয়েছে, আলংকারিক ও কাব্যিক মণ্ডনের তাগিদে নয়। বস্তুত, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ এবং ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ-সমূহে এ জাতীয় রচনায় অলংকার মূলত স্মৃতির সহায়ক।

ইন্দ্রজাল

বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে ইন্দ্রজালের একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যজুর্বেদ সংহিতার বহুস্থানে ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাসের স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন উল্লেখ রয়েছে, তবে মঙ্গলপ্রদ ইন্দ্রজাল ও অশুভপ্রসূ জাদুবিদ্যার মধ্যে ব্যবধান খুব কম, কেননা বহুক্ষেত্রেই অনুষ্ঠানের অনুপুঙ্খগুলি এমনভাবে বিবৃত হয় যে, শত্রুকে পর্যুদস্ত করার প্রয়োজনে আরও একটি পাল্টা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন দেখা দেয়। যজ্ঞীয় মন্ত্রগুলির অর্ধস্ফুট উপাংশু জপের পদ্ধতি দানব-শক্তির পরাজয়ের সময় আবিষ্কৃত হয়েছিল, এইরূপ ধারণা ব্যক্ত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যজ্ঞে উপাংশু জপ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত দানবেরা দেবশক্তির সঙ্গে সফলভাবে সংগ্রাম করেছিল। বলা বাহুল্য, যজমানের অনুষ্ঠানের প্রণালী গোপন করার এই প্রবণতাকে ইন্দ্রজালের সঙ্গেই মূলত সম্পৃক্ত ; পুরোহিত সম্প্রদায়ের এই প্রবণতাকে উপযুক্ত প্রত্নকথার মাধ্যমে যুক্তিগ্রাহ্য ক'রে তোলার চেষ্টা হয়েছে। বহু ক্ষেত্রেই ছদ্ম আপাত যুক্তিকে যজ্ঞধর্ম পালনের সমর্থনে সত্য যুক্তিরূপে উপস্থাপিত করার চেষ্টা হয়েছে যাতে আপাত দৃষ্টিতে যুক্তিহীন আনুষ্ঠানিক অনুপুঙ্খও নৈসর্গিক জগতের সঙ্গে কোনো এক কাল্পনিক স্তরে সমন্বিত হতে পারে।

বৈদিক ছন্দের সঙ্গে যজ্ঞ ও যজ্ঞলব্ধ সুফলের অন্তর্গূঢ় আধ্যাত্মিক সম্পর্ক এবং অতিজাগতিক তাৎপর্যযুক্ত ঐন্দ্রজালিক গুরুত্ব সম্পর্কে দীর্ঘ বিবৃতি পাওয়া যায়। একটি মৌল বিশ্বাস ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে যে, ইহজগতে আয়োজিত যজ্ঞ প্রকৃতপক্ষে সমগ্র সৃষ্টিতে অদৃশ্যভাবে নিয়ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে ; সৃষ্টিকে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজনে মানুষ বিশ্বসৃষ্টির অন্তর্নিহিত একটা মহাজাগতিক যজ্ঞকেই অনুকরণ ক'রে চলেছে। মানবিক প্রকৃতি এবং মানুষের বিচিত্র সামাজিক বৃত্তিকে প্রায়শই বিভিন্ন প্রত্নকথার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

'কিক্কিটা' শব্দটিকে একটি রহস্যময় উপাদান রূপে যজ্ঞীয় পশুর মন, চোখ, কান ও বাক্-এর সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। কীথ্ মনে করেন যে, এই শব্দটির ধ্বনিগত বিন্যাসে গবাদিপশুকে আহ্বানসূচক বিশেষ ধ্বনির প্রতিধ্বনিই রয়েছে। যজুর্বেদ সংহিতায় এই শব্দটিকে জনপ্রিয় ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বৈদিক ছন্দের মধ্যেও জাদুশক্তির অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়েছিল। অক্ষর বা চরণের সংখ্যা প্রাকৃতিক কোনও বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত

এবং এই সম্পর্ক-কল্পনার মধ্যেই যজ্ঞানুষ্ঠানের রহস্যময় উপযোগিতা বা ছন্দের প্রচ্ছন্ন শক্তি নিহিত। বৈদিক সমাজে এইরূপ ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাসের অতিপ্রাকৃত তাৎপর্য সুস্পষ্ট। সামবেদে এই দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টতর এবং ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে তা যথার্থই সর্বাতিগ প্রতীকী তাৎপর্য অর্জন করেছে। পরবর্তী সাহিত্যে সোমযাগের গুরুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছন্দের গৌরবও বর্ধিত হয় এবং সেই সঙ্গে সামবেদের মহিমা উত্তরোত্তর দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। সোমযাগকে পরিকল্পিতভাবে রহস্যনিবিড় স্তরে উন্নীত করার প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ক্ষেত্রেই অতিজাগতিক প্রতীকায়নের প্রবণতা দেখা দেয়। যৌথ-অবচেতনায় প্রত্নপৌরাণিক যুক্তি অনুযায়ী অগ্নি-ছন্দগুলিকে বস্ত্রের মতো ব্যবহার ক'রে নিজেকে আচ্ছাদিত করেন ; সহজ কথায় ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রে অগ্নি প্রশংসিত হন ; অগ্নির সঙ্গে ছন্দগুলির এইরূপ সম্পর্কের উপলব্ধির জন্যই উপাসক বস্ত্র লাভের যোগ্যতা অর্জন করেন। মহাকালের সূচনা-পর্ব থেকেই দেবগণ মানবজাতির প্রতি নানা ধরনের কৃপা বর্ষণ করছেন ব'লে তাদের শক্তি ও সারাৎসার এই প্রক্রিয়াতেই নিঃশেষিত হয়ে যায়। কখনও কখনও এই তথ্যকে দেবতাদের অঙ্গহানির প্রতীকের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। দেবতাদের এইসব হারানো অঙ্গ বা শক্তিকে পুনরুদ্ধার করার জন্য কয়েকটি বিশেষ যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধান দেওয়া হয়েছে। যজ্ঞধর্মের সামগ্রিক ভাবাদর্শের উপর এ জাতীয় প্রত্নকথার প্রভাবে যজমান যেন এক অতিপ্রাকৃত তাৎপর্য ও গুরুত্ব অর্জন করেছিলেন, কেননা হারানো শক্তিকে সত্বর পরিপূরণ না করা হলে সৃষ্টির ধ্বংসের আশঙ্কা দেখা দেয়। তাই যজমান যখন পুরোহিতের সাহায্যে যজ্ঞ ক'রে দেবতার অঙ্গহানির প্রতিষেধ করেন, তখন মহাবিশ্বের পটভূমিকায় যজ্ঞক্রিয়াটি তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। সুতরাং ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহের অগ্রগামী যজুর্বেদের পর্যায়েই যজ্ঞ অধ্যাত্মচিন্তার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ধীরে ধীরে সাধারণভাবে যজ্ঞধর্ম ও বিশেষভাবে আনুষ্ঠানিক অনুপুঙ্খগুলি সংশয়াতীতভাবে সামাজিক মননের মূল স্রোতে এসে মিশে যায়।

অধিকাংশ প্রত্নকথা তার স্বভাববৈশিষ্ট্যেই হেতুসন্ধানী, কিন্তু প্রায়ই সেসব যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত বিষয়গুলি সংলগ্ন হয়ে থাকে। কদ্রূ এবং সুপর্ণীর বিখ্যাত প্রত্নকথায় বৈদিক ছন্দগুলির বিশেষ ভূমিকা কল্পিত হয়েছে। অনুরূপভাবে অন্য একটি প্রত্নকথার গন্ধর্ব বিশ্বাবসু কর্তৃক অপহৃত সোম উদ্ধারের জন্য দেবতারা বাগ্‌দেবীকে প্রেরণ করেন, বাগ্‌দেবী গন্ধর্বদের সংগীত ও নৃত্যে মুগ্ধ হয়ে নিজ কর্তব্য বিস্মৃত হলেন ; ফলে, এই প্রত্নকথার উপসংহারটি আমাদের প্রত্যাশার বিপরীত। যক্ষ্মারোগের উৎস বিষয়ক একটি প্রত্নকথা আমরা পাই যা পরবর্তীকালে মহাভারত এবং পুরাণসমূহে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এ ধরনের প্রত্নকথায় একই সঙ্গে বহু উদ্দেশ্য সাধিত হয়। যক্ষ্মারোগের হেতুসন্ধান ছাড়াও বহুবিবাহ প্রথার কুফল সম্পর্কে সচেতনতা যেমন ব্যক্ত হয়েছে, তেমনি ব্যাধি থেকে আরোগ্যলাভের

প্রয়োজনে আদিত্যদেবের উপাসনার প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর মধ্যে আমরা একদিকে সৌর দেবতাদের সঙ্গে আরোগ্যালিপ্সু ঋগ্বেদীয় সূক্তগুলির সম্পর্কের কথা স্মরণ করতে পারি, অন্যদিকে পরবর্তী সাহিত্যে সূর্যদেবের সঙ্গে চিকিৎসার সম্পর্ক বিষয়েও অবহিত হই।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় আমরা সর্বপ্রথম ত্রিপুরদহন বিষয়ক বিখ্যাত দেবকাহিনীটির সন্ধান পাই, যেখানে শিবের একটি মাত্র বাণ নিক্ষেপ তিনটি দৈত্যপুরী যুগপৎ ধ্বংস হওয়ার বিবরণ রয়েছে। এই কাহিনীর সঙ্গে উপসৎ অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে এবং এতে সেই সঙ্গে দেবতাদের আশীর্বাদে রুদ্রের 'পশুপতি' অভিধা লাভের কাহিনীও বিবৃত হয়েছে। আলোচ্য কাহিনীটির সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রের বরাহবধের কাহিনীও উল্লিখিত ঃ দর্ভজাতীয় কুশগুচ্ছের সাহায্যে ইন্দ্র সপ্তপর্বত ভেদ ক'রে দানবকে বধ করেছিলেন এবং যে যজ্ঞ পলায়ন ক'রে পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল বিষ্ণুরূপ ধারণ করে তাকে উদ্ধার করেছিলেন। এই প্রত্নকথার উপসংহারে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য রয়েছে যে পৃথিবী প্রাথমিক অবস্থায় অসুরদেরই করায়ত্ত ছিল,—ইন্দ্র দেবতাদের প্রতিনিধিরূপে অসুর-ভূমিকে সবলে অধিকার করেছিলেন। অর্থাৎ ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী অসুর বা সিন্ধু-উপত্যকা-নিবাসীদের পরাভূত করেই যে আর্যরা নিজেদের বসতি বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তা একটি রূপকের দ্বারা যেন এখানে বর্ণিত হয়েছে।

শিবকে কেন্দ্র ক'রে বীরত্বমূলক উপাখ্যান ঈপ্সিতভাবে গড়ে ওঠে নি বলেই সম্ভবত তাঁর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার প্রয়োজনে ত্রিপুর-দহনের প্রত্নকথা কল্পিত হয়েছিল। ছলনার মাধ্যমে প্রাগার্য জনগোষ্ঠীর ভূ-সম্পদ আর্য আক্রমণকারীরা কীভাবে আত্মসাৎ করত তার ইঙ্গিত রয়েছে সালাবৃকী বিষয়ক প্রত্নকথায় যেখানে ইন্দ্র সালাবৃকীরূপে দৌড়ে অসুরদের প্রতিশ্রুত ভূমিভাগ অর্থাৎ সমগ্র অসুরভূমি আত্মসাৎ করেন। তেমনি ঐন্দ্রজালিক শক্তিপ্রয়োগের নিদর্শন রয়েছে ইন্দ্র কর্তৃক বরাহ-নিধনের উপাখ্যানে। এছাড়া, আমরা একটি বিচিত্র অর্থযুক্ত সংক্ষিপ্ত সৃষ্টিতত্ত্বমূলক কাহিনীর সন্ধান পাই যেখানে অগ্নিদেবের অতিজাগতিক ও সৃজনশীল ভূমিকা বিবৃত হয়েছে। বাস্তবজীবনে সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা ও প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে অগ্নির অনিবার্য ভূমিকা আর্যরা লক্ষ্য করেছিলেন। মানুষের প্রথম ধর্মীয় আচরণের, অর্থাৎ যজ্ঞের, সঙ্গে অগ্নিই একমাত্র নৈসর্গিক উপাদানরূপে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। মানুষের বন্ধুরূপে অগ্নির অন্যান্য যে ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তা হল নিশ্চিত শস্য সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা ও বহু সন্তান উৎপাদনে সহায়কের ভূমিকা। প্রথম অগ্নি-উৎপাদনক ও কার্য-বিধায়ক গোষ্ঠীর দৈব প্রতিরূপ হিসাবে 'সাধ্য'গণ পরিকল্পিত হয়েছিল। একই প্রত্নকথায় অগ্নিকে সেই পুরুষের পদবী দেওয়া হয়েছে, যিনি নিজেকে আত্মযজ্ঞে সমর্পণ ক'রে বিশ্বসৃষ্টি সম্পাদন করেন।

কোনও প্রাগার্য সংসার-বিমুখ, ভ্রমমান সাধক-গোষ্ঠীর প্রতি ইন্দ্রের নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতকতার আভাস রয়েছে একদল 'যতি'কে সালাবৃকদের কাছে সঁপে দেওয়ার নিষ্ঠুর কাহিনীতে।

যজ্ঞীয় আহুতিগুলির মধ্যে 'ইলা' বা 'ইড়া' (যজ্ঞভাগ) বিশেষ পবিত্র বস্তু। দুটি পরস্পর সংবদ্ধ উপাখ্যানের মধ্যে এই পবিত্রতার কল্পনাকে মহিমান্বিত করা হয়েছে। পূষা ভ্রান্তিবশে সাধারণ খাদ্য ভেবে কঠিন ইড়াকে চর্বণ ও ভক্ষণ করতে গিয়ে দন্তহীন হয়ে পড়েছিলেন। বৃহস্পতি যজ্ঞের পবিত্রশক্তির ধারক ; বিশ্বজগতের সর্বত্রগামী চক্ষু, অর্থাৎ সূর্যের মাধ্যমে তিনি ইলার দিকে দৃষ্টিপাত করেন ও অন্যান্য দেবতাদের মতো অগ্নির মাধ্যমে তাকে গ্রহণ করেন। এই প্রত্নকথার আহুতির মৌলরূপটি পরিবর্তিত হয়ে একটি সর্বাতিশায়ী দৈব-শক্তির প্রতিনিধিতে পরিণত হয়েছে। এ ধরনের প্রত্নকথার সাহায্যে যজ্ঞ বিষয়ে যথার্থ ও অনুষ্ঠানগতভাবে প্রত্যয়সিদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে এবং তাদের মধ্যেই যজ্ঞ নিত্যনূতন মাত্রা, মর্যাদা ও গৌরব অর্জন করে। প্রকৃতপক্ষে এটাই যজুর্বেদের অন্যতম প্রধান অবদান।

যদিও অধিকাংশ প্রত্নকথাই চরিত্রগতভাবে হেতুসন্ধানী, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এসব কাহিনীর মধ্যে দেবতাদের প্রতি নূতন এক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ও পাওয়া যায়। এগুলি প্রধানত সাতটি ধারায় বিভক্ত। যেমন—(১) কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসিদ্ধির ক্ষেত্রে একক দেবতার অসামর্থ্যের ফলে একটি বিশেষ বাধা অতিক্রম করার প্রয়োজনে নির্দিষ্ট কোনো অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়। সূর্য, বরুণ ও অশ্বীদের সম্পর্কে এ জাতীয় কিছু দেবকাহিনী প্রচলিত রয়েছে। (২) কিছু কিছু দেবকাহিনীতে একটি নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে যে, দেবতারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কোনো কার্যসাধনে ব্রতী হয়েও ব্যর্থ হলেন, পরে প্রজাপতির কাছে উপদেশ প্রার্থনা করলে তিনি তাদের নির্দিষ্ট একটি যজ্ঞ সম্পাদন করতে নির্দেশ দেন। তবে এ জাতীয় প্রত্নকথা এখনও বিরল, ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। (৩) কোনও কোনও প্রত্নকথা প্রায়শ্চিত্তমূলক—যজ্ঞকর্মে ত্রুটিবিচ্যুতি এবং ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্য ও ভ্রান্তিজনিত পাপক্ষালনের প্রয়োজনে এগুলি রচিত। তবে, পরবর্তী ব্রাহ্মণসাহিত্যে আনুষ্ঠানিক প্রায়শ্চিত্তের ভূমিকা যতটা গুরুত্বপূর্ণ, যজুর্বেদ সংহিতায় ততটা নয়। (৪) কিছু কিছু নিবৃত্তিমূলক ও স্বস্তিবাচক কাহিনীও গড়ে উঠেছে, মুখ্যত অদিতি, ইন্দ্র ও রুদ্রকে কেন্দ্র করে। (৫) কখনো কখনো অনুষ্ঠান বা যজ্ঞীয় অনুপুঙ্খকে মহিমান্বিত করার প্রবণতা এ কাহিনীগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। আদিত্যদের অঙ্গিরসের দ্বারা অগ্নিচয়ন, দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের আয়োজন ইত্যাদির বিবরণে এর নিদর্শন রয়েছে। (৬) কখনো বা সমস্যা নিরসনের চতুর কৌশলরূপে কোনও কোনও প্রত্নকথা প্রযুক্ত হয়। উদাহরণরূপে বষট্ উচ্চারণের সঙ্গে সম্পর্কিত ক্ষুদ্র কাহিনীটির উল্লেখ করা যেতে

পারে। (৭) কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অভিনব দৃষ্টিভঙ্গির অভিব্যক্তি বিস্ময়কর কিছু কাহিনীতে পরিস্ফুট হয়েছে। তাই কোথাও বা দেখা যায় যে, সমস্ত দেবতাই বৈরি জনগোষ্ঠীরূপে আকস্মিকভাবে চিত্রিত হয়েছেন যাঁদের কাজ হ'ল মানুষের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত ক'রে তাদের বিভ্রান্ত করা। সম্ভবত, আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ইতোমধ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান ব্যয়ে, জটিলতায় ও নিয়মের ক্রমবর্ধমান বাহুল্যে দুর্বহ হয়ে দাঁড়িয়েছে ; কেবলমাত্র অত্যন্ত ধনী ব্যক্তিই তখন যজ্ঞ সম্পন্ন করতে পারতেন। ফলে, সাধারণ মানুষ নিতান্ত দর্শক হিসেবে দেবতাদের দেখতে পেতেন অত্যাচারী ও মানুষকে পীড়ণ ক'রে হব্য আদায় করার ভূমিকাতে। সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত যজ্ঞও তাদের কাছে ঈপ্সিত ফলদানে অসমর্থ ব'লে প্রতিপন্ন হয়েছিল, কারণ যজ্ঞ ক'রে অভীষ্ট ফললাভের ব্যর্থ মানুষের অভিজ্ঞতায় জমা হচ্ছিল ক্রমেই। দেবতাদের যেখানে যজ্ঞের বিধ্বংসী এবং অপহারক রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে রচয়িতার প্রকৃত অভিপ্রায় সম্পর্কে ধারণা করা কঠিন। সম্ভবত, এব মধ্যে আমরা বিচ্ছিন্নতাবোধ, অবিশ্বাস এবং দৈব প্রতারণা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা লক্ষ্য করতে পারি। যদিও এই অংশটি যে মন্ত্র সংকলনের সময় বর্জিত হয় নি সেটার বিস্ময় থেকেই যায়। যে সোমযাগ ক্রমশ বর্ধিত গুরুত্ব অর্জন করেছিল, তার সপ্রশংস উল্লেখ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল ব'লেই সম্ভবত এই আপাত-বিরোধী অংশটি পরিত্যক্ত হয় নি।

কখনো কখনো প্রত্নকথার মধ্য দিয়ে কোনও বিকাশোন্মুখ ভাবাদর্শ বিশ্লেষণের উপযোগী অন্তর্দৃষ্টি আমরা লাভ করি যা পববর্তী সাহিত্যে ক্রমে প্রধান আধ্যাত্মিক প্রবণতারূপে পবিণতি লাভ করেছে। যেমন নির্বাণোন্মুখ গার্হপত্য অগ্নির পুননবীকরণের নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করার সময় তাকে জীর্ণ নির্মোকযুক্ত সর্পের সঙ্গে সুসংগত একটি প্রত্নকথায় কথিত হয়েছে যে, বদ্রুপুত্র কসর্নীর যথোপযুক্ত ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল যার সাহায্যে সে নতুন নির্মোক লাভ করতে পারে। পরবর্তীকালে এই চিত্রকল্পই আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তির যে তত্ত্বে রূপান্তরিত হয়েছিল, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রয়েছে ভগবদ্গীতার একটি বিখ্যাত শ্লোকে। সেখানে আমরা সেই মানুষের মৃত্যুহীন ভাবমূর্তি দেখতে পাই, যে জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করার মতোই মৃত্যুকালে শরীর ত্যাগ করে। ব্যাবিলনীয় মহাকাব্য 'এপিক অব্ গিল্‌গামেশ্'-এর অনুরূপ রূপটিই ব্যবহৃত হয়েছে। গিল্‌গামেশ্ মহাকাব্যে মানুষের অমরত্বের জন্য আহৃত অমৃত হঠাৎ পান ক'রে সাপ নির্মোক ত্যাগ করে নবজীবন লাভ করে। বস্তুত, জন্মান্তরে দেহান্তর-প্রাপ্তির কল্পনার পশ্চাতে যে সাপের নির্মোক-মোচনই রয়েছে এতে বিশেষ সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং প্রত্নকথাগুলি বিবিধ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে, বহু ভিন্ন ভিন্ন সচেতন ও অবচেতন দাবি-পূরণ করতে গিয়ে, বিচিত্র আনুষ্ঠানিক অনুপুঙ্খের আপাত-যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নির্ণয় করেছিল। এই সব প্রত্নকথা সামাজিক

আচারকে যুক্তিগ্রাহ্য ক'রে, সামূহিক বা ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্যকে নিবারণ ক'রে, দেবতাদের সন্তুষ্টি বিধান ক'রে তাদের গোষ্ঠী বা ব্যক্তির প্রতি প্রসন্ন ক'রে তোলে, আনুষ্ঠানিক ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করে এবং ব্যক্তিগত দৈব-দুর্বিপাকের প্রতিবিধান করে। কখনও বা প্রত্নকথার মধ্যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি প্রতিফলিত হয়। যমের আধিপত্য, স্বর্গের অমরতা এবং সত্র, দীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে যে ভাবনা ব্যক্ত হয়েছে, তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে একটি বস্তুনিষ্ঠ পরিপ্রেক্ষিত।

আনুষ্ঠানিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে প্রত্নকথাগুলি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে তাদের বিচিত্র ভূমিকা পালন করে। কোনও কোনও প্রত্নকথায় যজমান ও পুরোহিতের কাছ থেকে যজ্ঞের পলায়ন এবং যজমান ও পুরোহিতের অন্বেষণ ও পরে শর্তাধীন প্রাপ্তি বর্ণিত। প্রতি ক্ষেত্রেই এই প্রাপ্তির জন্য অনুষ্ঠিত কোনো একটি অনুপুঙ্খ এর পরে যজ্ঞে সন্নিবেশিত হয়। এইভাবেই কাহিনীর মধ্য দিয়ে যজ্ঞের জটিলতা ও নব নব অঙ্গবিন্যাস ঘটে। এটা ঘটে যজ্ঞানুষ্ঠান ক্রমশ জটিল, ব্যয়সাধ্য, বহু পুরোহিত-নির্ভর ও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার যুগে। তখন যজ্ঞীয় পুরোডাশ ও উচ্চ বেদীয় সঙ্গে যথাক্রমে কচ্ছপ ও সিংহীকে উপমিত করা হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, অগ্নি, রুদ্র বা বিষ্ণুর যজ্ঞভূমি থেকে পলায়ন বা যজমানদের কাছ থেকে আত্মগোপন করাও বর্ণিত হয়েছে। যজ্ঞীয় আহুতি প্রদানে বা বিশেষ কিছু মন্ত্র উচ্চারণে বা নির্দিষ্ট ছন্দে মন্ত্র-গ্রন্থনায় কিংবা পৃথকঅনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শনের শর্তে সেই দেবতা শেষ পর্যন্ত যজ্ঞে অংশগ্রহণে সম্মতও হয়েছেন। এসব কাহিনীতে প্রতিফলিত হয়েছে সমাজে সুবিধাভোগী কিছু ব্যক্তির মান-অপমান বোধ ও তাদের প্রতি উদ্দিষ্ট স্তাবকতা। তৃতীয়ত, দেবতা ও অসুরদের চিরকালের সংগ্রাম, অনিবার্যভাবে দেবতাদের পরাজয় এবং শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোনো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জয়লাভ সুনিশ্চিত হওয়া ইত্যাদিও কিছু কিছু প্রত্নকথায় লক্ষ্য করা যায়। কোনো নবাবিষ্কৃত অনুষ্ঠানের অপরিহার্যতা ও উপযোগিতাকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠার জন্যই এগুলির সৃষ্টি। চতুর্থত, দেবতাদের সঙ্গে অসুর বা অন্যান্য তির্যক-যোনির প্রতিযোগিতাও বর্ণিত হয়েছে—এইসব ক্ষেত্রে কোনো কোনো অনুষ্ঠানের নিয়ামক ভূমিকা লক্ষণীয়। পঞ্চমত, প্রাকৃতিক ঘটনাবলী প্রত্নকথার মাধ্যমে আপাতভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টাও চোখে পড়ে, যে গৌণ কোনো আনুষ্ঠানিক অনুপুঙ্খের সঙ্গে এদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান। ষষ্ঠত, কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রত্নকথা আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দিয়ে আপাতভাবে অনুষ্ঠানটির যৌক্তিকতা বিধান করে। যেমন বলা হয়েছে, দীক্ষিত ব্যক্তির নিদ্রামগ্ন হওয়া উচিত নয়, যেহেতু নিদ্রিত যজমানকেই রাক্ষসেরা আক্রমণ করে থাকে। সপ্তমত, কিছু কাহিনীর মাধ্যমে সামাজিক আচার ব্যবহারও ব্যাখ্যাত হয়। বহুবিবাহ প্রথা, পত্নীকে প্রহার করার প্রচলিত ব্যবস্থা, যজ্ঞে নারীদের যোগদানের

বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক নিষেধ, যজ্ঞের দক্ষিণা, চিকিৎসকদের উপর সামাজিক তাচ্ছিল্যসূচক বিধিনিষেধ আরোপ ইত্যাদি নিশ্চিতভাবেই বিবিধ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উপাদানেব পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছিল ; কিন্তু এখন সেইগুলি প্রত্নকথার মধ্য দিয়েই যুক্তিযুক্ত ব'লে প্রমাণিত ও জনসমাজে সেগুলিকে গ্রহণযোগ্য ও নির্বিচারে আচরণীয় ক'রে তোলার চেষ্টা হচ্ছে এসব কাহিনীর অবতারণা ক'রে। সামাজিক ও মানবিক স্তর থেকে পবিত্র অনুষ্ঠানের স্তরে উন্নীত ক'রে এই সব ব্যাখ্যাকে চূড়ান্ত ও তর্কাতীত রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। অষ্টমত, কিছু কিছু শব্দের কাল্পনিক ব্যুৎপত্তিকে সমর্থন করার প্রয়োজনে কিছু কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছিল। বহু ক্ষেত্রেই এই সব ব্যুৎপত্তি শেষ পর্যন্ত প্রকৃত সময়সীমা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো ধূসর প্রত্ন-পৌরাণিক অতীতে উপনীত হয়েছে। এই প্রবণতার সঙ্গে ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাসের পরোক্ষ সম্পর্ক অনুমেয়। পরিশেষে বহু-সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী, উপকাহিনী গড়ে উঠেছিল ভিন্ন ধরনের বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে সাম্য বা একাত্মতা কল্পনার মধ্যে দিয়ে। যেমন রুদ্রই অগ্নি, মৃত্যু ব্রহ্মারই রূপ, যজ্ঞ বেদীতে স্থাপিত অগ্নি প্রকৃতপক্ষে নিদ্রিত সিংহ, সিন্ধুরা বরুণের পত্নী, ব্রহ্মা দেবতাদের বৃহস্পতি, বরুণই দুর্বাক ইত্যাদি। স্পষ্টতই এ ধরনের সমতা স্থাপনের প্রবণতা মূলত পৌরাণিক এবং নিতান্ত পরোক্ষভাবে আনুষ্ঠানিক। তাই, আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার চেয়ে সেইসব প্রক্রিয়ার পশ্চাদবর্তী বিশ্বাসকে স্পষ্ট করাই এগুলির লক্ষ্য। স্বাভাবিকভাবেই সমতা বা একাত্মতা স্থাপনের প্রবণতা সর্বদা একইভাবে উপস্থিত নয়, ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী এবং অনুষ্ঠানে এগুলির রূপও ভিন্ন ভিন্ন। প্রত্নকথাগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য সন্ধান করা বৃথা ; একসঙ্গে একটিমাত্র উদাহরণকে সুস্পষ্ট করার উদ্দেশ্যেই ব্যাখ্যার প্রয়োগ হয় এবং ঠিক তার পরেই নতুন কোনো নিদর্শনের জন্য সাম্যবোধের নতুন এক সূত্র সন্ধান অনিবার্য হয়ে পড়ে।

অগ্নিচয়ন অনুষ্ঠানের অন্যতম অংশ রুদ্রহোম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কেননা বিখ্যাত শতরুদ্রীয় এর অন্তর্ভুক্ত। রুদ্রহোম এগারটি অধ্যায়ে বিভক্ত ; শেষের দুটিতে রয়েছে রুদ্রের প্রতি নিবেদিত ঋক্ ও যজুমন্ত্রসমূহ। প্রথম অধ্যায়ে রুদ্রের প্রসন্নতা অর্জনের উদ্দেশ্য প্রযুক্ত মন্ত্র এবং দ্বিতীয় থেকে নবম অধ্যায়ে দুই বা এক অর্ঘ্যযুক্ত রুদ্রপ্রশস্তি রয়েছে। বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক অনুপুঙ্খের মধ্যে রুদ্রের ক্রোধ প্রশমনের আকাঙ্ক্ষাই মূর্ত হয়ে উঠেছে—শতরুদ্রীয় সূক্তে রুদ্র শতাধিক নাম বা বিশেষণে ভূষিত হয়েছেন। বস্তুত, সমস্ত প্রাচীন প্রত্নপুরাণের সাধারণ চরিত্রলক্ষণই হ'ল অসংখ্য প্রায়োগিক গুণ ও নামে অলংকৃত ক'রে পূজার্হ দেবতার বলদৃপ্ত ও শক্তিমান ভাবমূর্তি রচনার প্রবণতা। বিভিন্ন মন্ত্র বিশ্লেষণ ক'রে রুদ্রদেবের আর্য ও অনার্য উৎসের ইঙ্গিত

প্রবল হয়ে ওঠে। যদিও আমাদের কাছে কোনও সুস্পষ্ট নিদর্শন নেই, তবুও অনুমান করতে বাধা নেই যে, ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দেও বৈদিক আর্য ধর্মবোধ অর্থাৎ বৃহৎ ঐতিহ্যের সঙ্গে অনার্য সংস্কৃতির অর্থাৎ লঘু ঐতিহ্যের সহাবস্থান সম্ভব ছিল। রুদ্রের প্রাথমিক উৎসস্থল অনার্য সংস্কৃতির মধ্যে থাকলেও ঋগ্বেদ এবং যজুর্বেদে যজ্ঞানুষ্ঠানকে নিষ্কণ্টক করার প্রয়োজনে আর্যরা বিশেষভাবে তাঁর প্রসন্নতা কামনা করেছেন। পরবর্তী বহু শতাব্দী ধ'রে ভারতবর্ষে যে সংশ্লেষণ ও সমন্বয়ের প্রক্রিয়া অব্যাহতভাবে চলছিল, যজুর্বেদে তারই সূচনা লক্ষ্য করি। অন্তরঙ্গ নিদর্শন থেকে মনে হয় যে, রুদ্র জনপদ বা গ্রামের দেবতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন নির্জন অঞ্চল ও দূরবর্তী নদী ও জলস্রোতের দেবতা। সম্ভবত, তিনি মূলত অরণ্য থেকে কাষ্ঠ সমিধ্ ও জল আহরণকারী শূদ্র এবং ব্রাত্যদের দেবতা। এছাড়া, রুদ্রকে বিভিন্ন আকৃতি ও বর্ণ এবং বহু বিচিত্র জীবিকার ব্যবস্থাপকরূপে বন্দনা করা হয়েছে। এই সব জীবিকার মধ্যে এমন কিছু কিছুও রয়েছে যা আর্য ধর্মবোধ অনুযায়ী দেবতার উপযুক্ত নয়—সম্ভবত, আদিম অধিবাসীদের প্রতি আর্যদের তাচ্ছিল্য ও ঘৃণাই এতে প্রকাশিত। আর্য-বসতি থেকে দূরে এইসব নীচ, অবহেলিত ও অশুচি বৃত্তিজীবীরা নির্বাসিত হয়েছিল ব'লেই তাদের দেবতা রুদ্রের বিষয়ে পড়ি যে, তিনি অরণ্যে, পর্বতে ও নির্জন অঞ্চলে চির ভ্রমমাণ। আর্যমানসে শত্রুর চতুর কৌশল ও নিজেদের সাময়িক কিছু পরাজয়ের স্মৃতি জাগরূক ছিল ব'লেই এবং জয়ের পরে সমৃদ্ধতর আর্যপল্লীতে প্রত্যন্তবাসী প্রাগার্য মধ্যে মধ্যে হানা দিত ব'লে অনার্যদের দস্যু, প্রতারক, তস্কর ইত্যাদি বিশেষণ দেওয়া হয়েছে। নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে অনার্যরা বাধ্য হয়ে যে লুণ্ঠনের আশ্রয় নিত, তারও ইঙ্গিত রয়েছে বর্ণনায়। বহু ক্ষেত্রে রুদ্রের প্রশস্তি-বাচক বিশেষণে যে বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে, তা তাৎপর্যপূর্ণ। বিজয়ী আর্যদের নিকট স্বভাবতই পরাজিত জনগোষ্ঠী নামহীন জনতারূপে প্রতিভাত হ'ত, যদিও ঋগ্বেদে গোষ্ঠীপতিদের কয়েকটি নাম পাওয়া যায়। এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত কয়েকটি জীবিকার উল্লেখ রয়েছে ঃ দ্বারপাল, শিকারী, কুকুর-পালক, দারুশিল্পী, রথনির্মাতা, কুম্ভকার, ধাতুশিল্পী প্রভৃতি। সম্ভবত, এদের মধ্যে সিন্ধু-উপত্যকার উৎকৃষ্ট কারুশিল্পীর পরিচয়ও নিহিত, যাদের প্রতি যাযাবর আর্যরা শুধুই তাচ্ছিল্যই প্রকাশ করতেন। এছাড়া, আমরা আরও কিছু বৃত্তিজীবী, কৌম সমাজভুক্ত পুঞ্জিষ্ঠ ও নিষাদ, শিপিবিষ্ট গোষ্ঠীভুক্ত দেবতা ত্রয়ী অর্থাৎ ভব, শর্ব ও শিপিবিষ্টের কথা উল্লেখ করতে পারি,—এদেরই সমন্বয়ে পরবর্তীকালে রুদ্র-শিব দেবতাটির জন্ম হয়েছিল। এই যুগনদ্ধ দেব-কল্পনায় ও দেবতার দেহ বর্ণনায় অনার্য জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আর্যদের মানসিক প্রতিক্রিয়া অভিব্যক্ত। জাতিগত সংমিশ্রণ ও ধর্মীয় সংশ্লেষণের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন অনার্য ভাবনা যখন কতকটা মর্যাদা অর্জন করেছিল, আর্যদের ধর্মতত্ত্বে তখনই তাদের জন্য চূড়ান্ত স্থানও নির্দিষ্ট হ'ল। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের সঙ্গে যজুর্বেদেও এই যুগের অন্যতম সৃষ্টি।

অনার্যদের দেবতার বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনতর আর্যদেবতা রুদ্রের নিয়ত উল্লেখও দেখতে পাই ; তিনি মূলত প্রসন্ন ভাবমূর্তিরই দেবতা ছিলেন এবং যজুর্বেদের ক্ষেত্রেও তাঁর এই প্রসন্নতা অটুট ছিল। তবে, যজুর্বেদে চিত্রিত রুদ্রদেবের ব্যক্তিত্বে হয়ত বিমূর্ত কোনো দেবতার অর্থাৎ আকস্মিক দুর্ঘটনার অধিষ্ঠাতা একটি দেবতার উপযুক্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য গুণাবলী যুক্ত হয়েছিল। সৌর দেব-গোষ্ঠীর প্রসন্নতা প্রার্থনা ক'রে যতই প্রশস্তিবচন উচ্চারিত হোক না কেন, তৎকালীন সমাজে তা আকস্মিক দুর্ঘটনার কোনও অভাব ছিল না—গবাদি পশু হঠাৎ মহামারীতে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ত, মানব-শিশুর মৃত্যুর হারও অধিক ছিল, বহুবিধ অজ্ঞাত কারণে মানুষ ক্ষুধা, ব্যাধি, বিপদ ও মৃত্যুর আশঙ্কায় পীড়িত হ'ত। বৈদিক রুদ্রদেবের নেতিমূলক এবং অশুভসূচক ব্যক্তিত্বটি এইসব ধ্বংসকারী শক্তির সমন্বয়েই গড়ে উঠেছিল। বস্তুত, সকল দেবতাই মূলগতভাবে দ্বৈত চরিত্রযুক্ত—তাঁদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রার্থনাতেও তাই দ্বিবিধ তাৎপর্য—দেবতার ব্যক্তিত্বে নিহিত সমস্ত অশুভের দূরীকরণ এবং আকাঙ্ক্ষাপূরণের জন্য আশীর্বাদলাভ। আর্যদের দৃষ্টিকোণ থেকে অনার্যরা যেহেতু অমঙ্গলের মূর্ত রূপ ব'লেই গণ্য হ'ত, তাই অনার্য উৎসজাত দেবতাও ভয়ংকর ও অশুভ ব'লে চিত্রিত হতেন। বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে যখন রুদ্রের জটিল ভাবমূর্তি স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছিল, এই দ্বৈত বোধই হয়ে উঠল তাঁর শক্তির উৎস। তাই, অগ্নিচয়নের মতো প্রধান ও গাম্ভীর্যপূর্ণ যাগের অনুষ্ঠানের স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ ক'রেও রুদ্রদেবের প্রসন্নতা লাভের জন্য প্রশস্তি ও প্রার্থনা নিবেদিত হ'ল। আর্য ও অনার্য উপাদানের জাতিগত ও সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের প্রক্রিয়ার একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ স্তরের নিদর্শন শতরুদ্রীয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে। যজুর্বেদের প্রত্নকথাগুলির সৃষ্টির পশ্চাতে যে সামাজিক প্রেরণা সক্রিয় ছিল, তার চরিত্র অনুধাবন করা খুব কঠিন নয়। বিবাহসূত্রে অনার্যরা যখন আর্যদের জীবনধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আর্য ধর্ম-ভাবনার মৌল প্রবণতাগুলি আত্মসাৎ ক'রে নিচ্ছিল, তখন নতুন উপাসনা পদ্ধতি গ্রহণের সমর্থনে ধীরে ধীরে তাদের যৌথ অবচেতনায়—সুসঙ্গত প্রত্নপৌরাণিক উপাখ্যান সৃষ্টি হ'ল। তৈত্তিরীয় সংহিতার বিভিন্ন প্রত্নকথার ক্ষেত্রে এই প্রবণতাই অক্ষ-স্বরূপ।

চূড়ান্ত বিচারে একথাই বলা যায় যে, যজ্ঞের মহিমা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞানুষ্ঠানের দক্ষিণার গুরুত্বও বহুগুণ বর্ধিত হ'ল। এই দক্ষিণার বর্ধিত গৌরব থেকে প্রমাণিত হয় যে, পুরোহিত শ্রেণীর ক্রমিক উত্থানের ফলে তারা সমাজের অগ্রগামী অংশে পরিণত হয়েছিল। ইতোমধ্যে আক্রমণকারী আর্যরা ভারতভূমিতে কৃষিজীবীরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজেদের আয়-বৃদ্ধির প্রয়োজনে গোসম্পদ উন্নয়ন, প্রাথমিক কারুশিল্প এবং কিছু কিছু বাণিজ্য জীবিকা ও বৃত্তি হিসাবে অবলম্বন করেছিল। সুনির্দিষ্ট

কৃষিব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে উদ্বৃত্তজনিত নবলব্ধ বিলাসিতার সূত্রপাত হ'ল ; মৃগয়া ও পশুপালনের যুগে যা সম্ভব ছিল না, কৃষিব্যবস্থার যুগে বর্ষাকালেও খাদ্য সঞ্চয় করা সম্ভব হ'ল। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও শ্রেণীগত বিভাজনের ফলে কৃষিকার্যের দায়িত্ব বৈশ্য ও শূদ্রদের উপর ন্যস্ত হ'ল, যাতে উদ্বৃত্ত সম্পদ সৃষ্টি হয় এবং তারই কল্যাণে সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশের মুষ্টিমেয় কিছু লোক উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পায়। এই পরশ্রমভোগী শ্রেণীর লোকেরাই কৃষিকার্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক বর্ষ-পঞ্জী আবিষ্কার করল এবং এরাই জ্ঞানে, অভিজ্ঞতায়, যুক্তি, বিদ্যা ও সাধারণী করণের ক্ষেত্রে অনেক উন্নত ছিল। সমাজের পক্ষ থেকে এরা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতেই শুধু সাহায্য করত না, সমাজের আধ্যাত্মিক অভিভাবকের ভূমিকা অর্জন ক'রে নিল এবং এরাই যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাও ব্যাখ্যা করেছিল। শাসন বা জাদু-পুরোহিত এবং জাদুকর সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ উত্তরসূরি রূপে তাদের গ্রহণ করা যেতে পারে। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের বহু প্রাচীন রীতি অর্থাৎ সম্পদের প্রতীকরূপে আদিম পশুচারী যুগের সরল পশুবলি প্রথাকে এঁরা নূতন জটিল এক স্তরে পুনরুজ্জীবিত বা পুনঃপ্রচলিত করলেন এবং অগ্নির উদ্দেশে তার প্রত্যেকটি অঙ্গ অর্পণ ক'রে জনগণের কাছে এই অনুষ্ঠানের প্রত্যাশিত ফলগুলি বিবৃত করলেন। এইভাবে কৃষিজীবী যুগে পশুবলি নূতন ভূমিকায় ও নূতন মহিমায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

এই প্রাচীন প্রথাকে সাহিত্যগত ও আনুষ্ঠানিকভাবে সুসমন্বিত করার প্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষ ফসলরূপেই যজুর্বেদ জন্ম নিয়েছিল ; সুষম ও সুস্থির খাদ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা এবং তার ফলস্বরূপ উৎপাদনের স্তরে জনসাধারণের একটি অংশের শ্রমসাধ্য কর্ম থেকে অব্যাহতি লাভের ফলে এটা সম্ভব হয়ে উঠেছিল। উৎপাদন প্রক্রিয়াকে নির্বিঘ্নে ও উৎপাদন প্রচুর পরিমাণ ক'রে তোলার প্রয়োজনে প্রাগুক্ত সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তির উন্মেষ কল্পনা করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে এই প্রত্যয়ও সুদৃঢ় হয়েছিল যে, বিধিমত যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করলে মানুষের সকল প্রচেষ্টা প্রকৃতির দাক্ষিণ্য লাভ করবে, দানব শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করবে না এবং দেবতারা তাদের উপর আশীর্বাদ বর্ষণ করবেন। এইগুলি যেহেতু মৌলিক প্রক্রিয়ারূপে গণ্য হ'ত, পুরোহিত-তন্ত্র গৌরবান্বিত হ'ল, পুরোহিতের সংখ্যাবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিততর হ'ল। যজ্ঞানুষ্ঠানগুলি দীর্ঘতর, জটিলতর, ব্যাপকতর ও অগণ্য হয়ে উঠল এবং যজ্ঞের দক্ষিণা বহুগুণে বৃদ্ধি পেল।

নূতন উৎপাদন-ব্যবস্থা ও অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নূতন নূতন জীবিকার আবির্ভাবও আমরা লক্ষ্য করি। বৎসর জ্ঞাপক 'বর্ষ' শব্দের মধ্যে স্পষ্টতই বার্ষিক বৃষ্টিপাত বা বর্ষার প্রভাব রয়েছে। নক্ষত্র, রাশি ইত্যাদি সম্বন্ধে নবজাত কৌতূহল

সম্ভবত নৌ-বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত যেহেতু বিভিন্ন নক্ষত্রের সঙ্গে পরিচিত হওয়া তৎকালীন নাবিকদের পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল। সরল স্থাপত্যের সঙ্গে চিত্রকল্পের ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যে, কৃষিজীবী সমাজের মধ্যে ক্রমে স্থায়ী বাসগৃহ নির্মাণের বিদ্যা বিকশিত হয়েছিল। পরবর্তী যুগের ব্রাহ্মণ সাহিত্যে অতিপল্লবিত যজ্ঞধর্মের যে বিস্তারিত বর্ণনা আমরা পাই, তারই অব্যবহিত পূর্ববর্তী যজ্ঞপ্রক্রিয়াগুলি যজুর্বেদে বিবৃত হয়েছে। যজুর্বেদ-সংহিতার শেষ পনেরোটি অধ্যায় (২৬-৪০) পরবর্তীকালে সংযোজিত ব'লেই নবগঠিত রাজ্যসমূহের প্রশাসক রাজাদের দ্বারা পালনীয় সৌত্রামণী, পুরুষমেধ, সর্বমেধ ও প্রবর্গ্যের মতো যজ্ঞ সেখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ছাব্বিশ অধ্যায়ের প্রথম ছয়টি মন্ত্র অর্থাৎ ঃ 'শিবসংকল্প' সূত্রটি আপন স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে উপনিষদের সঙ্গে তুলনীয় এবং এ সংহিতার শেষতম অধ্যায়টিই ঈশোপনিবদ্। সুতরাং এই পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে স্পষ্টত নবোদগত ক্ষত্রিয় ও রাজকীয় যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযোগী মন্ত্র এবং ঔপনিষদিক বিষয়বস্তু সংযুক্ত ক'রে যজুর্বেদ সংহিতাকে সার্বভৌম রূপ দেওয়ার সচেতন চেষ্টা হয়েছিল। এভাবে যজুর্বেদের মধ্যে যজ্ঞানুষ্ঠানের ক্রমাগত জটিলতা অর্জনের প্রক্রিয়া এমন একটি কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিবৃত হয়েছে যখন উত্তরভারতে সুদূরপ্রসারী সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয় আর্যের ধর্মভাবনার নিদর্শনরূপে যজুর্বেদের বিরাট ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য ; নিরন্তর বৃদ্ধি, পরিবর্তন ও উন্নতির উপযোগী গতিশীলতার সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত এর মধ্যে রয়েছে ; বিশেষত শেষের কয়েকটি অধ্যায়ের পরবর্তী বৈদিক যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপাদানের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই।

চতুর্থ অধ্যায়

অথর্ববেদ সংহিতা

পাঠভেদ

অথর্ববেদ সংহিতার দুটি শাখা পাওয়া গেছে। প্রয়াত প্রখ্যাত গবেষক দুর্গামোহন ভট্টাচার্য উড়িষ্যায় পৈপ্পলাদ শাখার পাণ্ডুলিপি খুঁজে পাওয়ার পূর্বে হুইট্‌নি শৌনক শাখাটি আবিষ্কার করেছিলেন। প্রাচীন সাহিত্যে অথর্ববেদের ন'টি শাখা উল্লিখিত হয়েছে ঃ শৌনক, তৌদ, মৌদ, পৈপ্পলাদ, জাজল, জলদ, চরণবৈদ্য, ব্রহ্মবদ ও বেদদর্শ। এদের মধ্যে প্রথম ছ'টি সম্ভবত পৃথক শাখারূপে যথার্থই বিদ্যমান ছিল ; চরণবৈদ্য বা ভ্রমমাণ চিকিৎসকও সম্ভবত অথর্ববেদের ভেষজ বিষয়ের সূক্তগুলি থেকে উদ্ভূত প্রতিশব্দ বিশেষ। অনুরূপভাবে 'ব্রহ্মবদ' কথাটি ব্রহ্মবেদ শব্দের সামান্য রূপান্তরিত প্রতিশব্দ। স্মরণীয়, অথর্ববেদের পুরোহিতের নাম ব্রহ্মা। 'বেদদর্শ' শব্দের মধ্যে দীর্ঘকাল যাবৎ অবহেলিত অথর্ববেদের গৌরবায়ণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শৌনক ও পৈপ্পলাদ শাখার পাঠের তুলনামূলক আলোচনা ক'রে আমরা যে বিপুল সংখ্যক পাঠভেদের নিদর্শন পাই তা মূলত যজুর্বেদের কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখার মধ্যবর্তী পাঠভেদের সঙ্গেই তুলনীয়। পৈপ্পলাদ শাখার মধ্যে ব্রাত্য অংশ প্রায় সম্পূর্ণতই অনুপস্থিত ; এমন কি, অথর্ববেদের দুটি সূত্রগ্রন্থ, বৈতান ও কৌশিকের মধ্যেও তার কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

মূলপাঠ

অথর্ববেদ-সংহিতা মোট কুড়িটি অধ্যায়ে বিভক্ত ; তার মধ্যে শেষ দুটি অধ্যায় স্পষ্টতই পরবর্তীকালে সংযোজিত যদিও বহুপূর্বেই এগুলি রচিত হয়ে গিয়েছিল। প্রথম পাঁচটি অধ্যায়ে মোটামুটিভাবে সমান দৈর্ঘ্যের সূক্ত থাকলেও ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে হ্রস্বতর সূক্তের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত সূক্তগুলিতে সামাজিক ও পারিবারিক কল্যাণ সাধনের উপযোগী অনুষ্ঠান ছাড়াও প্রতিযোগী ও শত্রুদের ধ্বংস কামনায় প্রযুক্ত অনুষ্ঠানের বর্ণনা রয়েছে। সংহিতায় দ্বিতীয় অংশে অর্থাৎ অষ্টম থেকে দ্বাদশ অধ্যায়ে পূর্ববর্তী অংশে প্রাপ্ত সূক্তগুলির অনুরূপ রচনার

সন্ধান পাই ; তবে এছাড়াও বহুসংখ্যক দীর্ঘতর দার্শনিক ও সৃষ্টিতত্ত্বমূলক সূক্তও সেখানে পাওয়া যায়। তৃতীয় অংশ অর্থাৎ ত্রয়োদশ থেকে বিংশতিতম অধ্যায় স্বভাববৈশিষ্ট্য পরিশিষ্ট জাতীয় ; অথর্ববেদ প্রাতিশাখ্য এদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব ব'লেই এই অংশ যে অনেকটা পরবর্তী কালে রচিত হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়।

প্রথম আঠারটি অধ্যায় মোট চৌত্রিশটি অনুবাকে বিভক্ত ; আবার সপ্তদশ অধ্যায়টি সাতটি অনুবাকযুক্ত একটি প্রপাঠকে বিন্যস্ত। বিংশতিতম অধ্যায়ে যে নয়টি অনুবাক রয়েছে, তার মধ্যে তৃতীয় অনুবাকে তিনটি পর্যায়সূক্ত রয়েছে। অথর্ববেদ সংহিতায় মোট ছ'হাজার মন্ত্র রয়েছে। উনবিংশতিতম অধ্যায়ের পাঠ বহু ক্ষেত্রেই অশুদ্ধ, এতে ব্যাকরণ ও শৈলীগত ত্রুটি লক্ষিত হয়। বস্তুত এই সংহিতার বিংশতিতম অধ্যায়টিও সম্ভবত স্বল্প-প্রতিভাশালী রচয়িতা ও সম্পাদকের দ্বারা সংকলিত হয়েছিল। বিংশতিতম অধ্যায়ের অধিকাংশ উপাদানই ঋগ্বেদ থেকে আহৃত হয়েছে। অভিন্ন বিষয়বস্তুর সূত্রে ঋগ্বেদীয় সূক্তের বহু খণ্ডিত চরণকে একত্র গ্রথিত ক'রে নূতন নূতন মন্ত্র সংকলিত হয়েছে। প্রথম এগারোটি অধ্যায়ের বিষয়সূচিতে যথেষ্ট বৈচিত্র্য রয়েছে। দ্বাদশ অধ্যায়ের দীর্ঘতম অংশে সুদীর্ঘ ভূমি-সূক্ত। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে মূলত ধর্মতত্ত্বমূলক মন্ত্র সন্নিবিষ্ট ; চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রধান বিষয়বস্তু বিবাহ, পঞ্চদশে ব্রাত্য এবং ব্রাহ্মণ সাহিত্যের অনুরূপ গদ্যভাষায় রচিত ষোড়শ অধ্যায়ে সাধারণভাবে দুঃস্বপ্ন দূরীকরণের মন্ত্র বিধৃত রয়েছে। সপ্তদশ অধ্যায়ে যে একটিমাত্র সূক্ত আছে, তাতে আছে সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা ; আবার অষ্টাদশ অধ্যায়টি মূলত পারলৌকিক ক্রিয়া-সংক্রান্ত সূক্তে পরিপূর্ণ। চতুর্দশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ের বহু উপাদান ঋগ্বেদ থেকে গৃহীত ; সেই সঙ্গে সাধারণ-বিষয়বস্তু সম্বলিত পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ঋগ্বেদীয় মন্ত্রাংশকে একত্র ক'রেও বহু পৃথক সূক্তও গঠিত হয়েছে।

রচয়িতা

অথর্ববেদ সংহিতায় সূক্তসমূহের রচয়িতারূপে বহুসংখ্যক নূতন নাম পাওয়া যায়। এদের মধ্যে রয়েছে পরবর্তী মহাকাব্য ও পৌরাণিক যুগের কিছু কিছু বিখ্যাত নাম, যেমন বৃদ্ধ, অজমীড় ও নারায়ণ। অবশ্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অথর্ব, ভৃগু ও অঙ্গিরার নাম উল্লিখিত হয়েছে। ঋগ্বেদের অন্তিম পর্যায়ে প্রজাপতি নামে যে দেবতার উদ্ভব ঘটেছিল, অথর্ববেদে তিনি অন্যতম রচয়িতা। তেমনি ঋগ্বেদের অন্যতম অর্বাচীন দেবতা 'ব্রহ্মা'কে অথর্ববেদের বহু আধ্যাত্মিক ও ধর্মতত্ত্বমূলক সূক্তের রচয়িতারূপে কল্পনা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ কল্পনা কৃত্রিম ; ঐ সব সূক্তের রচয়িতা নয় বিষয়বস্তুই ব্রহ্ম বা পরতত্ত্ব। ঋষি ভৃগু কালের মতো বিমূর্ত ধারণার উপর ভিত্তি

ক'রেও সূক্ত রচনা করেছিলেন, আর অঙ্গিরা ব্যাধি, ডাকিনীবিদ্যা ও ইন্দ্রজালের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। ঋগ্বেদে যে যম-দেবতাকে নিতান্ত যান্ত্রিকভাবে কিছু সূক্তের রচয়িতা ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে এখানেও তিনি বহু সূক্তের রচয়িতা। ঋগ্বেদের বহু ঋষির নাম অথর্ববেদেও মন্ত্রদ্রষ্টারূপে উল্লিখিত ; কিন্তু এখানে যে নূতন নামগুলি পাওয়া যায়, সেগুলি কৌতূহলজনক ঃ প্রধান শাখার রচয়িতা শৌনক, যম, প্রচেতা, শম্ভু এবং ক্ষত্রিয়- ঋষি বিশ্বামিত্র বা কৌশিক—এই শেষোক্ত জন অথর্ববেদের কৌশিক সূত্রের রচয়িতারূপেও কথিত। প্রায়ই আমরা নিম্নোক্ত সমাসবদ্ধ শব্দ খুঁজে পাই ঃ ভৃগুরাথর্বা, ভৃগ্বঙ্গিরা, অথর্বাঙ্গিরা, প্রত্যঙ্গিরা, তিরশ্চিরঙ্গিরা। স্পষ্টতই অথর্ববেদের মৌলিক সূক্তগুলির প্রথম দ্রষ্টারূপে ভৃগু, অথর্বা ও অঙ্গিরার নাম পরবর্তীকালে ঐতিহ্যগতভাবে নির্দিষ্ট কিছু সূক্তের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট ব্যক্তি নাম বা গোষ্ঠী নামে পরিণত হয়। কুরু, কৌরুস্তুতি ও কৌরুপথী নামগুলিতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল আর্যবসতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে কুরু নামটি গৌরবান্বিত হয়েছিল। অথর্ববেদ ব্রাহ্মণের রচয়িতা গোপথ সংহিতার কয়েকটি সূক্তেরও মন্ত্রদ্রষ্টারূপে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে অথর্বা কখনোই রচয়িতারূপে উল্লিখিত না হলেও অথর্ববেদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সূক্তে যেমন ব্রাত্য-সূক্তে, পৃথিবী ও অগ্নির প্রতি নিবেদিত সূক্তে এবং গভীর দার্শনিক ও কাব্যিক অন্তর্দৃষ্টি-মণ্ডিত স্কম্ভসূক্তে তাঁকে মন্ত্রদ্রষ্টারূপে পাওয়া যাচ্ছে।

অথর্ববেদের সঙ্গে প্রধানত তিনটি নামই সম্পর্কিত ঃ ভৃগু, অথর্বা ও অঙ্গিরা ; এইজন্য এই বেদকে অথর্বাঙ্গিরস বেদ, ব্রহ্মবেদ বা ভৃগ্বঙ্গিরস বলা হয়ে থাকে। সোমযাগের পুরোহিতদের অবস্থান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক অগ্নিদেবের পুরোহিতরূপেই ভৃগু, অঙ্গিরা ও অথর্বার অস্তিত্ব স্বীকৃত। 'অথর্' শব্দটি অগ্নিবাচক প্রাচীন পারসিক শব্দ 'অতর্'-এর এবং পরবর্তীকালের আতস্-এর উৎস থেকে উদ্ভূত এবং অঙ্গিরা শব্দটি 'অগ্নি' শব্দের ধ্বনিগত বিপর্যাস থেকে উদ্ভূত—দুটি ক্ষেত্রেই অস্তিত্ববাচক প্রত্যয় (মতুপ্ ও র) যোগে শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। সুতরাং অথর্বা শব্দটি যে ইন্দো-ইরাণীয় যুগের সমকালীন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে এই শব্দটির তাৎপর্য অস্পষ্ট হয়ে যায় এবং অগ্নি শব্দের ব্যুৎপত্তিজাত প্রতিশব্দ 'অঙ্গিরস্' তার স্থান অধিকার ক'রে নেয়। 'অগ্নিরস্' শব্দের ইন্দো-ইয়োরোপীয় উৎস রয়েছে ; গ্রিক ভাষায় এর সমজাতীয় শব্দ 'আঙ্গেলস্' অর্থাৎ 'দূত'। ঋগ্বেদে দূত শব্দ অগ্নির সাধারণ বিশেষণ এবং দৌত্য তাঁর মৌলিক কর্মরূপে উল্লিখিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, ঋগ্বেদের বিখ্যাত দশরাজার যুদ্ধে সুদাসের বিরোধীপক্ষে অবস্থিত কৌম বা গোষ্ঠীর নামরূপে দ্রুহ্যু ও তুর্বশের সঙ্গে ভৃগুও উল্লিখিত হয়েছে। সম্ভবত, ভৃগু কৌম বা গোষ্ঠীর ইতিহাস ইন্দো-ইয়োরোপীয় পর্যায় থেকেই খুঁজে পাওয়া যায়। অগ্নিবাচক

গ্রিক শব্দ ফ্লেগ্ম্‌-এর মধ্যে আমরা ভৃগুর প্রাথমিক সমজাতীয় শব্দের ধ্বনিরূপের সন্ধান পাই। অগ্নিকে নির্বাপিত হতে না দেওয়াই ছিল ভৃগুশ্রেণীভুক্ত পুরোহিতদের প্রাচীন দায়িত্ব।

চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ রচয়িতার নাম ব্রহ্মা। সম্ভবত, অথর্ববেদটি সংহিতা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরেই তিনি পূর্বোক্ত তিনটি শ্রেণীর পুরোহিতদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। অগ্নি আদিম মানুষের বিস্ময় ও ভীতি উদ্রেক করত ; প্রাথমিক স্তরের যে সমস্ত ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ায় পটু পুরোহিতেরা অগ্নি মন্থন ও প্রজ্বলন ক'রে তার সুরক্ষা ও প্রয়োগের ব্যবস্থা করতেন, সমাজে তাঁরা সার্বভৌম সম্মানের অধিকারী হতেন। চিরাগত এই অভ্যাসের কতকটা আভাস অথর্ববেদের 'ব্রহ্মা' শ্রেণীর পুরোহিতদের গৌরবলাভের মধ্যে নিহিত। ইন্দো-ইয়োরোপীয় বা ইন্দো-ইরাণীয় উৎসজাত তিনজন প্রধান পুরোহিতই অথর্ববেদে অগ্নি উপাসনার সঙ্গে সম্পর্কিত ; সুতরাং অনুমান করা যায় যে, সমান্তরাল সোমচর্যা থেকে পৃথক কিন্তু অনুরূপ প্রাচীন অগ্নিচর্যার অংশরূপেই অথর্ববেদ ও তার পুরোহিতদের কার্যকলাপ ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। 'অথর্বাঙ্গিরস' শব্দের দুটি অংশের (অর্থাৎ অর্থবন্‌ ও অঙ্গিরস্‌) তাৎপর্যই হ'ল অগ্নি এবং এই যুগ্ম নামের মধ্যে অগ্নি-উপাসনা, তদপুযোগী প্রত্নকথা ও পুরোহিতদের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রয়েছে। বরুণ ও পাতাললোকের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ভৃগু অথর্ববেদের অন্যতম প্রধান রচিয়তা। ঋগ্বেদের ষষ্ঠমণ্ডলে কথিত হয়েছে যে, অথর্বকর্তৃক অরণিকাষ্ঠের সাহায্যে অগ্নি উৎপাদনের রীতি অন্যান্যদের দ্বারা অনুসৃত হয়েছিল ; পরবর্তী সাহিত্যে অথর্ব ভেষজ বিদ্যার সঙ্গেও সম্পর্কিত।

পরবর্তীকালে যে অথর্ববেদ স্বীকৃতি লাভ করল, তার অন্যতম প্রধান কারণ সম্ভবত ছিল, রাজপুরোহিতরূপে অথর্ববেদের পুরোহিতদের বিশেষ গুরুত্ব ও সমাজে তাদের বিশেষ সুবিধাভোগীর ভূমিকা। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের শেষদিকে যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উত্থান হচ্ছিল, নিজেদের রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণের জন্য অলৌকিক সহায়তা লাভের আশায় রাজারা কোনও জাদুকরকে রাজসভা ও রাজপরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুরোহিতরূপে নিয়োগ করতে বিশেষ উৎসুক ছিলেন। গ্রামের 'শামান' বা জাদু-পুরোহিতই এই মহিমান্বিত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছিলেন, এমন মনে করার কারণ নেই। তাদের মধ্যে যে সমস্ত পুরোহিতেরা আধ্যাত্মিক ও ঐন্দ্রজালিক রহস্য বিদ্যায় পারঙ্গম হয়ে উঠতেন, কেবলমাত্র তাদেরই রাজ-পুরোহিতরূপে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হ'ত, কিন্তু শামান পুরোহিত তার গ্রামবাসী যজমানদের মধ্যেই রয়ে যেতেন অনেকটা বর্তমান ওঝার ভূমিকাতে। যাই হোক, অথর্ববেদের পুরোহিতদের মধ্যে খুব বেশিসংখ্যক লোক এই নতুন সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেতেন না, অধিকাংশ জাদু-বিদ্যায় পারঙ্গম চিকিৎসক-পুরোহিতেরা পূর্বের মতোই ক্রিয়াকাণ্ড পরিচালনা

করতেন। সুতরাং অথর্ববেদের পুরোহিতদের মধ্যেও সুস্পষ্ট শ্রেণীভেদ ছিল। ব্রহ্মৌদন, ব্রহ্মগবী ও বিপুল দক্ষিণা নবোন্নীত রাজ-পুরোহিতেরাই ভোগ করতেন, অপরপক্ষে গ্রামের দরিদ্র শামান পুরোহিতদের সামান্য দক্ষিণাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হ'ত।

অথর্ববেদের পুরোহিতরা রাজ-পুরোহিত রূপে নিযুক্ত হওয়ার পরে সমগ্র গোষ্ঠী তাদের মহিমা স্বীকার ক'রে নিল, ফলে প্রাচীন-পন্থী পুরোহিত সম্প্রদায় এই নবোদিত পুরোহিত শ্রেণীকে আর পূর্বের মতো অবহেলা করতে পারল না। এই রাজ-পুরোহিতরা যজ্ঞের গূঢ় রহস্যে পারঙ্গম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা ও রাজন্যশ্রেণীর কল্যাণ কামনায় ইন্দ্রজালের প্রয়োগও শিখে নিলেন। অথর্ববেদ-বহির্ভূত অধিকাংশ শ্রৌতযাগে অথর্ববেদে শিক্ষিত পুরোহিত 'ব্রহ্মা' নামে অভিহিত হয়ে যজ্ঞের দায়িত্ব পালন করতেন ; অন্যদিকে জনসাধারণের জন্য ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান পরিচালনায় গ্রামের 'শামান' বা জাদুপুরোহিতেরা নিযুক্ত থাকতেন। বিভিন্ন শ্রেণীর সূক্তে এই ত্রিবিধ বিভাজন স্পষ্টভাবে উপলব্ধ হয় এই সূক্তগুলির উদ্দিষ্ট হল ঃ আত্মিক সমৃদ্ধি, যজ্ঞ, কঠোর সাধনা, এবং সুখের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত ব্রহ্মকর্মসমূহ এবং ভাষার উৎকর্ষলাভ। কিছু কিছু সূক্তে পূর্ণিমা, অমাবস্যা এবং তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী রাত্রিসমূহের বিবৃতি পাওয়া যায়। এছাড়া, প্রায়শ্চিত্ত, অগ্নি, খাদ্যলাভ, বিষক্রিয়া থেকে মুক্তি, যজ্ঞবেদী, আহুতি প্রভৃতির মতো সাধারণ পার্থিব বিষয়বস্তুও কিছু কিছু সূক্তে বিধৃত হয়েছে। প্রথম সাতটি অধ্যায় এবং বিংশতিতম অধ্যায়ের ঋগ্বেদের বহুসংখ্যক সূক্ত থেকে ঋণ গৃহীত হয়েছে—যা সাধারণভাবে ঋগ্বেদের দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত প্রথম, অষ্টম ও দশম মণ্ডল থেকে সংকলিত।

বিষয়বস্তু

আনুষ্ঠানিক কারণে অথর্ববেদের বিষয়বস্তু অসংখ্য 'গণ'-এ বিভক্ত হয়েছিল ; যেমন—অভয়, রৌদ্র, বাস্তু, অভিষেক, অপরাজিত, কৃত্যা, স্বস্ত্যয়ন, দুঃস্বপ্ন-নাশন, আয়ুষ্য, মৃগার ইত্যাদি। স্পষ্টতই এ ধরনের বিভাজন কখনই সম্পূর্ণ কিংবা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে পারে না ; তাই এক শ্রেণীর সঙ্গে অপর শ্রেণী প্রায়ই সংলগ্ন হয়ে থাকে এবং ফলস্বরূপ গণগুলিকে আমরা বিষয়বস্তুর সাধারণ বর্গীকরণ রূপেই গ্রহণ করতে পারি।

মোট কুড়িটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম ছয়টি এবং অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে বিবিধ বিষয়ের সূক্ত রয়েছে যাদের উপজীব্য বিষয়বস্তু হ'ল শত্রু, দানব ও রাক্ষসদের বিতাড়ন করা, বিভিন্ন ব্যাধি নিরাময় করা, (যেমন রক্তপাত বন্ধ করা, শিরাবন্ধনী, কৃমি, গলগণ্ড, ক্ষয়রোগ, শ্লীপদ, পাণ্ডুরোগ, সর্পদংশন প্রভৃতি)। পিতৃগৃহ-নিবাসিনী

বঞ্চিতা ও বয়স্কা অনূঢ়া নারীদের প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রার্থনা ছাড়াও অন্যান্য যে সমস্ত বিষয়ে প্রার্থনা নিবেদিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে দীর্ঘজীবন এবং পর্যাপ্ত ও সময়মত বৃষ্টিপাত, সমৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, সামরিক অভিযানে রাজার বিজয়, রাজা ও তাঁর সৈন্যবাহিনীর কল্যাণ, নির্মীয়মাণ গৃহের মঙ্গলবিধান, কৃষিকার্য, গোসম্পদ, বৃক্ষলতা, প্রভৃতি শ্রীবৃদ্ধি, বীরপুত্রের জন্ম, পারিবারিক শান্তি, গূঢ় বিদ্যা ও পরমাত্মা সম্পর্কে জ্ঞান এবং সর্বোপরি জীবনের সর্বপ্রকার অমঙ্গল থেকে মুক্তি। সপ্তম অধ্যায়ে আধ্যাত্মিক কল্যাণ সম্পর্কেই অধিক আগ্রহ : এর বহু সূক্তে আত্মা, পরমাত্মা ও ব্রহ্মের মতো বিমূর্ত ভাবনা রূপায়িত হয়েছে।

নবম অধ্যায়ে আধ্যাত্মিক ও পার্থিব—উভয়বিধ বিষয়ই রয়েছে। তাই, এখানে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়ে বহু সূক্ত দেখি—মধুবিদ্যা, অতিথিপরিচর্যা, পঞ্চৌদন অজ, গার্হস্থ্য শ্রী-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা, ক্ষয়রোগ নিবারণের জন্য প্রার্থনা এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক চিন্তাযুক্ত 'অস্যবামীয়' সূক্তটিও এখানে ঋগ্বেদ থেকে উৎকলিত হয়েছে। এছাড়া দশম ও একাদশ অধ্যায়ের সূক্তগুলির বিষয়বস্তু ঃ খাদ্য, শত্রুবিনাশ, বিষের প্রতিষেধ, পাপের প্রায়শ্চিত্ত, জয়লাভের জন্য রক্ষা-কবচ-বন্ধন, ব্রহ্মচর্য, শতান্নদায়ী গোধন, ব্রাহ্মণের উদ্দেশে খাদ্যদান, বন্ধ্যা ধেনু, যজ্ঞদক্ষিণার গোধন এবং বিশ্বজগতের মূলাধার-স্বরূপ যে পরমাত্মা তাঁর বিষয়ে একটি ও 'প্রথম ব্রহ্ম' বিষয়ে আর একটি সূক্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়ের দীর্ঘতম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সূক্ত হ'ল মাতা পৃথিবীর প্রতি নিবেদিত ভূমিসূক্তটি এবং তা সমগ্র অধ্যায়ের তিন-চতুর্থাংশের অধিকস্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। এই অধ্যায়ের অন্য তিনটি সূক্তের বিষয়বস্তু ক্ষয়রোগ, স্বর্গের খাদ্য, যজ্ঞদক্ষিণারূপে ব্রাহ্মণের প্রতি দাতব্য ধেনু এবং বশা গবী বা বন্ধ্যা গাভী। ত্রয়োদশ অধ্যায় থেকে আমরা ভিন্ন ধরনের সম্পাদনা কার্যের নিদর্শন পাই। বিষয়বস্তুর চরিত্রের দিক দিয়ে এইগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বেশি—ত্রয়োদশ অধ্যায়টিতে অবশ্য সম্পূর্ণতই আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তু। চতুর্দশ অধ্যায়টি প্রধানত বিবাহ সূক্তের সংকলন, যেগুলির অধিকাংশই ঋগ্বেদ থেকে গৃহীত। অষ্টাদশটি সূক্তের সমাহার পঞ্চদশ অধ্যায়টি 'ব্রাত্যখণ্ড'-রূপে পরিচিত। ষোড়শ অধ্যায়ে মুখ্যত দুঃস্বপ্ন বিনাশ করার জন্য যমদেবের প্রতি প্রার্থনা জানানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই অধ্যায়ে দুটি ভিন্নধর্মী অংশ রয়েছে ; গদ্যে রচিত প্রথম অনুবাকে রাজকীয় অভিষেক বিবৃত হয়েছে, অন্য দিকে পদ্যে বিন্যস্ত দ্বিতীয় অংশটি দুঃস্বপ্নের প্রতিষেধককল্পে প্রযুক্ত—অপটু সম্পাদনার ফলে একই অধ্যায়ে এই দুটি অংশ গ্রথিত হয়েছে।

সপ্তদশ অধ্যায়ে আদিত্যের উদ্দেশে একটি সূক্ত রয়েছে, অন্যগুলি সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনায় ইন্দ্রের প্রতি নিবেদিত। এছাড়া, 'বৈষাসহি'র প্রতি একটি সূক্তে

বেদবিদ্যা-শিক্ষার্থীদের অভ্যর্থনা, দীর্ঘ জীবনের জন্য প্রার্থনা এবং সূর্যগ্রহণের সময়ে সুরক্ষা রীতি বিবৃত হয়েছে। সমগ্র অষ্টাদশ অধ্যায় পিতৃপুরুষদের জন্য নিবেদিত অনুষ্ঠানে পূর্ণ ; ঋগ্বেদের একটি সূক্ত প্রায় সম্পূর্ণভাবে এবং দশম মণ্ডলের অন্তর্গত দশম থেকে সপ্তদশ সূক্ত সামান্য পরিবর্তন সহ এতে গৃহীত হয়েছে। ষষ্ঠ ও অষ্টম মণ্ডল থেকেও কিছু কিছু ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে। আহূত দেবতাদের মধ্যে যম ও অগ্নিই প্রধান। ঋগ্বেদের সূক্ত ও মন্ত্র বিন্যাসক্রম এখানে মাঝেমাঝে পরিবর্তিত হয়েছে।

অথর্ববেদের ঊনবিংশতি ও বিংশতিতম অধ্যায় দুটি পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছিল। এদের মধ্যে ঊনবিংশতিতম অধ্যায়ে বিবিধ নূতন বিষয় ও নানা ভাববস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে ; যেমন—যজ্ঞ, সিন্ধুগণ, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, বিশ্বজগতের বীজ, পুরুষ, নক্ষত্রমণ্ডলী, বশিষ্ঠ, 'একবীর' বা প্রধান বীর, ছন্দসমূহ, অথর্বা, স্বর্ণময় রক্ষাকবচ-বন্ধন, ওষধি ও প্রস্তরনির্মিত বিবিধ রক্ষাকবচ, রাত্রি, মহাকাল, বেদমাতা এবং পরমাত্মা। বিংশতিতম অধ্যায়টি প্রধানত ঋগ্বেদ থেকেই সংকলিত ; প্রথম পনেরটি সূক্তে ঋগ্বেদের বিবিধ কবির দ্বারা ইন্দ্র আহূত হয়েছেন। আবার একশ সাতাশতম সূক্ত থেকে একশ ছত্রিশতম সূক্ত কুন্তাপসূক্তরূপে পরিচিত এবং এদের অধিকাংশই ঋগ্বেদ থেকে সংগৃহীত। বাকি সূক্তগুলি স্বভাববৈশিষ্ট্যে নিগূঢ় রহস্যে পূর্ণ ; এগুলি শুধু শৌনকপাঠেই পাওয়া যায়, পৈপ্পলাদ পাঠে এগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

বৈদিক ঐতিহ্যে অথর্ববেদের অস্বীকৃতি ঃ

বৈদিক যুগে দীর্ঘকাল পর্যন্ত অথর্ববেদকে সংহিতাসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। আমরা 'ত্রয়ী' ত্রিবেদ ইত্যাদি যে সমস্ত শব্দের উল্লেখ পাই তাতে সংহিতারূপে ঋক্, যজু ও সাম মন্ত্রের সংগ্রহের কথাই বলা হয়। শতপথ ব্রাহ্মণ সাধারণত পৃথকভাবে অন্য তিনটি বেদ কিংবা সামগ্রিকভাবে ত্রয়ীর উল্লেখ করলেও অন্তত একটি ক্ষেত্রে ঋক্, যজু, সাম এবং অথর্বাঙ্গিরসের উল্লেখ করেছে। এই গ্রন্থে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, বাকোবাক্য বা তর্কশাস্ত্র, ইতিহাস এবং পুরাণের উল্লেখ আছে। কিন্তু অসংখ্য প্রচলিত ধর্মগ্রন্থে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ এবং অঙ্গিরস বেদের সঙ্গে সঙ্গে সর্পবিষয়ক লোকগাথা, দেবজন উপাখ্যান, ইন্দ্রজাল, ইতিহাস ও লোকশ্রুতি উল্লিখিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই অথর্ববেদের উপনিষদগুলি ত্রয়ীর সঙ্গে অথর্ববেদের উল্লেখ করেছে ; অবশ্য গোভিল, খাদির, আপস্তম্ব ও হিরণ্যকেশী ধর্মসূত্র অথর্ববেদের উল্লেখও করে নি। অনুরূপভাবে যজুর্বেদের বাজসনেয়ী ও মৈত্রায়ণী সংহিতা, ঋগ্বেদের ঐতরেয় ও কৌষীতকি ব্রাহ্মণ বা সামবেদের লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র অথর্ববেদের উল্লেখ করে নি। তবে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের প্রথম সূক্তে 'অথর্বাঙ্গিরস' কথাটি আছে এবং এককভাবে 'অঙ্গিরস' শব্দটি আছে তৈত্তিরীয় সংহিতায়। বিপুল বৈদিক সাহিত্যে

অথর্ববেদ সম্পর্কে অপযশ প্রচলিত ছিল, যদিও পরবর্তী সাহিত্যে চতুর্বেদের অন্যতম যথার্থ সংহিতারূপে তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

অথর্ববেদের বিরুদ্ধে এইরূপ প্রতিরোধ গড়ে তোলার কারণ কি? অথর্ববেদের বিষয়বস্তু পরীক্ষা করার পূর্বে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, অন্য তিনটি বেদের মধ্যে অনুষ্ঠানগতভাবে পরিচ্ছন্ন একটি পরিকল্প বিদ্যমান ছিল,—হোতা আবৃত্তি করতেন, উদ্গাতা গান গাইতেন এবং অধ্বর্যু অনুষ্ঠানটি হাতেকলমে নিষ্পাদন করতেন। সাহিত্যগত শ্রেণীবিচারের দিক দিয়ে বৈদিক সাহিত্য সামগ্রিকভাবে সম্পূর্ণ ছিল ঋগ্বেদ আবৃত্তির উপযোগী কাব্য, সামবেদ সংগীতের জন্য স্তোত্র এবং যজুর্বেদ অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য ধর্মানুষ্ঠানকেন্দ্রিক গদ্য নির্দেশাবলী সরবরাহ করত। কোনো কোনো ভারতীয় পণ্ডিত এই চিরাগত ধারণা পোষণ করেন যে, প্রাগুক্ত ত্রিবিধ রচনাই ত্রয়ী শব্দের তাৎপর্য এবং অথর্ববেদ যেহেতু গদ্যপদ্যময় সংহিতা, সেটিও ত্রয়ীর বহির্ভূত নয়। অথর্ববেদের বিষয়বস্তুকে অন্তরঙ্গভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি যে, এই সংহিতার অধিকাংশ সূক্তই নূতন বিষয়ভিত্তিক, যা ঋগ্বেদের ভাববৃত্তের তুলনায় সম্পূর্ণ অভিনব। এটা সত্য যে, ঋগ্বেদের শেষ মণ্ডলে এই ধরনের কিছু কিছু বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে, কিন্তু এগুলির সংখ্যা খুবই কম এবং তাও আবার সেই সংহিতার অন্তিম পর্যায়েই খুঁজে পাওয়া যায়। নূতন বিষয়বস্তুকে আমরা নিম্নোক্তভাবে বর্গীকরণ করতে পারি ঃ (ক) গার্হস্থ্য ও নারীবিষয়ক (খ) সামাজিক ও পারিবারিক (গ) পিতৃপুরুষ বিষয়ক (ঘ) রাজকীয় ও সৈন্যবাহিনী সংক্রান্ত অর্থাৎ ক্ষত্রিয়শ্রেণী সংক্রান্ত এবং (ঙ) রহস্যময় ও ঐন্দ্রজালিক বিষয় সম্পর্কিত। অন্যভাবে বলা যায় যে, গৃহ, নারী, রাজা ও সৈন্য এখন মনোযোগের কেন্দ্র-বিন্দুতে, এবং দৃষ্টিভঙ্গি মূলত ইন্দ্রজালের উপযোগী।

এই সমস্ত বিষয়ের অধিকাংশ নিশ্চিতভাবে সূচনা থেকেই ছিল। ধর্মীয় ইতিহাসের আধুনিক গবেষকগণ ইন্দ্রজালকে ধর্মের তুলনায় প্রাচীনতর বা পরবর্তী ব'লে ভাবেন না, তাদের মতে এই দুটি সমকালীন। পুরোহিত ও ঐন্দ্রজালিকের নিকট একই সমস্যা ছিল অর্থাৎ প্রাকৃতিক শক্তির সামনে অসহায়তার বোধ ; এই দুজনেরই লক্ষ্য একই—প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা, যাতে প্রকৃতির বৈরী শক্তির মধ্যেও অস্তিত্ব রক্ষা করার উপায় তারা আবিষ্কার করতে পারে। এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পুরোহিতের কার্যকলাপে যে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়, তাতে দেখা যায় তিনি নির্দিষ্ট কোনো অনুষ্ঠান করছেন, বিভিন্ন প্রার্থনা ও মন্ত্র আবৃত্তি এবং অথবা এমন গান করছেন যাতে প্রার্থীর পক্ষ থেকে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দেবতার প্রসন্নতা কামনা করা হয়। অন্যদিকে জাদুকর বা শামানেরা যে ঐন্দ্রজালিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করতেন, তাতে জাদুশক্তির সাহায্যে প্রত্যক্ষভাবে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোনো গূঢ় মন্ত্র জপ করা হ'ত।

ধর্ম ও ইন্দ্রজালের মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট্য সাধারণভাবে উপস্থিত :

(ক) ধ্বংসের আশঙ্কা এবং জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার আকাঙক্ষা। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত গবেষক পোল রদ্যাঁর বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে ; ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার প্রধান লক্ষ্যরূপে তিনি খাদ্য সরবরাহ, ব্যাধি ও মৃত্যু নিবারণ, নারীদের অসুস্থতা এবং মৃত্যুভীতির কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত এই যে, ধর্ম ও ইন্দ্রজাল সমব্যাপী ও সমকালীন ; ইন্দ্রজাল থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয় নি।

(খ) অন্য একটি ব্যক্তি অর্থাৎ পুরোহিত বা জাদুকরের মধ্যস্থতা।

(গ) কোনো মন্ত্র বা গূঢ় শক্তিসম্পন্ন জাদু শব্দের আবৃত্তি।

(ঘ) নির্দিষ্ট কিছু অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা। একমাত্র পদ্ধতির ক্ষেত্রেই পারস্পরিক পার্থক্য বিদ্যমান অর্থাৎ কোথাও নির্দিষ্ট কোনো দেবতার সুবিন্যস্ত ভূমিকা এবং অন্যত্র তার অনুপস্থিতি।

অন্য তিনটি সংহিতা অর্থাৎ ঋগ্বেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদ একটি সুসমঞ্জস সামগ্রিক সাহিত্যরূপে গড়ে উঠেছে, কেননা ঋগ্বেদে রয়েছে আবৃত্তিযোগ্য সূক্ত, সামবেদে সংগীতোপযোগী মন্ত্র এবং যজুর্বেদে জপনীয় পাঠ ও প্রধান শ্রৌত-যাগসমূহ অনুষ্ঠানের জন্যে নির্দেশাবলী। খুব স্বাভাবিকভাবেই অথর্ববেদ এই সাহিত্যবৃত্তের অন্তর্ভুক্ত নয় : এর সূক্তগুলি প্রধানত গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান, নারী, রাজা, সৈন্য, রুগ্ণ ব্যক্তি, কৃষিজীবী এবং গৃহস্বামীর প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাছাড়া, খাঁটি অথর্ববেদীয় মন্ত্রগুলির জন্য দেবতারা কোনো প্রয়োজন নেই, যদিও পরবর্তীকালে তাদের সঙ্গে বহু দেবতার নাম সংযোজিত হয়েছিল, সুতরাং লক্ষ্য ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে অথর্ববেদ অন্য তিনটি বেদের তুলনায় স্বরূপত ভিন্ন। অথর্ববেদের প্রধান বিষয়বস্তুগুলি সাধারণত ঋগ্বেদের মন্ত্রকারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি।

পশুপালক সমাজ সাধারণত অন্যবিধ কায়িক শ্রমের অর্থাৎ কৃষি ও বাণিজ্যের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ ক'রে থাকে ; তাই প্রাথমিকভাবে বাণিজ্য ও কৃষিকর্মে নিযুক্ত বৈশ্যশ্রেণীর প্রতি উপেক্ষাই প্রদর্শিত হয়েছে—কেননা পশুপালক আর্যদের নিজস্ব আচরণবিধি অনুযায়ী প্রগুক্ত দুটি বৃত্তিই ছিল মর্যাদাহানিকর। বৈদিক যুগের অন্তিম পর্যায়ে অথর্ববেদ সংকলিত হওয়ার সময়ে আর্যরা কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন,—পশুপালন তখন তাঁদের আয়ের গৌণ ও পরিপূরক একটি উৎস, কখনো কখনো ব্যবসা-বাণিজ্যও তার পরিপূরক। উৎপাদন ব্যবস্থার অভ্যন্তর বিধানে কৃষিকার্যের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করায় পরিবর্তনের ফলে উপরি সংগঠনে মূল্যবোধের ক্ষেত্রে বহুদিন পর্যন্ত অনুরূপ কোনো স্পষ্ট পরিবর্তন দেখা যায় নি। ভূমিকর্ষণের প্রতি পশুপালক সমাজের অন্তর্গূঢ় বিতৃষ্ণা আরো দীর্ঘকাল

অবধি অব্যাহত ছিল ; বৈদিক সাহিত্য সংকলনে অথর্ববেদ যে অন্তর্ভুক্ত হয় নি, তার জন্যেও এই বিতৃষ্ণার মনোভাবও অংশত দায়ী। ভেষজবিদ্যাকেও অগৌরবজনক ভেবে তাচ্ছিল্য করা হ'ত ; পরবর্তীকালের রচনাগুলিতে এই প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন রয়েছে। তৈত্তিরীয় সংহিতা (৬ : ৪ : ৯ : ৩), মৈত্রায়ণী সংহিতা (৪ : ৬ : ২) এবং শতপথ ব্রাহ্মণ (৪ : ১ : ৫ : ১৪) গ্রন্থে এ ধরনের বক্তব্য লক্ষ্য করা যায়। অথর্ববেদে যেহেতু ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভের জন্য বিপুল সংখ্যক মন্ত্র রয়েছে,—সুদূর প্রাচীন কাল থেকে জাদুকর চিকিৎসকরা আরোগ্যের জন্য নানারকম ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানের সময়ে সম্ভবত এইসব মন্ত্র উচ্চারণ করতেন—এদের প্রতি সংস্কৃতিসচেতন প্রাচীন আর্য পুরোহিতরা যে ঘৃণার মনোভাব পোষণ করতেন তা সহজেই অনুমেয়। ওষধিযুক্ত রক্ষাকবচ ও বিশেষ-নামযুক্ত প্রস্তর উল্লিখিত হয়েছে ব্যাধি, দানব এবং বিবিধ সামাজিক ও পারিবারিক অমল প্রতিরোধ করার উপায় হিসেবে। এমনকি কখনো কখনো সংকটকালে রাজারও অলৌকিক সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দিত এবং এইসব জাদুকর চিকিৎসকরা ইন্দ্রজালের অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁরা ইষ্টসিদ্ধির ব্যবস্থা করতেন।

চিকিৎসাশাস্ত্র বা আয়ুর্বেদের প্রাথমিক সূত্রপাত হয়েছে 'ভৈষজ্য' অংশে যেখানে ব্যাধি ও চিকিৎসা পদ্ধতি বিবৃত। অথর্ববেদের অন্যতম শাখা চরণবৈদ্যকে যে চরক-সংহিতার লুপ্ত উৎসরূপে মনে করা হয়ে থাকে তা বিশেষভাবে স্মরণীয়। আনুষ্ঠানিক নির্দেশগুলি বা বিনিয়োগগুলিতে আমরা লক্ষ্য করি যে, ওষধি, ধাতু এবং রাসায়নিক পদার্থ ঔষধ প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহৃত হ'ত ; শিশু-চিকিৎসা, ধাত্রীবিদ্যা ও শল্য-চিকিৎসার উপাদানগুলি খুবই প্রাথমিক স্তরে হলেও বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীকালে মৈত্রী উপনিষদেও চিকিৎসকদের পক্ষে স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ করা হয়েছে। অথর্ববেদের অস্বীকৃতির এটিও একটি কারণ, এতে চিকিৎসা-সংক্রান্ত বহু মন্ত্র রয়ে গেছে।

অথর্ববেদে গৃহ ও নারীর প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত ব'লেই তারই মধ্যে আমরা পরবর্তীকালে গৃহ্যসূত্রগুলির পূর্বাভাস লক্ষ্য করি। এই বিশেষ শ্রেণীর রচনা অন্যান্য সংহিতাগুলির গণ্ডী-বহির্ভূত, যেহেতু সেইসব সংহিতা মুখ্যত প্রধান শ্রৌতযাগগুলির বিবরণ দিয়েছে, যে সমস্ত অনুষ্ঠানে নারীর ভূমিকা উপেক্ষিত হলেও রাজার ভূমিকার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। অথর্ববেদেই বিশেষভাবে অভিষেক ও যুদ্ধাভিযান-বিষয়ক অনুষ্ঠানগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রাজা ও সৈন্যবাহিনীর উপর এই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রাজা ও সৈন্যবাহিনীর উপর এই গুরুত্ব আরোপের কারণ সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শেষদিকে উত্তর ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উত্থান এবং কিছু কিছু সঙঘবদ্ধ রাজ্য থেকে ক্রমশ বৃহত্তর রাজ্য ও পরে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। পরবর্তী বৈদিক যুগের সূচনাপর্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

জনপদের রাজারা ধীরে ধীরে গৌরব ও শক্তি অর্জন করছিলেন। এই পর্যায়ে রচিত অথর্ববেদের মধ্যে রাজার গুরুত্ব শুধু বৃদ্ধিই পায় নি, অভিষেক-সংক্রান্ত রাজসূয় যজ্ঞ এক রহস্যময় ও প্রতীকী তাৎপর্য লাভ করেছিল। পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে, রাজসূয় যজ্ঞে কিছু কিছু আদিম অনুষ্ঠানের প্রতীকায়ন ঘটেছিল—সম্ভবত মহাবিশ্বের পুনর্নবীকরণের উদ্দেশ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে যে সমস্ত বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ত, তাদের সংক্ষেপিত রূপান্তর রাজসূয় যজ্ঞে অভিব্যক্ত। অভিষেক সূক্তগুলি ভাবাদর্শ ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে অভিনব নয় ; ঋগ্বেদে প্রাপ্ত রাজসূয় বা বাজপেয় সম্পর্কিত অন্তর্বস্তুরই ধারাবাহিক ও বিশদীকৃত রূপ। কিন্তু সৈন্যদের কল্যাণকামনা, তাদের শরীরে বিদ্ধ তীরসমূহের নিরাপদ নিষ্কাশন, শত্রুসৈন্যকে সম্মোহিত করার ইন্দ্রজাল ইত্যাদি নতুন ভাববস্তু, কেননা এই ইন্দ্রজাল প্রায় সামগ্রিকভাবেই অথর্ববেদীয়।

সাধারণত 'অথর্বন্' ও 'অঙ্গিরস্' শব্দ দুটি যদিও অগ্নিদেবের পুরোহিত সম্প্রদায়কেই বোঝায়, প্রকৃতপক্ষে এ দুটি ভিন্ন ধরনের ইন্দ্রজাল প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। অথর্বা চিকিৎসাবিষয়ক এবং কল্যাণপ্রসূ বা নির্মল ইন্দ্রজাল পরিচালনা করতেন। এর মধ্যে ছিল শারীরিক কুশলের ,ও স্বাস্থ্যের জন্য ইন্দ্রজাল (ভৈষজ্য), চিকিৎসা সম্পর্কিত (পৌষ্টিক), সাধারণ পারিবারিক কল্যাণ ও সৌষম্যের জন্য ইন্দ্রজাল (সাংমনস্য) রাজকীয় অনুষ্ঠান (রাজকর্মাণি) এবং সমৃদ্ধির জন্য স্ত্রী-আচার (স্ত্রী কর্মাণি)। পরবর্তীকালে রচিত ধর্মসূত্রগুলি এইসব বিষয়কেই যথেষ্ট মর্যাদা দান করেছে ; অবশ্য সেই সঙ্গে এইসব গ্রন্থ ঐন্দ্রজালিক আচার অনুষ্ঠানের প্রতি তাচ্ছিল্যও প্রকাশ করেছে। ঋগ্বেদের সময় থেকে যে জাদুবিদ্যা নিন্দিত, অঙ্গিরার সঙ্গে তাই সম্পৃক্ত ; একে প্রধানত অভিচার বা কৃত্যা ব'লে অভিহিত করা হয়—এর বিভিন্ন উপবিভাগগুলির মধ্যে রয়েছে মারণ, উচাটন, সম্মোহন ও বশীকরণ। অভিচার বা কৃত্যা প্রকৃতপক্ষে একটি দ্বিমুখী অনুষ্ঠান, যার মধ্যে রয়েছে কৃত্যাপ্রতিহরণ বা শত্রুর জাদুক্রিয়াকে নিষ্ক্রিয় করার উপযোগী ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া, যাকে আবার কৃত্যাদূষণ অধ্যায়ে নিন্দা করা হয়েছে। ঋষি অঙ্গিরার সাধারণ বিশেষণ হ'ল 'ঘোর' বা ভয়ংকর। অথর্ববেদের পঞ্চম কল্পকে অঙ্গিরস কল্প (বা যাতু, অভিচার বা বিধানকল্প) বলা হয়েছে, এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে 'অঙ্গিরস্' শব্দটি কৃষ্ণ বা ভয়ংকর ইন্দ্রজালের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই অংশে যাতু বা দানবদের নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি লাভ করার জন্য মন্ত্র এবং কিছু কিছু স্ত্রী-আচারের মন্ত্রও আছে।

অথর্বা পরিবার অপেক্ষা অঙ্গিরা পরিবারের সঙ্গেই ভৃগুর সম্পর্ক বেশি। মৈত্রায়ণী সংহিতায় এই তিনটি নাম অর্ধদেবতারূপে বর্ণিত ; আবার তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে অঙ্গিরা এবং ভৃগু এবং বাজসনেয়ী সংহিতায় অথর্বা দেবতারূপে গৃহীত হয়েছেন।

পরস্পর-সংবদ্ধ এই তিনটি পরিবারভুক্ত ব্যক্তিরাই অথর্ববেদের রচয়িতা। অথর্বা এবং অঙ্গিরা উভয়েই অগ্নিচর্যার পুরোহিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে এই যে দ্বৈত বোধ, শুভ ও অশুভ ফলদানের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে, তার উৎস প্রাচীন ইন্দো-ইরাণীয় পর্যায়ে আবিষ্কার করা যায়। বস্তুত, ঋগ্বেদের সময়েই অগ্নির দুটি স্পষ্ট রূপভেদ লক্ষণীয়। একদিকে তিনি শুভপ্রদ হব্যবাহন ও হব্যাৎ আবার অন্যদিকে অশুভ ক্রব্যাৎ,—সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে, অগ্নি প্রাথমিক পর্যায়েই দ্বিবিধ কার্যকলাপ ও অনুষঙ্গ নিয়ে গড়ে উঠেছিলেন। অবেস্তায় অগ্নির বিশেষ গুরুত্বের কথাও আমাদের মনে পড়ে ; ঐ গ্রন্থে শবদাহ অনুমোদিত নয়, যেহেতু অশুচি শবদেহের সংস্পর্শে অগ্নির মালিন্য দোষ দেখা দেবে, এই তাদের আশঙ্কা। ভারতীয়দের শবদাহপ্রথায় অগ্নি যেহেতু অশুচি শবের সংস্পর্শে 'দূষিত' হয়—ইরাণীয়রা তাই অঙ্গিরার প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ করেছে এবং নিজেদের অগ্নিবিষয়ক পুরোহিতকে শুভসূচক অথর্বা ব'লে পৃথকভাবে চিহ্নিত করেছে। ধর্মসূত্রগুলি মাঝে মাঝে অথর্ববেদের প্রতি পরস্পর-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করেছে, কেননা একদিকে তারা যদিও অথর্ববেদকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপরিহার্যরূপে স্বীকার ক'রে নিয়েছে, অন্যদিকে আবার বিষয়বস্তুর বিচারে তাকে অপবিত্র, অপধর্মীয় ও ঐন্দ্রজালিক কার্যকলাপ উপস্থাপিত করার অপরাধে সাধারণভাবে অপকৃষ্ট বলে বিবেচনা করেছে। এই সব গ্রন্থে এই অভিমত ব্যক্ত হয়েছে যে, অথর্ববেদের ক্রিয়াকর্ম সাধারণভাবে শাস্তিযোগ্য। ইন্দ্রজাল ও পুরোহিততন্ত্র যেহেতু পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, বরং সমস্ত আদিম এমনকি বহু উন্নত ধর্মেও এদের সহাবস্থান লক্ষণীয়,—তাই আমরা এমন একটি সময়-পরিধি কল্পনা করতে পারি যখন শামান ও জাদু চিকিৎসক পাশাপাশি নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করত। বৃহৎ ঐতিহ্য যজ্ঞীয় ধর্ম ব্যাপকতর হওয়ার পর যখন পরিশীলিত স্তোত্র-সাহিত্য সৃষ্টি হ'ল এবং এমন একটি দেব-সঙ্ঘের বন্দনা করা হ'ল যেখানে দেবতাদের সুনির্দিষ্ট অবয়ব ও কার্যকলাপের সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে,—তখন লঘু ঐতিহ্যের শামান পুরোহিতদের নিকৃষ্ট অবস্থানে অবনমন ঘটল। স্পষ্টতই অথর্ববেদের প্রাচীনতম সূক্তগুলির সঙ্গে দেবতাদের কোনও সম্পর্ক প্রায় ছিলই না। অন্য সমস্ত প্রকৃত জাদুবিদ্যার মতো তারাও প্রত্নকথা ও যজ্ঞানুষ্ঠানের পরিবর্তে ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান ও মায়ার সাহায্যে প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল। বহু কাল পরে অথর্ববেদ যখন রক্ষণশীল বৃহৎ ঐতিহ্য দ্বারা স্বীকৃত হল, পুরোহিতরা এবং ঋগ্বেদের সূক্তগুলি সমগ্রত কখনো অপরিবর্তিত এবং কখনো বা বিকৃতভাবে অথর্ববেদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত হয়েছে ; তখনই প্রত্যেক সূক্তের সঙ্গে এক বা একাধিক দেবতার সম্পর্ক স্থাপনের ঐতিহ্যগত পদ্ধতিকে অনুকরণ করা হয়েছিল। বর্তমানে প্রচলিত পাঠে বহু সূক্তের দেবনাম ও সূক্তের মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতা থেকে তা প্রমাণিত। বহু ক্ষেত্রে 'মন্ত্রোক্ত দেবতা' ব'লে দেবতাদের অনির্দিষ্ট অবস্থায় রাখা

হয়েছে। কৃমি বিনাশের জন্য একটি সূক্তে দেবতারূপে ইন্দ্রের উপস্থিতি প্রকৃতপক্ষে বহু উদ্ভট উদাহরণের অন্যতম, যেখানে সংহিতা-বিষয়ক নিয়মের একেবারে যান্ত্রিক প্রয়োগ ঘটেছে। যে কোনও স্বীকৃত সংহিতায় প্রতিটি সূক্তের এক বা একাধিক দেবতা, একজন কবি, একটি নির্দিষ্ট ছন্দ এবং যথার্থ আনুষ্ঠানিক প্রয়োগ বা বিনিয়োগ থাকবে এই হ'ল নিয়ম ; এই নিয়মের যান্ত্রিক অনুকরণ সত্ত্বেও অধিকাংশ অথর্ববেদীয় সূক্তেরই নিগূঢ় স্বভাবধর্ম অনুযায়ী এই সব বৈশিষ্ট্য থাকা সম্ভব ছিল না। কিন্তু, এই নিয়মটি গৃহীত হওয়ার পর স্বীকৃতি ও মর্যাদালাভের জন্য যে আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হ'ল, তারই ফলে প্রতি সূক্তের শীর্ষে নিয়মমাফিক এইগুলি সন্নিবেশিত হ'ল। এইভাবে যা কিছু মূলত জাদু পুরোহিতের উপযোগী জাদুক্রিয়া বা প্রেতনিবারক অনুষ্ঠান ছিল, তাই এখন ঋগ্বেদীয় সূক্তের অনুকরণে বৃহৎ ঐতিহ্যের ভূমিকা আত্মসাৎ ক'রে নিল। তবে মনে রাখতে হবে যে, ঋগ্বেদের অন্তিম পর্যায়ের রচনা—প্রথম ও দশম মণ্ডলেই—তা সর্বপ্রথম দেখা গিয়েছিল। সেখানকার কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য অথর্ববেদের কথাই মনে করিয়ে দেয়, ঠিক যেভাবে কিছু কিছু অথর্ববেদীয় সূক্ত—ঋগ্বেদ থেকে গৃহীত না হওয়া সত্ত্বেও—স্বভাববৈশিষ্ট্যে ঋগ্বেদতুল্য।

সুতরাং যুক্তিসহ অনুমান এই যে, বেশ কিছুকাল, সম্ভবত কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বৃহৎ ও লঘু ঐতিহ্য সহাবস্থান করেছিল। শ্রৌতযাগ বৃহৎ ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত, — তার মধ্যে সমুন্নত প্রত্নকথাভাণ্ডার, আনুষ্ঠানিক সাহিত্য ও পুরোহিততন্ত্র ছিল ; জনসাধারণের সামূহিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্যা তার বিষয়-পরিধির অন্তর্গত। কোনো সুনির্দিষ্ট প্রণালীবদ্ধ ধর্মতত্ত্ব বা প্রত্নপুরাণ অথর্ববেদ না থাকার কারণ মূলত তা সম্পূর্ণভাবে দেবসংস্রবমুক্ত ছিল। মন্ত্রগুলি কখনো কখনো নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ এবং অদীক্ষিতের কাছে অর্থহীন বাগাড়ম্বর ব'লে প্রতিভাত।

বৃহৎ ঐতিহ্যের পুরোহিতগণ কিছুকাল পৃষ্ঠপোষকসুলভ মনোভাব নিয়ে লঘু ঐতিহ্যের অন্তর্গত ধর্মাচরণকে মেনে নেওয়ার পরে এমন একটা সময় এল, যখন প্রাচীনপন্থী পুরোহিতরা জাদুকর-চিকিৎসকের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্রূপ প্রদর্শণের পরিবর্তে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলেন। সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থায় যোগাদান না ক'রে, পরভোজী শ্রেণীরূপে এঁরা প্রচুর স্বাচ্ছন্দ্য ও ঐশ্বর্য ভোগ করতেন। ফলে এঁরা সেই জাদুকর-চিকিৎকদের নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবছিলেন, যাঁরা প্রচলিত দেবকাহিনী বা যজ্ঞানুষ্ঠান ব্যতিরেকেও যজমানদের সম্পদের উপর নির্ভরশীল হয়ে জীবনযাপন করত।

প্রধান সামাজিকে শ্রেণী-বিভাজন অবশ্য ছিল ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও শামানের মধ্যে। এটা যথার্থ যে, এই দুই শ্রেণীর পুরোহিতদের কার্যক্ষেত্র ছিল পরস্পর ভিন্ন ; তবে, প্রাচীনপন্থী পুরোহিতদের কাছে এটা স্পষ্ট ছিল যে, যজমানের যজ্ঞীয় দক্ষিণা দেবার ক্ষমতা যেহেতু সীমাবদ্ধ, তাই এই দুই ধরনের ধর্মচর্যা ও পুরোহিতসম্প্রদায়ের

পরস্পর-বিচ্ছিন্ন কার্যাবলীর ফলে তাদের উপার্জনযোগ্য ধন অকারণে বিভাজিত হচ্ছে। এরই ফলে অথর্ববেদকে সংহিতা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করার তাগিদ বাড়ল ; ত্রয়ী হল চতুষ্টয়ী ঃ অথর্ববেদেয় পুরোহিতকে 'ব্রহ্মা' নামে অভিহিত ক'রে যজ্ঞে বিশেষ স্থান দান করা হ'ল। তবে যজ্ঞানুষ্ঠানে বিভিন্ন দায়িত্ব যেহেতু ইতিমধ্যে হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্যু এবং তাদের সহকারীদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাই ব্রহ্মাকে দূরে উপবিষ্ট অবস্থায় সমগ্র যজ্ঞটি পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হ'ল,—অনুষ্ঠানের ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে তিনি প্রায়শ্চিত্তমূলক অনুষ্ঠানের বিধান দিতেন। এই দায়িত্বভার গ্রহণ করার পূর্বে ব্রহ্মাকে প্রচলিত শাস্ত্র শিক্ষা করতে হ'ত ; কিন্তু তিনি সেই সঙ্গে অথর্ববেদের নিজস্ব রচনাকে মূল ধারার সঙ্গে সংযোজিত ক'রে দক্ষিণার সিংহভাগ গ্রহণ করতেন,—রাজপুরোহিতরূপে ব্রহ্মার শ্রেণীগত অবস্থানের ফলেই তাঁকে তা থেকে বঞ্চিত করা সম্ভব ছিল না। তবে, ব্রহ্মার ভূমিকার গুরুত্ব সমাজে অনেক বিলম্বে উপলব্ধ হয়েছিল।

অথর্ববেদেব পরিপ্রেক্ষিতে যে অলৌকিক ক্ষমতা প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে বা প্রতিবাদী লোকাতীত শক্তিকে নিরপেক্ষ করে তোলে—ব্রহ্মা তারই মানুষী রূপ। অবশ্য বৃহৎ ঐতিহ্যের অন্তর্গত পুরোহিতরাও যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্যে এই শক্তির ক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত ছিলেন—পরবর্তীকালে এর যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানে যজমানের পক্ষ থেকে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ-কামনায় উচ্চারিত মন্ত্রসমষ্টি থেকে উদ্ভূত শক্তিকে তাঁরা 'অপূর্ব' আখ্যা দিয়েছিলেন। ব্রহ্মার সঙ্গে ইন্দ্রজালের সম্পর্ক বিষয়ে পরবর্তী ব্রাহ্মণ সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। দেবশক্তির মধ্যস্থতা ছাড়াই লোকাতীত শক্তিকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করার যে খ্যাতি তিনি অর্জন করেছিলেন, তারই ফলে ব্রহ্মার উন্নততর আধ্যাত্মিক অবস্থান এবং যজ্ঞবিদ্যা সম্পর্কে সমৃদ্ধতর জ্ঞান সমাজে স্বীকৃত ছিল ব'লে যজ্ঞ পর্যবেক্ষক পুরোহিতের ভূমিকা গ্রহণ তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। একদিকে হোতা, উদ্গাতা ও অধ্বর্যু এবং অন্যদিকে ব্রহ্মার ভূমিকার কল্যাণে সামূহিক ও গার্হস্থ্য ক্ষেত্রে যাবতীয় প্রয়োজন সিদ্ধির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বৃহৎ ও লঘু ঐতিহ্যের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে 'ব্রহ্মা' পুরোহিতদের সামাজিক প্রতিপত্তি বর্ধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিমূর্ত আধ্যাত্মিক ভাবনার প্রতীক 'ব্রহ্মন্' (ক্লীবলিঙ্গ)-এর গৌরবও বর্ধিত হল। এই ব্রহ্মা বৈদিক যুগের চূড়ান্ত পর্বে বহু বিলম্বে দেবসঙ্ঘে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন ; ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে তাঁর সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে,—এই অংশটি বহু বিমূর্ত ভাবকেন্দ্রিক অথর্ববেদীয় সূক্ত রচিত হওয়ার পর্যায়ের সমকালীন।

উন্নতিশীল পশুপালক সমাজে একক পরিবারের কর্তা পুরোহিতের ভূমিকা গ্রহণ করতেন ; অন্যদিকে গোষ্ঠীপতি ছিলেন একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারের পুরোহিত। আবার

গ্রামীণ জাদুকর-পুরোহিত সমগ্র গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে ধর্মীয় আচরণগুলি পরিচালনা করতেন। কৃষিব্যবস্থার পত্তন হওয়ার পরে উদ্বৃত্ত সম্পদ যখন আরো বর্ধিত হ'ল,— কায়িক শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন ও অবকাশযুক্ত পুরোহিতশ্রেণীর উত্থান দেখা গেল। বৃহৎ ঐতিহ্যে জাদুকরপুরোহিতকে মূলত এককভাবে, মাঝে মাঝে এক বা দুজন গৌণ সহকারীর সাহায্যে, কার্যভার পরিচালনা করতে হ'ত। যাজকতান্ত্রিক ভারতীয় সমাজের অন্তিম পর্যায়ে অথর্ববেদীয় পুরোহিত যখন মূল যাজকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেন তখন ঐতিহাসিকভাবে পরস্পরভিন্ন পৌরাহিত্য-প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে নতুন ধরনের সমন্বয় ও সংমিশ্রণের প্রবণতা দেখা দিল। অবশ্য এই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বে শামানেরা যজ্ঞীয় সাহিত্য অধিগত ক'রে নিয়েছিলেন ; এদের মধ্যে অনেকেই সম্ভবত অনার্য ব্রাত্যদের সংস্পর্শে এসে তাদের রহস্যগূঢ় রচনাসম্ভারের সাহায্যে বিমূর্ত ও আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণার একটি প্রবণতা গড়ে তুলেছিলেন। সুতরাং যে দীর্ঘ ঐতিহ্যের অন্তভাগে অথর্ববেদের অবস্থান, তার মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ জাদুকর-পুরোহিতগণ (শামান), যাজক সম্প্রদায় এবং রহস্যময় আধ্যাত্মিক (সন্ন্যাস) চিন্তাধারা।

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে বৌদ্ধধর্মের উত্থান ও বিস্তারের ফলে বৈদিক ধর্ম যখন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়েছিল, খুব সম্ভবত তখনই অথর্ববেদ সংহিতা-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পুরোহিতদের মধ্যে এই উপলব্ধি সঞ্চারিত হয় যে, ঐক্যবদ্ধ না হলে তাদের পতন অনিবার্য। রক্ষণশীল ধর্মের সম্পদশালী পুরোহিতদের পক্ষে এই সিদ্ধান্ত ছিল বৈপ্লবিক ঘটনা এবং নিশ্চিতভাবে এতেই বৈদিক ধর্মের আয়ুষ্কাল বহুগুণ বর্ধিত হয়েছিল। প্রাচীন ধর্মচর্যার পরিধি থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকেও জনসাধারণের কিছু কিছু অংশের সুখী ও তৃপ্ত জীবন যাপনের আশঙ্কাও সেখানে ছিল। জাদুকর চিকিৎসক যেহেতু তাদের গার্হস্থ্য জীবনের সমস্যা সমাধান ক'রে দিত, বিপুল ও ব্যয়সাধ্য প্রধান যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রতি কোনও আকর্ষণ তারা বোধ করত না কিংবা তেমন সঙ্গতিও তাদের ছিল না। ব্রহ্মাবর্ত অর্থাৎ কুরু-পাঞ্চাল অঞ্চলের কেন্দ্রভূমি থেকে দূরে যারা বাস করত তাদের মধ্যে বৃহৎ ঐতিহ্যে উল্লিখিত যজ্ঞের প্রভাব হ্রাসের লক্ষণগুলি অধিক প্রকট, কেননা রক্ষণশীল অঞ্চলের প্রান্তসীমায় বসবাসকারী জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ধর্মাচারের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের প্রবণতা সর্বদাই অধিক পরিস্ফুট হয়। এটা আকস্মিক কোনো সমাপতন নয় যে, অথর্ববেদের ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্টতই পূর্বাঞ্চলে মগধদেশে আর্যদের বসতি বিস্তারের প্রমাণ বহন করে, যেখানে অবৈদিক আদিম ধর্ম প্রচলিত ছিল। সেই সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী, সমকালীন ও পরবর্তী সন্ন্যাসী গোষ্ঠীগুলির উত্থান ও বিকাশের কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে। সম্ভবত, সমাজবদ্ধ জনসাধারণের যে বিপুল অংশ তখনও পর্যন্ত এইসব গোষ্ঠীপতিদের মতবাদকে অনুসরণ করত,

তারা প্রধান শ্রৌত-যাগগুলি সম্পর্কে মোটামুটিভাবে মোহমুক্ত হয়ে প'ড়েছিলেন, কিন্তু সেই সময় অবধি গার্হস্থ্য ও সামাজিক সংকট মুহূর্তে সম্ভবত তাঁরা শামানদের প্রয়োজন অনুভব করতেন। সুতরাং তৎকালীন ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিতে শামানদের এবং তদুপযোগী অথর্ববেদের ধর্মচিন্তাকে তখনও পর্যন্ত প্রশ্রয় দিয়েছিল যদিও শ্রৌতপুরোহিতরা ও তাদের যজ্ঞানুষ্ঠান তখন প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পথে। ফলে শ্রৌতপুরোহিতদের কাছে এই সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে ইন্দ্রজালের প্রতি উপেক্ষার মনোভাবকে জয় করতে হবে ; অথর্ববেদ ও তার পুরোহিতসম্প্রদায়ের প্রতি সামাজিক উপেক্ষার মনোভাবকে দূর করতে হবে এবং পবিত্র সংহিতা-সাহিত্যের পরিধিতে ও আনুষ্ঠানিক আচার অনুশীলনের মধ্যে তার শাস্ত্র ও যাজকতন্ত্রকে স্বীকৃতি দিতে হবে। অস্তিত্বরক্ষার জন্য আপোষ মীমাংসার অনিবার্য কঠোর পদ্ধতিরূপে তা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল।

সংহিতা সাহিত্যে বিলম্বে সন্নিবেশিত অথর্ববেদের মধ্যে আমরা অধিকতর মাত্রায় দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং সেই সঙ্গে বিহার ও বাংলার বেলাভূমি অঞ্চলের বিবিধ প্রকার ব্যাধি-নামের সঙ্গে পরিচিত হই ; ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকেও বোঝা যায় যে, অথর্ববেদের অধিকাংশই অন্যান্য সংহিতার তুলনায় পরবর্তী কালের রচনা। বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, অথর্ববেদের সূক্তগুলি কেবলমাত্র সেই সমাজেই রচিত হওয়া সম্ভব যা কৃষি ব্যবস্থা, বাণিজ্য, প্রশাসন, স্থাপত্য, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে এবং যার মধ্যে জটিল ও সুপ্রতিষ্ঠিত যাজকতন্ত্র বিদ্যমান। দক্ষিণার উপর গুরুত্ব আরোপ এবং ব্রহ্মৌদন, ব্রহ্মগবী ও পঞ্চৌদন অজ, বশা গবী ইত্যাদিব প্রয়োগ থেকে পুরোহিততন্ত্রের তুলনামূলকভাবে পরবর্তী পর্যায়ই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাজা ও সৈন্য সম্পর্কিত সূক্তগুলি প্রতিষ্ঠিত রাজত্ব এবং প্রশাসন ও সুনিয়ন্ত্রিত সৈন্যবাহিনীর দিকে নির্দেশ দেয়।

এটা সত্য যে, অথর্ববেদের বিষয়বস্তু বহু অংশ যদিও প্রথম সংকলিত হয়েছে তবু এইগুলি নিশ্চয়ই আর্য জনগোষ্ঠীর নিকট দীর্ঘকাল ধ'রে পরিচিত ছিল। সুতরাং উল্লিখিত ব্যাধিসমূহ, অপদেবতায় বিশ্বাস, বৃক্ষনাম, সর্প এবং কীটপতঙ্গের ভয়, সপত্নী সম্পর্কে উদ্বেগ, অনূঢ়া বৃদ্ধার উদ্বেগ ও হতাশা ইত্যাদি সমাজের চিরকালীন বিষয়। কিন্তু এই সংহিতায় তাদের উপস্থিতি থেকে পরবর্তীকালে এগুলির সংযোজনই প্রমাণিত হয়,—বিশেষত যখন শ্রৌত পুরোহিতরা বিরোধিতা ত্যাগ ক'রে এই পাঠ ও বিবিধ সহগামী ধর্মবোধকে রক্ষণশীল ধর্মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা অনিবার্য ব'লে বুঝেছিল।

রচনাকাল

অথর্ববেদের রচনাকাল সম্পর্কে যে কোনো বিবরণকেই কতকটা স্ব-বিরোধী ব'লে মনে হতে পারে, কেননা সংক্ষেপে বলতে গেলে, ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদের তুলনায় অথর্ববেদ একই সঙ্গে প্রাচীনতর ও নবীনতর। সংহিতাপাঠের দিক দিয়ে সামবেদ তাৎপর্যহীন, যেহেতু পাঠগতভাবে এর অধিকাংশই ঋগ্বেদ থেকে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। অথর্ববেদের বিষয়বস্তু, বিশেষত তার ঐন্দ্রজালিক অংশটি সভ্যতার উষাকাল থেকে জনসাধারণের মধ্যে বর্তমান ছিল ; কিন্তু অথর্ববেদের বহু সূক্তই পরবর্তী কালে রচিত। আর্যরা তখন সদানীরা নদী অতিক্রম ক'রে এতাবৎকাল পর্যন্ত নিষিদ্ধদেশ রূপে পরিচিত অঞ্চলে অর্থাৎ বিহার ও সম্ভবত উত্তর-পশ্চিম বাংলায় প্রবেশ করেছিল। অথর্ববেদের সাধারণ পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষত সেই ব্রাত্যগোষ্ঠীর উপস্থিতি—যাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত বা বুদ্ধদেবের সমকালীন নাস্তিক্যবাদী ধর্মগোষ্ঠীর পূর্বসূরি—আধ্যাত্মিক চাঞ্চল্য ও অস্থিরতার সূত্রপাত ঘটানোর অন্যতম কারণ ছিল। মগধে যে অপেক্ষাকৃত স্বাধীন, বেদবহির্ভূত অরক্ষনশীল ধর্মমত প্রচলিত ও স্বয়ংশাসিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহের সম্মিলিত সঙঘ বর্তমান ছিল—তা আর্যদের পরিচিত অভিজ্ঞতা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। নতুন অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ, চিন্তাধারা ও প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান পরিচিতি এবং সেই সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম ও অন্যান্য নাস্তিক্যবাদী গোষ্ঠী ও আন্দোলনের বিস্তারের ফলে সংহিতা রচনার পর্যায় সমাপ্ত হল। বৈদিক বিশ্ববীক্ষার দীর্ঘকাল-ব্যাপী ক্রমিক অবরোহণের পথে অথর্ববেদ সংহিতার সংকলন একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপক।

সূক্তসমূহের শ্রেণী বিন্যাস

আমরা ইতোমধ্যে সামাজিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে রচিত সূক্তগুলিকে নিম্নোক্তভাবে বর্গীকরণ করেছি : (১) শারীরিক কল্যাণ, (২) দৈনন্দিন জীবনে কল্যাণ, (৩) পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণ, (৪) রাজকীয় ও সৈন্যবাহিনী সংক্রান্ত, (৫) ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র সম্পর্কিত, (৬) সৃষ্টিতত্ত্ব, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক এবং (৭) ঐন্দ্রজালিক মায়া।

শারীরিক কল্যাণ বিষয়ক সূক্তিগুলিতে তৎকালীন জনসাধারণের মধ্যে যেসব ব্যাধির প্রকোপ দেখা যেত তার উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে আছে ক্ষয়রোগ, হৃদ্‌রোগ, ম্যালেরিয়া, সর্দি-কাশি, রক্তাল্পতা, গলগণ্ড, অন্ধত্ব, জ্বর, পাণ্ডুরোগ, কৃমি, কেশনাশ, বিভিন্ন রকমের ব্যথা এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের পক্ষাঘাত। এইসব ব্যাধির অধিকাংশেরই মূলে রাক্ষস বা ভূতপ্রেত—এই বিশ্বাস তখন প্রচলিত ছিল।

এইজন্যেই বিভিন্ন অনুষ্ঠান এদের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হ'ত এবং মন্ত্রগুলি প্রেতবিতাড়নের জাদুকৌশল ছিল ব'লে মনে হয়। রক্তপাত, অতিরিক্ত সোমপানজনিত ব্যাধি, শারীরিক যন্ত্রণা, উন্মত্ততা, আকস্মিক দুর্ঘটনা, বিষক্রিয়া, সর্পদংশন, শিশুর দন্তোদগম প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের জন্য ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া কিংবা প্রার্থনা প্রচলিত ছিল। বহু ঔষধি, ধাতব ও রাসায়নিক পদার্থ, গ্রহরত্ন, রক্ষাকবচ ইত্যাদির প্রস্তুতি ও প্রয়োগের জন্য নানাবিধ ইন্দ্রজাল প্রয়োগ করা হ'ত। এ সমস্ত বিষয়ের অধিকাংশই অথর্ববেদের নিজস্ব বিষয় নয়। কিন্তু শাস্ত্রে এদের অন্তর্ভুক্তি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, শাস্ত্র রচনার মূলপর্ব যখন সমাপ্ত হতে চলেছিল, বৈদিক যুগের সেই অন্তিম পর্বেই এইগুলি সংকলিত।

বাস্তবজীবনের কল্যাণকামনায় প্রযুক্ত সূক্তগুলিই সংখ্যায় সর্বাধিক ; এদের মধ্যে রয়েছে দীর্ঘজীবন ও সম্পত্তির জন্য প্রার্থনা (আয়ুষ্য ও পৌষ্টিক), স্থাপত্য, জ্যোতির্বিদ্যা, বৃক্ষলতা ও প্রাণীসমূহের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা, নির্দিষ্ট সময়ে বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা, আকস্মিক আঘাত, সর্প ও বিষাক্ত কীটের দংশন থেকে রক্ষার জন্য প্রার্থনা ইত্যাদি। সাধারণভাবে এইসব প্রার্থনা নবপ্রতিষ্ঠিত কৃষিজীবীদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত, যারা সুনির্মিত গৃহে বাস করত, কৃষির প্রায়োগিক দিকসম্পর্কে অবহিত ছিল, বৃক্ষলতা ইত্যাদির প্রয়োজন অনুভব ক'রে তাদের প্রতি যত্নবান ছিল এবং যারা পশুপালন, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করত।—সম্ভবত, সেই প্রয়োজনেই গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান সম্পর্কে তাদের মধ্যে নতুন আগ্রহ দেখা দিয়েছিল।

সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের কাছ থেকে আর্যরা পোড়া ইঁটের সাহায্যে গৃহনির্মাণপদ্ধতি শিখে নিয়েছিলেন। অথর্ববেদে গৃহনির্মাণের বিভিন্ন উল্লেখ থেকে স্থাপত্যবিদ্যা সম্পর্কে আর্যদের আগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যায়। সাধারণভাবে যে অর্থনৈতিক চিত্র এখানে পরিস্ফুট, তা থেকে বোঝা যায় যে, নিতান্ত প্রাথমিক স্তরে থাকলেও বিত্তবান শ্রেণীর দ্বারা নির্বিত্তের শ্রমশক্তির শোষণ ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে ; ফলে, প্রাথমিক উৎপাদক আর ধন ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে পারছে না, এবং তাদের শ্রমের ফল থেকে বঞ্চিত করার জন্যে একটি উপস্বত্বভোগী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে। অথর্ববেদে ব্যবহৃত 'বস্ন' শব্দটির অর্থ বিক্রয়মূল্যের অংশ ; এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, মুনাফা সম্পর্কিত ধারণা ও তার বাস্তব অভিব্যক্তি তখনকার সমাজে পরিচিত ছিল।

পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণবিষয়ক সূক্তগুলিতে আমরা পারিবারিক শান্তির জন্যে প্রার্থনা (সাংমনস্য), দাম্পত্য সম্পর্কে এবং মহিলাদের নিজস্ব প্রয়োজন নিবৃত্তির জন্যে প্রার্থনা (স্ত্রীকর্ম) এবং গর্ভধারণ ও প্রসবসময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যাধিগুলির উপশমের জন্যে প্রার্থনা লক্ষ্য করি। গর্ভবতী রমনী ও নবজাত শিশুর জন্যে তখনকার

সমাজের বিবিধ ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল,—দানব ও অপদেবতাদের বিতাড়িত করাই ছিল এগুলির লক্ষ্য। অথর্ববেদের সমকালীন ঋগ্বেদের একটি সূক্তে (১০ : ১৬২) অথর্ববেদের মতই গার্হস্থ্য বিষয় বর্ণিত ; সেখানে আসন্নপ্রসবা নারীর নিরাপত্তার জন্যে অপদেবতাদের বিতাড়নের কথা বলা হয়েছে। তখনকার সমাজে যেহেতু জনসংখ্যার বৃদ্ধি অভিপ্রেত ও প্রয়োজনীয় ছিল, তাই বন্ধ্যাত্বকে সমাজ অভিশাপ বলেই জ্ঞান করত। উপযুক্ত মন্ত্র ও ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে বন্ধ্যাত্ব দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। অনুমান করা যেতে পারে, সমগ্র অথর্ববেদ বৈদিক ধর্মচর্যার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত বহু স্ত্রী-আচার মূলত নারীসমাজের দ্বারাই আচরিত ও পরিচালিত হ'ত।

অন্যদিকে বহুপত্নীক স্বামীর অবিভক্ত প্রেম ও মনোযোগ লাভ করার জন্যে প্রার্থনা এবং প্রণয়িনীর প্রেম-অধিকারের জন্যে স্বামী বা প্রণয়ীর প্রার্থনাও চোখে পড়ে। স্ত্রীকর্ম বিষয়ের সূক্তগুলির মধ্যে রয়েছে স্পষ্টত প্রণয় আকর্ষণের উদ্দেশ্যে জাদুক্রিয়া,—ঈপ্সিত প্রণয়ীর চিত্ত জয় করার জন্যে বা শীতলহৃদয় প্রণয়ীর হৃদয়ে প্রেম উদ্রেক করার জন্যে সম্ভবত প্রণয়বর্ধক পানীয়, প্রলেপ ও রক্ষাকবচ ব্যবহার করা হোত। পিতৃগৃহ-নিবাসিনী পরিণতবয়স্কা অনূঢ়া কন্যারও ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে কিছু কিছু প্রার্থনা আছে। স্পষ্টতই সেই সময় বিবাহ সকল নারীর পক্ষেই আবশ্যিক ব'লে সমাজে বিবেচিত হ'ত এবং অনূঢ়া যুবতী সমাজের দৃষ্টিতে কণ্টক-স্বরূপ হয়ে উঠত ; কুলপা কন্যারূপে তার উপস্থিতি তাই তাৎপর্যপূর্ণ। অধিকতর সমৃদ্ধি ও সম্পত্তির বৃদ্ধির ফলে সামাজিক ক্ষমতা সম্পূর্ণতই পুরুষের অধিগত হয়ে পড়েছিল ; অনূঢ়া নারীর সম্পত্তির অধিকার বিতর্কের বিষয়বস্তু হওয়ার ফলে সেই নারী অনিবার্যভাবেই সামাজিক মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছিল।

স্ত্রী-আচারগুলিতেও প্রণয়সম্পর্কিত জাদুতে সাধারণত অগ্নি যে আহূত, হতেন সম্ভবত তার কারণ এই যে, আবেগের প্রতীকী প্রকাশ হওয়া ছাড়াও তিনি প্রতিকূল দানবশক্তির বিরুদ্ধেও কার্যকরী ছিলেন।

সমাজ

সামাজিক জীবন সম্পর্কিত সূক্তগুলির মধ্যে যে সমস্ত বিষয়ে প্রার্থনা রয়েছে, তার মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য ঃ—সমৃদ্ধি, সন্তানের স্বাস্থ্য, গোধন, যথাকালে বৃষ্টি, ভূমির উর্বরতা, পর্যাপ্ত শস্য, সম্পদবৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্যে সাফল্য, গৃহ ও শস্যক্ষেত্রের নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ ও অগ্নিভয়-জনিত শস্যহানির আশঙ্কা থেকে রক্ষা, সর্পদংশন, আকস্মিক মৃত্যু, শত্রুর আক্রমণ ও ধ্বংসপ্রবণ দানবশক্তির বিরুদ্ধে

আত্মরক্ষা প্রভৃতি। এই সমস্ত বিষয়সূচী থেকে স্পষ্টতই কৃষিজীবী সমাজের চিত্রটিই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, যার অভীষ্ট ছিল সমৃদ্ধি ও পরিপূর্ণ শষ্যভাণ্ডার। সমস্ত কৃষিজীবী সমাজে আতিথেয়তা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ব'লে বিবেচিত হ'ত; অথর্ববেদও এ-বিষয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট অভিমত পোষণ করে। অতিথিসেবা পবিত্র সামাজিক কর্তব্য ব'লে বিবেচিত হয়েছে। স্পষ্টতই এই প্রথা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ও উপনিবেশের প্রতিষ্ঠাতা আর্যদের বিশ্ববীক্ষারই নিদর্শন। আর্যরা তখনও যথেষ্ট সঞ্চরণশীল ছিলেন ব'লে স্থায়ী গৃহস্থদের সমৃদ্ধির ওপর নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে কতকটা নির্ভরশীল ছিলেন। অতিথিদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দানগুলির তালিকা থেকে মনে হয় যে, অপরিচিত গ্রামবাসীদের মধ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্যে প্রয়োজনীয় সাহায্য নবাগত ব্যক্তিকে দেওয়া হ'ত।

খাদ্য বা অন্নকে উজ্জ্বল ভাষায় প্রশংসা করা হয়েছে ; তাই আমরা উষ্ণ, পীতবর্ণ ও পুষ্টিকর অন্নে পূর্ণ থালার বর্ণনা পাই, যা স্বয়ং সূর্যের প্রতীক হয়ে উঠেছিল, কেননা পরোক্ষভাবে সমস্ত খাদ্যই সূর্য থেকে উৎপন্ন। জীবনীশক্তি, যে রহস্য-গূঢ় সত্ত্বা প্রাণ থেকে প্রাণহীনকে পৃথক করে, অন্ন থেকেই তা' উৎপন্ন হয়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে নববধূর প্রতি যে ধরণের আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছিল, তা থেকে মনে হয় যে সেই সময়ের সমাজ থেকে অথর্ববেদের সমাজ গুণগতভাবে ভিন্ন। প্রতিষ্ঠাপন-সূক্ত এবং অন্যান্য বিচ্ছিন্ন নিদর্শন থেকে বোঝা যায় যে, নারী সেই সমাজে স্বাধীনতা ও মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। তবে বিধবা-বিবাহের সুস্পষ্ট উল্লেখ অথর্ববেদে পাওয়া যায় (৫।১৭।৮ ; ৯।৫।২৭) ; আবার সতীদাহের উল্লেখও এতে আছে (১৮।৩।১,৩)।

কৃষিব্যবস্থার বিবিধ দিক সম্পর্কিত সূক্তগুলির প্রয়োগ অথর্ববেদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ঋগ্বেদের অধিকাংশই আর্যদের কৃষিজীবী হয়ে ওঠার পূর্বে রচিত ; সেইজন্য গোধন, অন্যান্য পশু ও অশ্বের বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য বহু সূক্ত নিবেদিত হলেও কৃষিকার্য সম্পর্কিত সূক্ত বিরল। অথর্ববেদে প্রায়ই আমরা অনেক নতুন নামের উদ্ভিদ ও নানা ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায় সেগুলির ব্যবহার দেখতে পাই। এই পর্যায়ে 'গোধন' 'সম্পদে'র প্রতিশব্দ হয়ে পড়েছে এবং অনেক প্রার্থনায় তাদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সংখ্যাবৃদ্ধি, ব্যাধিপ্রতিকার ইত্যাদি বিষয়ে সমাজের উদ্বেগ প্রতিফলিত। কৃষিকার্যে প্রয়োজনীয় পশুদের প্রতি মনোযোগ খুবই স্বাভাবিক, কেননা অথর্ববেদ মূলত সেই জনগোষ্ঠীর দ্বারা রচিত যাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি কৃষিব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। সমৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ুর জন্য সাধারণ প্রার্থনা ছাড়াও রক্ষাকবচ, প্রলেপ, মায়াঞ্জনের ব্যবহার, গোদান ও 'মহাব্রীহি' প্রভৃতি সামাজিক প্রথার অস্তিত্ব, জ্ঞান ও মেধার জন্যে প্রার্থনা এবং সেইসঙ্গে গৃহনির্মাণের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মঙ্গলবিধানের

আকাঙ্ক্ষায় প্রার্থনা বিবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে নিরাপত্তার জন্যে প্রার্থনা,—সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন দিকের পরিচয় বহন করছে। সভা ও সমিতির উল্লেখ থেকে স্বায়ত্তশাসন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অস্তিত্ব এবং দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন সম্পর্কে আমরা অবহিত হই। অথর্ববেদের পুরোহিত রাজার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ব'লে এ গ্রন্থে প্রশাসনের বিভিন্ন দিকের উল্লেখ থাকা খুবই স্বাভাবিক। যে যুগে সমগ্র উত্তর ভারত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক রাজাই প্রতিবেশীর রাজ্য গ্রাস ক'রে নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্যে উৎসুক ছিলেন, সে যুগে অথর্ববেদের পুরোহিতের ভূমিকা স্বাভাবিকভাবেই অংশত রাজনৈতিক মাত্রা পেয়ে গিয়েছিল। শত্রুকে পরাস্ত করার জন্যে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার ব্যবস্থা করা ছাড়াও পুরোহিতকে রাজ্যাভিষেক বা সৈন্যাভিযানের সময়ে সর্বাত্মক দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হ'ত। সামাজিক শ্রেণীরূপে ক্ষত্রিয়দের উত্থান ও প্রাধান্য অথর্ববেদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। সোমযাগগুলি বিশদ ও দীর্ঘায়িত হয়ে ওঠার যুগে রাজন্যশ্রেণীর প্রাধান্যলাভ খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার, কেননা প্রভূত ব্যয়সাধ্য ও অতিরিক্ত মাত্রায় দীর্ঘায়ত যজ্ঞানুষ্ঠানের আর্থিক দায়িত্ব বহন করা অন্য কোনো শ্রেণীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ক্ষত্রিয়দের পৃষ্ঠপোষকরূপে 'ক্ষত্রভৃৎ অগ্নি' নামে অগ্নির বিশেষরূপ তখনই পরিকল্পিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতসম্প্রদায়ের গুরুত্বও কিছুমাত্র কম ছিল না। সামাজিক শ্রেণীরূপে ব্রাহ্মণের পবিত্রতার উপর গুরুত্ব আরোপ থেকে বোঝা যায় যে, অথর্ববেদের কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক সূক্ত অনেক পরবর্তীকালে অর্থাৎ বৈদিক যুগের অন্তিম পর্যায়ে রচিত, যখন সমাজে শ্রেণীবিন্যাস স্পষ্ট এবং ব্রাহ্মণের অবস্থান সমাজের শীর্ষস্থানে।

দেবসঙ্ঘ

ঋগ্বেদের দেবতারা যদিও অথর্ববেদেও উপস্থিত রয়েছেন, তথাপি ভগ, অর্যমা, অংশ, দক্ষ, মার্তণ্ড, অদিতি এবং দৌ-এর মতো যে সমস্ত গৌণ দেবতা ঋগ্বেদের পর্যায়েই ম্লান হয়ে গিয়েছিলেন, অথর্ববেদে তাঁরা আরও ছায়াবৃত ও প্রায় সম্পূর্ণ বিস্মৃত। এইসব দেবতারা ঋগ্বেদ থেকে সরাসরি অথর্ববেদে এসে পৌঁছেছিলেন এবং প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই ঋগ্বেদের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে অথর্ববেদের সূক্তগুলির শিরোদেশে যান্ত্রিকভাবে তাঁদের আরোপ করা হয়েছিল। কেননা মৌলিক অথর্ববেদীয় সুক্তগুলি স্বভাববৈশিষ্ট্যে ঐন্দ্রজালিক হওয়ার ফলে এগুলি প্রকৃত অর্থে দেবতার প্রভাবের বাইরে অবস্থিত। ঋগ্বেদের তুলনায় অথর্ববেদে অগ্নির অনেক বেশি কার্যকলাপ ও নাম রয়েছে। যেমন :—রক্ষোঘ্ন, সপত্নহ, দস্যুনাশন, পাপমোচন ও শালাগ্নিদৈবত। ঋগ্বেদের আপ্রীসূক্তের, মতো অগ্নির আরও বহু ধরনের নাম ও

বিশেষণ আমরা পাই। অগ্নির উপর অথর্ববেদে এই যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা ইরাণীয় অগ্নিবাচক 'অথর্' ও অগ্নিচর্যার পুরোহিত অথর্বার অন্তর্লীন সম্পর্কের কথা বিবেচনা করতে পারি। পূর্বেই দেখেছি অথর্ববেদের তিনটি রচয়িতা বংশ—অথর্বা, ভৃগু ও অঙ্গির—ব্যুৎপত্তিগতভাবে অগ্নির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত।

অথর্ববেদের বহু সূক্ত যেহেতু ঋগ্বেদ থেকে সরাসরি ঋণ হিসাবে গৃহীত, তাই এগুলির সঙ্গে সহগামী দেবতারাও অনিবার্যভাবেই এখানে উপস্থিত। ব্রাত্যসূক্তের সঙ্গে আমরা মহাদেবকে (ঈশান বা শিব নামে) পাই, যাঁর শারীরিক বর্ণনার মধ্যে পরবর্তীকালের বিখ্যাত বিশ্লেষণ 'নীললোহিতে'র পূর্বভাস সূচিত হয়েছে। অথর্ববেদের মধ্যে বৈদিক সাহিত্যের মূলধারা ইতোমধ্যেই ইতিহাস, গীতিকা ও বিখ্যাত পুরুষদের সম্পর্কে লোকশ্রুতি দ্বারা সমৃদ্ধ হতে শুরু হয়েছে। বেদ এবং বেদমাতা সম্পর্কিত ধারণা যে অথর্ববেদে দেবতায় পরিণত হয়ে গেছে, তার মধ্যে সম্ভবত সংহিতা সাহিত্য রচনার সমাপ্তি ও পবিত্র লোকোত্তর শাস্ত্ররূপে তাদের স্বীকৃতি পাওয়ার প্রমাণ স্পষ্ট। অথর্ববেদে রুদ্রদেবের সঙ্গে যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত, তা ঋগ্বেদে দেখা যায়নি ; তাই, তিনি এখন বাণিজ্য-যাত্রায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন এবং গৃহ, শস্য, ক্ষেত্র ও জলাধার থেকে সর্প, কুকুর, শৃগাল, বাজপাখি, অজগর, মশামাছি ইত্যাদি বিতাড়ন করেন। দেবতাদের পাশাপাশি বিচিত্র ধরনের অর্ধদেবতা, ভূতপ্রেত, সর্প, অপ্সরা ইত্যাদির দেখা পাওয়া যায়। লোকায়ত ধর্মের লঘু ঐতিহ্যের অন্তর্গত অথর্ববেদ বেদরূপে স্বীকৃতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে লোকমানসের গহনে নিহিত জনপ্রিয় প্রত্নকথার একটি সমগ্রস্তর যৌথ অবচেতন থেকে উত্থিত হয়ে সচেতন সাহিত্য-রচনায় স্থানলাভ করে। 'মধুকশা' নামক রহস্য-গূঢ় ধর্মচর্যার সঙ্গে অশ্বীদের সম্পর্কও উল্লেখযোগ্য। ভৃগুর সঙ্গে সম্পর্কিত ও অথর্বা-ধারার অন্তর্গত দধ্যঙ্ ঋষি এই গোপন মধুবিদ্যার তত্ত্ব অশ্বীদের শিক্ষা দিয়েছিলেন।

দর্শন

অথর্ববেদের বিষয়বস্তুর মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্বমূলক ও আধ্যাত্মিক সূক্তের উপস্থিতি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। ঋগ্বেদের প্রথম ও দশম মণ্ডলের অপেক্ষাকৃত নবীনতর অংশে এই ধরনের সূক্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তঃশায়ী পরমাত্মার ধারণা পরবর্তী কালেরই সৃষ্টি ; সম্ভবত, ইন্দো-ইয়োরোপীয় গোষ্ঠীবহির্ভূত সেই আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকেই তা অধিগৃহীত, যাদের একাংশ হয়তো [illegible] ঈশ্বরবা[illegible] ছিল এবং এরই পরবর্তী স্তরে বিমূর্তায়নের প্রবণতা থেকে অদ্বৈত[illegible] নিয়েছিল।

ব্রহ্ম বা আত্মা বিষয়ক জ্ঞান বহু সূক্তে আলোচিত হয়েছে। ঋগ্বেদের অন্তর্গত বৃহস্পতি, ব্রহ্মা, প্রজাপতি, বিরাট ও আত্মার মতো প্রাচীন নামগুলি যেমন এখানে পুনর্বার উপস্থিত হয়েছে, তেমনি বেন, রোহিত ও স্কম্ভের মতো নতুন কিছু অধ্যাত্মতত্ত্বের ও তদ্বাচক দেবতার নামও দেখা যাচ্ছে, এতে বিমূর্তায়নের বা আধ্যাত্মিক অনুশীলনের ক্রমিক কিছু স্তর প্রতিফলিত। সৃষ্টির অন্তর্গত রহস্য যে অথর্ববেদের বিভিন্ন কবিকে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে, তার বহু প্রমাণ আমরা পাই। অন্তিম পর্যায়ের কিছু সূক্তে পরমাত্মার বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের ব্যাকুলতা ও সংজ্ঞা প্রদানের প্রয়াস অভিব্যক্ত হয়েছে। জ্ঞান ও উপলব্ধির জন্যে ব্যাকুল প্রার্থনায় বৈদিক সাহিত্যের শেষ পর্যায়ের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যই প্রকাশিত—ঋগ্বেদের সর্বশেষ পর্বে তার শুরু এবং উপনিষদের মধ্যে তার সমাপ্তি।

প্রাচীনতম কাল থেকে বৈদিক আর্যরা 'ব্রহ্মন্' শব্দে সেই ঐন্দ্রজালিক অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাটি বুঝতেন, যা বিশ্বজগতের অন্তর্নিহিত। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, যথাযথ মন্ত্রের সাহায্যে উপযুক্ত যজ্ঞানুষ্ঠানে আহূত হয়ে, প্রত্নকথা ও অনুষ্ঠানসমূহে নিহিত ব্রহ্মের সুপ্তশক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে এই শক্তি সম্পর্কিত জ্ঞান আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যখন সৃষ্টিরহস্য ভেদ করার উৎসাহে নিজস্ব পথে ক্রমশ গুরুত্ব অর্জন করল, তখন 'ব্রহ্মণ্' শব্দের অর্থগৌরবও সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। অথর্ববেদের পুরোহিতদের যজ্ঞে কোন প্রত্যক্ষ আবশ্যিক ভূমিকা ছিল না ব'লে তাঁরা আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনায় ব্যাপৃত ছিলেন, এবং তাঁদের 'ব্রহ্মা' বা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ববিদ ব'লেই অভিহিত করা হ'ত ; অথর্ববেদকেও বলা হ'ল ব্রহ্মবেদ।

'কালে'-এর উদ্দেশে নিবেদিত দুটি সুপ্রসিদ্ধ সূক্তে মোট পনেরোটি শ্লোক গ্রথিত হয়েছে। কাব্যগুণে উৎকৃষ্ট, এই দু'টি সূক্তে কালের যে আধ্যাত্মিক ভাবমূর্তি পরিস্ফুট হয়েছে, তাতে কাল অদৃশ্য, সৃজনশীল এবং ব্রহ্মাণ্ডধারণকারী চিরন্তন পরমসত্তা। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দেবকল্পনাতেও কালের দেবায়ন ঘটেছে। ভারতে কালের দেবায়নের সঙ্গে স্রষ্টারূপী সময়ের প্রতীকায়িত দেবরূপ 'প্রজাপতি'র উত্থান একই সূত্রে গ্রথিত। সভা ও সমিতিকে যজ্ঞের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ক'রে দেখানো হয়েছে। অথর্ববেদে আরো কিছু অতীন্দ্রিয় ধারণা মাঝেমাঝেই অভিব্যক্ত হয়েছে। যেমন, সৃষ্টিশীল প্রেরণারূপে বিরাট। বাস্তব জগতে বিরাটকে যে দুগ্ধবতী গাভীর সঙ্গে, আধ্যাত্মিক স্তরে যে রহস্যগূঢ় বাক্-এর সঙ্গে এবং অতিজাগতিক স্তরে যে রক্ষাকারী শক্তির সঙ্গে সমন্বিত করা হয়েছে, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পঞ্চৌদন অজও তেমনি হঠাৎ অতিজাগতিক তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে অনন্ত যজ্ঞের প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে। স্কম্ভের মধ্যেও আমরা বিমূর্ত অতীন্দ্রিয় ভাবনার প্রকাশ লক্ষ্য করি ; সমগ্র সৃষ্টির উপগঠনরূপে তারই বিভিন্ন অংশ থেকে বিশ্বজগতের উপাদানসমূহ আবির্ভূত।

স্কম্ভ ও কাল সম্পর্কিত ধারণা—বর্ষ, ঋতু, মাস, পক্ষ, মহাশূন্য ইত্যাদির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। সৃষ্টির আদিকারণ বিষয়ে বিমূর্ত ভাবনার অভিব্যক্তি ঘটেছে 'জৈষ্ঠব্রহ্মের'র উদ্দেশে রচিত একটি সূক্তে।

ব্রহ্মৌদন, প্রাণ, ব্রহ্মচর্য ও কিছু কিছু বস্তু ও ধারণা বিমূর্ত ভাব-রূপে বন্দিত হয়েছে। সৃষ্টির অন্যতম প্রেরণা রূপে রোহিতের বন্দনা থেকে মনে হয় সূর্যদেবই সেখানে বিমূর্তায়িত, আবার অন্য একটি অনুপুঙ্খ থেকে অনুমান করা যায় যে, রোহিত ও অদিতির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে পার্থিব রাজা ও তাঁর সঙ্গিনী নারীরা গৌরবান্বিত হয়েছেন। একটি দ্ব্যর্থবোধক সূক্ত একই সঙ্গে পুরুষ ও অদ্বৈত তত্ত্বের প্রতি প্রযোজ্য। এইসব অসংখ্য আধ্যাত্মিক ও অতীন্দ্রিয় ভাববস্তুকে নিছক একই বিমূর্ত ভাবনার বিভিন্ন নামান্তর ব'লে মনে করা যায় না ; তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম ভাবগত পার্থক্য রয়েছে। সম্ভবত, ভিন্ন ভিন্ন ঋষির দ্বারা এবং বিভিন্ন অঞ্চল ও যুগে এদের উৎপত্তি হয়ে কালক্রমে বিভিন্ন চিন্তাবিদদের মধ্যেও বিশ্বাসের নানা শাখায় এগুলি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

অথর্ববেদের সৃষ্টিতত্ত্ব ও অধ্যাত্মবিদ্যার যে পৃথক চরিত্র রয়েছে, তার সঙ্গে ঋগ্বেদের শেষতম আধ্যাত্মিক সূক্তের সাযুজ্য লক্ষণীয় ঃ উভয়ের ভাষাই সাংকেতিক, অতীন্দ্রিয় গূঢ়বিদ্যার উপযোগী,—সম্ভবত সমাজের কয়েকটি গোষ্ঠী বিশেষ যত্নের সঙ্গে সেই গোপন রহস্যবিদ্যাকে লোকচক্ষুর আড়ালে সংরক্ষণ করত, উপনিষদে এসে আমরা এ তথ্যের প্রমাণ পাই। প্রত্নকথা ও অনুষ্ঠানপরায়ণ যুগের ফসলরূপে এরা অনিবার্যভাবে অর্ধসাংকেতিক প্রত্নপৌরাণিক ভাষায় বাস্তবতা সম্পর্কিত নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করেছে। কয়েক শতাব্দী পরে দেবকল্পনা ও অনুষ্ঠানচর্যার সঙ্গে নাড়ীর বন্ধন যখন প্রায় ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, তখন আমরা যথার্থ বিমূর্ত ভাবনার প্রথম সার্থক অভিব্যক্তি লক্ষ্য করি উপনিষদের প্রত্নপৌরাণিক পরিমণ্ডল-বহির্ভূত অধ্যাত্মবাদী চিন্তার মধ্যে। কিন্তু সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত নতুন মূল্যবোধের কাঠামো প্রয়োজনীয় ব'লে উপস্থাপিত না করছে ততক্ষণ নতুন অধ্যাত্মবিদ্যার ক্ষেত্র আবিষ্কারের প্রয়াস শুরু হবে না এবং সৃষ্টিতত্ত্ব ও অধ্যাত্মবিদ্যা অনিবার্যভাবেই প্রত্নকথা, অনুষ্ঠানচর্যা, ইন্দ্রজাল ও রহস্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সংযোগ রক্ষা ক'রে চলবে।

ব্রাত্য সূক্ত

তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণে ব্রাত্যদের সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—ব্রাত্য কালো পোশাক (কখনও কখনও সাদা পশমের পোশাক) ও পাগড়ি (বা শিরস্ত্রাণ) পরে, অমসৃন রথে আরোহন করে এবং যজ্ঞের জন্যে পৃথকভাবে সংরক্ষিত আর্যদের খাদ্য

অপহরণ করে। সুললিত বাগ্‌ভঙ্গী ক'রে 'ব্রাত্য' তার এই অপকার্যের দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। যজ্ঞের জন্যে উপযুক্তভাবে দীক্ষিত না হয়েও 'ব্রাত্য'রা আর্যভাষায় কথা বলে, তবে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রতি সামান্যতম মনোযোগও তাদের নেই। 'ব্রাত্য' শব্দটি সাধারণত 'ব্রত' শব্দ থেকে নিষ্পন্ন এবং এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরা হয় 'ব্রত থেকে পতিত' অর্থাৎ বৈদিক ধর্মের পরিধি-বহির্ভূত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, ব্রাত্য শব্দ থেকেই পরবর্তীকালে প্রাগুক্ত অর্থটি নিষ্কাশন করা হয়েছিল। শব্দটির মূল তাৎপর্য হ'ল 'বিধিবিরোধী গোষ্ঠী'। অন্য একটি ব্যুৎপত্তি অনুসারে এটি 'ব্রাত' (অর্থাৎ 'দল') শব্দ থেকে নিষ্পন্ন হতে পারে ; এই ব্যুৎপত্তিটিকেই অধিকতর যুক্তিসংগত ব'লে মনে হয়, যেহেতু ব্রাত্যরা আর্যদের কাছে শৃঙ্খলাবিহীন উন্মার্গগামী বা উচ্ছৃঙ্খল একটি 'দল' রূপেই প্রতিভাত হ'ত। তাণ্ড্য-মহাব্রাহ্মণ অনুযায়ী এরা আর্যভাষী ছিল, তাই অনুমান করা যায় যে, ব্রাত্যরা সম্ভবত ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সেই প্রাচীনতর অবৈদিক জনগোষ্ঠী, যারা কয়েক শতাব্দী পূর্বে ভারতবর্ষে প্রবেশ ক'রে আদিম অধিবাসীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসে প্রাচীনতর 'যোগ' জাতীয় ধর্মচর্যা অবলম্বন করেছিল, যারা বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করত না। পরে যখন এরা একই ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত বৈদিক আর্যদের সংস্পর্শে এল তখন তারা সহজেই আর্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে সম্মত হ'ল। ততদিনে তারা একটি 'শিব'কেন্দ্রিক ধর্মচর্যার অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। এই ভয়ংকর দেবতা যেহেতু নিজেই যোগী ব'লে পরিচিত, তাই সহজেই তিনি ভ্রমণশীল সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের একান্ত দেবতায় পরিণত হলেন। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এই শিবের হয়তো ভিন্ন ভিন্ন নামও ছিল, ও তৎসংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানও প্রচলিত ছিল ; ব্রাত্য-সূক্তগুলির সংকলনে এই দেবতার সমস্ত আঞ্চলিক নাম ও চর্যাবৈশিষ্ট্যের অগভীর ও পরীক্ষামূলক আপাত সমন্বয়ে একটা চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। শিবের বিভিন্ন নামের মধ্যে 'ভব', 'শর্ব', 'মৃড়', 'ঈশান', 'পশুপতি', 'উগ্রদেব' ও 'মহাদেব' নামগুলি ব্রাত্যসূক্তে প্রাধান্য পেয়েছে ; পরবর্তী সাহিত্যে শিবের জনপ্রিয় বিশেষণ হলো 'নীললোহিত', এ নাম ব্রাত্যদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, ব্রাত্যরা জীবিকার জন্যে তখনো কৃষিজীবী হয়ে ওঠেনি, বরং বহু সাহিত্য নিদর্শন থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তখনো তারা কতকটা যাযাবর জীবনযাপন করত। অবশ্য, সমাজে তাদের জন্য সম্মানিত আসন নির্দিষ্ট ছিল ; ভিক্ষাজীবী ব্রাত্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ক'রে রাজা বা গৃহস্থ নিজেদের কল্যাণ ও সমৃদ্ধিকে সুনিশ্চিত করতেন, এমন আভাসও ব্রাত্যসূক্তে আছে। ব্রাত্যের আধ্যাত্মিক ও নিগূঢ় রহস্যাবৃত পরিচয় সম্পর্কে আর্যরা যে সচেতন ছিলেন, তার প্রমাণ রয়ে গেছে সামাজিক, ধর্মীয় ও দার্শনিক জীবনে তার ওপরে গুরুত্ব আরোপের চেষ্টার মধ্যে। আমাদের কাছে যে জ্ঞানী 'যতি'র ভাবমূর্তি পরিস্ফুট হয়, সেই ব্যক্তির

সঙ্গে কোনো উৎপাদক শ্রমের সম্পর্ক নেই ব'লে জীবনধারণের জন্যে তাকে ভিক্ষা করতে হয় ; পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে পরিলক্ষিত বিবিধ ভ্রমমাণ 'যোগী' সম্প্রদায়ের আদিমূর্তি আমরা যেন ব্রাত্যের মধ্যে খুঁজে পাই। পরিধান, ভাষা, জ্ঞান, তত্ত্ববিদ্যা এবং যোগীর অনুরূপ জীবনযাপনের জন্যেই তাঁরা সমাজে সম্মানিত। বৈদিক আর্যদের এদেশে আগমনের পরেই তাঁদের পূর্বাগত আত্মীয়গণ মূল ধারার সঙ্গে মিশে যাবার কথা ভেবেছিলেন। পূর্বাগত জনগোষ্ঠীগুলি যদিও বা বৈদিক ধর্মমতের অনুসরণ করতেন, তবু ভারতবর্ষে তাঁরা আক্রমণকারীরূপে প্রবেশ না ক'রে নিছক আগন্তুক রূপেই এসেছিলেন। সম্ভবত, অমোঘ লৌহনির্মিত অস্ত্র নিয়ে আসেননি ব'লেই তাঁদের এদেশের আদিম অধিবাসীদের প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়নি ; বৈদিক আর্যদের তুলনায় সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত হীন ছিলেন ব'লে, তাঁরা সিন্ধু উপত্যকার জনসাধারণের নিকট কোনো প্রকৃত আশঙ্কার কারণরূপে প্রতিভাত হ'ন নি। এদেশে প্রবেশ ক'রে তাঁরা উত্তর ভারতের কৃষিজীবী অধিবাসীদের মধ্যে যাযাবর ভিক্ষাজীবী জনগোষ্ঠীরূপে বসবাস ক'রে জ্ঞান ও তত্ত্ববিদ্যার জন্যে যথেষ্ট সম্ভ্রম অর্জন করেছিলেন। প্রাচ্য ও নিষাদ সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীপতিদের সমাজে গ্রহণ করার জন্যে যে সমস্ত অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, তাদের সাহায্যে আর্য রাজারা সমাজের নিম্নবর্গীয় জনসাধারণের বিরুদ্ধে শাসনোপযোগী সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন। সেই আচার অনুষ্ঠান যেসব ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও ক্ষত্রিয় রাজাদের পক্ষে লাভজনক ছিল, তারা বৈশ্য শূদ্রদের বিরুদ্ধে যেন সামাজিক প্রতিরোধের দুর্গ গঠন করেছিলেন। আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি যে, অথর্ববেদে রাজপুরোহিতদের প্রাধান্য একটা নতুন রাজনৈতিক দিক পরিবর্তন অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যসমূহের গঠনের প্রতি তর্জনীসংকেত করছে।

মৃগার ও কুন্তাপসূক্ত

অথর্ববেদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যযুক্ত দুই শ্রেণীর সূক্ত 'মৃগার' ও 'কুন্তাপ' সূক্ত ব'লে পরিচিত। চতুর্থ অধ্যায়ে সাতটি 'মৃগার' সূক্ত একাদিক্রমে বিন্যস্ত ; রচয়িতা মৃগার ঋষির নাম অনুযায়ী সূক্তগুলির সাধারণ নামকরণ করা হয়েছে। সূক্তগুলিতে আহূত দেবতারা যথাক্রমে প্রচেতা অগ্নি, ইন্দ্র, সবিতা ও বায়ু, দ্যাবাপৃথিবী, মরুদ্‌গণ, ভব ও শর্ব বা রুদ্র এবং মিত্রাবরুণ। এইসব সূক্তের সমস্ত শ্লোকেই একটি সাধারণ ধ্রুবপদ রয়েছে : 'তিনি আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করুন।' এই মন্ত্রগুলি 'বৃহচ্ছান্তি' বা 'অংহোলিঙ্গ' শ্রেণীর মন্ত্রসমূহের অন্তর্গত ; আবার একইসঙ্গে এরা বৃহত্তর পৌষ্টিক শ্রেণীভুক্ত মন্ত্রের অন্যতম উপবিভাগ। আরোগ্যমূলক ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপে এইগুলি ব্যবহৃত হ'ত বলে বোঝা যায় যে, পাপই ব্যাধির কারণ রূপে নির্দেশিত। চব্বিশতম সূক্ত ছাড়া অন্যত্র দুই বা ততোধিক দেবতা মন্ত্রে উদ্দিষ্ট হয়েছেন। সমস্ত

সূক্তেই ভাববস্তু নৈতিক পাপ-স্বীকারোক্তি, শাস্তি-বাচক, প্রায়শ্চিত্তমূলক এবং ফলের দিক দিয়ে মুক্তিপ্রদ। অপরাধ-সচেতনতা এবং ক্ষমা, শান্তি ও সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা-মিশ্রিত ভয় এইসব সূক্তে মুখ্য আবেগরূপে পরিস্ফুট হয়েছে। নৈতিক সূক্ত যেহেতু সংহিতা-সাহিত্যে সাধারণভাবে বিরল, মৃগার সূক্তের বিশেষ গুরুত্ব তাই অনস্বীকার্য।

কুন্তাপ সূক্তের সংখ্যা মোট তেরটি, সাধারণত অথর্ববেদ সংহিতার উপসংহারে এদের স্থান নির্দিষ্ট। এই সূক্তগুলিতে কোনো দেবতা, রচয়িতা, ছন্দ বা সম্পূর্ণ বিনিয়োগ উল্লিখিত হয় নি, এমনকি, কোনো পদপাঠও নেই। মন্ত্রগুলি ঋগ্বেদ থেকে সম্পূর্ণত উৎকলিত হয়েছে ; বৈতান-সূত্র অনুযায়ী এরা শস্ত্র ও স্তোত্ররূপে সোমযাগে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এদের কিছু কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে ; যেমন এরা পুনরাবৃত্তিময়, সাংকেতিক, গূঢ় রহস্যপূর্ণ, কখনো কখনো আপাতদৃষ্টিতে আদিরসের আভাসযুক্ত ;—সম্ভবত, রহস্যময় ঐন্দ্রজালিক উর্বরতাবৃদ্ধির অনুষ্ঠানে এগুলি প্রযুক্ত হ'ত। সূক্তগুলির ভাষা সাধারণভাবে প্রাচীন এবং এগুলি জনপ্রিয় ছিল ব'লে অনুমান করা যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়ের সূচনায় 'ভূমিসূক্ত' নামে বিখ্যাত একটি দীর্ঘ ও চমৎকার সূক্ত রয়েছে, নিজস্ব রচনাগুণে যা অতুলনীয়। বেশ কিছু সূক্তে যদিও দ্যাবাপৃথিবী দেবতারূপে বন্দিত, মৌলিক ভাবনার দিক দিয়ে এসব 'ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে ঋগ্বেদের ভাবকল্পনার অনুসরণ অব্যাহত রয়েছে আকাশ-দেবতার সঙ্গিনী হওয়া ছাড়া পৃথিবীর পৃথক বৈশিষ্ট্য সব সূক্তে অনুপস্থিত। কিন্তু ভূমি-সূক্তটি কাব্যগুণেই অনন্য ; পৃথিবী এখানে সেই মৃত্যুহীন জননী, যিনি আপন সন্তানদের অন্নদান করেন ; তাদের দৌরাত্ম্য ও চাঞ্চল্য ধৈর্যসহকারে সহ্য করেন, স্বর্ণশীর্ষ শস্যক্ষেত্রের মাধুরীতে মণ্ডিতা হয়ে যিনি সুন্দরী, এবং বৃক্ষ লতা ও' পুষ্প-সমৃদ্ধিতে যিনি মনোরমা। এ সূক্তটি কাব্যিক প্রেরণামণ্ডিত প্রার্থনা ও প্রশস্তি গীতি ; শুধুমাত্র পর্যাপ্ত অন্ন ও জলের জন্যে প্রার্থনাই নয়, গো-সম্পদ বৃদ্ধি এবং বহু অদৃশ্য নৈসর্গিক বিপদের আশঙ্কা থেকে নিরাপত্তার জন্যে প্রার্থনা ছাড়াও জননী পৃথিবীর কিছু কিছু স্বভাব-বৈশিষ্ট্য, যেমন ধৈর্য, মনোহারিতা, সহিষ্ণুতা, আকর্ষণীয় সুরভি ইত্যাদি উপাসক যেন আপনার মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারেন, তার জন্যেও প্রার্থনা জানানো হয়েছে। তরুণী ও স্বাস্থ্যবতী জননীরূপে পৃথিবীর সৌন্দর্য নানাভাবে বর্ণিত ও প্রশংসিত হয়েছে। পরিণত স্বর্ণশ্যাম শস্যের মনোহরণ রূপ, গভীর অরণ্যের রহস্যময় সৌন্দর্য এবং বিভিন্ন ঋতুতে পৃথিবীতে পরিবর্তনশীল রূপ সম্পর্কে মুগ্ধতা এই সূক্তে বিবৃত।

পৃথিবী সম্পর্কে কৃষিজীবী মানুষের নবসঞ্জাত বিস্ময় ও সম্ভ্রমের বোধ এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির মর্মমূলে বিরাজমান ; ঋতুচক্রের আবর্তনের সঙ্গে পৃথিবীর পরিবর্তনশীল সৌন্দর্য এবং সোনালি শস্যের প্রথম উদ্গমে গভীর পরিতৃপ্তি অনুভব ক'রে মানুষ এই উপলব্ধিতে পৌছল যে, পৃথিবী আশ্রয়, নিরাপত্তা ও নিরন্তর অন্নসংস্থানের একটি নির্ভরযোগ্য ধ্রুব উৎস। নতুন জগতে জনসাধারণের বিপুল অংশের পক্ষে ভূমিই

জীবনধারণের প্রধান উৎস, অর্থনীতি এখন মূলত কৃষিনির্ভর ; উৎপাদনের অন্যান্য গৌণ উপায় থাকলেও সমাজজীবনে সেগুলির গুরুত্ব খুব বেশি ছিল না। এই ভূমিসূক্ত সে যুগে রচিত হয়েছিল, যখন যাযাবর পশুপালক জনগোষ্ঠী কৃষিব্যবস্থাকে গ্রহণ ক'রে নতুন জীবনযাত্রার আনন্দকে কৃতজ্ঞচিত্তে মেনে নিয়েছে, ফলে, এই প্রথম পৃথিবী সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যপূর্ণ মাতৃকা-দেবী রূপে উপলব্ধ হয়েছেন। বস্তুত, একটি বা দু'টি আধ্যাত্মিক সূক্তের কথা বাদ দিলে ভূমিসূক্তই অথর্ববেদের সর্বাধিক কাব্যগুণান্বিত সূক্ত।

ধর্মবিশ্বাস

আমরা যখন অথর্ববেদের ধর্মবিশ্বাসের কথা বলি, বৈদিক ও অবৈদিক আর্য জনগোষ্ঠী এবং আর্য ও আদিম ধর্মমতগুলির লঘু এবং বৃহৎ ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা ও পারস্পরিক সংমিশ্রণে পরিণতিই আমাদের উদ্দিষ্ট। অথর্ববেদের সূক্তগুলি যজ্ঞানুষ্ঠানের বিভিন্ন অবিচ্ছেদ্য কুশীলব অর্থাৎ পুরোহিত, ব্রাহ্মণ ও রাজন্যদের কেন্দ্র করেই রচিত ; এছাড়া, ইন্দ্রজাল ও জাদু অনুষ্ঠান এবং কল্যাণপ্রসু অনুষ্ঠানে এবং অশুভ অভিচার ক্রিয়াও এ সংহিতার অন্তর্ভুক্ত। বৃহৎ ঐতিহ্যে প্রধান দেবতারা মূলত ঋগ্বেদ থেকেই গৃহীত, কখনো কখনো দেবতাসহ কয়েকটি সম্পূর্ণ ঋগ্বেদীয় সূক্তই সামগ্রিকভাবে বা অংশত ঋণ হিসাবে গৃহীত হয়েছে ; কখনো বা সূক্তকে সম্ভ্রান্ত ক'রে তোলার প্রয়োজনে ঋগ্বেদীয় দেবতাদের বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়াকলাপ অথর্ববেদে বহুলাংশে পরিবর্তিত। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে, অগ্নির ভূমিকা এখন বহুধাবর্ধিত। এমনকি, কখনো-বা দেবতাদের ভূমিকা সম্পূর্ণ নতুনভাবে নির্ধারিত হয়েছে . যেমন অগ্নি বৃক্ষের, মিত্রাবরুণ বৃষ্টির, মরুদ্‌গণ পর্বতের, সূর্য চক্ষুর, মরুদ্‌গণের পিতা প্রাণিজগতের এবং মৃত্যু জনগণের অধিষ্ঠাতা দেবতা। বিভিন্ন দেবতার মধ্যেও নূতনভাবে সম্পর্ক নির্ণীত হয়েছে ; বরুণানী স্বপ্নের জননী, যম তার পিতা এবং তিনি স্বয়ং অররু নামে পরিচিত। তবে, অন্যান্য সংহিতার তুলনায় অথর্ববেদে উপদেবতাদের প্রাধান্য বেশি : রোহিত, স্কম্ভ ও বাস্তোস্পতিকে দৃষ্টান্ত রূপে উল্লেখ করা যায়। ব্রাত্যসূক্তের সঙ্গে সম্পর্কিত শিবের বিলম্বে আগত নামগুলি একইভাবে উল্লেখযোগ্য : ভব, শর্ব, ঈশান, নীললোহিত, পশুপতি ও উগ্রদেব।

'ব্রাত্য' শব্দটিও দেবনাম রূপে ব্যবহৃত এবং কালক্রমে নামটি যে বিশ্বদেবের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল, তার কারণ আর্যদেবসঙ্ঘে নবাগত দেবতাকে অন্যান্য ঋগ্বেদীয় দেবতার মতো সর্বব্যাপী এক দেবতার সম্মানে ভূষিত করা হ'ত। স্পষ্টতই ব্রাত্য বৃহৎ ঐতিহ্যে ধর্মের বিকল্প শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ব্রাত্য সূক্তগুলিতে প্রধান শব্দ হ'ল 'অনুব্যচলন্' বা অনুসরণ করেছিল। এই ব্রাত্যকে কী অনুসরণ করে?

যজ্ঞধর্মের সঙ্গে নিয়ত সংশ্লিষ্ট অনুপুঙ্খসমূহ, অর্থাৎ অনুষ্ঠান-পরিচালক পুরোহিত, উপকরণসমূহ, দেবতারা, ছন্দসমূহ, এমনকি বিভিন্ন দিক। এই সমস্তই ব্রাত্য, আবার সমস্তই তিনি অতিক্রম ক'রে যান। ব্রাত্য সূক্তগুলির অধিকাংশই যে রহস্যপূর্ণ ব'লে মনে হয়, এর কারণ এই যে, এদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিক প্রয়োগবিধি ইতিমধ্যে চিরকালের মত হারিয়ে গেছে। এই সূক্তগুলিতে যে প্রবণতা স্পষ্ট, তা হ'ল, সর্বজনগ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয় আনুষ্ঠানিকতা ও দেবকাহিনী নির্মাণের সুব্যক্ত লক্ষ্য। সাধারণভাবে এই প্রবণতাই পরবর্তী কালের সমগ্র বৈদিক ধর্ম ও সাহিত্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

ইন্দ্রজাল বা জাদু

আমরা দেখেছি কীভাবে ইন্দ্রজাল সমগ্র অথর্ববেদ সংহিতার পরিব্যাপ্ত রয়েছে। তবে, এই ইন্দ্রজালের নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি নেই ; তার বহু লক্ষ্য ও প্রকরণ রয়েছে— যথোপযুক্ত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াসহ অতিলৌকিক শক্তিযুক্ত মন্ত্রপূত শব্দ উচ্চারণের সাহায্যে প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করাই 'জাদু' বা 'ইন্দ্রজালে'র উদ্দেশ্য। পার্থিব সুখই এর লক্ষ্য—কখনো সাধারণ পদ্ধতিতে, কখনো বা সমস্যা ও মহামারীর উপশমের মাধ্যমে তা অর্জিত হয়। ঐন্দ্রজালিক মোহ বিস্তার ক'রে এবং ওষধি-প্রয়োগ ও অপদেবতার সাহায্য নিয়ে ব্যাধি থেকে আরোগ্যলাভের চেষ্টা করা হ'ত। নির্দিষ্ট কিছু জাদুক্রিয়ার সাহায্যে নানা নামে দানব, রাক্ষস, পিশাচ, অপ্সরা ও ভূতপ্রেতকে আহ্বান ও নিয়ন্ত্রণ করা হ'ত। বৃক্ষলতা ও ওষধি থেকে নানা ধরনের ঐন্দ্রজালিক ওষধি ও চিকিৎসার উপযোগী ভেষজ প্রস্তুতির নিদর্শন পাওয়া যায়। এ ধরনের ক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে পরিতৃপ্তিতে কাল্পনিক উত্তরণ লক্ষণীয়, —কৃমিবিনাশক অনুষ্ঠান কিংবা প্রণয়জাদুর ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানগুলির অন্তিম অংশে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

যৌন-শক্তিবর্ধক ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান 'বাজীকরণ' নামে পরিচিত ; এক্ষেত্রে আহূত দেবতার 'শেপ অর্ক' নামটিতে সূর্যের উর্বরতাশক্তির প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত। বেশ কিছু সূক্তে যৌনদক্ষতা ও আবেগনির্ভর মানসিক আদান-প্রদান, হৃদয়-বিনিময়, ক্রোধের উপশম ইত্যাদির ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠাপন, প্রীতিসঞ্জনন, সম্মোহন, উচাটন ইত্যাদি নানাবিধ বশীকরণ জাতীয় জাদু অনুষ্ঠানের বহুল-প্রয়োগ লক্ষণীয়। গ্রামীন জাদু-পুরোহিত বা আদিম ইন্দ্রজালের প্রভাব স্বর্গ আরোহনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত জাদু-প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে নিহিত। আবার সত্যানৃত পরীক্ষা-জাতীয় অনুষ্ঠান স্পষ্টতই নৈতিক ও পরমার্থিক বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল ছিল ; প্রাচীন মানুষের বিশ্বাস অনুযায়ী বিশ্বজগৎ যেহেতু সর্বাতিক্রমী সত্য বা ঋতের উপর

প্রতিষ্ঠিত, সেজন্যে পাপকর্মা বা অনৃতকারীকে নিশ্চিতই ইন্দ্রজাল-নিয়ন্ত্রিত অদৃশ্যশক্তি উপযুক্ত শাস্তি দেবে,—এ বিশ্বাস ছিল। শত্রুবিনাশের জন্যে সূক্ত উচ্চারণ করার সময় তদুপযোগী ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানে একটি ভেকের প্রতীকী ব্যবহার করা হত। তেমনি বিষক্রিয়া থেকে আরোগ্য লাভের জন্যে উইটিবির মাটিকে জাদুক্রিয়ার ব্যবহার করা হ'ত।

ঐন্দ্রজালিক সূক্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হ'ল কৃত্যা ও কৃত্যাপরিহরণ। যাতু কিংবা রক্ষোবিদ্যা বা অভিচার নামে পরিচিত বিশিষ্ট ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার তিনটি উপবিভাগ রয়েছে ঃ কৃত্যা (মোহবিস্তারী যাদু), বলগ (সাধারণত কলস বা অন্ধকার গুহায় লুক্কায়িত গোপন জাদুক্রিয়া) ও মূলকর্ম (বৃক্ষমূল ইত্যাদির সাহায্যে অনুষ্ঠিত ইন্দ্রজাল)। এই ত্রিবিধ ইন্দ্রজালই অঙ্গিরার সঙ্গে সম্পর্কিত। এদের বিপরীত মেরুতে রয়েছে কৃত্যাপরিহরণ, কৃত্যাদূষণ বা প্রত্যাভিচার—এদের মূল উদ্দেশ্য হল কোনো ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানের প্রতিক্রিয়া নিবারণ। অভিচারকে যেমন যাতুধান অর্থাৎ পিশাচ, দানব বা দুষ্টু আত্মার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যায়, প্রত্যাভিচার তেমনই শত্রুপক্ষের জাদুক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হ'ত। মোহন, বশীকরণ, উচাটন প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি 'কৃত্যা'র অন্তর্গত ; 'বলগ' জাতীয় ক্রিয়া পাতাললোকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষ ধবনের গোপন রহস্যানুষ্ঠান এবং বিশেষত শত্রুপক্ষকে পর্যুদস্ত কবার জন্যেই ব্যবহৃত, 'মূলকর্ম' লোকরসায়নের উপর নির্ভরশীল, কেননা আপন উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে এটি (অন্য দুই প্রকার ইন্দ্রজালের অন্তর্গত) বৃক্ষমূল ও ওষধিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করত।

আঙ্গিক ও ভাষা

অথর্ববেদের ব্যাকরণ ও শব্দভাণ্ডার থেকে এর তুলনামূলক অর্বাচীনত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রাচীনতর উদীচ্য বা মধ্যদেশীয় ভাষার 'অশ্রীর' বা 'অশ্লীল' অথর্ববেদে 'অশ্লীল' রূপে রয়েছে ; এতে মনে হয় যে, আর্যরা ইতোমধ্যে মগধের উপভাষার সংস্পর্শে এসেছে, 'র' এর পরিবর্তে 'ল'-এর প্রয়োগ যার সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

পরিমাণগতভাবে অথর্ববেদে সাংকেতিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত রচনা অনেক বেশি। সাধারণভাবে সুলভ ধ্রুবপদগুলি ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ক্রমে লব্ধ পঙ্‌ক্তি ও অর্ধপঙ্‌ক্তিসমূহের যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি আমরা লক্ষ্য করি। প্রচলিত অর্থে এইগুলি অবশ্য ধ্রুবপদ নয়, কিংবা অসংখ্য পুনরাবৃত্তিকে তাদের স্মৃতিসহায়ক প্রয়োগের দ্বারা ব্যাখ্যাও করা যায় না। বস্তুত, কেবলমাত্র ঐন্দ্রজালিক তাৎপর্যের সাহায্যেই অন্যান্য সংহিতার তুলনায় অথর্ববেদে এগুলির অধিকতর মাত্রায় ব্যবহারের ব্যাখ্যা করা চলে।

তেমনি একই ব্যাখ্যা ভাষা প্রকরণের যান্ত্রিক প্রয়োগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য—যেমন আবেগের সাংগীতিক উচ্চাবচতা অনুযায়ী আরোহী-অবরোহী ক্রমে শব্দবিন্যাস কিংবা তুলনামূলক উৎকর্ষ বা শ্রেষ্ঠত্ববাচক শব্দ প্রয়োগ অথবা বিভিন্ন অর্থালঙ্কার ও শব্দালঙ্কারের ব্যবহার ইত্যাদি ইন্দ্রজালের উপযুক্ত মোহময় পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

অথর্ববেদের শব্দভাণ্ডারেও যথেষ্ট অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায়। অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় শব্দ ছাড়াও বিদেশী প্রভাবের নিদর্শন রয়েছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা কিছু শব্দের প্রয়োগে, যেমন তৈমত, উরুগুল ও আলিগি-বিলিগি (এই বিলিগি শব্দের সম্ভাব্য উৎস প্রাচীন আসীরীয় দেবনাম—বিল্‌গি)। নৌবাণিজ্যের মাধ্যমে ভারতবর্ষের সঙ্গে সেসব দেশের যে সম্পর্ক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে স্থাপিত হয়েছিল,—সে সম্পর্কে অন্তত আট শতাব্দীর কিছু বেশি সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে অথর্ব বেদ অবশ্য সামগ্রিকভাবে ঋগ্বেদের তুলনায় পরবর্তী সময়স্তরের প্রমাণ বহন করে। রচনাশৈলীতে ঋগ্বেদের তুলনায় একই সঙ্গে প্রাচীনতর ও নবীনতর উপাদান বহন করলেও অথর্ববেদের কিছু কিছু নিজস্ব চরিত্রবৈশিষ্ট্যও রয়েছে। এ গদ্য নিশ্চিতভাবেই স্বরপ্রবাহযুক্ত, ফলে পদ্যের নিকটবর্তী। আবার, এ পদ্যের গঠনভঙ্গি প্রচলিত ছন্দোরীতির তুলনায় জটিলতর। অধিকতর জনপ্রিয় ও স্বল্পপরিশীলিত ছন্দপ্রকরণের প্রভাবেই সম্ভবত পদ্যের গড়ন এরকম হয়েছিল; জনপ্রিয় স্মৃতিসহায়ক কাব্যরীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যরূপে অনুপ্রাসের প্রয়োগ বারবার ঘটেছে, যেহেতু ঐন্দ্রজালিক প্রতিক্রিয়ার পক্ষে তা কার্যকরী। ঐন্দ্রজালিক সাংকেতিকতার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যরূপে পরিগণিত নানাবিধ বাক্‌প্রকরণের প্রয়োগ অথর্ববেদে লক্ষণীয় ; শ্রোতাদের কাছে স্পষ্টভাবে বিষয়বস্তুকে প্রকাশের পরিবর্তে প্রকৃতপক্ষে এইগুলি ঐন্দ্রজালিক যথার্থ উদ্দেশ্যটিকে গোপনই করেছে। ভাষা এখানে ছায়াছন্ন অন্ধকারে প্রবেশ ক'রে রহস্য-গূঢ় প্রহেলিকা হয়ে উঠেছে, যা শুধুমাত্র গ্রামীণ জাদুপুরোহিত বা শামান এবং প্রকৃতির কল্পিত অধিষ্ঠাতা উপদেবতার নিকটই বোধগম্য ব'লে মানুষ মনে করত।

অথর্ববেদে এমন কিছু ভাষাগত ও রচনাশৈলীগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না, যদিও সামবেদের স্তোত্রসমূহ বা যজুর্বেদের সংক্ষিপ্ত মন্ত্রোচ্চারণ বিধি ভাবগত দিক দিয়ে এর সঙ্গে সাযুজ্য বহন করে। অথর্ববেদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের অন্যতম হ'ল প্রহেলিকাপূর্ণ অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন বাক্যাংশ বা শব্দের পুনরাবৃত্তি। এক-চতুর্থাংশ, অর্ধেক বা সম্পূর্ণ পঙ্‌ক্তি ও স্তবকের পুনরাবৃত্তি চরিত্রবৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে সংকেতপূর্ণ, স্মৃতি ও ঐন্দ্রজালিকতার সহায়ক। এই ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্যকে পৃথকভাবে ভাষাতাত্ত্বিক, যাজকতান্ত্রিক ও জাদুপুরোহিতের উপযোগী ব'লে

ভাবার কারণ নেই ; বস্তুগ্রাহ্য জগতে হস্তক্ষেপ করার উপযোগী অলৌকিক শক্তি উৎপন্ন করার প্রাথমিক প্রয়োজনে এই বৈশিষ্ট্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। অথর্ববেদের যে বৈশিষ্ট্য ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলেও লক্ষ্য করা যায়, তা হ'ল খুব সংক্ষিপ্ত কলেবর সূক্তের উপস্থিতি। অথর্ববেদে কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটিমাত্র পঙ্‌ক্তিতে একটি সূক্ত সম্পূর্ণ। ষষ্ঠ অধ্যায়ে কেবলমাত্র সংক্ষিপ্ত সূক্তগুলিই পাওয়া যায় ; এগুলি সম্ভবত সতর্ক সম্পাদনার চিহ্ন বহন করে। এছাড়া প্রায়ই 'পর্যায়' শ্রেণীর সূক্ত পাওয়া যায়, যেখানে বেশ কিছু সংক্ষিপ্ত মন্ত্রের সাহায্যে একটি দীর্ঘ সূক্ত গ্রথিত—এর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উল্লেখ পাওয়া যায়—কেবলমাত্র বিষয়ের দ্বারাই গ্রথিত সূক্তটি অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের অঙ্গ-রূপেই মন্ত্রগুলি একটি অভিন্ন সূক্তের অন্তর্গত।

'দর্ভমণি'র প্রতি উদ্দিষ্ট সূক্তে বিদ্বেষসূচক ভাষা যেন অতিরিক্ত মাত্রায় স্পষ্টতা ও শক্তি অর্জন করেছে ; ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতাকে এখানে সামগ্রিকভাবে শত্রুনিধনের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়েছে ; অত্যাচার ও ধ্বংসসূচক বিবিধ ক্রিয়াপদের ব্যবহারে আবেগের সূক্ষ্ম তারতম্যও স্পষ্ট অভিব্যক্ত ; যেমন বিদ্ধ করা, ভেঙে ফেলা, বিযুক্ত করা, চূর্ণ করা, খোঁচা দেওয়া, তীক্ষ্ম অস্ত্র দিয়ে ভেদ করা, ছিদ্র করা, অবরোধ, হত্যা, মন্থন, দগ্ধ, আত্মসাৎ ও ধ্বংস করা।

ভাষার দিক দিয়ে অথর্ববেদ ঋগ্বেদের তুলনায় অধিকতর পরিশীলিত পর্যায়ের রচনা। পদ্য ও স্বরপ্রবাহযুক্ত গদ্য অথর্ববেদে যথেচ্ছভাবে মিশ্রিত হয়েছে ; সংহিতা সাহিত্যে গদ্য বিলম্বে আবির্ভূত হয়েছিল। চরিত্রগতভাবে এ সংহিতাটির ঐন্দ্রজালিক বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। বস্তুত, অথর্ববেদে গদ্য ও পদ্য এমনভাবে সংমিশ্রিত যে, তাদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা কঠিন। ছন্দোযুক্ত গদ্য ও নিতান্ত আটপৌরে তাৎপর্যবর্জিত পদ্য যথার্থ সংহিতাশ্রেণীর ছন্দের সঙ্গে স্বাধীনভাবে মিশ্রিত হওয়ায় এবং প্রায়ই সংযোজন ও প্রক্ষিপ্ত বিষয়ের যুগপৎ সন্নিবেশ ঘটায় এ সংহিতাটির সাহিত্যমূল্য বহুলাংশে নষ্ট হয়েছে।

কখনো কখনো আমরা সেইসব উপাদানের সংরক্ষণের একটি প্রবণতা লক্ষ্য করি, যেগুলি রক্ষা না করলে হয়ত জনসাধারণের স্মৃতি থেকে তা' লুপ্ত হয়ে যেত। সুতরাং, এদের সংরক্ষণ থেকে রচনার অর্বাচীনত্ব প্রমাণিত না হলেও সংগ্রহের বিলম্বিত প্রয়াস সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। নিশ্চিতভাবে এই প্রক্রিয়ায় ভাষাও যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়েছিল। শব্দের আঙ্গিকগত রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে অন্তত কিছুটা শব্দার্থগত পরিবর্তনও ঘটে ; আবার, তার মধ্যেই নিহিত থাকে সামাজিক ও ধর্মীয় চেতনায় পরিবর্তনের প্রবণতা। ঋগ্বেদে যে 'ব্রহ্মণ্' শব্দের তাৎপর্য ছিল ভক্তি, প্রার্থনা, বা আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মন্ত্রোচ্চারণ, অথর্ববেদে তার শব্দার্থগত

পরিবর্তন ঘটে গেল ; সম্ভবত, 'ব্রহ্ম' শ্রেণীর পুরোহিতের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়ে এর অর্থ দাঁড়াল ঐন্দ্রজালিক মোহাবেশ। শুধু তাই নয়, ঋণরূপে গৃহীত ঋগ্বেদীয় সূক্তগুলির আনুষ্ঠানিক প্রয়োগও নতুন তাৎপর্যবহ, প্রধান শ্রৌতযাগসমূহ পুরাতন প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অথর্ববেদে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ক্রমশ অধিকমাত্রায় ব্যবহৃত হতে থাকল ; ফলে, কোনো একসময় এই সূক্তগুলি বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার উপযোগী জাদুমন্ত্রে পর্যবসিত হ'ল।

সূক্তগুলির সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদেরও অবনমন ঘটলো। ইন্দ্র ও অগ্নির মত ঋগ্বেদের প্রধান দেবতারা এখন তুচ্ছ বিপদ ও ক্ষুদ্র আশঙ্কা থেকে রক্ষা করার জন্যে আহূত হচ্ছেন। এই সমগ্র প্রক্রিয়া থেকে সম্ভবত দু'টি দিক স্পষ্ট হয়ে উঠছে ঃ প্রথমত, প্রধান যজ্ঞগুলি কালক্রমে জনপ্রিয়তা হারিয়েছে ; কেননা, কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় রাজন্য বা ঐশ্বর্যবান পৃষ্টপোষকের পক্ষেই তখন যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা সম্ভব। সেইসঙ্গে সাঙ্কেতিক মন্ত্রগুলিও তখন ক্রমশ গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানসমূহে অধিকতর মাত্রায় ব্যবহৃত হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, অথর্ববেদে প্রতিফলিত লঘু ঐতিহ্যকে স্বীকরণের একটি পদ্ধতি হ'ল আদিম অধিবাসীদের কিছু কিছু ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানকে মূলধারায় যথাযথ শুচিতার সঙ্গে গ্রহণের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত করা। বহুযুগ ধ'রে এ সমস্ত জাদু-প্রক্রিয়ার নিহিত গুরুত্ব স্বীকৃত হওয়ায় রক্ষণশীল সমাজের কাছেও লোক ঐতিহ্যের প্রায়োগিক কুশলতা অনিবার্যভাবেই গৃহীত হয়েছিল। বস্তুত, দু'টি ভিন্ন ঐতিহ্যের মধ্যে আপস-মীমাংসার পক্ষে প্রয়োজনীয় অনুঘটক রূপেই অথর্ববেদের এই প্রবণতা সক্রিয় ছিল।

অবশ্য, এ সবই অথর্ববেদের বিলম্বিত স্বীকৃতির কারণগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ; এই যুগে যাজকতান্ত্রিক সাহিত্যপ্রক্রিয়া রূপে সংহিতা রচনা তার শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। অথর্ববেদ সংহিতায় বিষয়বস্তুগত বৈচিত্র্যের কারণরূপে আমরা পুরোহিতদের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের অবক্ষয়কে নির্দেশ করতে পারি। ঋগ্বেদ (সামবেদ ও যজুর্বেদও এই ধারারই অন্তর্গত) ও অথর্ববেদ—এই দ্বিবিধ ধারার পুরোহিতসম্প্রদায় প্রচলিত সূক্ত, জাদুমন্ত্র, মোহাবেশ সৃষ্টিকারী শব্দবন্ধ, যুদ্ধগীতি, প্রহেলিকা ইত্যাদি সংকলন ও সংগ্রহ ক'রে এসব রচনাকে সংরক্ষিত করার জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কেননা, ইতোমধ্যেই কাব্যিক ঐতিহ্য সজীব শক্তিরূপে আপন গুরুত্ব সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে। তাছাড়া কোনো মৌলিক মন্ত্রও যেহেতু আর বহুদিনের মধ্যে রচিত হয়নি, তাই নিঃশেষ মন্ত্রসংগ্রহ প্রস্তুতির প্রয়াস কেবলমাত্র তখনই সম্ভব ব'লে বিবেচিত হ'ল।

কাব্যগুণ

অথর্ববেদ সংহিতা কাব্যরূপে মূলত ঋগ্বেদীয় কাব্যের সমপর্যায়ভুক্ত হলেও তার কিছু কিছু নিজস্ব চরিত্রবৈশিষ্ট্যও রয়েছে। বিষয়বস্তুর মৌলিক প্রকৃতির জন্যেই এই

সংহিতা আশু ও বাস্তব-প্রয়োগযুক্ত এবং অধিকতর পার্থিব বিষয়বস্তুগত সাধারণ দৈনন্দিন গার্হস্থ্য ভাবনাকে প্রতিফলিত করেছে। অধিকাংশ রচনাই যেহেতু ঐন্দ্রজালিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত তাই এদের কাব্যগুণ খুব বেশি নেই। তবে যে সমস্ত সূক্তে বিপদের আশঙ্কা বা ব্যাধি থেকে পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে, সে সমস্ত ক্ষেত্রেও এমন চমৎকার স্পষ্টতা লক্ষ্য করা যায় যা ঋগ্বেদের অল্প কিছু সূক্ত বাদে বেশ দুর্লভ। বিদ্বেষ ও ভীতির আবেগ থেকে বহুক্ষেত্রে শক্তিশালী চিত্রকল্পের সৃষ্টি হয়েছে। ওজস্বিতার জন্যে প্রার্থনা কিংবা রণবাদ্যের প্রতিক্রিয়া বা ক্রুদ্ধ নারীকে শান্ত করার উপায় বা শত্রুর বিনাশ বর্ণনা প্রসঙ্গে যেসব সহজ সরল উপমা প্রয়োগ করা হয়েছে, তাতে আবেগজনিত প্রত্যক্ষতার ফলে চমৎকার কাব্যিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। প্রণয়-উদ্বোধক জাদুক্রিয়ার মধ্যেও অনুরূপ উপমা নির্মাণশক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। ভীতি ও বিদ্বেষ ছাড়া অন্যান্য আবেগের অভিব্যক্তি থেকেও শক্তিশালী চিত্রকল্প-সমন্বিত চিত্তাকর্ষক কাব্যিক মুহূর্তের সৃষ্টি হয়েছে। তবে, কাব্যের এই স্তরে চিত্রকল্পগুলি সাধারণভাবে প্রধান অলঙ্কার অর্থাৎ উপমা, রূপক ও অনুপ্রাস এবং অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে শ্লেষকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছে। করুণ রসাশ্রিত আবেদনের জন্যে সপত্নীর প্রতি ঈর্ষার বর্ণনা খুবই মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। কখনো কখনো নিরলঙ্কার সরল প্রার্থনা এবং দরিদ্রের কুটীরের বর্ণনাও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ব্যক্ত। ইট-কাঠের সাহায্যে গৃহনির্মাণের কৌশল আর্যদের অধিগত হওয়ার পর তাদের মনে নিরাপত্তার অতিরিক্ত উপলব্ধি সৃষ্টি হ'ল এবং নবলব্ধ জ্ঞান ও নিশ্চয়তার ফলরূপে জন্ম নিয়েছে অভিনব সরল কাব্যিক অনুভূতি। তেমনি নববিবাহিত দম্পতীর প্রগাঢ় আবেগের প্রতিফলনেও কাব্যের সৌন্দর্যময় প্রকাশ ঘটেছে।

অন্ত্যেষ্টিবিষয়ক রচনায় বা গর্ভপাত আশঙ্কা থেকে পরিত্রাণের মন্ত্রগুলিতে সাধারণ মানবিক আবেগ—উদ্বেগ, কল্যাণকামনা ইত্যাদি চমৎকার স্পষ্ট ঋজুতায় অভিব্যক্ত। তেমনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নিবিড় দর্শনজনিত আনন্দও বিভিন্ন চিত্রকল্পের মধ্যে নিটোলভাবে প্রকাশিত হয়েছে,—এমন কি ঐন্দ্রজালিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত সূক্তের মধ্যেও তা মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। সরল ও সংক্ষিপ্ত পঙক্তিতে সহজ বর্ণনা ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যসঞ্জাত বিস্ময়ের কাব্যিক অভিব্যক্তি ঘটেছে। আদিম মানুষের জীবনমুখী চিন্তা ও প্রকৃতিদর্শন জনিত বিস্ময়ের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমরা ভূমিসূক্তের মধ্যে লক্ষ্য করি—কাব্যিক প্রকাশের সাবলীল স্পষ্টতা ও শক্তির বিচারে এই রচনাটি যথার্থই অনবদ্য।

অথর্ববেদ যদিও বহু সূক্ষ্মচিন্তা ও অধ্যাত্ম ভাবনামূলক সূক্ত ঋগ্বেদ থেকে আহরণ করেছে, তবুও অথর্ববেদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক অতীন্দ্রিয়বাদী ও কাব্যিক দিক দিয়ে হৃদয়গ্রাহী প্রকৃতির শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উপাদান এবং উৎস সম্পর্কে চমৎকার সূক্ষ্ম চিন্তা ও উপলব্ধির পরিচয়ও কোনো কোনো রচনায় পাওয়া

যায়—ঋজুতা ও প্রত্যক্ষতার গুণে এই সব রচনা কাব্যিক দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট। মানুষকে দৈব মহিমায় উন্নীত করার মধ্যে একটি নতুন প্রবণতার প্রমাণ পাওয়া যায় ; এমন কি মানবদেহকেও বিশেষ মহিমায় মণ্ডিত করা হয়েছে—তাই মানবদেহ সকল দেবতার অধিষ্ঠানভূমি রূপে বর্ণিত। অন্যত্র বলা হয়েছে যে, দেবতা ও মানুষের সুষম সমন্বয়ে এই বিশ্বজগৎ গড়ে উঠেছে—পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক এবং জীবনের মর্মগত রহস্য উভয়কেই আবৃত্ত করে। কামনা ও কালের ধারণাকে কেন্দ্র ক'রে অতীন্দ্রিয়বাদী ভাবনা গড়ে উঠেছে—এই উভয়ই অপেক্ষাকৃত নতুন বিমূর্ত আধ্যাত্মিক ভাবনা এবং উভয়ই সৃষ্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই পর্যায়েই কামনার সৃজনশীল ভূমিকাকে অতিজাগতিক পর্যায়ে উন্নীত করা এবং শেষপর্যন্ত তা আদিমতম অতৃপ্তিজনিত চাঞ্চল্যে এবং পরমাত্মার সেই মহত্তম একাকিত্বের উপলব্ধিতে পরিণতি লাভ করে—উপনিষদে এই ভাবনাই শেষপর্যন্ত সৃষ্টির মূলাধার স্বরূপ চালিকা শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। অথর্ববেদের পর্যায়ে কামনা যেমন সৃজনশীল শক্তির প্রতিকল্প তেমনি শাশ্বতকাল সম্পর্কিত কিছু কিছু বিমূর্ত ভাবনা যখন বিলম্বে আবির্ভূত হ'ল, ততদিনে তা' সমুন্নত মহিমাযুক্ত ভাবনায় পরিণতি লাভ করেছে। কাল সম্পর্কিত ভাবনা যখন এভাবে জনচিত্ত অধিকার করেছে, ততদিনে কৃষি ব্যবস্থার পরবর্তী পর্যায়ের সূচনা হয়ে গেছে, কেননা ঋতুচক্র ও শস্যসমূহের আবর্তন লক্ষ্য করেই কাল সম্পর্কে বিমূর্ত ভাবনার সৃষ্টি হয়েছিল। পশুচারী সমাজের পক্ষে তা তখনও একটি অস্পষ্ট ধারণা, যেহেতু তাদের পালিত পশুসমূহ সম্পূর্ণ বৎসর জুড়েই বংশবৃদ্ধি করে ; ফলত, কাল সম্পর্কিত ভাবগত রূপটি আকস্মিক, অপ্রাসঙ্গিক ও নিষ্প্রয়োজন। কেবলমাত্র যখন ভরণপোষণের জন্যে সময়মত বার্ষিক বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করতে হ'ল এবং নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে শস্য উৎপন্ন হ'ল তখনই মানুষ ঋতুচক্রের যথার্থ আবর্তন সম্পর্কে নিবিড়ভাবে আগ্রহী হয়ে উদ্বিগ্নভাবে ফসলের প্রতীক্ষা করতে শিখল। সেইসঙ্গে মানুষ কালের সম্পূর্ণ অনিবার্যতা ও অমোঘতা সম্পর্কেও সচেতন হয়ে উঠল। সম্পূর্ণত মানুষের আয়ত্তের বহির্ভূত, অথচ অদৃশ্যভাবে মানবিক নিয়তি নিয়ন্ত্রণকারী বিমূর্ত ধারণারূপে কাল সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। এই উপলব্ধি দেখা দেওয়ার পরই চরম বিমূর্ত ধারণারূপে বিশ্বজগৎ-স্রষ্টা কালের একটি সমগ্র ভাবায়তন মানুষের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। সুতরাং অথর্ববেদের কালসূক্ত কাল সম্পর্কে মানুষের অতীন্দ্রিয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিকাশই সূচিত করছে।

ঐন্দ্রজালিক কাব্যরূপে এবং জীবন সম্পর্কে মূলত আদিম ও রহস্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ রূপে অথর্ববেদ বস্তুবিশ্ব সম্পর্কে শত্রুতাপূর্ণ ও জীবন সম্পর্কে সক্রিয়ভাবে বিদ্বেষপ্রবণ যে ভাবনার অভিব্যক্তি আমাদের সামনে তুলে ধরেছে—সেই অথর্ববেদেই আবার পাই সর্বব্যাপী অপ্রাপণীয় অথচ নিত্য কল্যাণের ও সার্বভৌম

আকাঙক্ষার মহত্তম উচ্চারণ ঃ 'ইহলোক যা কিছু অন্ধকারে আচ্ছন্ন অর্থাৎ হিংস্রতাপূর্ণ, ইহলোকে যা কিছু নিষ্ঠুর, যা কিছু অশুভ—সে সমস্তই শান্ত হোক, কল্যাণে পরিণত হোক, এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুই আমাদের কাছে শান্তিময় হয়ে উঠুক।' বস্তুত প্রাগ্-বৈজ্ঞানিক যুগে বৈরী প্রকৃতির সম্মুখীন মানুষের অসহায়তার এই হ'ল অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি—যে মানুষ চতুষ্পার্শ্বের অন্ধকার ও অমঙ্গলপ্রদ শক্তির ক্রোধ শান্ত করার জন্যে তীব্র আকাঙ্খা ব্যক্ত করে এবং একই সঙ্গে শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্যে তার শাশ্বত বাসনাকেও প্রকাশ করে।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্রাহ্মণ

সংহিতা সাহিত্য হ'ল আনুষ্ঠানিক আবৃত্তি ও মন্ত্রগানের কাব্য ও গীতিকা ; যে সমস্ত অনুষ্ঠানে এগুলি প্রযুক্ত হয়, ব্রাহ্মণ সাহিত্য প্রাথমিকভাবে তাদের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট : যজ্ঞের প্রয়োজন, পদ্ধতি-প্রকরণ ও সুফলসমূহ তাতে বিবৃত হয়ে থাকে। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ একত্রে কর্মকাণ্ড অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক কর্মসংক্রান্ত অধ্যায় নামে বিখ্যাত, কেননা এদের প্রাথমিক লক্ষ্যস্থল যজ্ঞানুষ্ঠান ছাড়া অন্য কিছু নয়। আপস্তম্ব তাই বলেছেন : 'মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদ নামধেয়ম্'।

নিঃসন্দেহে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের প্রচুর অংশই রচনাকালের দিক থেকে সংহিতার শেষ পর্যায়ের সমকালীন ; তবু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল সাহিত্যমাধ্যম ও বৈদিক সাহিত্যে পৃথক পর্যায়রূপে ব্রাহ্মণগুলি সংহিতার তুলনায় পরবর্তী যুগেই রচিত হয়েছিল। আমরা নিশ্চিতভাবেই অনুমান করতে পারি যে, ব্রাহ্মণ সাহিত্যের বিপুল অংশই খ্রিস্টপূর্ব দশম থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে প্রণীত। ভারতীয় ঐতিহ্যে ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তুকে বিধি ও অর্থবাদ (অনুজ্ঞা ও ব্যাখ্যা) রূপে নির্দেশিত করে। অনুজ্ঞা অংশে যজ্ঞানুষ্ঠানে করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ বিবৃত হয়। অন্যদিকে অর্থবাদ অংশে যজ্ঞকর্ম বিষয়ে পালনীয় নিয়মাবলী নির্দেশিত এবং কর্মকাণ্ডের বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা, কাহিনী ইত্যাদি বিবৃত। আপাতদৃষ্টিতে কখনো কখনো দু'টি প্রাসঙ্গিক নিয়ম পরস্পর-বিরোধী ব'লে মনে হয়। এই অংশে কখনো একটি বিশেষ কর্ম পদ্ধতিকে অপর কোনো পদ্ধতি অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতিপন্ন করা হয়, কখনো যজ্ঞানুষ্ঠানকে নানাবিধ প্রত্নকথার সাহায্যে, এমনকি মাঝে মাঝে কাল্পনিক ব্যুৎপত্তির সাহায্যেও ব্যাখ্যা করা হয়। ফলত অর্থবাদই ব্রাহ্মণ সাহিত্যের দীর্ঘতর ও অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ অংশ। সংহিতার প্রাচীনতম ভাষ্যরূপে এ অংশের ভূমিকা সম্পর্কে ব্রাহ্মণ রচয়িতাগণও বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। 'প্রবচন', 'প্রোক্ত' 'বিবরণ' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ব্রাহ্মণ সাহিত্য চরিত্রগতভাবে বিশ্লেষণাত্মক।

'ব্রাহ্মণ' শব্দটি 'ব্রহ্মন্' শব্দ থেকে নিষ্পন্ন যার মৌলিক অর্থ হলো গূঢ়শক্তিসম্পন্ন শব্দ ; সাধারণ ভাষা থেকে পৃথক এজাতীয় শব্দে ঐশী শক্তি ও অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা আছে এমন বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। এই শব্দনিচয়কে সৃষ্টিমূলক গূঢ় ক্ষমতাসম্পন্ন,

আরোগ্যদায়ক, বলবর্ধক, ক্ষতিকারক বা শান্তিদায়ক ব'লে মনে করা হ'ত। আপাতদৃষ্টিতে এ সাহিত্য মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তি অর্থাৎ সমাজের আধ্যাত্মিক অভিভাবকদের বিশিষ্ট সম্পত্তি। এরকম একটি সম্পূর্ণ বিবৃতি বা এগুলির সমষ্টি যে সমগ্র অনুশাসন কিংবা এগুলির অংশে সংশ্লিষ্ট দেবকাহিনীকেও 'ব্রহ্ম' বলা হ'তো। আবার যিনি তা' উচ্চারণ করতেন, জানতেন বা যজ্ঞানুষ্ঠানে যথার্থভাবে প্রয়োগ করতে পারতেন—তাঁকেও বলা হ'ত 'ব্রহ্ম' ; সমস্ত পৃথক 'ব্রহ্ম' উক্তির যোগফল সামূহিকভাবে 'ব্রাহ্মণ' সাহিত্যরূপে পরিচিত ছিল।

মূলত এ-সব পবিত্র শক্তিযুক্ত বাণী যজ্ঞবিদ্যার প্রবীণ বা সম্মানিত শিক্ষকদের দ্বারা উচ্চারিত হ'ত, তাঁদের দৈব ক্ষমতার অধিকারী ব'লে মনে করা হ'ত ব'লে তাঁদের দ্বারা নির্দেশিত যজ্ঞকর্মের জ্ঞাতব্য তত্ত্বগুলি পুরোহিত সমাজে অবশ্য শিক্ষণীয় ব'লে গণ্য ছিল। এ'ভাবে শিক্ষক পরিবারগুলিতে বহু প্রজন্ম ও বহু যুগ ধ'রে ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় পূর্বকথিত প্রাজ্ঞোক্তিসমূহ সংগৃহীত ও সঞ্চিত হয়েছিল, এবং ধীরে ধীরে এ'টি একটি সম্পূর্ণ শাস্ত্রগ্রন্থে পরিণত হয়েছিল। প্রত্যেক সংহিতাগ্রন্থের জন্যেই যে সাধারণত, একাধিক ব্রাহ্মণ রয়েছে, এই তথ্য থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, দেবকাহিনীর চেয়ে যজ্ঞানুষ্ঠান অনেক বেশি বিতর্কমূলক ছিল কেননা ব্রাহ্মণ-গ্রন্থসমূহ যেখানে বৈদিক ধর্মের আনুষ্ঠানিক পরিচয় বহন করছে, সংহিতা সাহিত্য সেক্ষেত্রে (বিশেষত ঋক্, সাম ও অথর্ব) দেবকাহিনীগুলির বিবরণ। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে, সংহিতা সাহিত্যে অথর্ববেদের বিলম্বিত প্রবেশের অন্যতম প্রমাণ এই যে, অন্যান্য সংহিতার যেখানে একাধিক ব্রাহ্মণ রয়েছে, সে ক্ষেত্রে অথর্ববেদের ব্রাহ্মণ মাত্র একটি। যাইহোক, রচনাশৈলীর দিক দিয়ে যজুর্বেদে বৈশিষ্ট্য আছে কেননা সাহিত্যের মাধ্যমরূপে তা' সংহিতা ও ব্রাহ্মণের ঠিক মধ্যবর্তী স্তরে আছে ব'লে একদিকে যেমন সংহিতা রচনা প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিনিধি, অন্যদিকে তেমনি আনুষ্ঠানিক সাহিত্যের প্রকৃত পূর্বগামীও এই সংহিতাটি।

সামূহিক নির্জ্ঞানের ফসলরূপে দেবকাহিনীগুলি যেখানে স্পষ্ট তাৎপর্যযুক্ত, অন্তর্নিহিত প্রতীকী তাৎপর্যের জন্যে যজ্ঞানুষ্ঠান সেখানে দ্ব্যর্থবোধক। বিভিন্ন পরিবার ও কর্তৃত্ব অনুযায়ী তার তাৎপর্য পরস্পরভিন্ন হওয়ায় সহজেই তা' বিতর্কের সৃষ্টি করে, ফলে আমরা বহু সমান্তরাল সমপ্রাধান্য বিশেষজ্ঞের সম্মুখীন হই। প্রত্যেক আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াই নানাভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব ; কোনো একটি দেবকাহিনীর বিশেষ ব্যাখ্যার সঙ্গে যেহেতু অনুষ্ঠানকে সমন্বিত করতে হয়, বহু ক্ষেত্রেই তাই সর্বজনগৃহীত বিশেষ ব্যাখ্যার সঙ্গে অনুষ্ঠানের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়নি। তাই, বহু ও বিচিত্র অনুষ্ঠানের সঙ্গে পরিচিত হই—যার প্রত্যেকটিই হয়ত বিশেষ কোনও দেবকাহিনীর অবচেতন ব্যাখ্যাকে অনুসরণ করে। বস্তুত, এজন্যই ব্রাহ্মণ সাহিত্যে বৈচিত্র্যের অন্ত

নেই। ব্রাহ্মণ সাহিত্যের রচয়িতারা যাস্ক-কথিত অধিযজ্ঞ পক্ষের অন্তর্গত, যেহেতু তাঁদের কাছে যজ্ঞানুষ্ঠানই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

পাঠভেদ

প্রত্যেক সংহিতার সঙ্গে এক বা একাধিক 'ব্রাহ্মণ' সংশ্লিষ্ট রয়েছে ; এটা থেকে অনুমান করা যায় যে, আবৃত্তি বা গীতির উপাদানকে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানমূলক শাখায় বিভাজনের প্রক্রিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছিল যখন তাদের সঙ্গে নির্দেশসূচক ব্যাখ্যামূলক উপাদান যুক্ত হচ্ছিল। সূত্রসাহিত্য অন্তত তেইশটি ব্রাহ্মণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছে, যদিও এদের মধ্যে সবগুলি আমাদের কাছে পৌঁছায়নি। এগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি প্রধান ঃ—অহ্বরক, কঙ্কত, কালববি, চরকছাগলেয়, জাবালি, পৈঙ্গায়নি ভাল্লবি, মাসসরাবি, মৈত্রায়ণীয়, রৌরুকি, শায্যায়ন, শৈলালি, শ্বেতাশ্বতর ও হারিদ্রাবিক। এই ব্রাহ্মণগুলির লুপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণ ঃ পূর্ববর্তী রচনাগুলির সারাংশ পরবর্তী রচনাগুলির মধ্যেই অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যাওয়া ; পুনরাবৃত্তির ফলে কিছু কিছু রচনার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়া এবং সাধারণভাবে যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যাপারটিরই প্রভাব ক্ষুন্ন হওয়া। কিছু কিছু পুরোহিত পরিবার তাঁদের নিজস্ব 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থসহ অধিক ক্ষমতাবান ও জনপ্রিয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা সম্ভবত সম্পূর্ণত আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলেন, কালক্রমে তাঁদের পারিবারিক দুর্বলতর ব্রাহ্মণ রচনাগুলি ক্রমে অপ্রচলিত হ'য়ে গিয়েছিল।

ঋগ্বেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্রাহ্মণ দু'টি হ'ল ঐতরেয় ও কৌষীতকি (দ্বিতীয়টি শাঙ্খায়ন নামেও পরিচিত)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ মোট চল্লিশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত ; প্রত্যেকটি অধ্যায় আটটি পঞ্চকে (বা পঞ্চিকায়) বিভক্ত। প্রাচীন ঐতিহ্য অনুযায়ী এ গ্রন্থের রচয়িতা মহীদাস ঐতরেয়। সম্ভবত, এই ব্রাহ্মণটি পূর্বপ্রচলিত কিছু রচনার সংকলন.। এর প্রধান বিষয়বস্তু হ'ল সোমযাগ, এবং অগ্নিহোত্র (অগ্নিদেবের প্রতি প্রাত্যহিক দুগ্ধ-হব্যদান)। রাজসূয়-যজ্ঞও এতে বর্ণিত হয়েছে। কীথের অভিমত এই যে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ প্রকৃতপক্ষে জৈমিনীয় ও শতপথ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রাচীনতর—এমনকি, তৈত্তিরীয় সংহিতার ব্রাহ্মণ গোত্রের অংশগুলি অপেক্ষাও ঐতরেয়কে প্রাচীনতর বলা চলে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের রচনাশৈলী সাধারণভাবে বর্ণনাত্মক ও মাঝে মাঝেই প্রসঙ্গবিচ্যুত। ব্যাকরণ ও নিরুক্তের সম্বন্ধে এতে যে স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্ফুট হয়েছে, তা বহুলাংশে যাস্কের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় ; সম্ভবত এই দু'টি গ্রন্থ রচনাকালের দিক দিয়ে পরস্পরের নিকটবর্তী।

যদিও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সাধারণত ঐতরেয় ও কৌষীতকি ব্রাহ্মণ পরস্পর সংলগ্ন, তবু কিছু কিছু অংশে আবার দুটি গ্রন্থ সম্পূর্ণভাবেই পরস্পরবিরোধী মত

ব্যক্ত করেছে। সম্ভবত, এটা প্রাচীনতম ব্রাহ্মণ গ্রন্থের দ্বিধা বিভাগের ইঙ্গিত বহন করেছে ; যাজ্ঞিক পণ্ডিতদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক অনুপুঙ্খ সম্পর্কে মতভেদ হওয়ার ফলেই সম্ভবত তাঁরা অভিন্ন মূল গ্রন্থকে বিভাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শেষ দশটি অধ্যায় কৌষীতকিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবত, এই অংশে ঐতরেয়তে পরবর্তী কালে সংযোজিত হয়েছিল। কৌষীতকির প্রথম ছ'টি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হ'ল ঃ অগ্ন্যাধান, দর্শপূর্ণমাস ও চাতুর্মাস্য। পরবর্তী বাইশটি অধ্যায়ে শুধুমাত্র সোমযাগই আলোচিত হয়েছে ; এই অংশ অন্যটির তুলনায় অর্বাচীনতর ; যেহেতু শৈলীগত বিচারে এটি অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সম্পাদনার দিক দিয়ে আরো সুবিন্যস্ত। কিন্তু অন্যদিকে ঐতরেয় ব্রাহ্মণকে বহু ব্যক্তির প্রয়াস সৃষ্ট অসংলগ্ন 'ব্রাহ্মণ' জাতীয় রচনার একটি বিশৃঙ্খল সংকলন ব'লেই মনে হয়।

প্রাচীনতর অভিন্ন ব্রাহ্মণের সম্ভাব্য বিভাজনের আরো একটি কারণ হ'ল ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভৌগোলিক পটভূমিকায়, যেখানে কুরুপাঞ্চাল ও বশউশীনর অঞ্চল, কৌষীতকিতে সেখানে নৈমিষারণ্য। এই তথ্যটি ঐতিহাসিক কালক্রমের দ্বারা নির্দিষ্ট আঞ্চলিক ভিন্নতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঃ আর্যরা যখন দক্ষিণ-পূর্বদিকে আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন, সে সময় রচিত অর্বাচীনতর ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহের অন্যতম হ'ল কৌষীতকি। এটি যজুর্বেদের (সংহিতা ও ব্রাহ্মণ) শেষাংশের ব্রাহ্মণ গোত্রের অংশগুলি রচনার সমকালীন ; সম্ভবত, অথর্ববেদও তখনই সংকলিত হচ্ছিল। বৈদিক দেবসঙ্ঘে বিলম্বে আগত ঈশান মহাদেবের উল্লেখ এখানে পাই। অর্বাচীনতা সম্পর্কে ভাষাতাত্ত্বিক সাক্ষ্য ছাড়াও অধিক পরিশীলিত ভাষা প্রয়োগের কেন্দ্র উত্তর ভারতে শিক্ষার্থীরা যে শিক্ষাগ্রহণের জন্যে আসত তার উল্লেখও আমরা লক্ষ্য করি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞানুষ্ঠান বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা বহুগুণ বর্ধিত হ'ল। তাই কৌষীতকির পরবর্তীর অংশে প্রায়ই বিশেষরূপে পিঙ্গ ও কৌষীতক-এর নাম উল্লিখিত হয়েছে—বিশেষত যজ্ঞবিষয়ে কৌষীতককে অপ্রতিদ্বন্দ্বী রূপে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ; অথচ এই নামগুলি ঐতরেয়ে মাত্র একবার পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ সাহিত্যে সামবেদ সমৃদ্ধতম। সামবেদীয় ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হ'ল তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ বা পৌঢ় বা পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ। শেষোক্ত নাম থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, এতে পঁচিশটি অধ্যায় রয়েছে। হ্বিণ্টার নিৎসের মতে এ'টি প্রাচীনতর ব্রাহ্মণগুলির অন্যতম এবং কিছু কিছু লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য একে অনন্য ক'রে তুলেছে। এ' ব্রাহ্মণটি পড়ে যে নীরস ও শুষ্ক ব'লে মনে হয়, সম্ভবত তার কারণ এই যে, এর অতীন্দ্রিয় প্রবণতার আতিশয্য পরবর্তী প্রজন্মের নিকট সম্পূর্ণ তাৎপর্যহীন ব'লে প্রতিভাত হয়েছিল। তবে, এই গ্রন্থের প্রকৃত গুরুত্ব এই যে, এতে বহু দেবকাহিনী ও লোকশ্রুতি সংকলিত হয়েছে। সামবেদের ব্রাহ্মণরূপে এ'র মুখ্য

আলোচ্য বিষয় হ'ল সামমন্ত্র, সামগানের পদ্ধতি ও উপলক্ষ্য ; সংশ্লিষ্ট অতিপ্রাকৃত কাহিনী ও তৎপ্রসূত সুফল। অগ্নিষ্টোম থেকে শুরু ক'রে বিশ্বসৃজাময়ন (কিংবদন্তী অনুযায়ী একসহস্র বর্ষব্যাপী একটি যজ্ঞ) পর্যন্ত মোট সাতাশি ধরনের যজ্ঞানুষ্ঠান এই গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। কাত্যায়ন ও আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রে নির্দেশিত ক্রম অনুযায়ী যজ্ঞগুলি এখানে বিন্যস্ত।

তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ প্রকৃতপক্ষে সামবেদ সংহিতার সম্পূরক একটি রচনা। এই ব্রাহ্মণের প্রথম অধ্যায়ে প্রচুর যজুর্মন্ত্র থাকায় স্পষ্টই প্রমাণিত হচ্ছে যে, সাহিত্যমাধ্যমরূপে ব্রাহ্মণটি যজুর্বেদীয় আনুষ্ঠানিক রচনারই যুক্তিযুক্ত ধারাবাহিক অভিব্যক্তি। রচনাকাল নির্ণয় করতে গিয়ে আমরা বিষয়বস্তুর একটি বিশেষ দিক অর্থাৎ ব্রাত্যস্তোমের প্রতি মনোনিবেশ করতে বাধ্য হই। কুরু ও পাঞ্চাল অঞ্চল এই গ্রন্থের ভৌগোলিক পটভূমিকা নয় ; সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী পাঞ্জাবের অববাহিকা অঞ্চল এর পৃষ্ঠভূমি।

ষড়্‌ বিংশ ব্রাহ্মণ স্পষ্টতই পঞ্চবিংশের ধারাবাহিক সম্প্রসারণ। এই গ্রন্থ ছ'টি প্রপাঠক ও সাতচল্লিশটি খণ্ডে বিভক্ত। একাহ অনুষ্ঠানের জন্যে প্রযোজ্য রহস্যগূঢ় সুব্রহ্মণ্য সূত্র এ'র প্রধান বিষয়বস্তু। এর মধ্যে কিছু কিছু অথর্ববেদীয় বৈশিষ্ট্যও চোখে পড়ে যা মূলত শত্রুর ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত এবং ঐ জাতীয় ক্ষেত্রে বর্ণনার মধ্যে যা সবিশেষ পরিস্ফুট হয়েছে। আষেয় কল্পের মত পরবর্তী রচনায় এই গ্রন্থের অস্তিত্ব স্বীকৃত ব'লে আলোচ্য ব্রাহ্মণটি অন্তত এইসব রচনার তুলনায় প্রাচীনতর। এ'র মধ্যে প্রধানত—প্রায়শ্চিত্ত ও অভিসম্পাতের সূত্রগুলি রয়েছে। সামবেদীয় ব্রাহ্মণগুলির মতোই এই গ্রন্থের প্রাথমিক লক্ষ্য হ'ল সামমন্ত্র ও সেগুলির অতীন্দ্রিয় অনুষঙ্গ। তেমনি সাধারণ ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের মতোই এই গ্রন্থে আছে বিভিন্ন প্রত্নকথা, নিরুক্তি ; বিশেষত কারুবিদ্যা সম্পর্কে প্রযুক্ত শব্দগুলির ব্যুৎপত্তিগত ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে। দেবতা ও দানবদের যুদ্ধসম্পর্কিত কাহিনীগুলি নতুন অনুষ্ঠান প্রবর্তনের প্রস্তাবনারূপে ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তী সমস্ত সামবেদীয় ব্রাহ্মণের মতো এই গ্রন্থেও সূত্র ও ছন্দগুলির ব্যাখ্যা অতিপ্রাকৃতস্তরে। বিভিন্ন সূক্তের আনুষ্ঠানিক বিনিয়োগও এতে বর্ণিত হয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবকাহিনী এবং যজ্ঞভূমির নিকটে বিচরণশীল দানব ও রাক্ষসদের বিনাশসাধনের জন্যে উদ্বেগ ও ধ্বংসপ্রচেষ্টা এই ব্রাহ্মণের সর্বত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। কিছু কিছু প্রত্নকথা সৃষ্টিতত্ত্বমূলক ও হেতুসন্ধানের বৈশিষ্ট্যযুক্ত, আবার কিছু কিছু উপনিষদের ভাবনায় নিজ্ঞাত। প্রধান ব্রাহ্মণগুলির মতো এই গ্রন্থেও সামবেদ এবং তৎসংশ্লিষ্ট পুরোহিত ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত কারুবিদ্যামূলক শব্দের ছদ্ম ব্যুৎপত্তি দেওয়ার চেষ্টা রয়েছে। প্রায়শ্চিত্ত, বিনাশাত্মক ইন্দ্রজাল, যূপকাষ্ঠ, অগ্নিহোত্র, 'স্বাহা' শব্দের উচ্চারণ ('স্বাহা' এখানে দেবীরূপে গণ্য)

ইত্যাদি সমস্ত কিছুরই অতীন্দ্রিয় অনুষঙ্গ ব্যাখ্যাত হয়েছে। 'পলাশ' (আক্ষরিক অর্থে 'মাংসাশী' অর্থাৎ রাক্ষস) শব্দের মধ্যে সংখ্যাবিষয়ক অতীন্দ্রিয় প্রবণতা ও শুভকর ইন্দ্রজাল লক্ষণীয়। 'দৈবত' ব্রাহ্মণ দু'টি ভাগে বিভক্ত ও একান্নটি সংক্ষিপ্ত সূত্রের সংকলন। 'অদ্ভুত' ব্রাহ্মণ এ'রই পরিশিষ্ট, প্রকৃতপক্ষে 'ষড়বিংশে'র শেষতম অধ্যায়ের সঙ্গে সংযোজিত অংশ। কিছু কিছু সামবেদীয় সূত্রের সঙ্গে এ'র সাদৃশ্য রয়েছে ; যেহেতু এই গ্রন্থের প্রধান আলোচ্যবিষয় অপ্রত্যাশিত ঘটনা, ভাবী অমঙ্গলের পূর্বসূচনা ও তা' নিবারণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান এবং শস্যহানি, বজ্রপাত ও ভূমিকম্পজাতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিবারণের উপযুক্ত ক্রিয়াকল্প। 'প্রতিমা'র উল্লেখ থাকায় এই গ্রন্থের রচনাকাল বহু পরবর্তী যুগের ব'লে নির্দেশ করা সম্ভব।

'শাট্যায়ন' ব্রাহ্মণ থেকে গৃহীত বহু উদ্ধৃতি প্রকৃতপক্ষে জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে খুঁজে পাওয়া যায়। যেহেতু 'শাট্যায়ন ব্রাহ্মণ' নামে কোনো গ্রন্থ আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়নি, তাই খুব সম্ভব এই গ্রন্থের অধিকাংশ উপাদানই জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ আত্মসাৎ ক'রে নিয়েছিল। জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ও পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তুর মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। উভয় গ্রন্থেই সামমন্ত্র, গায়কদের কর্তব্য ও তৎসংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান—বিশেষত সোমযোগের বিভিন্ন রূপান্তর বিবৃত হয়েছে। তবে পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ যেখানে অনুষ্ঠান সম্পর্কিত বিষয় সম্বন্ধে অধিক মনোযোগী, সেখানে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ জৈমিনীয় ব্রাহ্মণটিতে কিছু কিছু প্রত্নকথা ও কিংবদন্তীও বিবৃত।

ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রাচীনতর। জৈমিনীয়তে এমন কিছু অনুষ্ঠান ব্যাখ্যাত হয়েছে (যেমন মহাব্রত ও গোসব) যেগুলি পঞ্চবিংশে পাওয়া যায় না ; সম্ভবত, এই দুই গ্রন্থেব মধ্যবর্তী পার্থক্য দু'টি যজ্ঞানুষ্ঠানগত ঐতিহ্যের ভিন্নতার ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল—একটি গ্রন্থে আপাতদৃষ্টিতে বর্বর জনগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান ও স্থান পেয়েছিল অন্যগ্রন্থে তা' দেখা যায় না। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে প্রচুর প্রত্নকথা ও লোকশ্রুতি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলেই তা' অপেক্ষাকৃত পরবর্তী, অধিক বিস্তৃত ও ব্যাপকতর রচনারূপে প্রতিভাত হয়।

বর্তমানে 'ছান্দোগ্য' ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে ছান্দোগ্য উপনিষদ্। একটি নির্দিষ্ট শাখার অন্তর্গত সমস্ত সমাবেদীয় পাঠের শ্রেণীগত নামরূপে 'ছান্দোগ্য'কে যেহেতু গ্রহণ করা হয়, তাই এমনও হতে পারে যে, মূলত পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ, ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ ও অদ্ভুত ব্রাহ্মণ একত্রে ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণকে গঠন করেছিল। প্রচলিত পাঠে প্রথম দুটি অধ্যায় পাওয়া যায় না, আবার এর শেষ আটটি অধ্যায় নিয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ গড়ে উঠেছে।

সামবেদের গৌণ ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে 'দেবতাধ্যায়' নামের ছোট উপব্রাহ্মণটি তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত ক্ষুদ্র সারগ্রন্থ এবং নামকরণের মধ্যেই ইঙ্গিত রয়েছে যে,

এতে সেইসব দেবতাদের নামের তালিকা রয়েছে যাদের উদ্দেশে সামমন্ত্রগুলি রচিত হয়েছিল।

পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত তথাকথিত 'সংহিতোপণিষদ' ব্রাহ্মণ স্পষ্টতই পরবর্তীকালের রচনা ; এখানে শিক্ষকদের প্রতি প্রদত্ত দক্ষিণাই বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এই গ্রন্থে প্রধানত সামমন্ত্র গানের সুফল এবং সুরনিবদ্ধ শব্দের গায়ন পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত 'বংশ' ব্রাহ্মণের নামের মধ্যেই এই ইঙ্গিত স্পষ্ট যে, এই গ্রন্থে শুধুমাত্র সামবেদের অধ্যাপকদের বংশতালিকা রয়েছে।

বহু পরবর্তীকালের রচনা 'সামবিধান ব্রাহ্মণ'কে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা কঠিন, কেননা এর বিষয়বস্তু সূত্র সাহিত্যেরই কাছাকাছি। জীবনের মূলাধার রূপে সুর ও তালকে মহিমান্বিত করা ছাড়াও এই গ্রন্থ অমঙ্গল, দানবশক্তি ও বিবিধ প্রকারের বিপদ নিবারণের উপায় এবং বাস্তব জীবনের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার পদ্ধতি বিবৃত করেছে। ধ্বংসাত্মক নেতিবাচক ইন্দ্রজালের ভূমিকা, বিশেষত দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে, এতে বেশ প্রাধান্য পেয়েছে। এই গ্রন্থে পুনর্জন্ম থেকে মুক্তির অঙ্গীকার উচ্চারিত হয়েছে ; তবে সবচেয়ে কৌতূহলপ্রদ তথ্য এই যে, গ্রন্থের শেষে ভারতমাতার একটি ভাবমূর্তি ; কল্পিত মাতৃভূমির উত্তরসীমায় হিমালয় ও দক্ষিণে কন্যাকুমারী ; এই দেবীর উপাসনাই মোক্ষের ধ্রুব উপায়। আয়ুর্বেদ ও চিকিৎসা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার উল্লেখও এতে রয়েছে এবং এসব তথ্য থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে এই গ্রন্থকে বৈদিক যুগের চেয়ে স্মৃতির অর্থাৎ পৌরাণিক যুগের রচনা বলেই নির্দেশিত করা উচিত।

কৃষ্ণ যজুর্বেদের একটিমাত্র ব্রাহ্মণ আমাদের হাতে পৌছেছে, তৈত্তিরীয়। তৃতীয় ও শেষ অধ্যায় ছাড়া এ গ্রন্থটির অন্যান্য অংশকে তৈত্তিরীয় সংহিতার অবিচ্ছিন্ন সংযোজন রূপেই গণ্য করা চলে—সমগ্র ব্রাহ্মণটি বারোটি প্রপাঠকে বিন্যস্ত। সামগ্রিকভাবে আপাস্তম্বকেই তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে রচয়িতা ব'লে উল্লেখ করা হয়, কিন্তু শেষ তিনটি প্রপাঠকে লেখক রূপে 'কঠ' উল্লিখিত হয়েছে, গ্রন্থের উপসংহারেও রয়েছে কঠোপনিষৎ।

ব্রাহ্মণ সাহিত্যের মধ্যে দীর্ঘতম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রচনা শতপথ ব্রাহ্মণ, এটি শুক্ল যজুর্বেদের অন্তর্গত। যজুর্বেদ সংহিতার মতো এই ব্রাহ্মণটিও দুটি শাখায় বিভক্ত,—কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন—রূপে আমাদের কাছে পৌছেছে। কাণ্ব শাখায় সতেরোটি কাণ্ড, সেগুলিও আবার প্রপাঠকে বিভক্ত। মাধ্যন্দিন শাখা থেকেই এই ব্রাহ্মণের নামকরণে 'শতপথ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ; কেননা মাধ্যন্দিন শাখায় চৌদ্দটি কাণ্ড

একশ'টি অধ্যায় বা আটষট্টিটি প্রপাঠকে উপবিভক্ত—এ ছাড়াও ক্ষুদ্রতর বিভাগ এই গ্রন্থে চারশ আটত্রিশটি ব্রাহ্মণে ও সাতহাজার ছ'শ চব্বিশটি কণ্ডিকা রয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণের কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখার প্রধান পার্থক্য এই যে, প্রথমোক্ত শাখায় উদ্ধারী, রাজপেয় ও রাজসূয় যজ্ঞ সম্পর্কে তিনটি অতিরিক্ত অংশ রয়েছে। বিষয়-বিন্যাসের ক্ষেত্রে দু'টি শাখার মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

শতপথ ব্রাহ্মণের সংকলন কতকটা পরবর্তীকালে হলেও এর বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রচুর প্রাচীনতর উপাদান রয়েছে। এই গ্রন্থে রুদ্রকে পরবর্তীকালের 'মহাদেব' নামে অভিহিত করা হয়েছে ; আমরা আরও একজন পরবর্তী দেবতা, 'পুরুষ নারায়ণে'র প্রথম উল্লেখ এখানে লক্ষ করি ; পরবর্তী অর্ধদেবতা কুবের বৈশ্রবর্ণেরও প্রথম উল্লেখ এখানেই পাওয়া যায়।

শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লিখিত দুজন রচয়িতার মধ্যে শাণ্ডিল্যের নাম ষষ্ঠ থেকে নবম অধ্যায়ে প্রায়ই চোখে পড়ে ; এই অংশে যাজ্ঞবল্ক্যের নাম পাওয়াই যায় না। তাই মনে হয়, শাণ্ডিল্যই সম্ভবত ঐ চারটি অধ্যায়ের রচয়িতা ছিলেন। অন্যদিকে যাজ্ঞবল্ক্য বাকি অংশের প্রণেতা। শাণ্ডিল্য রচিত অংশে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ভৌগোলিক পটভূমিকা স্পষ্ট, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য রচিত অংশে বিদেহের মতো দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের উল্লেখ লক্ষণীয়। সুতরাং শেষোক্ত অংশ সম্ভবত পরবর্তী কালে রচিত হয়েছিল। তখন লৌহনির্মিত সামগ্রী ও লাঙলের সাহায্যে কৃষিভূমি খনন ক'রে এবং অরণ্যভূমি নির্মূল ক'রে কিছু ব্যাপকভাবে কৃষিকার্য সম্ভব করা হয়েছিল। সেই যুগে আর্যরা ক্রমশ দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে অগ্রসর হচ্ছিলেন, অতএব শাণ্ডিল্য রচিত অধ্যায়গুলিই গ্রন্থের প্রাচীনতর অংশ। অন্যদিকে দশম থেকে চতুর্দশ অধ্যায় পরবর্তীকালে বৈদিক যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক রচিত ও পরে সংযোজিত হয়েছিল। বিষয়বস্তুর অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকেও শেষোক্ত অংশকে পরবর্তীকালে রচিত বলে গ্রহণ করা যায়। তখন প্রশাসকরূপে রাজার ভূমিকা সমাজে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নততর পর্যায় যেমন চোখে পড়ে, তেমনি বৈশ্রবর্ণের মতো উপদেবতা ও পিশাচযোনির উল্লেখ থেকেও ঐ অংশের বিলম্বিত আবির্ভাব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

যথার্থ বৈদিকযুগ সমাপ্ত হওয়ার বহুদিন পরে যখন বৌদ্ধধর্মের উন্মেষ ও বিলয় হয়ে গেছে, সম্ভবত ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের যুগে আমরা সামবিধান ও ঋগ্‌বিধান ব্রাহ্মণের মতো 'বিধান' ব্রাহ্মণ জাতীয় জাদু-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক নানা বিশ্লেষণপূর্ণ বিশেষ এক ধরনের রচনার সন্ধান পাই। এই শ্রেণীর গ্রন্থে অনুষ্ঠানগুলি যেমন বিশ্লেষিত হয়েছে, তেমনি সামগীতি ও মন্ত্র আবৃত্তি এখানে জাদুক্রিয়া রূপে বর্ণিত। বস্তুত, যথার্থ বৈদিক অনুষ্ঠানকে ব্যাখ্যা করার চেয়ে এ ধরনের গ্রন্থে বিপদ নিবারণের আশু

উপায়, প্রকৃতি ও সমাজের অভিসম্পাত, ভাবী অকল্যাণসূচক চিহ্ন, ('নিমিত্ত' ও 'শাকুন' নামে যা পরবর্তীকালে চিহ্নিত) অশুভপ্রদ ও ক্ষতিকারক জাদু ইত্যাদিই অধিকমাত্রায় বিবৃত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের সঙ্গে এদের সম্পর্ক নিতান্ত ক্ষীণ ও বাহ্য ; এরা যে 'ব্রাহ্মন' অভিধা আত্মসাৎ করেছে, তার কারণ আপাতদৃষ্টিতে যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পর্কেই এদের মনোযোগ পরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু তা শুধু আপাতদৃষ্টিতেই।

'আর্যেয়' ব্রাহ্মণ গ্রন্থটি সূত্র-ঐতিহ্যের অন্তর্গত আরও একটি বিলম্বিত রচনা ; কৌথুম শাখার অন্তবর্তী সামবেদের অর্বাচীনতর রচনাগুলির সঙ্গে সূত্র-সাহিত্যের সাযুজ্য একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। আর্যেয় নামের মধ্যে যদিও ঋষিদের সঙ্গে সম্পর্কের ইঙ্গিত রয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এটি 'গণ'গুলির বিবিধ নামের তালিকা। মাঝে মাঝে কোনো ঋষিকে তাঁর রচনা অনুযায়ী উল্লেখ করা হয়েছে, প্রায়ই ঋষির নিজস্ব নামের চেয়ে বিশেষণটি অধিক জনপ্রিয় ব'লে মনে হয়। এই ব্রাহ্মণে উল্লিখিত গানগুলি পূর্বার্চিক ও মহানাম্ন্যার্চিকের অন্তর্গত গ্রামগেয় ও অরণ্যগেয় গীতিসংগ্রহ থেকে উৎকলিত হয়েছে ; উত্তরার্চিকের উহ ও উহ্যগান এখানে উদ্ধৃত হয় নি। কীথ্ অবশ্য 'মন্ত্র' ও আর্যেয় ব্রাহ্মণকে একই গ্রন্থের দু'টি অধ্যায় ব'লে মনে করেন। রচনাশৈলীতে অর্বাচীনতার পরিচয় স্পষ্ট ; কালগত অসঙ্গতির অভিব্যক্তির মাধ্যমে প্রাচীনতার ভাণ করে কৃত্রিমভাবে রচনাকালকে পিছিয়ে দেবার কোনো প্রয়াস এখানে দেখা যায় না।

আর্যরা যে আর্যাবর্তে তাদের আদি বাসভূমি থেকে সরে এসেছিল, তার ভৌগৌলিক প্রমাণ স্পষ্ট। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল ও পাঞ্জাব থেকে তাঁরা পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলের অন্যত্র এসেছেন ব'লেই সম্ভবত ঐ উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের প্রতি যেন কতকটা তাচ্ছিল্য প্রকাশিত হয়েছে। স্পষ্টতই এই ব্রাহ্মণ মগধের নিকটবর্তী পূর্বাঞ্চলের দূরতম কোনো প্রান্তে রচিত হয়েছিল। এই অঞ্চল সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা তখনো পর্যন্ত বলবৎ থাকলেও পূর্বাঞ্চলের জনসাধারণের সঙ্গে আর্যদের পারস্পরিক সংমিশ্রণের কিছু কিছু প্রমাণও পাওয়া যায়, বস্তুত এই স্থানীয় অধিবাসীদের বসতির সীমানা এখন আর্যাবর্তের পূর্ব সীমান্তে। আর্যরা যেহেতু উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছিলেন, পূর্বদিকে ক্রমাগত অনুপ্রবেশও ঐ অঞ্চলের জনসাধারণের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক এই ব্রাহ্মণের অর্বাচীনতার প্রমাণই বহন করছে।

বৈদিক সাহিত্যে অথর্ববেদ অনেক বিলম্বে গৃহীত হয়েছিল, তাই তার একটিমাত্র ব্রাহ্মণই রয়েছে : গোপথ ব্রাহ্মণ। এর বিষয়বস্তু সূত্র সাহিত্যের অধিকতর নিকটবর্তী ; কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে এই গ্রন্থ অথর্ববেদের বৈতান-সূত্র অপেক্ষাও পরবর্তী।

এটি যে দুটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত, তাদের মধ্যে পূর্ব ব্রাহ্মণ নামে প্রথম অধ্যায়ের পাঁচটি প্রপাঠক ও উত্তর ব্রাহ্মণ নামে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ছ'টি প্রপাঠক। পূর্ব ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তু হ'ল সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রণব ও গায়ত্রীর অতীন্দ্রিয় তাৎপর্য, ব্রহ্মচারীর কর্তব্য, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার রহস্য, সূত্রের নিগূঢ় রহস্যময় তাৎপর্য এবং পুরোহিতদের আনুষ্ঠানিক ভোজন। এ ছাড়াও এতে ছন্দশাস্ত্র সম্পর্কেও একটি অংশ রয়েছে। উত্তর-ব্রাহ্মণে কিছু কিছু প্রধান যজ্ঞ বিবৃত হয়েছে ; তবে অথর্ববেদের ব্রহ্মা শ্রেণীর পুরোহিতের কর্তব্য ও অধিকার এবং যজ্ঞানুষ্ঠানে তার অবস্থানই দ্বিতীয় অধ্যায়ের মূল বর্ণনীয় বস্তু। সমগ্র গ্রন্থের গঠন শিথিল এবং সম্পাদনায় যত্নের অভাব স্পষ্ট।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ প্রাচীনতর গ্রন্থগুলির অন্যতম ; এই গ্রন্থ বিশ্লেষণ ক'রে আমরা ব্রাহ্মণগুলি রচনার কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করতে পারি, কেননা এই গ্রন্থের অন্যতম প্রধান বর্ণনীয় বিষয় হ'ল যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। এখানে বিভিন্ন দেবকাহিনীর মাধ্যমে যজ্ঞাগ্নির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তবে সমস্ত অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত লক্ষ্য রূপে খাদ্য উৎপাদনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ এই গ্রন্থের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। সৃষ্টি, গোসম্পদলাভ ও সন্তানলাভকেও যজ্ঞের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই প্রাচীনতর ব্রাহ্মণেও আমরা পুরোহিতদের বিভিন্ন কার্যকলাপ এবং দক্ষিণা গুরুত্ব সহকারে বিবৃত হতে দেখি। যজ্ঞের ক্রমবর্ধমান জটিলতা ও তৎসংশ্লিষ্ট তাৎপর্য কিছু কিছু নির্দেশ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রায় অন্তহীনভাবে পুনরাবৃত্ত দীর্ঘ গদ্য সূত্র এবং প্রত্যেকটি আনুষ্ঠানিক অনুপুঙ্খের প্রয়োগকে যুক্তিগ্রাহ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে বহু দেবকাহিনী উদ্ভাবিত হয়েছে। এমনকি এই প্রাচীনতম ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও সেইসব বৈশিষ্ট্য উপস্থিত যেগুলির প্রভাবে ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি সাহিত্য হিসাবে সাধারণভাবে অনাকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। সমগ্র ব্রাহ্মণ সাহিত্যে পরিব্যাপ্ত বৈশিষ্ট্য হ'ল সংহিতা-বহির্ভূত তাবৎ যজ্ঞসম্পর্কিত—এমনকি যজ্ঞ-বহির্ভূত—ধর্মীয় ও তৎকালীন লোকসমাজ থেকে এই প্রাচীনতম সংকলিত বস্তু এই ব্রাহ্মণ গ্রন্থটিতেও আমরা লক্ষ্য করি।

ঋগ্বেদের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ অর্থাৎ কৌষীতকি বা শাঙ্খায়ন আবার অর্বাচীনতর ব্রাহ্মণগুলিব অন্যতম। এই ব্রাহ্মণের রচয়িতা সম্বন্ধে আমরা স্বচ্ছন্দে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে অসংখ্য ব্যক্তির প্রচেষ্টায় রচিত এই গ্রন্থে যে সমস্ত ঋষির নাম উল্লিখিত হয়েছে, কুষীতক বা কৌষীতকি তাদের অন্যতম। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে প্রাথমিক পর্যায়ে ঋগ্বেদের একটিমাত্র ব্রাহ্মণ ছিল ; পরবর্তী কালে বিভিন্ন ঋষিপরিবার ও অঞ্চলের মধ্যে ভিন্নমত দেখা দেওয়ায় মূল গ্রন্থটি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। উভয় গ্রন্থের অভিন্ন একটি উৎস থাকায় বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে উভয়ের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে ঃ দেবতাদের সহগামী যজ্ঞাগ্নি সম্পর্কে একই ধরনের

উদ্বেগ প্রকাশিত হয়েছে—প্রাচীন মানুষের প্রত্নস্মৃতিতে অগ্নিপ্রজ্বলন সম্পর্কে যে উদ্বেগ, অগ্নিনির্বাপণের যে আতঙ্ক ও ভীতি, এবং যজ্ঞাগ্নি পুনঃপ্রজ্বলনের দীর্ঘ, ক্লান্তিকর প্রক্রিয়া সম্পর্কে যে অনিশ্চয়তার বোধ সমাজমানসে তখন জাগরূক ছিল, তা-ই এখানে প্রতিফলিত হয়েছে।

কৌষীতকি ব্রাহ্মণে বিবৃত যজ্ঞসমূহ হ'ল অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস, বহুগৌণ ইষ্টি, চতুর্মাস্য : বৈশ্বদেব, বরুণপ্রবাস, সাকমেধ ও শুণাসীরীয়। পর্যাপ্ত শস্যপ্রাপ্তির জন্যে যথাকালে ঋতুগুলির আবর্তন, স্বাস্থ্য, বরুণের পাশ, পাপ ও ব্যাধি থেকে মুক্তি ইত্যাদির কামনায় এই যজ্ঞগুলি পরিকল্পিত হয়েছিল। এছাড়া, নিম্নলিখিত যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গেও আমরা পরিচিত হই :—সোমযাগ, দীক্ষণীয় ইষ্টি, প্রায়ণীয় ও উদয়নীয়, আতিথ্য ইষ্টি, অগ্নিপ্রণয়ন, অগ্নিষ্টোম, পশুযাগ, প্রাতরনুবাক, আপোনপ্ত্রীয়, ষোড়শী, জ্যোতিষ্টোম ও গবাময়ন। বিংশতি থেকে ত্রিংশত অধ্যায় যজ্ঞের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বিষয়গুলি বর্ণনা করেছে এবং স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সেগুলি পরবর্তীকালে সংযোজিত।

ঐতিরেয় ও কৌষীতকি ব্রাহ্মণের মধ্যে সাধারণভাবে বর্তমান বিষয়গুলি স্পষ্টতই গ্রন্থের প্রাচীনতম অংশ। তবে ব্রাহ্মণ সাহিত্যে রচনা যখন শেষ পর্যায়ে, সে সময় কৌষীতকির শেষ অধ্যায়গুলি রচিত হওয়ায় এতে সমস্ত নূতন বিষয় সংকলিত হয়েছিল। বিশেষত, শেষ দশটি অধ্যায় বিশ্লেষণ ক'রে আমরা ব্রাহ্মণ সাহিত্যের বিলম্বে আগত বিষয়গুলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ক'রে নিতে পারি। সংবৎসর সম্বন্ধে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা এখন কালের অতীন্দ্রিয় দ্যোতনার সঙ্গে সম্পর্কিত, তেমনি মৃত্যু সম্পর্কিত অতীন্দ্রিয় ভাবনা এবং নিদানবিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা ও ব্যুৎপত্তি শাস্ত্র সম্পর্কিত আলোচনা, জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্য রূপে শূদ্রদের সমাজিক অবস্থান, কল্যাণপ্রসূ জাদু ও খাদ্য-উৎপাদন ও উৎপাদনবৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ, গ্রাবস্তুৎ শ্রেণীর পুরোহিতের কার্যকলাপ সম্পর্কে উদ্ভাবিত দেবকাহিনী, ঐন্দ্রজালিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অতিপ্রাকৃত স্তরে ব্যাখ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রবল্হিকা (ধাঁধা) প্রভৃতি কৌষিতকি ব্রাহ্মণে বিবৃত হয়েছে। গবাময়ন যজ্ঞ সম্পর্কে আলোচনায় 'পুরুষ'কে যজ্ঞের সঙ্গে একাত্ম ক'রে দেখা হয়েছে। প্রসঙ্গত যজ্ঞীয় অনুপুঙ্খ, পুরোহিত ও যজমানকে কেন্দ্র ক'রে যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রতীকী অতীন্দ্রিয় ব্যাখ্যাকে যেভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তাতে পরবর্তী তন্ত্রসাহিত্য ও আরণ্যকের পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায়। তবে সর্বাধিক প্রযুক্ত ও প্রাধান্যযুক্ত প্রতীকায়ন উৎপাদন প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, কেননা বাস্তবজীবনের সবচেয়ে জরুরি সমস্যারূপে একমাত্র উৎপাদনব্যবস্থাই ফসল, গোসম্পদ ও সন্তানের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ ও দ্রুতবৃদ্ধির আশ্বাস

আনত। এই উৎস থেকেই ক্রমে সমস্ত অতীন্দ্রিয়বাদী ও অধ্যাত্মবাদী প্রবণতার সূত্রপাত হয়েছিল।

সামবেদের আটটি প্রধান ব্রাহ্মণেব মধ্যে পঞ্চবিংশ বা তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ দীর্ঘতম ও সর্বাধিক পরিচিত। একাহ যজ্ঞ থেকে স্পষ্টতই প্রত্নপৌবাণিক সহস্রবর্ষ ব্যাপী যজ্ঞ পর্যন্ত সোমযাগের বিভিন্ন বিচিত্র প্রকাশ এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। অগ্নিষ্টোম, গবাময়ন ও মহাব্রতের মতো প্রধান যজ্ঞগুলি আলেচিত হলেও সামমন্ত্রের উৎস ও নিগূঢ় রহস্য, মন্ত্রগানের যথার্থ পদ্ধতি ও তৎপ্রসূত পুণ্যফলেব উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে।

পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের অনুবৃত্তি রূপে পরিচিত ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ অবশ্য প্রধান সোমযাগগুলিকে বিবৃত কবেনি, আপাতদৃষ্টিতে তা'-এব সম্পূবক ভূমিকাই গ্রহণ করেছে। এতে মূলত গৌণ অনুষ্ঠানগুলি আলোচিত হয়েছে। এতে কিছু অংশ আছে, যেগুলির সঙ্গে যজ্ঞের সম্পর্ক নিতান্ত পরোক্ষ। শেষ অধ্যাযে স্বাহা, স্বধা ও বষট্ উচ্চারণের বিধি প্রভৃতি আলোচিত হযেছে ; প্রকৃতপক্ষে এই অংশটি ষড়বিংশ ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট এবং অদ্ভুত ব্রাহ্মণ নামে পবিচিত। প্রকৃতপক্ষে তা' ষড়বিংশেবই ষষ্ঠ অধ্যায়। মানুষের জীবনে যে সমস্ত প্রাকৃতিক ও অলৌকিক দুর্যোগের আশঙ্কা থাকে, এতে তার প্রায় সমস্ত দিকই উপস্থাপিত। এই সঙ্গে অবশ্য প্রতিষেধমূলক অনুষ্ঠানগুলিও আলোচিত হয়েছে। স্পষ্টতই এই গ্রন্থটি বহু পরবর্তীকালের রচনা, যখন প্রতিমাপূজা ও দেবমন্দির নির্মাণের রীতি প্রচলিত হয়ে গিয়েছে তখনকার বৈদিক ঐতিহ্যকে কৃত্রিমভাবে বেদোত্তর পৌরাণিক ধর্মভাবনা পর্যন্ত প্রসারিত করবার যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল, এই গ্রন্থে তারই নিদর্শন পাওয়া যায়।

গুরুত্ব বিচারের দিক দিয়ে এর পরেই আমরা সামবিধান ব্রাহ্মণের নাম উল্লেখ করতে পারি, বিষয়বস্তুর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে স্পষ্টই বোঝা যায়যে, তা আরও পরবর্তীকালের রচনা। যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে এর প্রায় কোনো সম্পর্ক নেই বললেই চলে, ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির প্রতি গ্রন্থটি অধিক মনোযোগী। যদিও গ্রন্থে সূচনায় রহস্যপূর্ণভাবে বলা হয়েছে যে, সমস্ত প্রাণী সামবেদকে আশ্রয় করেই জীবনধারণ করে এবং সাতটি সাঙ্গীতিক সুরপ্রবাহে সমস্ত সৃষ্টি বিধৃত। কিছু পরেই কয়েকটি পার্থিব বিষয় সম্পর্কেই গ্রন্থের সম্পূর্ণ মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়েছে ; যেমন উত্তম পত্নী লাভ, পিশাচ ও রাক্ষসদের উৎপাত শান্ত করা, মৃত্যুর পর স্বর্গপ্রাপ্তি, পুনর্জন্মনিবৃত্তি ইত্যাদি। পার্থিব সুখ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার প্রয়োজনে এবং নানাবিধ আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক বিপদ নিবারণের জন্যে কিংবা ঐতিহ্যগত ধর্মাচরণের অভ্যাসে যে সমস্ত অনুষ্ঠান বিবৃত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে ব্রাহ্মণ্য বৃত্তবহির্ভূত ও ব্রাহ্মণ্যযুগের পরবর্তী উপাদানসমূহের প্রভাব স্পষ্ট।

শাব্দিক ব্যুৎপত্তি ও সামমন্ত্রের উৎস বিষয়ক কিছু কিছু রচনায় সামবেদীয় ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়েছে। 'আর্ষেয়' নামে ক্ষুদ্র গ্রন্থে সামমন্ত্রের ক্রম অনুযায়ী বিন্যস্ত সামবেদীয় ঋষিদের নামের তালিকা পাওয়া যায়। এই তাৎপর্যহীন রচনার প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এতে বলা হয়েছে যে, এই ঋষিদের সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞান না থাকলে সামগান থেকে বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে।

'দেবতাধ্যায়' নামক অন্য একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থে দেবনাম (অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, সোম, বরুণ, ত্বষ্টা, পূষণ ও সরস্বতী) এবং সামমন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগের পারিভাষিক নাম বিবৃত হয়েছে। আটটি প্রধান ছন্দের প্রতি তদুপযোগী বর্ণ যোজনা-প্রসঙ্গে অতীন্দ্রিয় বিশ্লেষণ প্রদত্ত হয়েছে। গায়ত্রীই সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ ছন্দরূপে এখানে প্রশংসিত ; ছন্দনামের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে যাস্কের অনুসরণ স্পষ্ট।

'বংশ' ব্রাহ্মণ নামক অত্যন্ত ক্ষুদ্র গ্রন্থটিতে সামবেদের বিভিন্ন শাখার প্রতিষ্ঠাতাদের যেসব নাম বিবৃত হয়েছে, তাদের সূচনায় ব্রহ্মা ও সমাপ্তিতে সর্বদত্ত। এই ব্যাপক তালিকা থেকেই বোঝা যায় যে, এটি বহু পরবর্তী কালে রচিত হয়েছিল।

সামবেদের অন্যতম প্রধান ব্রাহ্মণ ছান্দোগ্য দশটি প্রপাঠকে বিন্যস্ত। প্রথম দু'টি অধ্যায়ে গৃহ্য অনুষ্ঠানের মন্ত্রসমূহ আলোচিত হয়েছিল ব'লে এই অংশকে মন্ত্রব্রাহ্মণ বা মন্ত্রপর্বরূপে অভিহিত করা হয়। আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থে শুধু নিম্নোক্ত বিষয়গুলিরই আলোচনা। যথা—বিবাহ অনুষ্ঠান, নবজাতকের জাতকর্ম, সর্পের প্রতি অর্ঘ্য, স্নাতক শিক্ষার্থীদের অনুষ্ঠান, পিতৃপুরুষদের প্রতি নিবেদিত অনুষ্ঠান, গৃহপ্রতিষ্ঠা, নবনির্মিত গৃহে আনুষ্ঠানিক গৃহপ্রবেশ, কৃমিরোগ নিরাময় ইত্যাদি। গোভিল ও খাদির গৃহ্যসূত্রের সঙ্গে এই ব্রাহ্মণের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে, কেননা সম্ভবত এই দুটি গ্রন্থ এর প্রত্যক্ষ পূর্বসূরী।

ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের দশটি প্রপাঠকের মধ্যে একমাত্র প্রথম দুটিতেই ব্রাহ্মণের উপযুক্ত বিষয়বস্তু পাওয়া যায়। তৃতীয় থেকে অষ্টম অধ্যায়ে যে সব গৌণ বিষয় আলোচিত হয়েছে, তার মধ্যে ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ এই উভয়েরই চরিত্রবৈশিষ্ট্য বর্তমান। স্পষ্টতই এই গ্রন্থটি বহু পরবর্তীকালে রচিত হয়েছিল, যখন খুব কম লোকই যজ্ঞানুষ্ঠানের সূত্রগুলির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারত। অনুষ্ঠানের তখন এত বেশি যান্ত্রিকতা সৃষ্ট হয়েছিল যে, ধর্মাচারের প্রধান প্রবণতা তখন আনুষ্ঠানিকতা থেকে দ্রুত অতীন্দ্রিয় উপলব্ধিতে রূপান্তরিত হচ্ছিল। গ্রন্থের শেষ তিনটি অধ্যায়ে ছান্দোগ্য উপনিষদের সন্ধান পাই।

সংহিতোপনিষদ্ ব্রাহ্মণের নামটি খুবই কৌতূহলজনক, যেহেতু নামকরণের মধ্যে বৈদিক সাহিত্যের তিনটি প্রধান ধারাই—সংহিতা, উপনিষদ্ ও ব্রাহ্মণ—উল্লিখিত

হয়েছে এবং উপনিষদ্ স্থান পেয়েছে ব্রাহ্মণের আগে। প্রকৃতপক্ষে এটি পরবর্তীকালে রচিত ; বিষয়বস্তুর বিন্যাসে সর্বাত্মক হওয়ার প্রবণতা এর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এই গ্রন্থের পাঁচটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথমটিতে সমস্ত সংহিতাকে দেবতা, দানব ও ঋষিদের অনুষঙ্গ অনুযায়ী তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়টি প্রকৃতপক্ষে সামগানের বিভিন্ন অনুপুঙ্খ সংক্রান্ত। তৃতীয় অধ্যায়ে যজ্ঞানুষ্ঠান ও স্বরন্যাসের ক্ষেত্রে সামগানের প্রযোজ্য পরিবর্তনগুলি ব্যাখ্যাত হয়েছে। শেষ দুটি অধ্যায়ে আচার্যের উদ্দেশে প্রদত্ত গুরুদক্ষিণার আলোচনা আছে।

জৈমিনীয় ব্রাহ্মণের সঙ্গে পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে ; এতে মুখ্যত যে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে তা হ'ল যজ্ঞানুষ্ঠানে সামগায়ক ছান্দোগ্য পুরোহিতদের কর্তব্য। প্রথম অধ্যায়ে অগ্নিহোত্র ও প্রায়শ্চিত্ত সহ অগ্নিষ্টোম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে গবাময়ন ও সোমযাগের কয়েকটি শাখা বিবৃত হয়েছে।

চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত জৈমিনীয় উপনিষদ ব্রাহ্মণ একটি অর্বাচীন রচনা, প্রথম অধ্যায়ে বিভিন্ন সামমন্ত্রের নাম, দ্বিতীয় ঋষিদের নাম, তৃতীয়ে বিখ্যাত সাম গায়কদের তালিকা এবং চতুর্থে যক্ষ্মারোগ থেকে আরোগ্যের জন্যে প্রার্থনা, উদ্গাতা শ্রেণীর পুরোহিতদের কর্তব্য এবং সামবেদীয় আচার্য ও প্রধান গায়কদের তালিকা বিবৃত হয়েছে। এই গ্রন্থের শেষতম অংশই হ'ল কেনোপণিষদ্।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে একমাত্র তৈত্তিরীয় আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। এই গ্রন্থের তিনটি অষ্টকের উপবিভাগরূপে কয়েকটি প্রপাঠক কল্পিত হয়েছে যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণরূপে তা প্রাথমিকভাবে আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া ও প্রসঙ্গত মন্ত্রগুলির আলোচনা করেছে। এই গ্রন্থে সোমযাগের সমস্ত প্রধান রূপই ব্যাখ্যাত হয়েছে ঃ সৌত্রামণী, রাজসূয়, বাজপেয়, চাতুর্মাস্য, অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস, ইষ্টি, পুরুষমেধ, পশুযাগ ও অশ্বমেধ। এই গ্রন্থের মধ্যে যেহেতু বহুপরবর্তী যজ্ঞানুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি আগ্রহও ব্যক্ত হয়েছে, তাই আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, যজ্ঞানুষ্ঠানকে বিকৃত করার প্রক্রিয়া যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ সেই যুগেই রচনা। বর্ণনীয় বিষয়ের বৈচিত্র্যের কথা মনে রেখে আমরা অনায়াসে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণকে এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে পরিপূর্ণতম ও ব্যাপকতম ব'লে গ্রহণ করতে পারি। তবে, বিপুল ও বিচিত্র বিষয়বস্তুর বিন্যাসে যথেষ্ট শিথিলতা ও বিশৃঙ্খলা দৃষ্টিগোচর হয়ে ব'লে আমাদের অনুমান এই যে, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বিভিন্ন যজুর্বেদীয় পুরোহিত শাখার ভিন্ন ভিন্ন প্রজন্মের দ্বারা অসতর্ক ও শিথিলভাবে রচিত ও সম্পাদিত হয়েছিল। যজ্ঞানুষ্ঠান তখন ক্রমশ জটিলতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন আনুষ্ঠানিক উপাদান ও দেবকাহিনী উদ্ভাবিত হয়ে পুরোহিতসমাজের দ্বারা যজ্ঞশাস্ত্রে সমর্থিত হচ্ছিল এবং বিভিন্ন অনুপুঙ্খের মধ্যে

পরস্পর-বিরোধিতা ও পুরোহিতদের ক্রমবর্ধমান শাখাগুলির মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক তীব্র হয়ে উঠেছিল, বস্তুত, যাবতীয় ঐতিহ্যের সুদীর্ঘ ইতিহাস এই গ্রন্থের প্রেক্ষাপট রচনা করেছে।

শুক্ল যজুর্বেদের ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে একমাত্র শতপথ ব্রাহ্মণই এখনও পাওয়া যায় ; এই গ্রন্থটি ব্রাহ্মণ সাহিত্যের মধ্যে দীর্ঘতম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। মাধ্যন্দিন শাখায় ছটি কাণ্ডে বিন্যস্ত একশত অধ্যায়ের জন্যই গ্রন্থের এই নামকরণ। বিভিন্ন কাণ্ডের বিষয়বস্তু হল ঃ দর্শপূর্ণমাস (১ম), অগ্ন্যাধান, অগ্নিপুনঃপ্রজ্বলন অগ্নিহোত্র, পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ, আগ্রায়ণেষ্টি, দাক্ষায়ণ ও চতুর্মাস্য (২য়) ; সোমযাগ, দীক্ষা ও অভিষব (৩য়) ; ত্রিষবণ, সোমযাগের বিভিন্নরূপ ঃ দ্বাদশাহ, ত্রিরাত্র ও অহীনের জন্য দক্ষিণা এবং সত্র (৪র্থ), রাজসূয় ও বাজপেয় (৫ম), উখা, বিষ্ণুর ত্রিপাদবিক্রম, বাৎমপ্র ও উপাধান (৬ষ্ঠ)।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের মতো শতপথ ব্রাহ্মণেও যথার্থ সম্পাদনার অভাব লক্ষণীয়। রচয়িতারূপে যদিও যাজ্ঞবল্ক্যের নাম উল্লিখিত হয়েছে, তবু মনে হয় তে, গ্রন্থের বিপুল অংশ রচনা ক'রে থাকলেও সমগ্র ব্রাহ্মণ তিনি প্রণয়ন করেন নি, কেননা গ্রন্থের কোনো কোনো স্থানে (মোট তেইশবার) তাঁকেই প্রতিষ্ঠিত বিশেষজ্ঞ বা বিতর্কে যোগদানকারী ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্রাহ্মণের বহু স্থানে দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে যে সুস্পষ্ট বিভেদ অভিব্যক্ত হয়েছে, তাতেও একাধিক লেখকের হস্তক্ষেপ স্পষ্ট। যাজ্ঞবল্ক্য ছাড়াও বিশেষজ্ঞ রূপে শাণ্ডিল্য ও তুর কাবসেয় উল্লিখিত হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে জনমেজয়ের অভিষেক 'তুর' প্রধান পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন, এই জনমেজয় যদি মহাভারতের চরিত্র হয়ে থাকেন, তাহলে শতপথ ব্রাহ্মণের রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম বা ষষ্ঠ শতাব্দী। বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিতর্কে আমরা শৌচেয়/প্রাচীনযোগ্য, উদ্দালক, আরুণি, শ্বেতকেতু এবং বিদেহরাজ্যের ক্ষত্রিয় রাজা জনককে অংশগ্রহণ করতে দেখি, এবং লক্ষণীয় প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই যজ্ঞবিষয়ক বিতর্ক উপসংহারে আধ্যাত্মিক ভাবনায় পর্যবসিত হয়েছে।

অর্বাচীনতর ব্রাহ্মণগুলির অন্যতম শতপথ বিশেষভাবে মূল্যবান হওয়ার কারণ হল, এই গ্রন্থ বহু দেবকাহিনীর সংকলন হওয়া ছাড়াও আমাদের কাছে ইতিহাস ও ভূগোলের উপাদানসম্বলিত সামাজিক সংস্কার ও বিশ্বাসের বিচিত্র ও সমৃদ্ধ এই চিত্র উপস্থাপিত করেছে ; শুধু তাই নয়, একে আমরা অধ্যাত্মবাদী সৃষ্টিতত্ত্বমূলক ও দার্শনিক পরিশীলনের আকর-গ্রন্থ রূপে গ্রহণ করতে পারি—শেষোক্ত উপাদান অন্তিম অধ্যায়ে অর্থাৎ বৃহদারণ্যক উপনিষদের মধ্যে স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে।

অথর্ববেদের একমাত্র ব্রাহ্মণ গোপথ অর্বাচীনতর রচনাগুলির অন্যতম। বৈদিক সাহিত্যের অংশরূপে অথর্ববেদের স্বীকৃতিলাভের পরেই তার নিজস্ব একটি ব্রাহ্মণ

গ্রন্থের অনিবার্য প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল, ফলে গোপথ ব্রাহ্মণ রচিত হ'ল। দুটি ভাবে বিভক্ত এই গ্রন্থের পূর্বভাগে পাঁচটি অধ্যায় ও উত্তরভাগে ছটি অধ্যায়। পূর্বভাগের প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান এবং 'ওম্' ও অন্যান্য রহস্যগূঢ় শব্দের ব্যুৎপত্তি, মৌদগাল্য ও গালবের একটি দীর্ঘ বিতর্কে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মচারীর কর্তব্য, পঞ্চবিধ অগ্নি, পুরোহিতদের যোগ্যতা, ব্রাহ্মণদের খাদ্য, আত্রেয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং বৈশ্বানর ও সপ্তপন জাতীয় অগ্নির উৎস বিবৃত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে অথর্ববেদীয় ব্রহ্মা শ্রেণীর পুরোহিতের কার্যাবলীর উপর গুরুত্ব আরোপ করা ছাড়াও কয়েকটি প্রায়শ্চিত্তমূলক অনুষ্ঠান, পুরোহিতদের কর্তব্য ও তার প্রাপ্য দক্ষিণা, অগ্নিহোত্র, অগ্নিষ্টোম, ঋত্বিক্‌নিয়োগ অনুষ্ঠান সম্পর্কেও আলোচনা আছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ঋত্বিক্ নিয়োগ অনুষ্ঠানের পরবর্তী অংশ প্রধান পুরোহিত ও তাদের সহকারী, বর্ষের উৎপত্তি এবং দশরাত্র, মহাব্রত, জ্যোতিষ্টোম ও অতিরাত্র যজ্ঞ বিবৃত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে নানা বিভিন্ন বিষয়বস্তু।

উত্তরভাগেব পথম অধ্যায়ে যজ্ঞানুষ্ঠানে বরুণ প্রঘাস এবং পিতৃমেধ যজ্ঞ আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মাংস অর্ঘ্য, উপসদ্‌বিষয়ক দেবকাহিনী, দেবপত্নী, সোমপানের প্রশংসা, প্রত্নকথার মাধ্যমে কর্তব্যে শিথিলতার পাপক্ষালন, প্রজাপতির স্তোত্র ইত্যাদি বিবৃত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বষট্ উচ্চারণের বিধি এবং যজ্ঞদক্ষিণার বিভিন্ন উপকরণ ছাড়াও বষট্ উচ্চারণকে বজ্র ও ষড়্‌ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে দেবতাদের সঙ্গে বেদের সম্পর্ক, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সঙ্গে প্রযোজ্য মন্ত্র, দক্ষিণা, বেদী, পুরোডাশ, ত্রিষবণ, দেবাসুরযুদ্ধ, পঞ্চপ্রাণ, উক্‌থ ও ষোড়শী যাগ বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে শর্বরী শব্দের নির্বচন, রাত্রি সম্পর্কিত আটটি সূক্ত, সোমপান ও তৎসংশ্লিষ্ট সামগান, বাজপেয়, সোমযাগের প্রাথমিক ও গৌণ অংশ আলোচিত হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রগাথ, অহীন, নারাশংস, বালখিল্য, বৃহতী এবং এগুলির উপযোগী দেবকাহিনী প্রভৃতি বিবৃত হয়েছে।

গোপথ ব্রাহ্মণে যজ্ঞের আনুষ্ঠানিক বিচ্যুতি ও সংশোধন সম্পর্কে প্রায়ই যে আলোচনা লক্ষ্য করা যায় তা অথর্ববেদের ব্রহ্মা শ্রেণীর পুরোহিতের নির্দিষ্ট কর্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়া, এতে যে বিচিত্র বিষয়বস্তু আলোচিত হয়েছে, ব্রাহ্মণ সাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যে সেসব গোপথ ব্রাহ্মণের পক্ষে অনিবার্যই ছিল। অথর্ববেদ সংহিতার মধ্যে যদিও বহু প্রাচীন উপাদান রয়েছে, গোপথ ব্রাহ্মণ পরিকল্পিতভাবে রচিত হয়েছিল ব'লেই প্রচলিত ব্রাহ্মণ সাহিত্যের ঐতিহ্যকে তা একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছে। এই গ্রন্থে যেহেতু দীক্ষানুষ্ঠানের দেবীরূপে 'শ্রদ্ধা'কে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং ভাষার মধ্যে উপনিষদের সংলগ্নতা সুস্পষ্ট, তবুও একে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের অন্তিম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ব'লে সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায়। অনুষ্ঠান-সম্পর্কিত পারিভাষিক শব্দ, প্রয়োগ ও ক্রিয়ার মধ্যবর্তী অসামঞ্জস্যকে

যেভাবে রূপক নির্মাণ বা ছন্দ প্রতীকায়নের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে এবং ব্যাকরণকে পৃথক বিষয়বস্তুরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তা' থেকেও রচনাকালের পরবর্তিতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

তবে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের সাধারণ ধারার সঙ্গে গোপথের পার্থক্য এখানেই যে যথার্থ যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক খুব কম ; সে তুলনায় প্রতিবাদপ্রবণ ও ব্যাখ্যামূলক আলোচনা এবং দেবকাহিনীর সাহায্যে অর্থবাদ অংশের অবতারণাই এখানে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। কখনো কখনো এই গ্রন্থে অথর্ববেদের শ্রেষ্ঠত্বও ঘোষিত হয়েছে ; বস্তুত, এতে যেন সমাজের দীর্ঘ অবহেলার বিরুদ্ধে অথর্ববেদের বিলম্বিত ও সচেতন প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। এই গ্রন্থের আরও একটি বিশেষত্ব হ'ল গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানের আলোচনা। এ বেদটির উৎস যে লঘু ঐতিহ্যের মধ্যে, যার জন্যে বৃহৎ ঐতিহ্যের 'ত্রয়ী'-এর প্রতি দীর্ঘকাল পরম অবজ্ঞা পোষণ করেছে, তাও এই গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানের এবং দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার প্রতিবিধানের অনুষ্ঠানগুলির দ্বারা প্রমাণিত।

পারিবারিক ও গোষ্ঠীগত জীবনের সঙ্গে অথর্ববেদের নিবিড় সম্পর্কই এতে প্রমাণিত হচ্ছে। উল্লেখ করা যায় যে, অথর্ববেদ সংহিতার মতো গোপথ ব্রাহ্মণও ভৃগু ও অঙ্গিরার সঙ্গে আপন সম্পর্ক ঘোষণা করেছে।

অথর্বপরিশিষ্টের সাক্ষ্য থেকে মনে হয় যে, প্রচলিত গোপথ ব্রাহ্মণটি বিশালতর কোনো একটি রচনার অন্তিম অবশেষ, এই জন্যেই একে 'অনুব্রাহ্মণ' বলা হয়ে থাকে। সাধারণত অন্য ব্রাহ্মণগুলি যে সমস্ত লোকায়ত ও গার্হস্থ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করেনি, অথর্ববেদের বৈশিষ্ট্যযুক্ত এই ব্রাহ্মণে সেইসব বিষয়ও ব্যাখ্যাত হয়েছে ; যেমন—সর্পবেদ, পিশাচবেদ, অসুরবেদ, ইতিহাসবেদ ও পুরাণ। 'ব্রহ্মা' শ্রেণীর পুরোহিতের উচ্চ প্রশংসা, ব্রহ্মচারী ও ব্রাত্যদের বিশিষ্ট উল্লেখ, অথর্বা ও অঙ্গিরার ভূমিকার গৌরবকীর্তন, অবৈদিক প্রাগার্য ও যোগী ঐতিহ্যের উপাদান সম্বলিত দেবকাহিনী ইত্যাদি বিশ্লেষণ ক'রে অথর্ববেদের ব্রাহ্মণরূপে গোপথের মুখ্য প্রবণতা ও তাৎপর্য সম্পর্কে আমরা অবহিত হই। লক্ষণীয় যে, এই ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তুর অনুষ্ঠানগত তাৎপর্য ক্রমবিবর্তনের পথে আধ্যাত্মিক ও অতিজাগতিক স্তরে নিবিষ্ট হয়ে, পরবর্তী যুগে রচিত গভীর তাৎপর্যপূর্ণ অথর্ববেদীয় উপনিষদ্গুলির পূর্বাভাস সূচিত করেছে।

গৌণরচনা

বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে ব্রাহ্মণ সাহিত্যে দুটি প্রধান ভাগ রয়েছে : বিধি ও অর্থবাদ। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে বহু গৌণ বর্গ রয়েছে, যেমন ইতিহাস, পুরাণ,

গাথা, আখ্যান, নারাশংসী ও বাকোবাক্য। এই তালিকা থেকে আমরা তৎকালে প্রচলিত বিচিত্র সাহিত্যবর্গগুলি সম্পর্কে যেমন অবহিত হই, তেমনি তাদের ধারকরূপে প্রাচীন গদ্যভঙ্গির স্থিতিস্থাপকতারও পরিচয় পাই। এই তালিকাতে বিশ্লেষণ ক'রে আমরা বুঝতে পারি যে, আনুষ্ঠানিক নিয়মাবলী বা বিধিকে প্রতিষ্ঠিত ও সুরক্ষিত করার জন্যেই লোকায়ত সাহিত্য বর্গগুলির উদ্ভব ও চর্চা হয়েছিল। আখ্যান ও প্রশস্তি কাব্যের মতো সাহিত্যগুলির ভিত্তি যে জনপ্রিয় ছিল, তা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের একটি বক্তব্যে স্পষ্ট। সেখানে বলা হয়েছে যে, বেদের অশুদ্ধ অংশই গাথা ও নারাশংসীতে পরিণত হয়েছিল। বর্ষব্যাপী অশ্বমেধ যজ্ঞে অধ্বর্যু দ্বারা আমন্ত্রিত হোতা 'পারিপ্লব' আখ্যান নামে যে সব কাহিনী শোনাতেন, তার উদ্দেশ্য ছিল যজমান রাজাকে উন্নততর নৈতিক স্তরে উত্তীর্ণ করে দেওয়া, কিন্তু অতি দীর্ঘায়িত পুনরুক্তিবহুল এই কাহিনীগুলির নিজস্ব গৌরব খুব বেশি ছিল না—সম্ভবত প্রাচীন সমাজ অধুনাবিস্মৃত বিশেষ কোনো কারণেই এদের ওপর গুরুত্ব আরোপ করত।

আঙ্গিক ও ভাষা

ব্রাহ্মণগুলি সংস্কৃতে গদ্যসাহিত্যের প্রথম নিদর্শন ; গদ্য অংশযুক্ত কৃষ্ণযজুর্বেদের বিষয়বস্তুর প্রত্যক্ষ ও অবিচ্ছিন্ন ধারার অন্তর্গত বলেই ব্রাহ্মণ সাহিত্যকে গণ্য করা চলে। গান বা আবৃত্তির যোগ্য স্তবকের মতো গদ্যসাহিত্যের কোনো সৃজনশীল প্রেরণার দাবি ছিল না। তবুও তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য পূরণ করত ; গদ্য ব্যাখ্যা ও অর্থবাদের দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানকে এই ব্রাহ্মণ সাহিত্যই বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য ক'রে তুলেছিল। ব্রাহ্মণ সাহিত্যের বিষয়বস্তুর নিগূঢ় বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ নির্দেশ সূচনা ও ব্যাখ্যা এর গদ্যভঙ্গির চরিত্র নির্ধারণ করেছিল। মৌখিক রচনারূপে এই গদ্যের কিছু কিছু বিশেষ সমস্যা ছিল, কেননা এই বিপুল সাহিত্যকে কণ্ঠস্থ ক'রে সম্পূর্ণভাবে স্মৃতিতেই ধারণ করতে হত, অথচ ছন্দের সাহায্য ছাড়া এই বিপুল সাহিত্যসম্ভারকে স্মৃতিতে সংরক্ষণ করা অত্যন্ত দুরূহ ছিল।

ব্রাহ্মণসাহিত্য তিনভাবে এই সমস্যার সমাধান করেছিল। প্রথমত, এর রচনাশৈলীর মৌল লক্ষণ হ'ল বাক্‌সংযম বা সংক্ষিপ্ততা এবং যথাযথতা ; প্রায় কোথাও কোনো একটিও অপ্রয়োজনীয় শব্দ ও বাক্যবন্ধ পাওয়া যায় না এবং সেই সঙ্গে সমাস ও সংকুচিত বাক্যাংশের প্রয়োগ এবং খণ্ডবাক্যকে শব্দে পরিণত করার প্রবণতার ফলে গ্রন্থের আয়তন বহুলাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হ'ত। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই গদ্য ছন্দোবদ্ধ হওয়াতে ছন্দের দ্বারা কণ্ঠস্থ রাখার সুবিধা হ'ত। তৃতীয়ত, রচনাশৈলী সংহিতার মতোই সাংকেতিক সূত্র জাতীয়। এই সব সূত্র চরিত্রগতভাবে ভিন্ন ; তাদের বৈশিষ্ট্য হ'ল বাক্য ও বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তি, সুপরিনির্দিষ্ট বিশেষণ,

নিশ্চিত অবস্থানে শব্দের পুনরাবৃত্তি ইত্যাদি। মুহুর্মুহু পুনরাবৃত্তির ফলে গদ্য শৈলী অতিরিক্ত মাত্রায় ক্লান্তিকর ও একঘেয়ে হয়ে পড়েছে ; একই ধরনের খণ্ডবাক্য ও শব্দবন্ধের পৌনঃপৌনিক প্রয়োগ প্রায় অন্তহীনভাবে প্রযুক্ত হওয়ায় রচনাশৈলী প্রচণ্ডভাবে ভারগ্রস্ত। অন্যদিকে বিষয়বস্তু তার অন্তর্নিহিত যজ্ঞকেন্দ্রিক প্রকৃতির ফলেই অনাকর্ষণীয়। এই একঘেয়েমি এত স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত যে কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর অসামান্য ঐতিহাসিক মূল্যের জন্যেই ব্রাহ্মণসাহিত্য আজও বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায় নি। কখনো কখনো একই উপসর্গ বা প্রত্যয় বিভিন্ন শব্দে প্রযুক্ত হয়েছে, এগুলি একই সঙ্গে স্মৃতি-সহায়ক ও শ্রোতা ও বক্তার কল্পনায় ঐন্দ্রজালিক শক্তির উদ্বোধক। আবার শতপথ ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে দুটি সম্পূর্ণ স্তবকে 'গ্রহ' শব্দ ভিন্ন দুটি অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। মূলত যে-শব্দটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার সঙ্গেই সম্পৃক্ত ছিল, তা'র অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে এখানে অনুষ্ঠানবহির্ভূত একটি ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। স্পষ্টতই এই প্রবণতা অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক অতীন্দ্রিয়বাদ ও প্রতীকায়নের মধ্যে দিয়ে আরণ্যকের ভিত্তিভূমি নির্মাণ করেছিল। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে ঊর্ধ্বগামী বা নিম্নগামী সুর প্রবাহে বিন্যস্ত বাক্যাংশ ও খণ্ডবাক্যের বিন্যাস কিংবা পরিমাণগত সমতারক্ষা প্রকৃতপক্ষে শ্বাসাঘাত বা পুনরাবৃত্তির মতোই স্মৃতিসহায়ক। কোনো শব্দ বা শব্দবন্ধের পুনরাবৃত্তির দ্বারা আমরা সূত্রের মধ্যে স্বর-প্রবাহের ধারণা-সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত একটি কৌশলের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করি। সংহিতায় নিহিত নিয়মিত ছন্দের পরিগঠনে যে অভাব তা অব্যবহিত পরবর্তী উত্তরসূরীরূপে ব্রাহ্মণের আঙ্গিকেও দেখা যায়—কিঞ্চিৎ পরিমাণে তারই ক্ষতিপূরণের চেষ্টা ঐ উপাদানগুলির একত্র সন্নিবেশে লক্ষণীয়।

কাল্পনিক ব্যুৎপত্তি রচনার বিশেষ প্রবণতা ব্রাহ্মণসাহিত্যে রয়েছে। ব্যুৎপত্তির প্রতি এই আগ্রহ স্পষ্টতই আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনে ব্যক্ত, যেহেতু যজ্ঞানুষ্ঠানই ব্রাহ্মণের প্রাথমিক লক্ষ্যস্থল। তাই 'উদ্‌গীথ'কে দেবতাদের সঙ্গে সম্পর্কিত করার উদ্দেশ্যে জৈমিনীয় উপনিষদ্ ব্রাহ্মণে শব্দটির তিনটি অংশের ব্যুৎপত্তি নিম্নোক্তভাবে প্রদর্শিত হয়েছে ঃ উদ্ = আদিত্য, গী = অগ্নি এবং থ = চন্দ্র। কোনো সন্দেহ নেই যে, এজাতীয় সম্পর্ক কল্পনার যৌক্তিকতা প্রমাণের উপযোগী রচনা কোথাও নেই। কখনো কখনো এধরনের ব্যুৎপত্তিকে সমর্থন করার জন্যে কিছু কিছু দেবকাহিনী উদ্ভাবিত হয়েছে ; সেসব বর্তমানে আমাদের কাছে হাস্যকর ব'লে প্রতিভাত হলেও তৎকালীন জনসাধারণের কাছে এ'সবই বিভিন্ন ব্যুৎপত্তিকে গ্রহণযোগ্য ক'রে তুলত। ফলে যজ্ঞানুষ্ঠানের অনুপুঙ্খগুলি জনমানসে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা লাভ করত। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে প্রজাপতির বিস্ফারিত (শো ধাতু বিস্ফার অর্থে) চোখ থেকে 'অশ্বে'র উৎপত্তি, বা 'অঙ্গ' ও 'রস' থেকে অঙ্গিরস বা অঙ্গিরার নিরুক্তি প্রদত্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে

শতপথ ব্রাহ্মণে অঙ্গের থেকে অঙ্গিরসের ব্যুৎপত্তি কথিত হয়েছে, তাই ব্রাহ্মণসাহিত্যপ্রদত্ত নিরুক্তিগুলি পরস্পর বিসদৃশ, যদিও প্রবহমান বিপুল সাধারণ উৎস থেকেই পুরোহিতেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই নির্বচনের উপাদান সংগ্রহ করতেন। কখনো কখনো বর্ণনীয় বিষয়ের আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনের ওপর নির্ভর ক'রে বিকল্প ব্যুৎপত্তি উপস্থাপিত হ'ত। কখনো বা অনুষ্ঠানের সঙ্গে পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত প্রচলিত বিশ্বাসগুলিকে সমর্থন করার জন্যে নানাবিধ ব্যুৎপত্তি প্রবর্তিত হ'ত। গোপথ ব্রাহ্মণে 'পুত্র' শব্দের নিরুক্তি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যে পুন্নাম নরক থেকে ত্রাণ করে সে-ই পুত্র। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুত্রসন্তানই যেহেতু সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করত, তাই পুত্রলাভের পুণ্য সামাজিক মূল্যবোধেরই ইঙ্গিত বহন করে—সেই সঙ্গে পুন্নামক নরকের আবিষ্কারও এই মূল্যবোধেরই স্বীকৃতি। আবার, 'উপবাস' শব্দের ব্যুৎপত্তিতে যে পবিত্রতার দ্যোতনা রয়েছে, তাতে মনে হয়, এটা তখন প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। কেননা, উপবাসের সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্য সম্ভবত প্রাক্তন পশুপালক সমাজে নূতন প্রবর্তিত হয়েছিল, যখন যজ্ঞানুষ্ঠান আর এ জাতীয় আত্মনিগ্রহ দাবি করতে পারত না। তেমনি 'উপনিষদ্' শব্দটি 'নিষদ' বা আনুষ্ঠানিক দীক্ষা থেকে নিষ্পন্ন করা হয়েছে। স্পষ্টতই এটা হ'ল উদীয়মান ভাবনাত্মক যজ্ঞবিরোধী ঔপনিষদীয় প্রবণতার অনুষ্ঠান-সর্বস্ব ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের সমন্বয়ের নিদর্শন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ তাৎপর্যপূর্ণভাবে ইন্দ্র সম্পর্কে 'ত্রিধাতুশরণম্' বিশেষণটি প্রয়োগ করেছে—এই শব্দে স্পষ্টতই বৌদ্ধ শব্দবন্ধের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে ; 'ত্রিধাতু' এবং 'শরণ' বৌদ্ধ সাহিত্যে, দর্শনে কেন্দ্রীয় এবং বহুব্যবহৃত।

ব্রাহ্মণের রচয়িতারা উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই জাতীয় ব্যুৎপত্তি নিতান্ত কাল্পনিক ; তাই এ'ধরনের প্রয়াসের যৌক্তিকতা প্রদর্শনের জন্য তারা বহুস্থানে লিখেছিলেন 'রহস্যই দেবতাদের প্রিয়, অতিস্পষ্টকে তাঁরা অবজ্ঞা ক'রে থাকেন' ['পরোক্ষপ্রিয়া বৈ দেবাঃ, প্রত্যক্ষদ্বিষঃ']। সমগ্র পৃথিবীতে প্রাচীন পুরোহিত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যে দুর্জ্ঞেয়তা বা রহস্যসৃষ্টির প্রবণতা, রয়েছে এ যেন তারই অভিব্যক্তি; কেননা পুরোহিতরা অনুভব করেছিলেন যে এ ধরনের অতীন্দ্রিয়বাদী প্রবণতার পেছনে দেবকাহিনী, প্রত্নকথা নির্মাণের যে প্রয়াস সক্রিয়, তা' মূলত অবচেতনাপ্রসূত বলেই স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। পুরোহিততান্ত্রিক সমাজের প্রধান শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ করার প্রচেষ্টা এতে অভিব্যক্ত হয়েছে। ব্রাহ্মণে প্রতিফলিত ব্যাকরণ 'পাণিনি পূর্ববর্তী' যুগের ইঙ্গিত বহন করে ; বহুশব্দেই বিভক্তি তখনও নির্দিষ্ট নয়। ক্রিয়াপদ থেকে দূরে বিচ্ছিন্নভাবে উপসর্গ প্রয়োগের প্রবণতা সাধারণভাবে বিরলতর হয়ে গেলেও কখনো কখনো সংহিতা যুগের প্রাচীন অভ্যাস আমরা পুনরাবৃত্ত হতে দেখি। পাণিনির নিয়মবহির্ভূত প্রয়োগ ছাড়াও ইতিমধ্যে

আত্মনেপদী ও পরস্মৈপদী ক্রিয়াপদের ব্যবহারে তাৎপর্যগত স্পষ্ট পার্থক্য অভিব্যক্ত হয়েছে। ব্রাহ্মণের শব্দভাণ্ডারে আর্যদের কালানুক্রমিক ও ভৌগোলিক অগ্রগতি প্রতিফলিত হয়েছে। অনার্য উৎস-জাত বহু অপরিচিত বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদকে সম্পূর্ণ অপরিশীলিত ও সামান্য পরিশীলিত অবস্থায় ভারতীয় আর্যভাষা আত্মসাৎ করেছে। পাণিনির সমসাময়িক গোপথ ব্রাহ্মণের পূর্বভাগে সর্বপ্রথম অব্যয়ের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এখানে তির্যক রচনাশৈলীর জন্য সংলাপগুলি অধিকতর প্রত্যক্ষ ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ব্রাহ্মণের রচনাশৈলীতে যে চমৎকার অব্যবহিত প্রত্যক্ষতা, শক্তিমত্তা, সংক্ষিপ্ততা ও সংকোচনশীলতা অভিব্যক্ত হয়েছে, তা ব্রাহ্মণ সাহিত্যের পূর্বে বা পরে আর কখনো এমন যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় নি, যেহেতু অনুরূপ রচনাশৈলীযুক্ত সূত্র-সাহিত্যের কোনো সাহিত্যগুণ নেই, কিন্তু কাব্য সৌন্দর্যযুক্ত বহু স্তবক ব্রাহ্মণসাহিত্যে পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ সাহিত্যে প্রায়ই ধ্বনি সংকোচনের প্রয়োজনে প্রয়োগিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সন্ধি ব্যবহৃত হয়েছে। শ্রুতিসাহিত্য স্মৃতি সহায়ক হওয়ার জন্যেই সন্ধির ফলে প্রায়ই ধ্বনিগত কর্কশতা অনিবার্যভাবে দেখা দিয়েছে। প্রাচীনতর শব্দ একদিকে যেমন ক্রমশ লুপ্ত হয়ে এসেছে, তেমনিই বেশ কিছু নতুন শব্দও আবির্ভূত হয়েছে। ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাচীনতর নাটক ও শিলালিপিগুলিতে সাহিত্যিক গদ্যের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত কয়েক শতাব্দী ব্যাপী রচনায় ব্রাহ্মণের ব্যাকরণবিধিই অনুসৃত হয়েছিল। সবগুলি ব্রাহ্মণেই আমরা শব্দের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের প্রতি অভিনব উৎসাহ অভিব্যক্ত হতে দেখি। বিজয়ী আর্যজাতি যে নিজেদের ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সগর্ব ও সচেতন, তার বহু নিদর্শন এ সাহিত্যে পাওয়া যায়। অবশ্য দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে আর্যদের বসতি বিস্তারের পর্যায়ে বৈদিক ভাষায় অনার্য উৎসজাত ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রভাবও প্রতিফলিত হয়েছে।

ব্রাহ্মণ সাহিত্যে এমন কিছু প্রহেলিকার সন্ধান পাওয়া যায় যাদের আনুষ্ঠানিক উদ্দেশ্য আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অস্পষ্ট। পদ্যে নিবদ্ধ ও সাধারণভাবে অনুষ্টুপ্ ছন্দে গ্রথিত, এই প্রহেলিকাগুলিকে 'আজিজ্ঞাসেন্যা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। অথর্ববেদের প্রহেলিকাগুলি প্রতিরোধ, অতিবাদ ও অহনয়া নামে পরিচিত। বিভিন্ন ব্রাহ্মণে সার্বভৌম সত্য সম্পর্কে বেশ কিছু শ্লোক রয়েছে যা সাধারণভাবে অনুষ্টুপ ছন্দে গ্রথিত। প্রাচীনতম ব্রাহ্মণগুলির অন্যতম ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যে প্রচুরসংখ্যক শ্লোক রয়েছে সেগুলিও বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ; সম্ভবত সংহিতার অব্যবহিত পরবর্তী উত্তরসূরীরূপে এদের গণ্য করা চলে। প্রাচীন মানুষের সঞ্চিত জ্ঞানের প্রতিফলন হওয়া ছাড়াও এগুলির মধ্যে আমরা বহু প্রাচীন উপকথার সন্ধান পাই। অন্যান্য ব্রাহ্মণে এ ধরনের শ্লোককে ইন্দো-ইরাণীয় যুগের ঐতিহ্য অনুযায়ী 'গাথা' আখ্যা

দেওয়া হয়েছে ; অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুষ্টুপ ছন্দে এবং কখনো ত্রিষ্টুপ ছন্দেও গ্রথিত গাথাগুলির বহুস্থানেই প্রকৃত কাব্যিক সৌন্দর্য ও প্রাচীন লোকায়ত উপলব্ধির সজীব অভিব্যক্তি ঘটেছে। তবে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, এ ধরনের রচনায় আলংকারিক রচনাশৈলীর আভাস থাকলেও তা সর্বত্র কাব্যিক গুণের পরিচায়ক নয়, যেহেতু ব্রাহ্মণের অভীষ্ট হ'ল ঋজুতা, স্পষ্টতা, সংক্ষিপ্ততা ও দ্রুত অর্থবোধ। প্রত্যক্ষভাবে যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় চিত্রকল্পের প্রয়োগেও নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে। উপমা ও রূপক প্রযুক্ত হলেও যজ্ঞানুষ্ঠানের অনুপুঙ্খকে যথাযথ ও দৃঢ়ভাবে উপস্থাপিত করাই এর একমাত্র লক্ষ্য। অর্থাৎ কোথাও কোথাও রচয়িতার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় থাকা সত্ত্বেও সাধারণভাবে কোনো গভীর উপলব্ধি বা প্রাকৃত কাব্যিক অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটে নি।

বৈদিক জনসাধারণের শিল্প সম্পর্কিত ভাবনার প্রথম প্রকাশ ঘটেছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি বাক্যে—"আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি" (৬ : ৫ : ৬ : ২৭) এই গ্রন্থে শিল্পকে বাস্তবের অনুকরণ বলা হয়েছে। (৩ : ২ : ১ : ৫), শতপথ ব্রাহ্মণ অনুযায়ী ঋষিই কবি (১ : ৪ :.২ : ৮)।

দেবকাহিনী

বৈদিক সমাজের ধর্মীয় চেতনার গুরুত্বপূর্ণ স্তর যে সব দেবকাহিনীতে প্রতিফলিত হয়েছে, সেসব ব্রাহ্মণ সাহিত্যে প্রথম ও শেষবারের মতো বিধিবদ্ধ হয়েছিল। এইগুলিই ব্রাহ্মণ সাহিত্যের প্রাণ, যার মধ্যে তৎকালীন ধর্মীয় জীবনেব সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ বিস্তারিত ও জটিল যজ্ঞানুষ্ঠানের যৌক্তিকতা প্রদর্শিত হয়েছিল এবং কালক্রমে তা-ই একটি সামগ্রিক সাহিত্যের রূপ পরিগ্রহ করে। দেবকাহিনীগুলিকে ছ'টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায় ; (১) ধর্মতত্ত্বমূলক—এতে দেবতাদের উৎস, স্বভাব, কার্যকলাপ, সম্পর্ক ও বীরত্ব বিষয়ক কাহিনী বিবৃত হয়েছে। (২) আনুষ্ঠানিক—এজাতীয় প্রত্নকথায় আনুষ্ঠানিক কর্ম, ক্রিয়াকাণ্ডের কাল, পদ্ধতি, স্থান, বিধিনির্দেশ-পরিমাণ, সংখ্যা ইত্যাদি কাহিনীর রূপকে ব্যাখ্যাত হয়েছে। (৩) সামাজিক ও নৈতিক—এতে প্রচলিত সামাজিক বিশ্বাস, নিয়ম, সংস্কাব ও কার্যকলাপের যৌক্তিকতা কাহিনীর মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়েছে। (৪) সৃষ্টিতত্ত্বমূলক ও হেতুসন্ধানী—এ জাতীয় কাহিনীতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, পৃথিবী বা কিছু কিছু গৌণ সৃষ্টির উৎস আলোচিত হয়। (৫) নৈসর্গিক—এতে প্রাকৃতিক উপাদানগুলির স্বরূপ ও প্রকৃতি দেবকাহিনীর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়। (৬) আধ্যাত্মিক—এখানে মানুষ ও বিশ্বজগতের মধ্যে বিদ্যমান প্রকৃত ও আদর্শ সম্পর্কের উপরে আলোকপাত করা হয়।

ধর্মতত্ত্বমূলক কাহিনীগুলি সমগ্র সমাজের সামূহিক উত্তরাধিকাররূপে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়। ভারতবর্ষে আর্যদের আগমনের কিছুকাল পরে ধর্মতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা এজাতীয় কাহিনীকে বিস্তৃত রূপ দিয়েছিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠান ক্রমশ জটিলতর হওয়ার ফলে এদের যৌক্তিকতা প্রদর্শন ও অনুমোদনের জন্য নূতনতর দেবকথার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। অবশ্য আনুষ্ঠানিক কারণ ছাড়াও, এসব দেবকথা দেবতাদের সম্পর্কেও আলোকসম্পাত করে। বহু ক্ষেত্রেই এগুলির মধ্যে আমরা দেবতাদের প্রকৃত পরিচয় বিষয়ে তথ্য পাই। একটি বহুপ্রচলিত দেবকথার রুদ্র কর্তৃক প্রজাপতির দেহভেদ বর্ণিত হয়েছে ঃ প্রজাপতি স্বীয় কন্যার প্রতি কামনাসক্ত হয়েছিলেন ব'লে রুদ্র প্রজাপতিকে আঘাত করতে সম্মত হয়েছিলেন পশুদের উপর একাধিপত্যের বিনিময়ে। কোনো প্রাগ্বৈদিক রুদ্রের সঙ্গে পশুজগতের সম্পর্ক সম্ভবত আর্যদের ভারত আগমন অপেক্ষা প্রাচীনতর সিন্ধু উপত্যকার প্রত্ন পশুপতি শিবের সঙ্গে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত রুদ্রদেবের সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়েই আর্যদের নূতন এই দেবকাহিনীটি উদ্ভাবন করতে হয়েছিল, যেহেতু তা' না হলে সম্পূর্ণত আর্যদেবরূপে পশুপতির প্রতিষ্ঠা হওয়া অসম্ভব ছিল।

সমগ্র ব্রাহ্মণ সাহিত্যে বারবার প্রজাপতিকে প্রাণশক্তির সঙ্গে একীভূত করা হয়েছে। এমনকি শেষপর্যন্ত তিনি নবজাত বর্ধিষ্ণু শিশুর প্রতিকল্প হয়ে ওঠেন। প্রাণশক্তিরূপে তিনি উর্বরতা ও সৃষ্টির সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং তাঁর প্রধান শত্রু হল মৃত্যু। জীবন, বৃদ্ধি ও আয়ুর পরিপোষকরূপে প্রজাপতি ধ্বংসকারী শক্তির সঙ্গে কঠোর সংগ্রামে নিরত হয়ে সমস্ত জীবজগতের, বিশেষত মানুষের সমর্থক এক মহান দেবতায় পরিণত হয়েছেন। প্রজাপতির মৃত্যু-বিরোধিতা বিষয়ে বহুপ্রচলিত একটি দেবকাহিনীতে বহু দেবতার অঙ্গহানি বিবৃত হয়েছে। অবেস্তায় সৃজনশীল আহুর মজ্দা ও ধ্বংসাত্মক অঙ্গ মৈন্যুর মধ্যে যে দ্বন্দ্বের বিবরণ রয়েছে, তাই প্রজাপতি ও মৃত্যুর সংগ্রামে প্রতিফলিত ; সম্ভবত, একই ভাববস্তু পরবর্তীকালে দেবাসুরের প্রতীকী সংগ্রামে পর্যবসিত হয়েছিল। বহু দেবকাহিনীতে প্রজাপতি বিশ্বস্রষ্টা প্রতীকী সংগ্রামে পর্যবসিত হয়েছিল। বহু দেবকাহিনীতে প্রজাপতি বিশ্বস্রষ্টা দেবতারূপে বর্ণিত হয়েছেন ; সকল প্রাণীকেই তিনি পাপ ও মৃত্যু থেকে মুক্ত করেন। বৈদিক জনসাধারণ কৃষিকার্যে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হওয়ার পরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি এবং জন্মপ্রক্রিয়া, উর্বরতা ও প্রাচুর্যের সঙ্গে আরও স্পষ্টভাবে সম্পর্কিত একজন দেবতার প্রয়োজন তাদের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল ঃ ফলে, প্রজাপতি ক্রমশ প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। এই দেবতাকে প্রচলিত উপাসনা পদ্ধতি অর্থাৎ যজ্ঞের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে ; কালক্রমে তিনি যজ্ঞের সঙ্গে একাত্ম্য লাভ করেছেন। তেমনি বেদের সঙ্গেও প্রজাপতির সম্পর্কের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বৈদিক দেবতারা ক্রমশ তিনটি স্পষ্ট ভাগে বিন্যস্ত হয়েছেন ঃ ব্রাহ্মণ যুগের শেষ পর্যায়ে যাস্ক এই শ্রেণীবিন্যাস নিরুক্ত গ্রন্থে গ্রহণ করেছিলেন। দ্যুলোকবাসী, অন্তরিক্ষবাসী ও পৃথিবীবাসী (দ্যুস্থান, অন্তরিক্ষস্থান ও ভূস্থান) দেবতা। একটি প্রত্নকথায় পরম দেবতাত্রয়ীর উত্থান যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাতেও এই বিভাজন স্পষ্ট। অনুষ্ঠানবিষয়ক তত্ত্ববিদ্যা যজ্ঞানুষ্ঠানের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্যে নানারকম দেবকাহিনী উদ্ভাবন করেছে ; একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অর্থে এগুলি হ'ল প্রাথমিক পর্যায়ের, অর্থাৎ সবচেয়ে মৌলিক ভূমিকা পালন ক'রে থাকে। যেমন, শতপথ ব্রাহ্মণের একটি কাহিনী (৩ : ৯ : ৪ : ২) এখানে সোমযাগে সোমসবনকে বৃত্রহত্যার প্রতীকী উপস্থাপনা রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। ঐ ব্রাহ্মণে এ জাতীয় বহু কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায় ; তেমনি গোপথ ব্রাহ্মণে নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ মধুবিদ্যাবিষয়ক দেবকথাটিকেও এয় অন্যতম দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা যায়।

যে প্লাবনে সারা সৃষ্টি বিধ্বস্ত হয়েছিল, শতপথ ব্রাহ্মণের সেই মহাপ্লাবন বিষয়ক বিখ্যাত কাহিনীটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মনু তাঁর রক্ষিত একটি মৎস্যের সাহায্যে সে প্লাবন থেকে রক্ষা পান ও পুনর্বার বিশ্বসৃষ্টি করেন যজ্ঞের সাহায্যে। যজ্ঞের সৃষ্টিকারী ভূমিকা এ কাহিনীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঐ ব্রাহ্মণে উর্বশীর বিরহে কাতর পুরূরবার সঙ্গে গন্ধর্বদের কথোপকথনে যজ্ঞের উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে ; এই প্রত্নকথার উৎস ইন্দো-হিত্তীয় পর্যায়ে—পণ্ডিতরা এমন অনুমান করেছেন। একে আমরা প্রাচীনতম উৎসজাত কথাগুলির মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী অভিব্যক্তির অন্যতম ব'লে গণ্য করতে পারি। সম্ভবত, এই কাহিনীটির সবচেয়ে প্রাচীন এবং সেই সঙ্গে বিপরীতপ্রান্তীয় প্রকাশ রয়েছে, ব্যাবিলনীয় মহাকাব্য 'এপিক অব্ গিল্‌গামেশ'-এর অন্তর্গত দেবী নের্‌গাল-এর সঙ্গে মর্ত্য নায়ক গিল্‌গামেশের প্রণয় আখ্যানে। যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দেবতা ও মানুষকে প্রণয়ীযুগলরূপে উপস্থাপিত ক'রে বহু শিল্পসুষমাময় ও গীতিকবিতার লাবণ্যযুক্ত কাহিনী গড়ে উঠেছে। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে অবশ্য দেবকাহিনীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট যজ্ঞানুষ্ঠান, উপকরণ ও অর্ঘ্য নিবেদনের পদ্ধতির পবিত্রতায় মণ্ডিত করা হয়েছে।

বিভিন্ন দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ ক'রে আমরা বুঝতে পারি যে, সমস্ত কিছুর মাধ্যমে একটি কেন্দ্রীয় বক্তব্যই সমর্থিত হচ্ছে ঃ দেবতারা মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে যে সব অনুষ্ঠান সমাধা করেছিলেন, মানুষের যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রকৃতপক্ষে সীমিত সময়ের পরিসরে তারই পুনরায়োজন সূচিত হয়। মানবিক জগতে যজ্ঞের বিভিন্ন অনুপুঙ্খগুলির তাৎপর্য কোনো প্রত্নপৌরাণিক কার্য বা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনুধাবনীয়, যেহেতু তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রচনার মাধ্যমে সাম্প্রতিক কালের অনুষ্ঠানের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়। অবশ্যপালনীয় কর্তব্যরূপে যজ্ঞীয় অনুপুঙ্খসমূহের সুনিয়ন্ত্রিত পরিসর নির্দিষ্ট হয়ে

যায়। সংকটপূর্ণ অবস্থার তাগিদেই বিশেষ বিশেষ যজ্ঞানুষ্ঠান বিহিত হ'ত ; ঘটনাপ্রবাহ যখন প্রতিকূল, দেবকাহিনী তখন বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহাকালের সূচনালগ্নে প্রত্যাবর্তন ক'রে সমাজে নূতনভাবে শুদ্ধতার প্রবর্তন শুরু করে এবং নূতন সৃষ্টির সূত্রপাত ঘটায়। প্রখ্যাত গবেষক মির্চ্যা এলিয়াদের মতে, প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজজীবনের সংস্কার সম্ভব নয় ; উৎসে প্রত্যাবর্তন ক'রেই শুধুমাত্র জীবনকে নূতনভাবে সৃষ্টি করা যায়।

কোনো কোনো দেবকাহিনীতে প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতির যৌক্তিকতা প্রমাণের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। যেমন সরল বিবৃতির মাধ্যমে যজ্ঞনির্বাহী পুরোহিতদের দক্ষিণারূপে স্বর্ণদানের গুরুত্বকে শতপথ ও জৈমিনীয় উপণিষদ্ ব্রাহ্মণে স্পষ্ট করা হয়েছে। শতপথে প্রাপ্ত বাক্ ও সোমসংক্রান্ত প্রত্নকথাটিও আকর্ষণীয়। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে স্পষ্টতই জাতিভেদ প্রথা সমাজে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত, কারণ এখানে দেবতাদের মধ্যেও জাতিভেদের প্রতিকল্প সন্ধান আমরা লক্ষ্য করি। জৈমিনীয় উপনিষদ্ ব্রাহ্মণে বিশ্বেদেবাঃকে বৈশ্য বলা হয়েছে। নিষাদদের পঞ্চম জাতিরূপে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে ঐ ব্রাহ্মণেই দেবলোকে তার সমর্থন খোঁজা হয়েছে। আবার শতপথে সোমকে ক্ষত্র, অন্যান্য ওষধিকে বৈশ্য বা দুগ্ধকে ক্ষত্র ও মদ্যকে বৈশ্যরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তখনকার সমাজে চিকিৎসকদের যে অবজ্ঞা করা হ'ত, তা অশ্বীদের সোমপানে অধিকার নিষেধ সংক্রান্ত শতপথ ব্রাহ্মণের বিভিন্ন কাহিনীতে প্রতিফলিত হয়েছে। সোমপানে সব দেবতার অবিসংবাদিত অধিকার, চিকিৎসক ব'লে অশ্বীদের তার থেকে বঞ্চিত করার কাহিনীতে চিকিৎসকদের সম্বন্ধে সমাজের মনোভাব প্রতিফলিত।

তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থান বেশ কয়েকটি কাহিনীতে অভিব্যক্ত। বিশেষত, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটিতে (৩ : ২৩) পুরুষের বহুবিবাহ প্রথার যৌক্তিকতা প্রদর্শন প্রসঙ্গে নারীর বহুবিবাহ রীতির নিন্দা করা হয়েছে।

বিভিন্ন ঋতুর মধ্যে স্পষ্ট ভেদরেখা নির্ণয় প্রসঙ্গে গোপথ ব্রাহ্মণের উত্তরভাগে দৃষ্টান্তরূপে বলা হয়েছে যে, দেবতারা একে অপরের বাড়িতে বাস করেন না। সম্ভবত, এতে সমাজের সেই পর্যায় আভাসিত হয়েছে যখন সংযুক্ত পিতৃতান্ত্রিক 'কুল' বা বৃহৎ পরিবারগুলি ভেঙে যাচ্ছিল। ঐ ব্রাহ্মণের পূর্বভাগে বেদাভ্যাসরত ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষাদানের সমর্থনে একটি প্রত্নকথা কথিত হয়েছে। একই গ্রন্থে নৃত্যগীত থেকে ব্রাহ্মণকে নিবৃত্ত করার ইচ্ছা প্রকাশিত হওয়ার মধ্যে সে বিষয়ে সামাজিক রক্ষণশীল মনোভাবকে লক্ষ্য করা যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি কাহিনীতে যৌতুক প্রথা প্রতীকীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

কিছু কিছু দেবকাহিনীতে বিভিন্ন নৈসর্গিক পরিবর্তন ব্যাখ্যাত হয়েছে। সেই সঙ্গে লক্ষণীয় যে, ব্রাহ্মণসাহিত্যে দেবীদের তুলনামূলকভাবে নূতন আবির্ভাব ঘটেছে ;

তবে, তাঁরা এখনো নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিত্ব অর্জন করেন নি, এখনো শুধুই প্রখ্যাত দেবতাদের স্ত্রী ব'লেই পরিচিত। তাঁদের অবস্থান মোটামুটিভাবে পরস্পরের মধ্যে পরিবর্তনযোগ্য, এবং মাতা পৃথিবীর মধ্যে তাঁদের সমন্বয় লাভের প্রবণতা চোখে পড়ে।

এই কাহিনীগুলি বিশ্লেষণ করলে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়। একই কাহিনীর নানা বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন ব্রাহ্মণে, কখনো বা একই ব্রাহ্মণের বিভিন্ন অংশে পাওয়া যায়। তাই জল অগ্নির মাতা ও অগ্নি তার গর্ভ রূপে কথিত হয়েছেন। বস্তুত দেবকাহিনীগুলির প্রকৃত রূপ অপেক্ষা সেগুলির প্রসঙ্গ ও পশ্চাৎপট অনেকসময় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেকটি কাহিনীই কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে যথাযথ ব'লে বিবেচিত হয়। তবে যে যুক্তিতে উপযুক্ত প্রসঙ্গের সঙ্গে প্রত্নকথার সম্পর্ক নির্ণীত হয়, তাতে আসলে কোনো যুক্তিই নেই। যে জনগোষ্ঠী অল্পকাল পূর্বে কৃষি ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছে, তার সর্বাধিক উদ্বেগের কারণ ছিল নিয়মিত খাদ্য সরবরাহের আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি। বহু কাহিনীর সূচনায় প্রজাপতি খাদ্য অন্বেষণ করছেন, এমন কথা আছে। উদ্বিগ্ন প্রজাপতি শেষপর্যন্ত কোনো নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানকে ধ্যানের মধ্যে দর্শন করেন ও সেই অনুষ্ঠানের সাহায্যে খাদ্যলাভ করেন। ফলত, এই অনুষ্ঠানই পরবর্তী কালে খাদ্য সরবরাহের প্রতিশ্রুতিলাভের জন্যে জনগোষ্ঠীর নিকট একটি নির্দিষ্ট যজ্ঞের প্রতিকল্প হয়ে ওঠে। আমরা যদি তৎকালীন বহুধাবিপন্ন জীবনের নানা আতঙ্ক, আশঙ্কা, নিরাপত্তার অভাববোধের নানাবিধ কারণের কথা বিবেচনা করি, তাহলে তাদের এই নিরন্তর উদ্বেগ যুক্তিযুক্ত ব'লেই মনে হয় ; যেহেতু মৃত্যু মানবজাতির একমাত্র চিরন্তন অপরাজিত শত্রু, তাই এসব কাহিনীর দ্বারা মৃত্যুকে পৌরাণিক কল্পনার স্তরে জয় ক'রে মানুষ নিজের জীবনের আশাকে পুনরুজ্জীবিত করত এবং নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জীবনের ওপর বিশ্বাসকে নূতনভাবে সৃষ্টি করত।

সর্বাধিক প্রচলিত দেবকাহিনী হ'ল দেবাসুর যুদ্ধ ; একটি বিশেষ অর্থে তা ব্রাহ্মণসাহিত্যের সব দেবকাহিনীর কেন্দ্রস্থলে থেকে সব মৌলিক প্রকরণকে আমাদের নিকট উপস্থাপিত করেছে। এই প্রকরণে পৃথক সাহিত্যবর্গ রূপে ব্রাহ্মণের বিশিষ্ট চরিত্রও প্রতিফলিত। প্রাসঙ্গিক অনুপুঙ্খগুলি বাদ দিলে প্রত্নকথার মৌল কাঠামোকে এভাবে বিবৃত করা যায় : (ক) কোনো কিছু পালিয়ে যায়, হারিয়ে যায়, ভেঙে যায় বা কোনো ব্যক্তি বা প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব অনুভূত হয় ; (খ) দেবগণ প্রাচীনতর অনুষ্ঠান পালনের চেষ্টা করেন ; (গ) সেসব ব্যর্থ হয় ; (ঘ) দেবগণ প্রজাপতির নিকট ধাবিত হন ; (ঙ) প্রজাপতি একটি নূতন যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান বা তার ক্ষুদ্র কোনো অনুপুঙ্খের নির্দেশ দিয়ে সেটিকে পালন করার জন্যে দেবতাদের আদেশ

করেন ; (চ) দেবতারা এই নতুন যজ্ঞানুষ্ঠান করেন এবং (ছ) কাঙ্খিত ফল লাভ করেন। সাধারণত এর দ্বারাই ঘটে দানবশক্তির পরাজয়। এধরনের দেবকাহিনীর প্রকৃত উদ্দেশ্য হ'ল নূতন কোনো যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানের প্রবর্তন, তাই অন্যান্য প্রাচীনতর পদ্ধতির ব্যর্থতার অজুহাত আবিস্কৃত হয়। শেষ পর্যন্ত নূতন কোনো অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত শক্তির উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়, যার দ্বারা অতীতে দেবতাদের ইষ্টসিদ্ধি হয়েছিল ব'লেই ভবিষ্যতে যার কার্যকরী ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত হয়।

অবেস্তায় কল্যাণপ্রসূ দেবশক্তিকে 'অসুর' এবং দানবদের 'দএব' ব'লে চিহ্নিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, দএব ও অসুরদের (আহুর মাজ্‌দা স্বয়ং যাদের প্রধান) মধ্যে কঠিন সংগ্রাম হয়েছিল [যশ্‌ট্‌ ১৪ : ৫৫]। দএবদের কোনো ধর্মীয় অভিজ্ঞতা নেই বলে তারা অসত্য অনুসরণকারীরূপে নিন্দিত। অজ্ঞতাবশত দএবগণ পবিত্র অগ্নিতে ভুল ইন্ধন প্রয়োগ ক'রে সম্পূর্ণ ভুল ভাবে অনুষ্ঠান সমাধা করত। বৈদিক প্রত্নপুরাণে ব্রাহ্মণ সাহিত্যে অসুরদের প্রতি অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা যায়। ব্রাহ্মণ সাহিত্যের প্রত্নকথাগুলির মধ্যে দেবাসুরের যুদ্ধই প্রধান—তবে অবেস্তায় যারা দএব, ব্রাহ্মণে তারাই অসুর ব'লে পরিগণিত (অর্থাৎ অবেস্তার অসুর বিপবীতমুখী প্রতিক্রিয়ায় বৈদিক সাহিত্যে দেবতায় পরিণত হয়েছে)। স্পষ্টতই প্রাগার্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আর্যদের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ দেবকাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছে ; কেননা প্রাগার্যদের বংশে ঐতিহাসিক সংগ্রামগুলিতে জয়লাভ করার কয়েক শতাব্দী পরে ব্রাহ্মণ সাহিত্য রচিত হয়েছিল। তখন এই সংগ্রামকে অন্য নৈতিক স্তরে উত্তোরণ করিয়ে ভাল ও মন্দ, সত্য ও অসত্যের সংগ্রামরূপে চিহ্নিত করা কঠিন ছিল না। জয়ীপক্ষ সর্বদাই কল্যাণের প্রতিভূ এবং পরাজিত পক্ষ অনিবার্যভাবে অমঙ্গলের প্রতিনিধিরূপে চিত্রিত হয়ে থাকে, তাই আর্যরা দেবতায় ও প্রাগার্যরা অসুরে পরিণত হ'ল। আরো কিছুকাল পরে এই সংগ্রামকে যখন নৈতিক তাৎপর্যে মণ্ডিত করা হ'ল, তখন এটা হয়ে উঠল সত্য ও অসত্যের দ্বন্দ্ব। এই দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম সুব্যক্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় শতপথ ব্রাহ্মণে (৯ : ৫ : ১৩-১৬)।

কখনো কখনো একটি প্রাচীন প্রত্নপৌরাণিক বৈপরীত্যমূলক তুলনা দেখতে পাই আলোকশক্তির প্রতিভূ ও বিজয়ী আর্যদের সুদূর প্রতিকল্প আদিত্যবর্গের দেবগোষ্ঠী এবং প্রাচীন অগ্নি উপাসক পুরোহিত অঙ্গিরাদের মধ্যে। অগ্নির সঙ্গে রাত্রির স্বাভাবিক সম্পর্ক এবং অঙ্গিরার সঙ্গে জাদুশক্তির সম্বন্ধ। লঘু ঐতিহ্যের সঙ্গে বৃহৎ ঐতিহ্যের সম্পর্ক যেহেতু প্রতিষ্ঠিত তাই লোকায়ত ধর্মের সঙ্গে তার নিবিড় সংযোগই সম্ভবত ঐ বৈপরীত্যের ভিত্তি রচনা করেছে। দেবতা ও দানবের মতো আদিত্য এবং অঙ্গিরা—উভয়েই প্রজাপতির সন্তান ; হয়তো বা সৌরদেব ও পাতালের অধিষ্ঠাতা দেবতার দ্বান্দ্বিক অবস্থানই তাদের বৈপরীত্যের মূলে।

শতপথের এ.টি প্রত্নকথা অনুযায়ী বাক্ দানবনিধনের শক্তি অর্জন করে একটি যজ্ঞে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন ; সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে ক্রমশ মনুর পত্নীতে ও তাবপর যজ্ঞীয় উপকরণগুলিতে বাক্ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ভিন্ন স্তরে বাক্ যে অমঙ্গলজনকশক্তি ধ্বংস করতে করতে অবশেষে যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছিলেন তা লক্ষণীয়। বাকের মাধ্যমে শাব্দিক অভিব্যক্তির গৌরবায়ণের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞানুষ্ঠানের অর্থবোধের জন্যে জ্ঞানের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হতে থাকে। বার বার বলা হয়েছে যে, যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রকৃত সুফল সম্পূর্ণত সেই ব্যক্তি লাভ করেন যিনি যজ্ঞের ক্রিয়াকাণ্ডের তাৎপর্য সম্যক অবগত আছেন। বিভিন্ন ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানের প্রশংসা, যজ্ঞীয় গীতির যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ত-বর্ধমান আনুষ্ঠানিক অনুপুঙ্খগুলির বিশুদ্ধ প্রয়োগ—এই সমস্তকেই একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করতে হবে। স্পষ্টতই এর পশ্চাতে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক পরিস্থিতি আছে। এই পরিস্থিতি হ'ল নিষ্ফল যজ্ঞানুষ্ঠানের অতিপ্রয়োগের বিষম প্রতিক্রিয়া, তার সংশোধনের জন্যে অস্থায়ী প্রচেষ্টা এবং যজ্ঞধর্মেরই আয়ুষ্কাল দীর্ঘায়িত করার শেষ প্রচেষ্টা। কিন্তু এটা আবার ব্রাহ্মণসাহিত্যের অন্তিম অংশের চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য। উচ্চারিত শব্দে নতুন গৌরব যুক্ত হওয়ায় বহু প্রত্নকথায় বাক্-এর প্রধান ভূমিকা স্পষ্ট। তবে সংহিতায় বাক্-এর সর্বশক্তিমান্ অস্তিত্ব ব্রাহ্মণে বজায় থাকে নি ; শতপথের একটি দেবকাহিনীতে বাক্ ও মনের দ্বন্দ্বে বাক্-এর পরাজয় এবং প্রজাপতির প্রতি অভিশাপ বর্ণিত হয়েছে। ব্রাহ্মণে যজ্ঞানুষ্ঠাণের গুরুত্ব যেহেতু সর্বাত্মক, যজ্ঞভাবনা ও যজ্ঞকর্মের প্রেরয়িতা মনের নিকট বাক্ তাই নিষ্প্রভ ও কার্যত অধীন হয়ে পড়েছে।

ব্রাহ্মণ সাহিত্য দীর্ঘকাল ধ'রে অর্থাৎ সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ৯০০ থেকে ৫০০ বা ৪০০ পর্যন্ত রচিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণসাহিত্যে যজ্ঞানুষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান জটিলতা ও বিস্তার এবং অনুষ্ঠান ও দেবতাদের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রতিফলিত হয়েছে ; তবে সৃষ্টিশীল পর্যায়ের শেষদিকে এই সাহিত্যে নিশ্চিতভাবে দেখা যাচ্ছে দেবকাহিনীগুলি ক্রমে প্রত্নপুরাণে লোকায়ত হয়ে উঠছে এবং ধীরে ধীরে একটি একেশ্বরবাদী প্রবণতাও পরিস্ফুট হচ্ছে। এমনকি অদ্বৈতবাদী ভাবনার সূত্রপাতও তখনই লক্ষ্য করা যায়। কিছু কিছু অংশে আমরা স্রষ্টা, রক্ষাকর্তা ও বিনাশকারী রূপে ত্রয়ী দেবতা অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের উত্থানের সূচনা লক্ষ্য করি। তাঁরা কিছুকাল পর্যন্ত কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করলেও সকলের ওপরে প্রজাপতি সেই ভাবমূর্তি বিরাজ করেছে যা মূলত ব্রাহ্মণযুগেরই সৃষ্টি। আমরা আর বৃহস্পতি, ব্রহ্মা, পুরুষ বা ব্রহ্মণস্পতির কথা তত বেশি শুনতে পাই না, যত শুনি প্রজাপতির কথা, কেননা প্রজাপতিই এখন উদীয়মান ও বর্ধমান দেবতা। তিনি স্রষ্টা ও রক্ষাকর্তারূপে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করেন এবং তাঁর উপাসকদের জন্যে শান্তি, প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির নিশ্চিত আশ্বাস দেন। এই সময়েই

দেবতাদের সংখ্যা কমানোর জন্যে একটি সচেতন প্রয়াসের সূচনা হয় এবং গণদেবতাগুলির মধ্যে এই সংক্ষেপীকরণের চেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়। প্রজাপতিই এখন আমাদের সকল মনোযোগ আকর্ষণ করেন, কেননা এই যুগেই কৃষিকার্য, বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং বিবিধ কারুশিল্পের আবিষ্কার ও বিস্তার ঘটে। সম্ভবত এই সময়েই ক্ষুদ্র কুটীরশিল্পগুলি সংগঠিত হয়ে সঙ্ঘ নির্মাণ করে, অন্যদিকে আর্যদের রাজ্য ক্রমশ বিস্তার লাভ করার ফলে পর্বত ও অরণ্যবাসী প্রাগার্য জনগোষ্ঠীগুলি তাদের অধীন হয়। সে সময়ে তাই শস্যভূমিতে, পশুশালায় ও গৃহে প্রাচুর্য, নূতনতর প্রজন্ম ও উর্বরতার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছিল। বর্ধিত উৎপাদন যেহেতু আবশ্যক ছিল, উর্বরতা ও বৃদ্ধির অধিষ্ঠাতারূপে কোনো উপযুক্ত দেবতার সৃষ্টি তাই অনিবার্য হয়ে উঠল ; তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ধর্মচর্যা অর্থাৎ যজ্ঞের সঙ্গে অভিন্ন ও একাত্ম হয়েই প্রজাপতি দেবকুলে গৌরবের উচ্চশিখরে আরোহন করলেন। বস্তুত, ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে বারবার প্রজাপতি ও বিষ্ণুকে যজ্ঞের সঙ্গে একাত্মীভূত ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে ; তবে, মহিমান্বিত অবস্থানে উপনীত হতে বিষ্ণুর আরও কয়েক শতাব্দী লেগে গিয়েছিল। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণের কয়েকটি দেবকাহিনীতে আভাসিত হয়েছে যে, খাদ্যের ব্যবস্থাপনা করেই প্রজাপতি তাঁর গৌরবজনক আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। পূর্বোক্ত যুগের প্রধান দেবতা ইন্দ্র এখন নানা কাহিনীতে প্রজাপতির কৃপাপ্রার্থী— এই তথ্যটি এযুগে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ব্রাহ্মণ সাহিত্যে আলোচিত যজ্ঞানুষ্ঠান যেহেতু মূলগতভাবে দেবকাহিনী ও ঐন্দ্রজালিক অতীন্দ্রিয়বাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাই একমাত্র নির্দিষ্ট প্রসঙ্গেই তার বিশ্লেষণ সম্ভব ; কেননা পৃথক অনুষ্ঠানের নিজস্ব কোনো তাৎপর্য নেই। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের অনুপুঙ্খগুলি সতর্কভাবে ব্যাখ্যা করলেই আমরা এই মন্তব্যের যথার্থতা অনুধাবন করতে পারব।

ইন্দ্রজাল বা জাদু

সারা পৃথিবীর সব প্রাচীন ধর্মেই ইন্দ্রজালের বিপুল ভূমিকা ছিল। ভারতবর্ষেও তাই ছিল। ধর্মচর্যার কোনো অংশকে ইন্দ্রজালরূপে পৃথক করে নেওয়ার প্রবণতা স্পষ্টতই অযৌক্তিক, কেননা দেবকাহিনী ও যজ্ঞানুষ্ঠানের সম্পর্ক নিতান্তই ছদ্ম-যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি বিশেষ অর্থে সমস্ত অনুষ্ঠানই মূলত ইন্দ্রজাল-নির্ভর ; যজ্ঞে আচরণীয় ক্রিয়াকাণ্ড মূলত ও আদিতে স্বতন্ত্রই ছিল, কেবলমাত্র কোনো ভঙ্গুর ও অর্ধবিস্মৃত যোগসূত্র তাদের দেবকাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তোলে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে কল্যাণপ্রসূ ইন্দ্রজালের সঙ্গে অভিচার বা নেতিবাচক ও ক্ষতিকারক ইন্দ্রজাল খোলাখুলিভাবেই বর্ণিত হয়েছে। বহু আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার অনুপুঙ্খকে অবচেতনভাবে

ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে মণ্ডিত করা হয়েছে। যজ্ঞাগ্নির অন্যতম মৌলিক বৃত্তি হ'ল দানব, ভূতপ্রেত ও পিশাচ জাতীয় অন্ধকারের অপশক্তিগুলির বিতাড়ন। যজ্ঞের কিছু কিছু উপাদানও ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন ব'লে বিবেচিত হ'তে ; বিশেষ স্তোত্র অনুষ্ঠানের ব্যবহৃত হ'ত। তবে, কোনো অনুষ্ঠান প্রচলিত যজ্ঞের ক্রমের বিপরীতক্রমে প্রযুক্ত হলে তা শত্রুকে ধ্বংস করে, এই ছিল সাধারণ বিশ্বাস। সমগ্র জনগোষ্ঠী যেসব ভাবী অমঙ্গল চিহ্ন বা সংস্কারে বিশ্বাসী ছিল, গূঢ় আনুষ্ঠানিক শক্তিতে অন্বিত হয়ে সেসব ব্রাহ্মণ সাহিত্যের অঙ্গীভূত ; অনুপুঙ্খের ব্যাখ্যায় এই প্রবণতা স্পষ্ট। ঐতরেয়, শতপথ ও তৈত্তিরীয়ে এর বেশ কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অক্ষরের ঐন্দ্রজালিক শক্তি সম্পর্কে বিশ্বাসও ব্রাহ্মণ সাহিত্যে বহুক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। অপেক্ষাকৃত বিলম্বে আবিষ্কৃত সৌত্রামণী যাগ যেহেতু বহু জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ফল, তাই তাতে বিচিত্র ধরনের লোকায়ত ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাস অভিব্যক্তি হয়েছে, যেমন শতপথে (১৩ : ৯ : ৩) কথিত হয়েছে যে, সৌত্রামণীতে নেকড়েবাঘ, বাঘ ও সিংহের লোম সুরায় নিক্ষিপ্ত হয় · সেইসঙ্গে মিশ্রিত হয় নেকড়ে বাঘের মূত্র (ওজঃ বা বীরত্বের জন্য), বাঘের অস্ত্র (জুতি বা গতির জন্যে), সিংহের রক্ত (মৃত্যুর জন্যে)। আর্যরা যে অঞ্চলে থেকে এসেছিলেন সেখানে বাঘের বসতি ছিল না ; তাঁরা পরিক্রমার পথে মধ্যপ্রাচ্যে কিংবা ভারতবর্ষে উপনীত হয়ে বাঘের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, সৌত্রামণী যাগটি আদিতে অসুরদের কাছে ছিল, পরে তা দেবতাদের কাছে উপস্থিত হয়। বলাই বাহুল্য, প্রাগার্য জাতিদেরই 'অসুর' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

সৌত্রামণী যাগের দক্ষিণারূপে নিম্নোক্ত দ্রব্যগুলি নির্দেশিত হয়েছে : নতুন বস্ত্র, কাজল, পায়ের মলম, পুরাতন·যব, পুরাতন আসন ও বালিশ। এখানে স্পষ্টতই আমরা সাধারণ জনতার মধ্যে প্রচলিত—সম্ভবত, অসুর বা প্রাগার্য জাতির ব্যবহার্য বিভিন্ন উপাদানের দেখা পাচ্ছি, কেননা কেবলমাত্র এখানেই পুরাতন দ্রব্য দীর্ঘায়ুকে সুনিশ্চিত করে এমন বিশ্বাসের কথা পাই। অন্যত্র কোথাও যজ্ঞ দক্ষিণারূপে পুরাতন দ্রব্য প্রদত্ত হয়নি। সম্ভবত প্রাগার্য উপাদানই 'পুরাতন' রূপে তখন গণ্য হ'তে পারত।

মারুতহোমের সপ্তম আহুতি, শতরুদ্রীয় হোম, অগ্ন্যাধান, প্রবর্গ্য যাগ প্রভৃতির বিভিন্ন অনুপুঙ্খে ইন্দ্রজালের বহু বিচিত্র লোকায়ত বিশ্বাস অভিব্যক্ত হয়েছে। ঐ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী প্রেতাবিষ্ট মানুষই উন্মত্তার শিকার এবং কেবলমাত্র উপযুক্ত ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার মাধ্যমেই এর নিরাময় সম্ভব। শত্রুকে পর্যুদস্ত করার প্রয়োজনে ইন্দ্রজাল বারবার প্রযুক্ত হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণে যজ্ঞাগ্নি সম্পর্কিত বক্তব্যে (১১ : ৫ : ৩, ৮-১২) ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা ব্যক্ত হয়েছে ; এতে বোঝা যাচ্ছে,

সমাজ ক্রমশ ভাবী অমঙ্গল গণনা ও ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণের বিধিবদ্ধ পদ্ধতি নির্মাণের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। শেষ পর্যায়ের সামবেদীয় ব্রাহ্মণগুলি বিশেষত ষড়বিংশ ও সামবিধান, গার্হস্থ্য ও গোষ্ঠীজীবনের যাবতীয় সম্ভাব্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ; এ অংশগুলি ভবিষ্যদ্বাণী, ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা ও দুর্ঘটনার ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ। কখনো কখনো কুসংস্কারপূর্ণ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও দেখা দিয়েছে, যেমন শতপথে রয়েছে : 'একজন নারী, একজন শূদ্র, একটি কুকুর ও একটি কালো পাখি—এ সমস্তই মিথ্যা, এদের দেখা উচিত নয়, যাতে সমৃদ্ধি ও অমঙ্গল, আলো ও অন্ধকার, সত্য ও অসত্য পরস্পর মিশ্রিত হতে না পারে।' (১৪ : ১ : ১ : ৩১)। এই তালিকায় নারী ও শূদ্রের অন্তর্ভুক্তি তাদের সামাজিক অবস্থানের নির্মম সত্যই উদ্ঘাটিত করেছে।

দেবসঙ্ঘ

ব্রাহ্মণ সাহিত্যের দেবসংঘ সংহিতা থেকে ভিন্ন। কয়েকজন প্রাচীনতর দেবতা যেমন উষা, ভগ, অর্যমা, মার্তণ্ড, দক্ষ, দ্যৌঃ, পর্জন্য, বায়ুবাতাঃ এখানে সম্পূর্ণই অদৃশ্য হয়ে গেছেন। দ্বিতীয়ত, ইন্দ্র, মিত্র, ব্রহ্মা, মরুতঃ, রুদ্রাসঃ—ইত্যাদির মতো কয়েকজন প্রধান প্রাচীনতর দেবতার মহিমা খর্ব হয়ে গেছে। তৃতীয়ত, রুদ্র, বিষ্ণু, বৃহস্পতি ও ঋভুদের মতো প্রাচীনতর গৌণ দেবতারা ক্রমশ মহিমা ও তাৎপর্যের দিক দিকে উন্নততর অবস্থানে পৌঁছেছেন। চতুর্থত, কয়েকজন নতুন দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে যাদের মধ্যে প্রজাপতি প্রধান ; এছাড়া রয়েছেন 'মীঢুষী' ও 'জয়ন্তে'র মতো অর্বাচীন দেবতা এবং কয়েকজন গৌণ অর্ধদেবতা।

দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের অন্তর্গত মিত্রবিন্দেষ্টিতে কয়েজন দেবতার জন্যে কিছু কিছু হব্য নির্দিষ্ট হয়েছে, যেমন—অগ্নিকে অন্ন, সোমকে রাজ্য ও বরুণকে সাম্রাজ্য, মিত্রকে যোদ্ধার বীরত্ব, ইন্দ্রকে ওজস্বিতা, বৃহস্পতিকে ব্রাহ্মণ্য গৌরব, সবিতাকে রাষ্ট্র বা প্রশাসন, পূষাকে ভাগ্য, সরস্বতীকে পুষ্টি এবং ত্বষ্টাকে রূপ ও আকৃতি। ব্রাহ্মণসাহিত্যের সর্বত্র এসব শব্দই আলোচ্য দেবতাদের নির্দিষ্ট বিশেষণে পরিণত হয়েছে ; ব্রাহ্মণসাহিত্যের সর্বপ্রথম অভিব্যক্তি লাভ করার পূর্বে এগুলি সম্ভবত সামূহিক অবচেতনে উপস্থিত ছিল। ব্রাহ্মণ্য প্রত্নপুরাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে, আদর্শ চরিত্ররূপে দেবতাদের চিত্রিত করার কোনো প্রয়াসই এখানে দেখা যায় না। বহু রচনা প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রের পাপের তালিকা প্রণয়ন করেছে, যেমন তাণ্ড্য মহা ব্রাহ্মণে (১৩ : ৬ : ৯) রয়েছে, 'দীর্ঘজিহ্বী' নামে দানবীকে শক্তিদ্বারা পরাভূত করতে অসমর্থ হয়ে ইন্দ্র কুৎস সুমিত্রের সাহায্যে দানবীকে তাঁর প্রতি কামনাসক্ত করে তুললেন ; তারপর দু'জনে মিলে কুৎস সুমিত্রকে বধ করলেন। এছাড়া শালাবৃকদের কাছে যোগী সম্প্রদায়ভুক্ত 'যতি'দের সমর্পণ বিষয়ে যে প্রাচীন প্রত্নকথাটি ইন্দ্র সম্পর্কে

প্রচলিত ছিল, তা' আবার এখানে নতুনভাবে বিবৃত হয়েছে। অবশ্য ইন্দ্র এখানে 'যতি'দের প্রতি বর্বরোচিত নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করলেন। 'বৈখানস' নামে প্রাগার্য সম্প্রদায়টি ইন্দ্রের প্রীতিভাজন ছিল। সম্ভবত আক্রমণকারী আর্যদের প্রতি 'যতি'রা বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করতেন, আর বৈখানসদের মনোভাব ছিল তাদের প্রতি অনুকূল ; সেইসঙ্গে তাদের জীবনযাত্রা ধরনের মধ্যেও হয়তো বা ভিন্নতা ছিল।

ব্রাহ্মণ সাহিত্যে ইন্দ্রের বহু ক্রটিবিচ্যুতি আছে। এখানে তাঁয় সমস্ত ক্ষমতার একমাত্র উৎস প্রজাপতি। তবে পূর্বতন পর্যায়ের বীরত্বজনিত গৌরব যে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয় নি, তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। ইন্দ্র তাঁর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে তপস্যায় নিরত হয়েছেন। ব্রাহ্মণে এরূপ প্রচুর উল্লেখ থাকায় অনুমান করা যায় যে, এতে প্রকৃতপক্ষে বিজয়ী আর্যদের অপরাধীসুলভ মানসিকতা প্রতিফলিত হয়েছে, যেহেতু প্রাগার্যদের সঙ্গে বহু যুদ্ধে তারা অন্যায় ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিয়েছিল।

সমাজ

পৃথক বর্ণরূপে ব্রাহ্মণের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে এবং তখনই ব্রাহ্মণ রচনার প্রথম পর্যায়ের সূত্রপাত হয়েছে। ঋগ্বেদের একটি মাত্র ঋকে অন্য বর্ণ অপেক্ষা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হয়েছিল ; জাতিভেদপ্রথা, অন্তত প্রাথমিকভাবে, সমাজের নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা লাভ করার পরই শুধু ঐ মন্ত্র রচিত হওয়া সম্ভব। ব্রাহ্মণ সাহিত্যের সর্বত্র ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বকে অবিসংবাদী সামাজিক সত্যরূপে ইঙ্গিতে ধ'রে নেওয়া হয়েছে ; অবশ্য জনসাধারণের প্রতি তাদের দায়িত্বের আভাসও পরিস্ফুট। ব্রাহ্মণ জনসাধারণকে শিক্ষাদান ক'রে তার সামাজিক ঋণ পরিশোধ করে। গোপথ ব্রাহ্মণের পূর্বভাগ (২ : ২) বলা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণের সাতটি অতিরিক্ত গুণ রয়েছে : ব্রাহ্মণ্য মহিমা, খ্যাতি, নিন্দা, ক্রোধ, অহংকার, সৌন্দর্য ও সুঘ্রাণ। অধিকাংশ ব্রাহ্মণের বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে যে কায়িক শ্রম থেকে অব্যাহতি পাওয়ার বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে, তার পরিবর্তে কিছু কিছু বাধ্যবাধকতাও তাকে মেনে নিতে হয়। যেমন : অধ্যয়ন, শিক্ষাদান ও যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে মানসিক শ্রমসাধ্য অধ্যবসায়। তবে, স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সব ব্রাহ্মণই পুরোহিত ছিলেন না ; বর্ণগত বৃত্তিভেদও কিছু শিথিল, এমন কি কতকটা পরিবর্তনসহ ও সঞ্চরণশীল ছিল। কিন্তু, সাধারণভাবে ব্রাহ্মণেরা ছিল অবকাশভোগী শ্রেণী, সমাজে তাদের অবস্থান অপর্যাপ্ত সুবিধাভোগী রূপেই স্বীকৃত ছিল। অবশ্য তখনো পর্যন্ত, অন্ততপক্ষে এ যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে, তাদের জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতাপূর্ণ বলা যায় না। লোহার লাঙলের ফলা, মুদ্রা, বহির্বাণিজ্য যখন প্রবর্তিত হ'ল এবং সেই সঙ্গে কিছু কিছু ক্ষুদ্র অথচ প্রভাবশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল—ঐসব রাজা

ব্যয়সাধ্য যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে সমর্থ হলেন। এমন যজ্ঞানুষ্ঠানগুলি রাজন্য শ্রেণীর সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রতীক হয়ে উঠল ; স্বাভাবিকভাবেই অন্যদিকে পুরোহিত শ্রেণী সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। ধীরে ধীরে এবং সুনিশ্চিতভাবে প্রচুর অর্থ ও সমৃদ্ধি তাঁদের করায়ত্ত হ'ল।

ব্রাহ্মণরা যদিও প্রাথমিকভাবে যজ্ঞের প্রয়োজনেই বর্ষপঞ্জী আবিষ্কার করেছিলেন, তবু একই সঙ্গে তা সামুদ্রিক বাণিজ্যে নিরত ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠেছিল। এই বর্ষপঞ্জী আবিষ্কার ক'রে এবং ইন্দ্রজাল ও যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রতীকায়ন সম্পর্কে উন্নততর জ্ঞানের সাহায্যে ব্রাহ্মণরা ক্রমশ অধ্যাত্মবিদ্যার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন ; তাঁরা বর্ণগতভাবে ক্রমশ অধিকতর সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার ক'রে জনসাধারণের সম্ভ্রমভাজন হয়ে উঠলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাচীনতর জনগোষ্ঠীর মধ্যেও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে প্রতিতুলনীয় সম্প্রদায় ছিল। যেমন কেল্‌টিক ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের 'মায়া' সভ্যতা এবং ইহুদী, মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতার পুরোহিতবর্গ। প্রাচীন ভারতীয় যাজকতন্ত্রের সঙ্গে ব্যাবিলনীয় পুরোহিত সম্প্রদায়ের সম্ভবত অধিকতর সাদৃশ্য ছিল।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে 'ভূদেব'-রূপে অভিহিত ব্রাহ্মণদের যে উজ্জ্বল ভাবমূর্তি ছিল, তা ধীরে ধীরে সুস্থিতিযুক্ত ব্রাহ্মণ্য সমাজের পুরোহিতরা আত্মস্থ ক'রে নিলেন। এই পুরোহিতরা যেহেতু মূলত দেবতাদের এবং সৃষ্টি প্রক্রিয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতেন, তাই ব্রাহ্মণ-তান্ত্রিক পুরোহিতরা ধর্মীয় রাজাদের সম্ভ্রমের আসনটি থেকে অধিকারচ্যুত ক'রে সেই আসনে নিজেরা সমারূঢ় হলেন। পরবর্তী যুগে এই পুরোহিত সম্প্রদায় ক্রমে অলক্ষিতভাবে পুরাতন বৈশিষ্ট্যগুলি হারিয়ে ফেলে নূতনতর বৈশিষ্ট্যে অধিষ্ঠিত হলেন। তাদের সমৃদ্ধি, বিলাসিতার অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় দিনগুলি শেষ হয়ে গেল। এই ঘটনা ঘটার পূর্বে পুরোহিতদের কার্য-পদ্ধতিকে যেভাবে মহিমান্বিত করা হয়েছিল, তার বাস্তব ভিত্তি বহু পূর্বেই লুপ্ত হয়েছিল। যজ্ঞের গুরুত্বকে অতিরঞ্জিত, জটিলতর, বহুগুণ বর্ধিত ও দীর্ঘায়িত ক'রেই তা সম্ভব হয়ে উঠেছিল। আবার এই সমগ্র প্রক্রিয়াই সম্ভব হয়েছিল ভূমির স্বাভাবিক উর্বরতা এবং মোটামুটিভাবে সুনিশ্চিত শস্য উৎপাদনের ফলে, কেননা একমাত্র এধরনের সামাজিক পরিস্থিতিতেই জনসাধারণের একটি ক্ষুদ্র অংশকে উৎপাদনের শ্রম থেকে অব্যাহতি দেওয়া সম্ভব। বিভিন্ন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই বিশ্বাসে ইন্ধন যোগানো হ'ত যে, সৃষ্টির সূচনায় দেবতারা উর্বরতা, শস্য ও প্রাচুর্যকে নিশ্চিত করার প্রয়োজনে যা করেছিলেন, পুরোহিতরা আনুষ্ঠানিকভাবে যজ্ঞক্রিয়ার মাধ্যমে তারই পুনরুত্থান করছেন। এইভাবে উৎপাদনের ক্ষেত্রেও পুরোহিতদের কাল্পনিকভাবে এক তুরীয় আধ্যাত্মিক ভূমিকায় উন্নীত করা হ'ত। দীক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠানে আমরা এর স্পষ্ট প্রমাণ পাচ্ছি।

নির্দিষ্ট পুরোহিতদের সঙ্গে সম্পর্কিত বিবিধ সামাজিক রীতি দেবকাহিনীর মাধ্যমের উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন—অশ্বমেধ যজ্ঞে পুরোহিতরা হস্তী বা অশ্বে আরোহন ক'রে যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হতেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩ : ৮ : ১ : ২) বলা হয়েছে যে, তাঁরা মোট চারটি ভাগে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে প্রবেশ করতেন। যেমন : (১) অধ্বর্যু, ব্রহ্মা, হোতা ও অগ্নীধ্র ; (২) মৈত্রাবরুণ ও প্রতিপ্রস্থতা ; (৩) প্রস্তোতা (তারপরই শুরু হ'ত দীক্ষানুষ্ঠান) এবং (৪) ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, আচ্ছাবাক, নেষ্টা, প্রতিহর্তা, গ্রাবস্তুৎ, পোতা, উন্নেতা ও সুব্রহ্মণ্য।

অবেস্তায় যজ্ঞের প্রাচীনতম ইন্দো-ইরাণীয় রূপের অভিব্যক্তিকে মনে রেখে আমরা সহজেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে, ব্রাহ্মণ সাহিত্যে প্রতিফলিত পুরোহিতদের কার্যাবলীর দ্রুত বৃদ্ধি বস্তুতপক্ষে ভারতীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত ঘটনা। 'মহাব্রত' যজ্ঞে উদ্‌গাতা নামক সমাবেদীয় পুরোহিতটি গান করতেন। ঋগ্বেদীয় হোতা একটি দোলনায় উঠে সেখান থেকেই ঋঙ্‌মন্ত্র আবৃত্তি করতেন। যজুর্বেদীয় অধ্বর্যু একটি শিলাখণ্ডের উপর দণ্ডায়মান হয়ে শপথ গ্রহণ করতেন এবং অন্যান্য পুরোহিতরা বিভিন্ন আসনে উপবিষ্ট থাকতেন। এভাবে পুরোহিতদের বিভিন্ন শ্রেণী ও তাদের কার্যাবলীকে পৃথক রাখা হয়। আদিম জাদুচিকিৎসকদের স্তরের বহু অবশেষ এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় : ইন্দ্রকে যজ্ঞে আহ্বান করার জন্য মধুর ও উচ্চস্বরে আহ্বানের নির্দেশ, মন্ত্রাদির সাহায্যে ব্যাধি-অধিষ্ঠাতা প্রেতদের বিতাড়নের জন্য চীৎকার ইত্যাদির মধ্যে আদিম ধর্মস্তবটি রয়ে গেছে।

বিভিন্ন পুরোহিতদের কর্তব্য সম্পর্কে প্রত্নপৌরাণিক ব্যাখ্যা কয়েকটি বিশেষ যজ্ঞের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক পুরোহিতের কার্যপদ্ধতি বা অবস্থানের যৌক্তিকতা একটি দেবকাহিনীর মাধ্যমে এমনভাবে 'প্রমাণ' ক::: হয়েছ যাতে তাকে অপরিবর্তনীয় ও অপরিহার্য ব'লেই মনে হয়। আবার, এধরনের প্রত্নকথায় প্রযুক্ত আপাত-যুক্তির মৌল বৈশিষ্ট্য থেকে এই সত্য আভাসিত হয়, যে যৌক্তিকতা প্রমাণের ঐ চেষ্টা সমাজের বিলম্বিত যুক্তি অন্বেষণেরই ফল। প্রয়োগ ও প্রদর্শিত কারণের মধ্যবর্তী অন্তর্লীন একটি অসামঞ্জস্য যেহেতু যুক্তির কাঠামোকে দুর্বল করে, তাই যুক্তির অভাব গোপন করার প্রয়োজনে প্রায়ই নিম্নোক্ত ধরনের বিবৃতি দেওয়া হয়েছে : 'দেবতারা রহস্যময় উক্তি ভালবাসেন'! যেমন ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি দীর্ঘায়ত দেবকাহিনীতে (২ : ১ : ২ : ৮) যজ্ঞে প্রদত্ত পশুবলির যৌক্তিকতা প্রদর্শনের চেষ্টা লক্ষ করা যায়।

বহুবার কথিত হয়েছে যে, বিশেষ কোনো একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই দেবতারা স্বর্গে যেতে পেরেছিলেন। এটা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এই পর্যায়ে পার্থিব সুখী জীবনকে মৃত্যুর পরে স্বর্গ পর্যন্ত প্রসারিত করার সচেতন

প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, এখানে এই তথ্যও পাওয়া যাচ্ছে যে, যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্বে দেবতারা পৃথিবীতে বাস করতেন এবং তৃতীয়ত, কোন মানুষকে স্বর্গে পাঠানোও কোনো কোনো যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা সম্ভব, লক্ষণীয়, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১ : ৬ : ৫ : ২৭) কথিত হয়েছে যে, বাজপেয় যাগে যজমান ও তার পত্নী একটি মইয়ে ওঠেন—যার দ্বারা তাঁরা প্রতীকীভাবে স্বর্গে যান। শামান বা জাদুপুরোহিত যে অনুষ্ঠানে 'ভর'-এর মধ্যে স্বর্গে আরোহন করতেন, তার সঙ্গে সমগ্র বাজপেয় যাগটির একটি নিবিড় সাদৃশ্য রয়েছে। আবার একই সঙ্গে আমরা অনুষ্ঠানের সচেতন অধ্যাত্মীকরণও লক্ষ করি। খাদ্যাখাদ্য বিষয়ক বিধি নিষেধের অর্থে 'ব্রত' ব্যাপারটি অগ্নিচয়ন সম্পর্কিত একটি আলোচনায় প্রকাশিত হয়েছে। এতে যে আত্মনিগ্রহের ধারণা রয়েছে, তার মধ্যে আমরা তৎকালীন 'যোগী' সম্প্রদায়ের প্রভাবের নিদর্শন লক্ষ করি। সম্ভবত, এই সম্প্রদায়টি প্রাগার্য বা অবৈদিক আর্য জনগোষ্ঠীগুলির

দক্ষিণাকে ব্রাহ্মণ সাহিত্যে বারে বারে নানাভাবে মহিমান্বিত করা হয়েছে, যাতে যজমানের পক্ষে দক্ষিণা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। যেমন তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে, দক্ষিণা যজমানের অন্ধকার ও অপরিচ্ছন্ন পাপকে বিনষ্ট করে (৩ : ৮ : ৪ : ১৫)। পুরোহিতরা তাদের সমস্ত সময় যজ্ঞবিদ্যাশিক্ষা ও যজ্ঞসাহিত্যে প্রকাশিত তত্ত্ব ও ব্যবহার-বিধি প্রয়োগের জন্যই ব্যয় করতেন ; তাই দক্ষিণাই ছিল জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন। তৎকালীন জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস ছিল যে, যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমেই তারা প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধিপূর্ণ জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত সামগ্রী লাভ করতে পারে। পুরোহিতদের কার্যবলীর জন্য তারা সানন্দেই দক্ষিণা দিতে প্রস্তুত থাকত। কিন্তু অপর্যাপ্ত দানের অনুজ্ঞা যেহেতু তখনই শাস্ত্রে দেখা দিয়েছিল, তাই ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের সর্বত্রই দক্ষিণা সম্বন্ধে ঐ জাতীয় নির্দেশ অভিব্যক্ত হ'ল। বিশেষত, অশ্বমেধ যজ্ঞে দক্ষিণার বৈচিত্র্যে ও প্রাচুর্য এক অকল্পনীয় স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে যে অতীন্দ্রিয়বাদী প্রবণতা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, তা কঠোপণিষদের নচিকেতা উপাখ্যানে প্রবলতর অভিব্যক্তি লাভ করে। 'নচিকেতা অগ্নি' অতীন্দ্রিয় মহিমার সঙ্গে সম্পর্কিত ; এই অগ্নি প্রজ্জ্বলনকারীর জন্য ইহলোক ও পরলোকে সমৃদ্ধি-প্রতিশ্রুতি। তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণে যজ্ঞ-বেদীকে দেবতাদের মিলনভূমিরূপে প্রশংসা করা হয়েছে। বিভিন্ন ব্রাহ্মণে যজ্ঞানুষ্ঠানের ছোট ছোট অংশ ও অনুপুঙ্খ উপকরণ, কার্য, পুরোহিত, মন্ত্র বা অন্যান্য উপাদানকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তাদের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যজ্ঞের বিভিন্ন অনুপুঙ্খ যতই প্রতীকায়িত তাৎপর্য ও গুরুত্ব অর্জন করতে লাগল, ততই বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে বিতর্ক ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠল। তৎকালীন মানসিকতায় দেবকথা ও যজ্ঞানুষ্ঠান

মিলে একত্রে যে যৌগিক সামগ্রিকতাকে পুষ্ট করেছে, তাতে প্রতি অনুপুঙ্খই অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য। দেবতাদের কাছ থেকে যজ্ঞের পলায়ন ও নূতন আঙ্গিকের অনুষ্ঠানের দ্বারা পুনরুদ্ধার বিষয়ে বহু দেবকাহিনী বিভিন্ন ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। এ ধরনের কাহিনীতে যজ্ঞ যে বিরল সম্পদরূপে যত্ন, শ্রদ্ধা ও সতর্কতার দ্বারা অনুষ্ঠেয়—এই ভাবনাই স্পষ্ট। বৈদিক সমাজের ধর্মীয় চেতনা অনুযায়ী যজ্ঞ ছিল সৃজনধর্মী, নূতন প্রজন্মের জন্মদাতা, সৃষ্টিরক্ষাকারী এবং বিশ্বজগতের মধ্যে সাম্য স্থাপনের একমাত্র উপাদান। খাদ্য, গো-সম্পদ, বিজয়, স্বাস্থ্য, আরোগ্য, দীর্ঘায়ু, সন্তান ও স্বর্গলাভ নিশ্চিত ক'রে যজ্ঞই মানুষের সঙ্গে জড়প্রকৃতি, অন্যান্য প্রাণী, মানুষ, দেবতা—এমন কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও সৌষাম্যযুক্ত সম্পর্ক স্থাপন করে। এভাবে বিশ্বজগতের সর্বোত্তম সৃষ্টিশীল ও সংযোগপ্রবণ তত্ত্বরূপে যজ্ঞ মহিমান্বিত হয়েছে। অনিবার্য স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতরাও গৌরবমণ্ডিত হলেন এবং যজ্ঞের নৈতিক ও ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা অসামান্য তাৎপর্যযুক্ত হয়ে উঠলো। প্রখ্যাত গবেষক ই. ও. জেম্‌স্‌ বলেছেন যে, যজ্ঞের লক্ষ্য চতুর্বিধ ঃ উৎসব, শান্তিস্থাপন, সম্মানসূচক অর্ঘ্য নিবেদন ও আত্মদান। তাঁর মতে এসব কটি লক্ষ্যই ব্রাহ্মণ সাহিত্যে অভিব্যক্ত হয়েছে। তবে, চতুর্বিধ লক্ষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণে শান্তিস্থাপন ও সম্মানসূচক অর্ঘ্যনিবেদনের দৃষ্টান্ত সর্বাধিক পাওয়া যায় ; উৎসবের বৈশিষ্ট্য নিতান্ত গৌণ ও অস্পষ্টভাবেই দৃষ্টিগোচর হয়। শুধুমাত্র আরণ্যক অংশযুক্ত যজ্ঞানুষ্ঠানের পুনর্বিশ্লেষণে আমরা বাস্তবনিষ্ঠ যজ্ঞের পশ্চাদবর্তী আধ্যাত্মিক প্রেরণা রূপে আত্মদানের স্পষ্ট ধারণা ব্যক্ত হতে দেখি।

জনসাধারণের ধর্মীয় জীবনে এই সময় নূতন মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটতে শুরু করেছে। উপবাস যে ধর্মীয় তাৎপর্য অর্জন করেছে, তার মূলে রয়েছে আত্মনিগ্রহকেন্দ্রিক যোগিসুলভ মূল্যবোধ। সম্পূর্ণ যজ্ঞানুষ্ঠান বিপুলভাবে প্রতীকায়িত হয়েছে ; আপাতদৃষ্টিতে যা প্রসঙ্গক্রমে উপস্থাপিত বিবৃতি—তাতে এই মানসিকতা আভাসিত যে, আপাত-অর্থহীন যজ্ঞের দৃশ্যমান অংশের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে গভীরতর কোনো সত্য।

ব্রাহ্মণ যুগে উত্তর ভারতের সর্বত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উত্থান ঘটেছিল। প্রত্যেকটি রাজ্যের নিজস্ব শাসক ও রাজসভা ছিল। এদের অধিকাংশই আবার রাজ্যবৃদ্ধি বা আত্মরক্ষার জন্য প্রতিবেশীর সঙ্গে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হতেন। অতএব, রাজস্ব বৃদ্ধির প্রয়োজনে এবং রাজকোষগুলি পূর্ণ করার জন্য ও পৃষ্ঠপোষক রাজাদের সাধারণ সমৃদ্ধি কামনায় রাজপুরোহিতরা নূতন নূতন যজ্ঞ আবিষ্কার করতেন। অর্বাচীন অনুষ্ঠানগুলির অন্যতম 'বসোর্ধারা' হোমকে রাজন্যশ্রেণীর বিশেষ যজ্ঞ রাজসূয় ও রাজপেয়-এর তুলনায় অধিকতর অন্তর্গূঢ় শক্তিসম্পন্ন ব'লে মনে করা হত।

যজ্ঞানুষ্ঠানের দুটি মৌলিক ও প্রধান উপাদান অর্থাৎ দেবকাহিনী (ওম্ শ্রাবয় ও শ্রৌষট্) ও অনুষ্ঠান (যজ, যজামহে) আমরা ব্রাহ্মণে ব্যাখ্যাত ও অভিব্যক্ত হতে দেখি। প্রথমোক্ত উপাদানে রয়েছে আবৃত্তি ও গান এবং শেষোক্ত উপাদানে আনুষ্ঠানিক কর্ম। স্মরণাতীত কাল থেকে এই দুটোই আর্যদের যজ্ঞভাবনার স্নায়ুকেন্দ্র গঠন করেছে। অসংখ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রতীকীভাবে মানুষের জন্মপ্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর উপস্থাপিত হয়েছে (তুলনীয় শতপথ ব্রাহ্মণ ঃ ১০ : ১ : ১ : ৮)। এমন কি, যজ্ঞীয় উপকরণগুলিও জন্মপ্রক্রিয়ার স্পষ্ট ইঙ্গিতসহ জোড়ায়-জোড়ায় উল্লিখিত। বস্তুত, বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়ার সার্বিক প্রতীকী তাৎপর্য কৃষিজীবী ও পশুপালক জনগোষ্ঠীর পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু এ-ধরনের সমাজে উৎপাদনশীল শ্রমের জন্য জনশক্তির প্রয়োজন খুব বেশি। সুস্পষ্ট বাস্তব প্রয়োজন দ্বারাই মূল্যবোধ নিয়ন্ত্রিত হয়, আর এই মূল্যবোধ বিভিন্ন প্রত্নকথা ও আনুষ্ঠানিক অনুপুঙ্খের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

বেদীর নানাবিধ আকৃতি বিভিন্ন বস্তুর প্রতিনিধিত্ব করে, কিংবা প্রতীকী উপস্থাপনা ঘটায়। প্রধান যজ্ঞগুলিতে প্রতীকী আকৃতি, সংখ্যা ইত্যাদি এমনভাবে বিন্যস্ত হয়, যাতে তাদের মধ্যে অতিজাগতিক তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ছন্দগুলির সঙ্গেও বিশেষ তাৎপর্য যুক্ত করা হয়েছে ; বিশেষভাবে সামবেদীয় ব্রাহ্মণসমূহে বহু ছন্দের নিজস্ব নাম আছে। সুর বিলুপ্ত হয়ে গেছে ব'লে এই সামমন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য অনুমান করা সম্ভব নয়। এগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত রহস্যের একটি বৃহৎ অংশই আমরা বিভিন্ন দেবকাহিনী থেকে অনুমান করতে পারি ; এইসব দেবকাহিনীতে এগুলির অতিপ্রাকৃত বা পার্থিব গূঢ় শক্তির কথা বিবৃত হয়েছে। ইষ্টকের সংখ্যা, উপাদান ও নির্মাণপদ্ধতির বহু প্রতীকী তাৎপর্য এখানে বিবৃত হয়েছে। যখন এ-কথা স্মরণ করি যে, আর্যগণ প্রাথমিক স্তরে মৃৎকুটীর-নিবাসী এবং পরবর্তীকালে তাঁরা সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের কাছ থেকে অগ্নিদগ্ধ ইষ্টক তৈরির কৌশল শিখে নিয়েছিলেন,—কেবলমাত্র তখনই দৃঢ়তা, শক্তি ও স্থায়িত্বের প্রতীকরূপে অগ্নিদগ্ধ ইষ্টকের অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইষ্টকের নির্দিষ্ট কিছু স্তরের মাঝখানে যজ্ঞ, জীবন ও সূর্যের প্রতীক রূপে একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণনির্মিত মনুষ্য স্থাপন করা হ'ত, যাতে নিরাপত্তা ও প্রকৃত স্থায়িত্বের সম্ভাবনা বর্ধিত হতে পারে।

অনুষ্ঠানসংক্রান্ত কিছু কিছু নির্দেশ তৎকালীন সমাজ সম্পর্কে কৌতূহলোদ্দীপক কিছু তথ্য প্রতিফলিত হয়েছে ঃ অগ্নিহোত্র হ'ল গার্হপত্য অগ্নিতে প্রতিদিনের অবশ্য করণীয় একটি অনুষ্ঠান। গৃহস্থ যখন বিদেশে যেতেন, মনে মনে তিনি তাঁর গৃহ থেকে দূরবর্তী হতেন না ব'লে মনে মনেই অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানটি করতেন শতপথ [১১ : ৩ : ১]। যেহেতু এই যুগটি ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশের যুগ, তাই গৃহস্থকে হয়তো মাঝে মাঝে বৃত্তিগত প্রয়োজনেই গৃহের বাইরে থাকতে হ'ত ; ফলে

অবশ্যপালনীয় প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানকে তখন বাধ্য হয়েই অভ্যন্তরীণ ক্রিয়ায় পরিণত করা হ'ল, যাতে আচার-পালনে কোনো ছেদ বা ত্রুটি দেখা না দেয়। এই অভ্যন্তরীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যেই আরণ্যক ও উপনিষদে অভিব্যক্ত পরবর্তী সাংস্কৃতিক পর্যায়ে অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের সার্বিক অবমূল্যায়নের স্তরে উপনীত হওয়ার পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ সূচিত হ'ল। যজ্ঞ যখন বাস্তব অনুষ্ঠান ছাড়া মানসিক ক্রিয়াতে বিকল্প লাভ করল, তখন বাস্তব অনুষ্ঠানের অপরিণামিতা স্বভাবতই আর তত দৃঢ় রইল না।

যদিও ব্রাহ্মণসাহিত্য মূলত যজ্ঞনির্ভর, তবু একই সঙ্গে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সম্পর্কেও আমরা এর থেকে কিছু কিছু ধারণা গড়ে নিতে পারি। যজ্ঞে খাদ্য ও পানীয়ের কিছু ভূমিকা রয়েছে ; আবার, অর্থবাদ অংশে ধর্মীয় ভাষ্যমূলক ও প্রতিবাদাত্মক রচনা রয়েছে ব'লে জীবনযাত্রা, খাদ্য, পানীয়, বিনোদন, ব্যাধি, পরিবার, নারীর অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কেও অনেক প্রাসঙ্গিক মন্তব্য খুঁজে পাওয়া যায়। মদ্যপান কিংবা গোমাংস ভক্ষণ যে সমাজে নিষিদ্ধ ছিল না, তার প্রমাণ রয়েছে প্রাচীনতর ব্রাহ্মণগুলিতে। অবশ্য, পরবর্তী ব্রাহ্মণগুলিতে দেখা যায় গোমাংস ভক্ষণ সামাজিক অনুমোদন হারিয়ে ফেলেছে। অনুরূপভাবে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর জন্য মদ্যপান তখন নিষিদ্ধ হতে শুরু করেছে। অনুষ্ঠান সম্পর্কিত একটি সহজ দেবকাহিনীতে (শতপথ ৭ : ৫ : ২ : ২) তৎকালীন খাদ্যপরিস্থিতি প্রতিফলিত ; সম্ভবত. যজ্ঞে অসংখ্য গোহত্যার ফলে গোসম্পদ হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় সমাজে একটা উদ্বেগ সৃষ্টি হচ্ছিল। এই অপচয় পূরণ করার উদ্দেশ্যে নূতন ধরনের কিছু অনুষ্ঠানও পরিকল্পিত হ'ল।

কৃষিব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার পরে নির্দিষ্ট খাদ্য জোগান সম্পর্কে কতকটা নিশ্চয়তা ছিল, কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় অনিশ্চিত প্রাকৃতিক পরিস্থিতির ফলে ফসল কখনো কখনো অনিশ্চিত হয়ে উঠত। প্রায়ই খাদ্যের জন্য প্রার্থনা · ক্ত হয়েছে ; যজ্ঞে অর্জিত সুফলগুলির মধ্যে যজমানের সর্বাধিক অভীষ্ট এই যে, তিনি খাদ্যের ভোক্তা হতে পারেন এবং ক্ষুধায় যেন কখনো তাঁর মৃত্যু না হয়। ক্ষুধা নিবারণের জন্য চেষ্টার শেষ নেই, কেননা ক্ষুধাই মৃত্যু। এই যুগে ক্ষুধা প্রকৃত শত্রুরূপে গণ্য হয়েছে—যেহেতু জনসাধারণ ক্ষুৎপীড়িত হয়েই পরাজয় বরণ করে। খাদ্যে বিষপ্রয়োগের বিরুদ্ধে উচ্চারিত প্রার্থনাও আমরা লক্ষ্য করি। কখনো কখনো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কিংবা পরজন্মে পর্যাপ্ত খাদ্যের প্রতিশ্রুতি সুনিশ্চিত করার জন্যও প্রার্থনা ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং যজ্ঞের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল মৃত্যুরূপী ক্ষুধার নিবারণ। এ-ধরনের প্রার্থনার আত্যন্তিক গম্ভীরতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যদি আমরা যাযাবর পশুপালকদের খাদ্যের জন্য তীব্র ও স্থায়ী উৎকণ্ঠার কথা স্মরণ করি ; কৃষিকার্য শিক্ষা ক'রে খাদ্য সরবরাহ প্রক্রিয়ার উপর অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত নিয়ন্ত্রণ অর্জন করার পূর্বে বহু শতাব্দী ধ'রে তাদের যৌথ অবচেতনে এই উদ্বেগ নিহিত ছিল।

সঙ্গীত ও নৃত্য ছিল ব্রাহ্মণ যুগের প্রধান বিনোদন। বহুবিধ সাঙ্গীতিক উপকরণের উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ বাঁশী, বীণা, ঢোল ও দুন্দুভি। তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণের একটি অংশে (৩৯ : ৫) রয়েছে ঃ 'শিল্প তিন ধরনের—নৃত্য, বাদ্য ও গান'। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে, দু'জন ব্রাহ্মণ অশ্বমেধ যজ্ঞে বীণাবাদন করতেন ও গান গাইতেন। অন্যত্র রয়েছে, ব্রাহ্মণ দিনে এবং ক্ষত্রিয় রাত্রিতে গান করেন ; এভাবেই তাঁরা একত্রে রাজ্য রক্ষা করেন। অথচ, তা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণসাহিত্যের সূচনাপর্ব থেকেই সঙ্গীতের সম্বন্ধে এক দ্বিধান্বিত মনোভাব লক্ষ্য করা যায় ; সমাজে সংগীতজ্ঞদের অবহেলার দৃষ্টিতেই দেখা হ'ত। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের একটি দেবকাহিনী অনুযায়ী (১ : ৩ : ২ : ১৩) 'দেবতারা ব্রহ্ম ও খাদ্য থেকে বর্জনীয় অংশকে পৃথক করেছিলেন, তা-ই যথাক্রমে গাথা নারাশংসী ও সুরায় পরিণত হ'ল। তাই কোনো গায়ক বা মত্ত ব্যক্তির নিকট থেকে জনাসাধারণের দান গ্রহণ করা উচিত নয় ; যদি কেউ গ্রহণ করে, সে শুধু বর্জিত অংশই পায়।' গোপথ ব্রাহ্মণের পূর্বভাগে (২ : ২১) বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণের পক্ষে গান বা নাচে অংশগ্রহণ অনুচিত।

ইতিহাস

ব্রাহ্মণ সাহিত্যই আমাদের নিকট ইতিহাস ও ভূগোলের প্রথম দ্ব্যর্থবিহীন উৎসরূপে পরিগণিত, কেননা সংহিতা খুব কম ক্ষেত্রেই নিঃসংশয় তথ্যের জোগান দিতে পেরেছে। ব্রাহ্মণে আমরা লক্ষ্য করি যে, আর্যরা ক্রমশ দক্ষিণ ও পূর্বদিকে অগ্রসর হচ্ছেন। শতপথ ব্রাহ্মণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে (১ : ৪ : ১ : ১০-১৪) কথিত হয়েছে, 'রাজা বিদেঘ মাধব তাঁর পুরোহিত গোতম রহুগণকে বৈশ্বানর অগ্নি-সহ অগ্রসর হতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাঁরা সরস্বতী নদীর পূর্বতীর থেকে ক্রমাগত ভ্রমণ ক'রে সদানীরা নদীর উত্তর তীরে উপনীত হয়ে থেমে গিয়েছিলেন। প্রাচীনতর পুরোহিতেরা যেহেতু বৈশ্বানর অগ্নি-সহ সদানীরা নদী অতিক্রম করেন নি, তাঁরাও সে-চেষ্টা করলেন না।' এই আখ্যানে প্রকৃতপক্ষে আর্যদের দক্ষিণপূর্ব দিকে বসতি বিস্তারের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে ; ঐ সময় তাঁরা কর্ষণযোগ্য জমির প্রয়োজনে জলাভূমি ও পতিত অঞ্চল এবং অরণ্যভূমিকে অগ্নিসাৎ করছিলেন। বৈশ্বানর অগ্নি একটি যথার্থ প্রতীক ; কৃষিকার্য ও যজ্ঞের প্রয়োজনে বিপুল অঞ্চলকে অগ্নিদগ্ধ করার নিদর্শন এখানে রয়েছে। প্রাগুক্ত আখ্যানে পুরোহিত রাজাদের নিবাসের জন্য কোশল ও বিদেহের পূর্ব সীমান্তকে নির্দেশ করেছিলেন। এই দুটি স্থাননামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুধাবনযোগ্য ; কোশল মানে হ'ল যে স্থানে প্রচুর ঘাস পাওয়া যায়, অর্থাৎ চমৎকার গোচারণভূমি, যেখানে গোসম্পদের জন্য বিপুল খাদ্যের নিশ্চিত জোগান রয়েছে। আবার, বিদেহ মানে হ'ল পাহাড়ের আড়াল নেই

এমন সমভূমি, অর্থাৎ বিহার ও বাংলার গঙ্গাবিধৌত উপত্যকা। শতপথের অন্যত্রও কথিত হয়েছে, দিনানুদিনের ক্রমাগত চেষ্টায় অগ্নিকে দক্ষিণ দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

প্রাগার্যদের উপর আর্যদের চূড়ান্ত জয়লাভ থেকে বৌদ্ধধর্মের উত্থান পর্যন্ত ব্যাপ্ত দীর্ঘ সময়ের ইতিবৃত্ত ব্রাহ্মণ সাহিত্যে প্রতিফলিত। এই চার বা পাঁচ শতাব্দীর মধ্যে আর্যরা পাঞ্জাব থেকে উত্তর-বঙ্গ পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল অধিকার ক'রে নিয়েছিলেন। এই প্রক্রিয়াটি ছিল শ্রমসাধ্য, দীর্ঘায়ত ও নানাবিধ বিপদে আকীর্ণ ; আর্যদের দুঃসাহসী মানসতার প্রকৃত প্রমাণ এতে পাওয়া যাচ্ছে।

ব্রাহ্মণ সাহিত্যের নবীনতম গ্রন্থগুলির অন্যতম শতপথ ব্রাহ্মণ সেই সময়ে রচিত হয়েছিল, যখন লোহার লাঙলের প্রবর্তন ও অন্যান্য কিছু উপাদানের অস্তিত্বের ফলে নানাদিকে বিপুল পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। অগ্নি প্রজ্বলন ক'রে নিবিড় অরণ্য ধ্বংস করাকে সংক্ষিপ্ত চাষের পক্ষে প্রয়োজনীয় পদ্ধতিরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এই কৃষিপদ্ধতিতে বিভিন্ন ফসলের মধ্যে সময়ের ব্যবধান সংক্ষিপ্ততর হওয়াই ছিল কাম্য, কিন্তু সেজন্য উপযুক্ত লাঙল, হলবাহী পশু ও বহুব্যাপ্ত কৃষিব্যবস্থার প্রয়োজন অনিবার্য।

ব্রাহ্মণসাহিত্যে প্রাপ্ত নামগুলি আলোচনা ক'রে এবং ভাষাপ্রয়োগের মধ্যে প্রতিফলিত ভাষাগত বিবর্তন বিশ্লেষণ ক'রে আমরা বুঝতে পারি, কৃষিব্যবস্থা পরিণত পর্যায়ে পৌঁছানোর প্রক্রিয়া কতটা দীর্ঘায়ত হয়েছিল এবং কোন কোন অঞ্চলে আর্যরা বসতি স্থাপন করেছিলেন। পুরাতত্ত্ববিদদের খননকার্যের ফলে যে সমস্ত নিদর্শন এখনো পর্যন্ত পাওয়া গেছে, তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সিন্ধু উপত্যকার সং গা বিকশিত হয়েছিল আধুনিক সিন্ধুপ্রদেশ, পাঞ্জাব, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের কিছু কিছু অঞ্চলে। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও বিহারের অনেকাংশেই প্রকৃতপক্ষে সিন্ধুসভ্যতার বলয়বহির্ভূত ছিল। আর্যরা পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সোজাসুজি যাত্রা করেছিলেন ; তাঁদের এই যাত্রার নিদর্শন রয়েছে ব্রাহ্মণ সাহিত্যে উল্লিখিত স্থাননামগুলিতে। আমরা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে (কাশ্মীর, কাফিরিস্তান, কান্দাহার) গান্ধার, কাম্বোজ, উশীনর ও মদ্র, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ অঞ্চলে কুরু, পাঞ্চাল, চেদি, কাশী, বংস (বা বৎস), কোশল, বিদেহ ও বিদর্ভ ; গুজরাটে শূরসেন, রাজস্থানে সৌরাষ্ট্র, মৎস্য, শল্ব, বৈরাট এবং বিহার-বঙ্গে অঙ্গ ও মগধের উল্লেখ পাচ্ছি। প্রাচীন গ্রিসের নগর-রাষ্ট্রের মতো প্রাথমিক বৈদিক যুগের রাষ্ট্র ছিল ক্ষুদ্রাকৃতি—আধুনিক জেলার ভৌগোলিক পরিধির চেয়ে তা ব্যাপকতর ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র ছিল কৌম উৎসজাত।

সিন্ধু-উপত্যকা সভ্যতার প্রত্যক্ষ প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের বহির্ভূত অঞ্চলগুলিতেও বিভিন্ন কৌম গোষ্ঠীর বসতিতে তাদের নিজস্ব ধরনের প্রশাসন ছিল ; সেখানেই আর্যদের অভিযান হোক না কেন, এই জনগোষ্ঠীগুলি নিশ্চয়ই প্রতিরোধ তৈরি করেছিল এবং আদিম অধিবাসীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে আর্যদের প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। বিন্ধ্য পর্বতমালার সংলগ্ন অঞ্চলে সম্পূর্ণ জনবসতিশূন্য বা অতিসামান্য বসতিযুক্ত যে বিপুল অরণ্যভূমি ছিল, আর্যদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে (সংহিতা সাহিত্যে যার বিবরণ লক্ষ্য করা যায়) কিংবা যুদ্ধের সময়ে আদিম জনগোষ্ঠীগুলি সেখানে নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের জন্য পালিয়ে গিয়েছিল। এদের অনেকেই পরাজয়ের ফলে আর্যদের দাসে (বা 'দস্যু'তে) পরিণত হ'ল, কেউ কেউ বশ্যতা স্বীকার করে নিল, কেউ বা অন্যত্র চলে গেল। আর্যরা অক্লান্তভাবে তাদের জয়লাভের ফলকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য কখনো পূর্বতন অধিবাসীদের পশ্চাদ্ধাবন ক'রে তাড়িয়ে দিল, কখনো পতিত জমি বা অরণ্যভূমি পুড়িয়ে দিল, কখনো বা পরাজিত শত্রুকে আর্যীকরণের মাধ্যমে নিজেদের সাংস্কৃতিক বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিল বা মিশ্র বিবাহের মাধ্যমে আরো বহু কৌমকে ক্রমশ আত্মসাৎ ক'রে নিল। ব্রাহ্মণসাহিত্যে এই প্রক্রিয়াই লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই প্রক্রিয়া থাকার সময়েই যে-সমস্ত নূতন সামাজিক বৈশিষ্ট্য প্রকট হ'ল, তাদের মধ্যে রয়েছে ঃ বহু রাজতন্ত্রের উত্থান, স্পষ্টভাবে সীমানির্দিষ্ট (পর্বত, নদী বা অরণ্যের মতো প্রাকৃতিক সীমারেখা দ্বারা নিরূপিত) ভূমিভাগ, ক্ষুদ্র রাজ্য ও প্রাচীরবেষ্টিত নগরের পত্তন, ব্যবসায়ীদের সঙ্ঘ ও বহুবিধ বৃত্তিজীবী গোষ্ঠীর আবির্ভাব, নূতন নূতন প্রশাসনিক কার্যপদ্ধতির সূত্রপাত, অন্তত প্রথম পর্যায়ের তিন বা চার শতাব্দী-ব্যাপী সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, কৃষিকার্য, পশুপালন আর অন্তর্দেশীয় ও বহির্দেশীয় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার।

পাণিনি উত্তরাপথ, তক্ষশীলা ও তাম্রলিপ্তের মধ্যে বাণিজ্য-পথ এবং নানা মূল্যমানের ও নানা অভিধাযুক্ত মুদ্রার উল্লেখ করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, সে-সময় বিপুল বাণিজ্যের অস্তিত্ব ছিল এবং সমাজে সম্পদের বৃদ্ধি ঘটেছিল। পরবর্তী যুগে অর্থনীতি জটিলতর হয়ে ওঠে, ক্রমবর্ধমান নগরায়ণের প্রবণতা থেকে একদিকে ধনবান বণিক ও ব্যবসায়ী এবং অন্যদিকে দরিদ্র প্রাথমিক উৎপাদকের মধ্যে দেখা দেয় ব্যাপকতর ব্যবধান। বৃত্তিগুলির মধ্যে সঞ্চরণশীলতা ক্রমাগত অধিকতর সংকুচিত হওয়ার ফলে সমাজের নিম্নস্তরে অতি দরিদ্র শ্রেণীর উদ্ভব হয়, যাদের জীবন-নির্বাহের জন্য কোনো পথই উন্মুক্ত ছিল না। অন্যভাবে বলা যায়, নিঃস্ব ও জীবিকাহীন শ্রেণীর শোষিত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। এসমস্ত কিছুরই অনিবার্য পরিণতিরূপে উপসিং-গঠনে বিপুল পরিবর্তন সূচিত হ'ল এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তিতে, ভাবনার জগতে দেখা গেল নূতন তরঙ্গাভিঘাত।

ব্রাহ্মণ সাহিত্য থেকে সংগৃহীত ঐতিহাসিক তথ্য দ্বিবিধ ঃ প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য। যুদ্ধে প্রাগার্যরা নিশ্চিতভাবে পরাভূত হওয়ার পর সমাজে সাধারণভাবে যে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ তৈরি হ'ল, তা ব্রাহ্মণ সাহিত্যের নানা মন্তব্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কৌষীতকি ব্রাহ্মণের দুটি দেবকাহিনীতে (১২ : ১, ২) জলপথ-প্রহরারত অনার্যদের বিরুদ্ধে আর্যদের যুদ্ধের পর্যায় এবং নূতন ধরনের লৌহনির্মিত অস্ত্র (বজ্র) প্রয়োগের ফলে ব্রোঞ্জ ব্যবহারকারীদের পরাজয় প্রতিফলিত হয়েছে। বহু ব্রাহ্মণগ্রন্থে, বিশেষত তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে, আমরা প্রায়ই এমন কিছু অনুষ্ঠান নির্দেশিত হতে দেখি, যেগুলির সাহায্যে কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ নিজের জন্য একটি রাজ্য জয় ক'রে নিতে পারে। বিভিন্ন উপাখ্যান, গল্প, লোকশ্রুতি এবং দীর্ঘ যজ্ঞানুষ্ঠানের সময়ে কথিত 'পারিপ্লব' কাহিনীগুলিও ইতিহাসের মূল্যবান উৎস।

'পারিপ্লব' শতপথ ব্রাহ্মণ [১৩ : ৪ : ৩ : ২] শব্দটির অর্থ হ'ল পুনরাবৃত্তিময় ও বৃত্তাকারে আবর্তনশীল লোকশ্রুতি ; এরূপ অভিধার কারণ, যজ্ঞানুষ্ঠানের বছরে প্রতি দশ দিন অন্তর প্রাচীন লোকশ্রুতি বর্ণনা শুরু করা হ'ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শতপথে যে বাক্যে 'পারিপ্লব' শব্দটি পাই, তার ঠিক পরবর্তী বাক্যেই 'পুরাণ' শব্দের ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করি। মানবজাতির প্রত্নপৌরাণিক আদিপিতা মনুর বৃত্তান্ত দিয়ে প্রাচীন লোকশ্রুতির বিবরণ শুরু হয়েছে। বৈদিক সাহিত্য সম্পর্কে শিক্ষাগ্রহণ করার জন্য যে গৃহস্থ একত্র সম্মিলিত হতেন, তাঁরাই ছিলেন শ্রোতা। খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে, প্রকৃতপক্ষে যা বর্ণনা করা হ'ত—তা স্বভাববৈশিষ্ট্যে অবৈদিক লোকশ্রুতি। আদিপিতা মনু থেকে সঞ্জাত ক্রমিক প্রজন্মগুলির বিবরণে যে সমস্ত নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে অনেকগুলিই ব্যাবিলন ও মিশরের ঐতিহাসিক নৃপতিরূপে অনুমিত। এতে প্রমাণ হচ্ছে যে, মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে নৌবাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল ব'লেই এই সব ব্যক্তিদের সঙ্গে এতটা পরিচয় গড়ে উঠেছিল এবং এক-সময়ে তাঁরা আর্যদের পবিত্র লোকশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত হন।

বিলম্বে আগত মহাকাব্যিক ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের উল্লেখ থেকে (যেমন ঃ জনমেজয়, পরীক্ষিৎ, শৌনক, ভীমসেন, শ্রুতসেন, পুরুকুৎস, মরুত্ত, অবিক্ষিত) শতপথ ব্রাহ্মণের নবীনতা প্রমাণিত হয়। লোকশ্রুতির অন্তর্গত বিভিন্ন রাজার বীরত্বকাহিনী সম্ভবত কতকটা অতিরঞ্জিতভাবেই উল্লিখিত হয়েছে। মহাকাব্যিক ও মহাকাব্যোপম নামগুলির (দ্বৈতবন, মৎস্য, ভরত, দুষ্যন্তপুত্র, সুদ্যুম্ন, শকুন্তলা, কাশী, শতানীক, সত্রাজিৎ, সাত্বত, ধৃতরাষ্ট্র) উল্লেখ থেকে বুঝতে পারি, শতপথ ব্রাহ্মণ নবীনতম রচনাসমূহের অন্যতম। পূর্বাঞ্চলকে এখানে (১৩ : ৮ : ২ : ১) অসুর-দেশ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্য এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক তথ্য আধুনিক অর্থেই ইতিহাসপদবাচ্য, অর্থাৎ সেখানে প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

অধিকাংশ গবেষক এক মত যে, মহাভারতের যুদ্ধ যদি সত্যিই ঘটে থাকে, তবে তা খ্রিস্টপূর্ব ৯০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে হয়েছিল। তখন সংহিতা রচনা শেষ পর্যায়ে। ব্রাহ্মণে কথিত হয়েছে যে, দুষ্যন্তপুত্র ভরত গঙ্গা ও যমুনা নদীর তীরে যজ্ঞ করেছিলেন ; একই স্তবকে ইলাপুত্র পুরূরবারও উল্লেখ রয়েছে।

ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ সাহিত্যে বেশ কিছু বংশতালিকা পাওয়া যায়। শতপথ ও বংশ ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রাপ্ত নিদর্শন ছাড়াও অন্যত্র যে সমস্ত তালিকা পাওয়া যায়, সেগুলির সঙ্গে সমসাময়িক বৌদ্ধ নথিপত্রের বিষয়বস্তুর যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন, বিখ্যাত বৌদ্ধ গ্রন্থ মজ্‌ঝিম নিকায়ে আশ্বলায়নকে বিখ্যাত বেদবিশেষজ্ঞ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে, কৌষীতকি উপনিষদে পরিবেশিত তথ্যও এর অনুরূপ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পরীক্ষিৎ-পুত্র জনমেজয় (যাঁকে দেব-দানবের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও সর্বভূ বলা হয়েছে) কর্তৃক সমগ্র পৃথিবী জয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিবৃত হয়েছে। শতপথে (৫ : ১ : ১ : ১২-১৩) বিদেহরাজ জনককে যখন 'সম্রাট' বলা হচ্ছে, সেসময়ে কুরুরাজদের নিছক 'রাজা' বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। [ঐতরেয় ৮ : ১৪ ; পঞ্চবিংশ ১৪ : ১ : ১২]। সম্ভবত, এতে বিদেহের উত্থান ও কুরুর অবনমন সূচিত, কেননা ব্রাহ্মণ সাহিত্যের বিভিন্ন অংশে দেখা যায়, সে-যুগে এ-ধরনের বিশেষণগুলির সুস্পষ্ট ও স্বতন্ত্র তাৎপর্য ছিল। ক্রমশ কুরুরাজ্যের সাংস্কৃতিক গৌরবও বিলীন হয়ে যাচ্ছিল, যেহেতু এই যুগের শেষ পর্যায়ে কুরুরাজ্যের পণ্ডিতরা বিদ্যার্থীরূপে বিদেহ রাজসভায় উপস্থিত হচ্ছিলেন, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্যই শুধু তাঁরা আকাঙ্ক্ষী নন, অনুষ্ঠান পরিচালন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণও তাঁদের কাম্য। সম্ভবত, এই যুগেই সূচিত হয় পার্থিব জীবনের লাঞ্ছনা, শস্যহানি ও তজ্জনিত দুর্ভিক্ষ [ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ১ : ১০ : ১৭]। হয়ত বা সেই একদা-সমৃদ্ধ জনতা তখন গোষ্ঠীবদ্ধভাবে পূর্বদিকে অভিপ্রয়াণ করে ; পরবর্তী যুগের সাহিত্যে সেই বিপুল ও তাৎপর্যপূণ আত্মিক আলোড়নের নিদর্শন পাওয়া যায়, যার ফলস্বরূপ নূতন নূতন ভাবধারার উন্মেষ ঘটে। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে কম্বোজ বৈদিক বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করার ফলে ক্রমশ বৈদিকযুগের অন্তিম পর্বে সম্মুখ-সারিতে উপস্থিত হয়।

বংশ-ব্রাহ্মণ কম্বোজের ঔপমন্যব নামে জনৈক শিক্ষকের কথা উল্লেখ করেছে। কম্বোজ কৌমবদ্ধ আর্য জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিল না ; সেখানকার ভাষাও যে ভিন্ন ছিল, তা পরবর্তী বৌদ্ধ ও মহাকাব্যিক সাহিত্যের নিদর্শন থেকে বোঝা যায়। উত্তরকুরু অঞ্চলটি বিশেষ সম্মান ভোগ করত ; এটিকে সাধারণ ভূগোলের পরিধির বাইরে রাখা হয়েছে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৮ : ২৯)। আমরা যে সমস্ত রাজার উল্লেখ পাই, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল বিদর্ভের ভীম, গান্ধারের নগ্নজিৎ, সৃঞ্জয় কৌমের সোমক (যাঁর অন্য নাম সোমক সহদেব সৃঞ্জয়), ইন্দ্রের ব্যবহার্য অনুলেপে অভিষিক্ত

দুমূখ পাঞ্চাল, বভ্রু, দৈবাবৃধ ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের বিভিন্ন স্তবকে প্রাপ্ত স্থাননামগুলি যেমন বাস্তব রাজ্য, নগর বা রাজধানীর পরিচয় বহন করছে, তেমনি ঐ নামগুলির মধ্যেও ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের পরিচয় নিহিত। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে প্রসঙ্গক্রমে ইতিহাস পরিবেশিত হয়েছে ; সুতরাং, পুরাণের মতে তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ইতিহাসকে বিকৃত করেনি—ব্রাহ্মণের সাক্ষ্য তাই ইতিহাসের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য।

সাত্বতরা দক্ষিণাঞ্চলের একটি জনগোষ্ঠীর উল্লেখ করেছে, যাদের সঙ্গে ভোজ নামে পরিচিত ঐতিহাসিক জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক ছিল ; এই উভয় হ'ল যদুকৌমের দুটি শাখা। ব্রাহ্মণের বিভিন্ন অংশে প্রায়ই বিভিন্ন সামাজিক কৌমের পরিচয় ও তাদের সংঘর্ষ প্রতিফলিত হয়েছে ঃ সৃঞ্জয় গোষ্ঠী থেকে জনৈক কুরুরাজার পলায়ণ বা গোষ্ঠীগত বিষয়ে কুরুদের দ্বারা দাল্‌ভ্যকে ভর্ৎসনা ইত্যাদি। কৌমগুলি ক্রমশ ক্ষুদ্রতর হয়ে আসছিল এবং যখন মধ্যম ও বৃহৎ রাজ্যগুলি সেইসব বিজয়ী গোষ্ঠীপতিদের দ্বারা অধিকৃত হ'ল তখন সমগ্র উত্তর ও মধ্য ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে গেল।

রাজ-পদবী

দেবতাদের অধিরাজরূপে ইন্দ্রের নির্বাচনকে প্রতীকীভাবে উপস্থাপিত ক'রে রাজপদবীর উৎস নির্দেশ করা হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণের একটি প্রাসঙ্গিক দেবকাহিনী (৩ : ৪ : ২ : ২) বিশ্লেষণ ক'রে আমাদের মনে হয়, তার সঙ্গে রাজপদ বিষয়ক 'সামাজিক চুক্তি' তত্ত্বের সাদৃশ্য খুব বেশি ; প্রাথমিক স্তরে একটি প্রয়োজন অনুভূত হয়, পরে তার থেকে উদ্ভূত সমস্যাকে পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে সমাধান করা হয়। রাজপদবী তখন অভিষেকের মধ্য দিয়ে নির্ধারিত। অভিষেকে সমবেত জনসাধারণের উদ্দেশ রাজপুরোহিত যে ঘোষণা করে ঃ "হে জনগণ, ইনিই তোমাদের রাজা ; ব্রাহ্মণের রাজা সোম ; এর দ্বারা রাজা সোমের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠেন"। তবে, রাজকীয় ক্ষমতা অভিষেকের ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিব্যক্ত হয় না, পার্থ নামক অনুষ্ঠান ক'রেই রাজা ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন [তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১ : ৭ : ৪৪]। বহু স্তবকে ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতের কাছে রাজার সম্পূর্ণ অধীনতা প্রকাশিত। এও বলা হয়েছে যে, রাজপদবী লাভ ক'রেই রাজন্য নর-ঋষভ (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ১৯ : ১৭ : ৭) বা নরশার্দূল (তৈত্তিরীয় ২ : ৭ : ১৫ : ৪৯) হয়ে ওঠেন।

অভিষেকের সময়ে রাজা দুটি দীক্ষা-অনুষ্ঠান পালন করেন—উগ্রা ও বশিণী ; প্রথম অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য তাঁর প্রজাদের নিয়ন্ত্রণ, আর দ্বিতীয়টি শত্রুদের পর্যুদস্ত

করার জন্য পরিকল্পিত। রাজপদের আদি তাৎপর্যগুলির অন্যতম ছিল রাজস্ব-সংগ্রহ ; কয়েকটি দেবকাহিনীতে এই সত্য আভাসিত হয়েছে। রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন ক'রে 'রাজা' পদবী লাভ করা যেত, অন্যদিকে বাজপেয় যজ্ঞের মাধ্যমে পাওয়া যেত উচ্চতর পদ 'সম্রাট' । রাজার অন্যান্য উপাধি যেমন ঃ ক্ষত্রপতি, বলপতি, ব্রহ্মপতি, রাষ্ট্রপতি, বিট্‌পতি—তাঁর গৌণ বিশেষণ। অন্যান্য বিশেষণগুলি, যেমন, পরমেষ্ঠী, মহারাজ, সার্বভৌম ও একরাজ—এগুলি 'ইন্দ্রের' মহান অভিষেক অনুষ্ঠানের অনুসরণে অর্জন করতে হ'ত [ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৮ : ১৫]। এই ঐতরেয় ব্রাহ্মণেই আমরা আঞ্চলিক নামসহ নির্দিষ্ট কিছু উপাধি ব্যবহৃত হতে দেখি। পূর্বাঞ্চলের রাজা 'সম্রাট' রূপে অভিষিক্ত হতেন, দক্ষিণাঞ্চলের রাজারা 'ভোজ' (অন্যান্যদের নিয়ন্ত্রণকারী সার্বভৌম শাসক) নামে অভিহিত, উত্তরাঞ্চলের রাজা 'বিরাট্‌' (যুক্তরাষ্ট্রীয় অরাজতন্ত্রী রাজ্যগুলির অধিপতি), পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের রাজারা 'স্বরাট্‌' (স্বাধীন নৃপতি) এবং সুস্থিতিশীল মধ্যাঞ্চল অর্থাৎ কুরু, পাঞ্চাল, বশা ও উশীনর-এর শাসকরা 'রাজা' রূপে চিহ্নিত হতেন। আবার 'পুনরাভিষেক' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজা আধিপত্যসূচক সমস্ত উপাধি লাভ করতে পারতেন।

কখনো কখনো রাজন্য, ক্ষত্রিয়, এমন কি বৈশ্যদের মধ্য থেকেও অমাত্য ও পুরোহিত মণ্ডলী রাজাকে নির্বাচন করতেন। তত্ত্বগতভাবে কোনো অনার্যও রাজা হতে পারতেন ; রাজা জনশ্রুতি তার দৃষ্টান্ত। ছান্দোগ্য উপনিষদে পৌত্রায়ণ শূদ্র ব'লে উল্লিখিত ; তেমনি মরুত্ত আবিক্ষিত ছিলেন আয়োগব জাতির অন্তর্গত অর্থাৎ শূদ্র পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তান। রাজপদবী প্রধানত নির্বাচনের মাধ্যমে নির্ণীত হ'ত ব'লেই মনে হয়, তবে বংশগত রাজপদ সংক্রান্ত কিছু কিছু নিদর্শনও পাওয়া যায়। এই নির্বাচন কখনো কখনো সমগ্র জনগোষ্ঠী বা তাদের প্রতিনিধিমণ্ডলী এবং কখনো অমাত্যদের দ্বারা সম্পাদিত হ'ত ; আবার শতপথে এমন একটি রাজ্যের কথা বলা হয়েছে, যেখানে একই রাজবংশ দশ প্রজন্ম ধ'রে শাসন করেছে।

আদর্শ রাজা তাঁর প্রজাদের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করেন [তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২ : ৭ : ১৬ : ৫৮]। আবার, কোথাও কোথাও রাজাকে নরখাদক হত্যাকারী রূপেও বর্ণনা করা হয়েছে। [শতপথ ১৩ : ২ : ৯ : ৬ ; কৌষীতকি ২ : ৬]। অনিয়ন্ত্রিত রাজকীয় ক্ষমতার দ্বারা স্বেচ্ছাচারিতার বিপদ তখনো ছিল, এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে তাকে সংযত করার চেষ্টা সত্ত্বেও তা নিঃসন্দেহে প্রায়ই আত্মপ্রকাশ করত। প্রথমত, এই নিয়ন্ত্রণশক্তি ব্রাহ্মণদের হাতেই ছিল, অভিষেকের মুহূর্ত থেকে তাঁরা রাজার কাছে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করতেন। মন্ত্রী ও পরামর্শদাতারা একক ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে রাজার স্বেচ্ছাচারিতাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। অন্যদিকে গ্রামণী, সমাহর্তা ও সন্নিধাতার মতো কার্যনির্বাহকরাও প্রয়োগিক ক্ষেত্রে

সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা ভোগ করতেন। রাজাও সাধারণত তাঁদের ওপরে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করতেন না। রাজ্যের বিচক্ষণ ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত সভা এবং সমিতি, জন, মহাজন বা পরিষদ (বৌদ্ধ সাহিত্যে পরিস্‌স বা পরিসা) জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে পরিণত করার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ব'লে গণ্য হ'ত ; এমন কি, কোনো রাজার শাসনপদ্ধতিতে স্বৈরতন্ত্রের লক্ষণ দেখা গেলে সে সম্পর্কে কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারত। শতপথে (১২ : '৯ : ৩ : ১) তাই দেখা যায় যে, সৃঞ্জয় বা কিছু কিছু অবাঞ্ছিত রাজাদের নির্বাসনদণ্ড দিয়েছিলেন ঃ যেমন—রেবোত্তরস, পতিব, চক্র, স্থপতি ও দুষ্টরীষ্টু পৌংসায়ন। তেমনি ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও সিংহাসনচ্যুত রাজাদের নাম পাওয়া যায় [৮ : ১০]।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি জনকের উক্তিকে [৪ : ৪ : ২৩] এবং বিশেষত শতপথ ব্রাহ্মণের একটি তাৎপর্যপূর্ণ অংশে [১৩ : ৭ : ১ : ১৫] আমরা এমন একটি যুগের পরিচয় পাই যখন কৌম বা গোষ্ঠীর সম্পত্তিরূপে ভূমির প্রচলিত তাৎপর্য দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে এবং রাজা ও সম্রাটরা ভাবতে শুরু করেছেন যে, তাঁরা ইচ্ছামতো ভূমি দান করতে পারেন। কিন্তু সাধারণ জনমানসে এই ভূমিদান প্রথার বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠছিল। এর পরবর্তী পর্যায়েই ভূমি ইচ্ছামতো ক্রয়বিক্রয়যোগ্য ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হ'ল। নূতন নূতন কৃষিযোগ্য জমি প্রস্তুতির এবং পতিত ও গোষ্ঠীভোগ্য জমিতে পশুচারণের সাধারণ অধিকারগুলি ক্রমাগত বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। অন্যদিকে, সাধারণ কৌম অধিকারগুলির পরিবর্তে কোনো নির্দিষ্ট জমিতে প্রত্যেকটি কৃষক পরিবারের পৃথকভাবে স্থায়ী অধিকারের সূচনা তৎকালীন ঘটনাপ্রবাহের অন্যতম একটি সূত্র। এর ফলে কৃষিব্যবস্থার কাঠামো ক্রমশ এমনভাবে পরিবর্তিত হ'ল যে, ভূমির ব্যক্তিগত সত্ত্বাধিকারই সমাজের বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠল। সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের অন্য বড় কারণ হ'ল ক্রমশ অর্থবিনিময় ব্যবস্থা গ্রামগুলিতে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছিল। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে নগরায়ণের প্রবণতার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রয়েছে। এ-সময়ই কৌম সমাজগুলি ভেঙে যাচ্ছিল ; কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে বা গ্রামে বসতি স্থাপনকারী গোষ্ঠী বা কৌমের অন্তর্ভুক্ত জনসাধারণ স্বাভাবিকভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠত, যদি কখনো কোনো বহিরাগত ব্যক্তি এসে তাদের মধ্যে বাস করতে চাইত,—কেননা এতে একই গোত্রসম্ভূত স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি ও গোষ্ঠী-জীবনের ছন্দ বিপর্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

অর্থনীতি

ব্রাহ্মণসাহিত্যে বিভিন্ন প্রসঙ্গক্রমে সমকালীন ব্যবসা, বাণিজ্য ও বহুবিধ প্রচলিত বৃত্তি সম্পর্কিত তথ্য আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছে। আমরা জানি যে, এই

যুগে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে সামুদ্রিক বাণিজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়,—আর্যদের বিজয়লাভের পরে যা সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এমন কি, দেশের মধ্যেও কুটীরশিল্প ও প্রধান শিল্প বহুগুণ বর্ধিত হওয়ার ফলে সামাজিক শ্রেণী ও জাতিভেদ আরো পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বিনিময়ভিত্তিক অর্থনীতির স্থান ধীরে ধীরে মুদ্রা ও স্বর্ণভিত্তিক ক্রয়বিক্রয় রীতি দ্বারা অধিগৃহীত হ'ল। যজ্ঞের প্রয়োজনে সোম ক্রয়ের একটি প্রতীক আমাদের জন্য সংরক্ষিত হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণে বাণিজ্যকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিদানের প্রমাণ পাওয়া যায় [৩ : ৩ : ৩ : ১]।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে পুরুষমেধের বর্ণনায় তৎকালীন বৃত্তিগুলির সর্বোত্তম ও সবচেয়ে মূল্যবান নিদর্শন সংরক্ষিত রয়েছে। প্রায় ৯৩ রকম পেশার উল্লেখ থেকে শ্রমের অসংখ্য উপবিভাগের বিস্ময়কর নিদর্শন এ-অংশে বিবৃত রয়েছে। এমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতির চিত্র এখানে পরিস্ফুট, যা তৎকালে সংখ্যা, আকৃতি ও সমৃদ্ধির দিক দিয়ে ক্রমবর্ধমান নগরগুলির প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ ছিল। সেই সঙ্গে সে যুগের বাস্তব জীবনের মান এবং ঐশ্বর্যশালী বণিকশ্রেণী ও সমাজের অন্যান্য সমৃদ্ধ অংশের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন সম্পর্কেও আমরা একটি ধারণা পাই।

সমগ্র ব্রাহ্মণ সাহিত্যে আমরা 'জ্ঞান' অর্জনের পক্ষে সহায়ক একটি মানসিক পরিমণ্ডল দেখতে পাই। প্রকৃতপক্ষে এই যুগেই জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র কর্ষিত ও উন্মোচিত হচ্ছিল। অন্তিম পর্যায়ের সামবেদীয় ব্রাহ্মণগুলিতে বহুবিধ রোগ উল্লিখিত ; কিন্তু অথর্ববেদ পাঠ করে আমাদের মনে এই ধারণা জন্মায় যে, ঐন্দ্রজালিক আবেশ-সৃষ্টির পাশাপাশি রোগনিয়ন্ত্রণের জন্য প্রকৃত বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টাও চলছিল। ওষধি, মণিরত্ন ইত্যাদি সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক নির্দেশ সম্ভবত স্বভাব বৈশিষ্ট্যে সম্পূর্ণত ঐন্দ্রজালিক ছিল না। গোপথ ব্রাহ্মণ উত্তরভাগের একটি বাক্যে [১ : ১৯] রোগ পর্যবেক্ষণ চমৎকার প্রমাণ রয়েছে ঃ 'বিভিন্ন ঋতুর সন্ধিকালেই রোগ বর্ধিত হয়।' বিজ্ঞানরূপে চিকিৎশাস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় শেষ পর্যায়ের সমাবেদীয় ব্রাহ্মণগুলিতে।

আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনেই জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক জ্ঞানের উৎপত্তি হয়েছিল ; মিশর ও ব্যাবিলনের প্রভাবে এদেশে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার শুরু। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় তারকাপুঞ্জের বিবরণ দিয়েছে। অধ্যয়নের বিষয়বস্তুরূপে তালিকায় দেওয়া হয়েছে চার বেদ, ইতিহাস, লোকশ্রুতি, বীরদের এবং ঋষিদের সম্বন্ধে উপাখ্যান, ব্যাকরণ ও দর্শন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ এই তালিকার সঙ্গে সর্পবিদ্যা ও উপদেবতা বিষয়ক জ্ঞানকে যুক্ত করেছে। এছাড়া, আমরা দেখেছি যে, স্থাপত্য, ধাতুবিদ্যা ও জ্যামিতিরও তৎকালীন ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

ব্রাহ্মণযুগের বস্তুগত সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল ধাতুবিদ্যায় লক্ষণীয় অগ্রগতি। সিন্ধু সভ্যতার ভগ্নাবশেষ থেকে বহু ধাতুর ব্যবহার প্রমাণিত হয়। আক্রমণকারী আর্যরা ধাতু গলানো ও ধাতুশিল্পের বিজ্ঞান পরাজিত জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে শিখেছিল, আর সম্ভবত প্রথম পর্যায়ে তাদের মধ্য থেকে কারুশিল্পীদের নিয়োগ করেছিল ; এরাই ছিল শূদ্র, দাস ও দস্যু যারা উত্তরাধিকারক্রমে আর্যদের জন্য শিল্প ও কারুশিল্পের একটি ধারা গড়ে তুলল। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখছি [৫ : ৪ : ৪ : ২২] যে, রাজসূয় যজ্ঞে উদগাতা একটি সোনার হাতা পেতেন, হোতা পেতেন সোনার থালা আর দুজন অধ্বর্যু দুটি সোনার আয়না পেতেন। গোপনব্রাহ্মণ পূর্বভাগ [১ : ২৪-২৬] থেকে সোনা, রূপা, লোহা, সীসা ও টিন-এর কাজ সম্পর্কে ইঙ্গিত এবং ধাতুগুলিতে রাসায়ণিক ও তাপ-প্রয়োগের উল্লেখ পাচ্ছি। জৈমিনীয় উপনিষদ্-ব্রাহ্মণ [৪ : ৩ : ৩] থেকে ধাতু গলানো ও খাদ মেশানোর পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হই। আবার তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের একটি কাহিনীতে ৩ : ১১ : ৮ : ৪৮-৪৯ সোনা গলানোর অসুবিধাগুলির উল্লেখ আছে। কাঠ ও চামড়ার কাজ সম্পর্কেও বেশ কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় [যেমন তৈত্তিরীয় ১ : ৪ : ১ : ৩, ৪]।

ব্রাহ্মণসাহিত্যে সেই সমাজের চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে যেটি মাংসাশী যাযাবর পশুপালক স্তর থেকে নব্য বিশ্ববীক্ষাসম্পন্ন, নিরামিষাশী কৃষিজীবী স্তরে বিবর্তিত হচ্ছিল—কেননা মেসোপোটামিয়ার মতোই নদীবিধৌত ব্রহ্মর্ষিদেশে ও উপত্যকাতেও কৃষিকাজ ছিল খুবই সহজ ও লাভজনক বৃত্তি। অপেক্ষাকৃত সংখ্যাগুরু জনতা স্বভাবত খাদ্যশস্য উৎপাদনে অধিক মনোযোগী ছিল কেননা এখানকার মধ্যম-শ্রেণীর জমিতেও ফসল ভাল হ'ত। জনগোষ্ঠী এভাবে ইন্দো-ইউরোপীয় পর্যায়ের পশুচারী অশ্বারোহী অবস্থা থেকে নব্য গোপালক শস্যভোজী পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছিল। সমগ্র ব্রাহ্ম · -সাহিত্যে গোষ্ঠীর সম্পত্তির গুরুত্বপূর্ণ উপাদানরূপে ধেনু স্বীকৃত হয়েছে ; এছাড়া বাহন, কৃষির সহায় ও ভারবাহী পশু কিংবা খাদ্য ও যজ্ঞীয় বলি—বিশেষত দক্ষিণারূপে—ঘোড়া, ষাঁড়, বলদ, হাতি, গাধা, খচ্চর, গোরু, বাছুর, ভেড়া ও ছাগলের উল্লেখ লক্ষ্য করি। জনসাধারণ পর্যাপ্ত গোসম্পদ কামনা করত ; এই লক্ষ্য মনে রেখেই তারা যজ্ঞের আয়োজন করত—আর, সমাজ বিপুল গোসম্পদের অধিকারীকেই ধনবান ব'লে গণ্য করত।

পরিবার

পিতৃতান্ত্রিক বা পরিবর্ধিত পরিবার ছিল সমাজে ন্যূনতম একক, সেইসঙ্গে নিবিড় সুখবোধের ভিত্তিভূমিও। জন্মদাতা রূপে পিতা সম্মানিত হতেন ; পুত্রসন্তান যে চির-আকাঙ্খিত, তার অনেক প্রমাণ ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে রয়েছে। পুত্রকে সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার

উপায়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি উক্তি বেশ কৌতূহলপ্রদ ঃ 'পত্নী সহগামিনী, কন্যা দুঃখ, পুত্র উর্ধ্বতম স্বর্গের আলো, পুত্রহীন ব্যক্তি কখনো স্বর্গলাভ করে না' [৬ : ৩ : ৭ : ১৩]। বিবাহকে প্রশংসা করা হয়েছে, কারণ অবিবাহিত পুরুষ যজ্ঞ করতে কিংবা সন্তানের জন্ম দিতে পারে না। পত্নী স্বামীর আদেশের অনুগতা হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় যে, যজ্ঞমূলক ধর্মে গৃহস্থ যজমানের প্রয়োজন রয়েছে ; তাই, এই ধর্মে এমন মূল্যবোধের ন্যায্যতা প্রমাণ এমন কি জনগণের উপর তা আরোপ করাও বাধ্যতামূলক যা সন্ন্যাসকে নিন্দা করে, বিবাহিত জীবনকে শুধু উৎসাহই দেয় না, আবশ্যিকও ক'রে তোলে। জীবনের চারটি পর্যায়ের মধ্যে অন্তত দুটি—প্রথম ও শেষ (ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস) ভিক্ষাদানের উপরই নির্ভরশীল ঃ স্পষ্টত এবং একমাত্র গৃহস্থের পক্ষেই ভিক্ষা দান সম্ভব। গোপথ ব্রাহ্মণ পূর্বভাগে [২ : ৭] তাই এই বিধি রয়েছে ঃ 'প্রতিদিন ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দান করা গৃহস্থের কর্তব্য, নতুবা তাদের অকল্যাণ নিশ্চিত।' ঐতরেয় ব্রাহ্মণে [৫ : ৫ : ৫ : ৩০৭] বলা হয়েছে ঃ 'সন্ধ্যায় আগত অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়।'

নারী

ব্রাহ্মণ সাহিত্যের বহু অংশে নারীকে স্বামীর অর্ধাংশ বা যজ্ঞের পশ্চাৎঅর্ধ রূপে কিংবা সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধির প্রতীক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এধরনের বেশ কিছু প্রশংসামূলক মন্তব্য থাকা সত্ত্বেও তা সমগ্র চিত্রের একটি দিক মাত্র। অন্য দিকেই লক্ষ করি পুরুষ-প্রাধান্যের জ্বলন্ত ছবি—সামন্ততান্ত্রিক সমাজের যা অপরিহার্য অঙ্গ। নারীকে সাধারণভাবে পুরুষের তুলনায় হেয় ব'লে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। যজ্ঞের সঙ্গে যজমান-পত্নীর সম্বন্ধ প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল ; কেননা, যজ্ঞে সক্রিয় কোনো ভূমিকা না থাকলেও যজমান পত্নীর উপস্থিতি ছিল অপরিহার্য। সম্ভবত, প্রাথমিক স্তরে মাঝে মাঝেই যজমানের পত্নী অনার্য বংশোদ্ভূত হতেন এবং পরবর্তী স্তরে নারীর উপনয়ন নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল ; এইজন্যে যজ্ঞে তাঁর কোনো সক্রিয় ভূমিকা থাকত না। সমস্ত কৃষিজীবী সমাজের মতো মাতৃত্ব ছিল নারীর গুরুত্বের অপর কারণ। এটা শতপথ ব্রাহ্মণে বিবৃত একটি বিধিতে স্পষ্ট [৫ : ২ : ৩, ১৩] যেখানে অপুত্রক নারীকে (পরিবৃত্তি বা পরিবৃক্তি) ত্যাগের বিধান দেওয়া হয়েছে। নির্ঋতি বা ধ্বংসের কুপ্রভাবগ্রস্ত ব'লে সন্তানহীনা নারীকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পুরুষের বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল এবং শাস্ত্রে তার বৈধতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা রয়েছে যেমন ঃ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ [৩ : ৫ : ৩ : ৪৭]। সমাজে নারীর অবস্থানের শতপথের একটি দেবকাহিনীতে [৪ : ৪ : ২ : ১৩] চমৎকারভাবে প্রতিফলিত

হয়েছে। সেখানে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে ঃ 'নারীর নিজ শরীরের উপর বা কোনো উত্তরাধিকারে কোনো রকম অধিকার-ই নেই।' আবার, বরুণপ্রঘাস অনুষ্ঠানে নারীদের প্রতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অবিশ্বাস ও তাচ্ছিল্য অভিব্যক্ত হয়েছে যেমন ঃ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ঃ [১ : ৬ : ৫ : ৩৫ ; শতপথ ঃ ২ : ৫ : ২ : ২০] । বিধবা ইতোমধ্যে করুণার পাত্রী হয়ে উঠেছে, তার প্রমাণ পাচ্ছি তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের একটি প্রার্থনায়— ইন্দ্রানীর মতো যেন অবিধবা হই [৩ : ৭ : ৫ : ৫১]। ঐ গ্রন্থের একটি স্তবকে [২ : ২ : ৩২-৩৩] প্রায় অপ্রত্যাশিতভাবে নর-নারীর প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কে সততাপূর্ণ চিন্তা ব্যক্ত হয়েছে, একই সঙ্গে যা কাব্যমূল্যেও অসামান্য। তৈত্রিরীয়ে অন্যত্র [২ : ৪ : ৪ : ৪২] দাম্পত্য প্রণয়ের দেবতা ভগের প্রতি একটি প্রার্থনা পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে [১০ : ৫ : ২ : ১১, ১২] লক্ষণীয়ভাবে দাম্পত্য প্রেমকে শ্রেষ্ঠ আনন্দ ও স্বর্গপ্রদ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে পুরুষের অনুগতরূপে নারীর ভূমিকা লক্ষণীয় ঃ নারী অপরিহার্য, কারণ গার্হস্থ্য জীবনের প্রয়োজন নির্বাহ করা ছাড়াও সে পুত্রসন্তানের জন্ম দেয়,— বংশ ও সম্পদের অবিচ্ছিন্নতার জন্য যার গুরুত্ব সর্বাধিক। প্রথাগতভাবে যজ্ঞে নারীর নির্বাক ও নিষ্ক্রিয় আনুষ্ঠানিক উপস্থিতি প্রয়োজনীয় ছিল। এই বাইরে নারীকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী অথচ হীনতর প্রাণীরূপে বিবেচনা করা হ'ত, যার অস্তিত্ব সহ্য করতে হলেও একই সঙ্গে কঠিন প্রহরা ও অধীনতার মধ্যে রাখাই ছিল বিধি। ব্রাহ্মণগুলির বক্তব্যের সুর ও সার্বিক প্রবণতা থেকে এটা স্পষ্ট। শতপথে [১৩ : ৪ : ২ : ৮] বলা হয়েছে যে, সমৃদ্ধিশালী পুরুষের চারজন পত্নী, একজন পরিচারিকা ও চারশত দাসী থাকত ঃ সমস্তই ভোগের জন্য। বহু পত্নীর স্বামী হতে পারাকে তখনকার সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রতীক ব'লেই বিবেচনা করত [তদেব ১৩ : ২ : ৬ : ৭]।

জাতিভেদ

যদিও সমগ্র ঋগ্বেদের মধ্যে একটিমাত্র মন্ত্রে চতুর্বর্ণ ও তাদের উৎপত্তি স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে, পরবর্তী যুগের ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি কিন্তু জাতিভেদের উল্লেখে পূর্ণ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিকার ছিল। পাণ্ডিত্য ও অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার জন্য সমাজে ব্রাহ্মণদের স্থান ছিল সর্বোচ্চ। পুরোহিতরা প্রকৃতই সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণী ছিলেন ; অগ্নির সঙ্গে তাঁদের সাদৃশ্য কল্পিত হ'ত। তাৎপর্যপূর্ণ দ্বৈতবোধের ফলে ক্ষত্রিয়কে দুজন দেবতার সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে ; শতপথ ব্রাহ্মণের একটি স্তবকে (২ : ৪ : ৩ : ৬) ক্ষত্রিয় ইন্দ্র ও অগ্নিরূপে বর্ণিত। ক্ষত্রিয়কে যেমন ইন্দ্রের, তেমনি ব্রাহ্মণকে সোমের সমতুল্য করা হয়েছে। আবার তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে

(৩ : ১২ : ৮ : ৪৯-৫০) বলা হয়েছে যে, সামবেদের সঙ্গে ব্রাহ্মণের, যজুর্বেদের সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের এবং ঋগ্বেদের সঙ্গে বৈশ্যের সম্পর্ক্য। অন্যদিকে বসন্ত হ'ল ব্রাহ্মণের, গ্রীষ্ম রাজন্যের এবং শরৎ বৈশ্যের ঋতু। গোপথ ব্রাহ্মণ উত্তরভাগে (২ : ২) মতে জন্মমাত্রই ব্রাহ্মণ পবিত্র গুণাবলীর অধিকারী ; ব্রাহ্মণ্য গৌরব, খ্যাতি, নিদ্রা, ক্রোধ, শম ও দৈব সৌরভ। অন্য কোনো বর্ণের নরহত্যা তেমন পাপ নয়, কিন্তু ব্রাহ্মণকে হত্যা করার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড (শতপথ ব্রাহ্মণ ঃ ১৩ : ৩.৫ : ৩) ; ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাদ্বারা তৃপ্ত করা হ'লে যজ্ঞই তৃপ্ত হয়ে থাকে (তদেব, ৭ : ২ : ২৮)। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণরা 'নরদেব' ব'লে গণ্য।

বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ দুমেজিল-এর মতে ত্রিস্তর বৈদিক সমাজ পুরোহিত, যোদ্ধা ও গো-প্রতিপালকদের মধ্যে বিভক্ত ছিল এবং ইতোমধ্যে তা যাজকতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল। প্রাচীনতর সাহিত্যে আমরা ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত, যোদ্ধা বা রাজন্য (বা ক্ষত্রিয়) এবং শূদ্রের উল্লেখ লক্ষ্য করি, তবে বৈশ্যের উল্লেখ পাই আরো দেরিতে ; সম্ভবত এর কারণ এই যে, আর্যরা প্রাথমিক স্তরে যাযাবর ছিল এবং প্রাগার্যদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমেই তারা কৃষিকার্যে নিরত হয়।

ব্রাহ্মণদের মধ্যে পুরোহিতশ্রেণী ছিল সর্বাধিক সুবিধাভোগী। ক্ষমতা ও অবস্থানের সুদৃঢ় হওয়ার পরে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা কয়েক শতাব্দী ধ'রে নিজেদের প্রভুত্ব অব্যাহত রেখেছিল। সুবিধাভোগী অবস্থানে তাদের উত্থানের সূচনা দেখি ব্রাহ্মণ সাহিত্যে। পুরোহিতের ব্যক্তিত্ব ও সম্পত্তি ঔ অতিপবিত্র বলে বিবেচিত হ'ত ; এর সম্ভাব্য কারণ এই যে, প্রাথমিক স্তরে এই গোষ্ঠী জ্ঞানী ব্যক্তির দ্বারা গঠিত হ'ত ; যাদের কার্যাবলী সমাজের সর্বাধিক কল্যাণ বিধানে সমর্থ। তবে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপরাধী ব্রাহ্মণের শাস্তি বিধানের ব্যবস্থাও রয়েছে। সাধারণভাবে কোনো পুরোহিতকে অপরাধের জন্য গুরুদণ্ড দেওয়া হ'ত না কিংবা তার সম্পত্তিও কোনোভাবেই স্পর্শ করা যেত না। পরবর্তী যুগে বিভিন্ন জাতির মাধ্য পারস্পরিক সঞ্চরণশীলতা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেলেও ব্রাহ্মণের যুগে তা কতকটা বর্তমান ছিল। এরজন্য শতপথ ব্রাহ্মণে [১০ : ৪ : ১ ; ১০] দেখা যায় যে, শ্যাপর্ণ সত্যকামের পুত্রদের মধ্যে কেউ কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয় এবং কেউ বা বৈশ্য হয়েছিল।

সমাজে প্রতিপত্তির দিক দিয়ে ব্রাহ্মণদের পরেই ছিল ক্ষত্রিয়। রাজসভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, ঐশ্বর্যশালী ও মর্যাদাবান ক্ষত্রিয় পরিবারের সদস্যরা উচ্চপদে নিযুক্ত হতেন, এবং এঁরাই 'রাজন্য' পদবীতে ভূষিত হতেন। যোদ্ধা, এবং রাষ্ট্র ও সম্পদের রক্ষকরূপে সমাজে ক্ষত্রিয়দের বিশেষ সম্মানিত আসন নির্দিষ্ট ছিল। ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি যতই সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল এবং ক্রমশ অধিক সংখ্যক বিষয়ে রাজারা ক্ষমতা অর্জন করতে লাগলেন, ততই একটি নূতন পরিস্থিতি ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হয়ে

উঠল , মধ্যযুগীয় ইউরোপে গির্জার সঙ্গে রাষ্ট্রের যেমন সংঘাত দেখা দিয়েছিল, তার সঙ্গে তুলনীয়ভাবে পুরোহিত-জাতি ও যোদ্ধাজাতির মধ্যে একটি ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্বের বাতাবরণ এদেশেও সৃষ্টি হ'ল। এই দুটি জাতি দুটি ভিন্ন ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব ভোগ করত : আধ্যাত্মিক ও পার্থিব। যজ্ঞই যেহেতু সে সময় ধর্মের প্রচলিত ও পরিচিত রূপ ছিল এবং যজ্ঞে অপরিহার্য ভূমিকা ছিল পুরোহিতের ও পৃষ্ঠপোষক যজমানের, তাই এই দুজনেই সমাজে সর্বাধিক মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ দুজনের প্রত্যেকেই নিজেকে সমাজের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য অঙ্গ ব'লে ভাবতে শুরু করেছিলেন ব'লে সমাজে এ উভয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। সাধারণভাবে ক্ষত্রিয়রা যে সর্বদাই ব্রাহ্মণদের তুলনায় বেশি ঐশ্বর্যবান ছিলেন, তার সমর্থন পাওয়া যায় তৈত্রিরীয় ব্রাহ্মণে (৩ : ৯ : ১৪ : ৫৪)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৮ : ২৩) ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের দ্বন্দ্ব যে তীব্র হয়ে উঠেছে, তার আভাস পাওয়া পাওয়া যায়। পৃষ্ঠপোষকরূপে যজ্ঞের ক্রমবর্ধমান ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে রাজারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য ক'রেছিলেন, কীভাবে তাঁদের রাজকোষ প্রত্যক্ষভাবে পুরোহিতদেরই ধনবৃদ্ধি ঘটাচ্ছিল এবং কীভাবে কোনো কোনো পুরোহিত জনসাধারণকে নানা উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। অনুষ্ঠানসম্পর্কিত নতুন নির্দেশাবলীর ফলে পুরোহিতদের প্রাপ্য ও দাবি এমনভাবে বর্ধিত হ'ল যে, রাজ পুরোহিতদের প্রকৃত সম্পদই প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেল। সম্ভবত এ-সময়েই রাজপুরোহিতদের ভূমিদান করার প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল ; সুতরাং, ঐশ্বর্যবান পুরোহিতশ্রেণীর উত্থানকে ক্ষত্রিয় রাজা নিজ ক্ষমতার পক্ষে বিপদসূচক ব'লে মনে করতেন।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের যদিও প্রায়ই পরস্পরের উপর নির্ভরশীলরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তবু ক্ষমতা ও পাদপ্রদীপের আলোক অধিকারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে কখনো প্রচ্ছন্ন কখনো বা প্রকাশ্য বৈরিতার সূচনা হয়। বাস্তব জীবনে ব্রাহ্মণ যে অভাব বোধ করতেন, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তার বহুগুণ বেশি ক্ষতিপূরণ ঘটত— এই ছিল প্রচলিত ধারণা। অন্তর্দেশীয় সমৃদ্ধি ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রসারেরর সঙ্গে সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতা এবং বৈভব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল—বিশেষত রাজা ও অভিজাতবর্গের জীবনযাত্রায় প্রতিফলিত বিপুল আড়ম্বর এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রজাসাধারণকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি পর্যবেক্ষণ ক'রে ব্রাহ্মণরা নিশ্চিতই প্ররোচিত বোধ করেছিলেন। আবার, তাদের সমস্ত ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা সত্ত্বেও রাজা ও তাঁর অভিজাত পারিষদবর্গ ব্রাহ্মণের আধ্যাত্মিক শক্তি ও তজ্জনিত দম্ভের সম্মুখীন হয়ে নিশ্চিত ক্ষুব্ধ বোধ করতেন। শতপথ ব্রাহ্মণে [১১ : ৬ : ২ : ৫] জনকের বিতর্কসভা (ব্রহ্মোদ্য) সম্পর্কে ব্রাহ্মণদের প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তিতে এর আভাস রয়েছে।

নৌ-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির ফলে প্রাথমিক পুঁজি বৈশ্যদের হাতে কেন্দ্রীভূত হ'ল ; তা সত্ত্বেও তিনটি আর্য বর্ণের মধ্যে এরাই ছিল নিম্নতম। এদের বিপুল ক্ষমতা অর্জনের

সম্ভাবনাকে প্রতিহত করার জন্য সমাজে যে উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রমাণ রয়েছে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের একটি নির্দেশে [৩ : ৯ : ৭ : ৩২] ঃ 'বৈশ্যের পুত্রকে (রাজপদে) অভিষিক্ত করবে না।' আদিত্য, রুদ্র ও বসু—এই গণদেবতাদের মধ্যে বিভিন্ন কৌমের প্রতিফলন দেখা যায় ; তাঁদেরও আবার যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতিতে বিভক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন ক'রে কৌমগুলি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছিল, যদিও তাদের মধ্যে চিরাগত দ্বন্দ্ব ও সংঘাত ছিল অব্যাহত ; তার ইঙ্গিত ব্রাহ্মণ সাহিত্যের বেশ কিছু স্থানে পাওয়া যায়। আবার, কিছু কিছু অস্পষ্ট আভাস থেকে মনে হয়, অন্তত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বর্ণগত সঞ্চরণশীলতা অক্ষুণ্ণ ছিল। ঋষি মেধাতিথি বৎসকে অব্রাহ্মণ, শূদ্র নারীর পুত্র ব'লে অভিহিত করেছিলেন। বিতর্ক মীমাংসার জন্য তাঁরা নিজেদের মন্ত্রসহ অগ্নিপ্রবেশের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই অগ্নিপরীক্ষায় বৎস শ্রেষ্ঠতর ব্রাহ্মণরূপে প্রমাণিত হয়েছিলেন [তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ১৪ : ৬ : ৬]। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শূদ্রার পুত্রও জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ ঋষি মেধাতিথির তুলনায় প্রশংস্যতর ব্রাহ্মণ ব'লে গণ্য হয়েছিলেন ; যদিও এই মেধাতিথি বৈদিক সূক্তেরও রচয়িতা।

শূদ্র উচ্চতর তিনটি বর্ণের ভৃত্য, অস্থাবর সম্পত্তি, এমনকি মাঝে মাঝেই ক্রীতদাসরূপে বর্ণিত হয়েছে। মহাব্রত অনুষ্ঠানের অন্তর্গত ছদ্ম যুদ্ধে একটি গোলাকৃতি চর্মখণ্ডের জন্য ব্রাহ্মণ ও শূদ্র পরস্পরের সঙ্গে বিসংবাদে প্রবৃত্ত হত ; তখন অনুষ্ঠানের খাতিরে তারা পর্যায়ক্রমে পরস্পরকে দোষারোপ ও প্রশংসা করত [তৈত্তিরীয় ১ : ২ : ৬ : ৫০]। কিন্তু এটা এমন বেশি মাত্রায় প্রথাসিদ্ধ আনুষ্ঠানিক কর্ম যে, এর মধ্য থেকে সম্ভাব্য কোনো প্রকৃত ঐতিহাসিক সূত্র আবিষ্কার করা খুব দুরূহ। এই বিবৃতির শেষে শূদ্রের উৎপত্তি স্পষ্টভাবে প্রদত্ত হয়েছে ঃ 'শূদ্র অসুর উৎসজাত।' অর্থাৎ পরাজিত আদিম অধিবাসীদের মধ্য থেকেই শূদ্রের উৎপত্তি। কৌষীতকি ব্রাহ্মণে [২৭ : ১] বারাঙ্গনা অপেক্ষাও হীন ও অস্পৃশ্য ব'লে শূদ্র নারীকে বর্ণনা করা হয়েছে। শূদ্র বর্ণের কাছ থেকে অগ্নিকে অপসারিত করার কথা বলেছে শতপথ ব্রাহ্মণ [৬ : ৪ : ৪ : ৯]। সোম যাগের জন্য দূরবর্তী পার্বত্য অঞ্চল থেকে সোম সংগ্রহ করতে শূদ্রেরা ; বিনিময়ে যে গোবৎসটি তারা মূল্য হিসাবে লাভ করত, তাও মধ্যপথে প্রহার ক'রে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হ'ত [কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ১৭ : ১]। তৎকালীন সমাজে শূদ্রদের বিড়ম্বিত জীবনের সুস্পষ্ট চিত্র এখানে পাওয়া যাচ্ছে। অস্থাবর সম্পত্তিরূপে পরিগণিত শূদ্রদের শ্রম ও তাদের দ্বারা উৎপাদিত সমস্ত কিছুই আর্যসমাজের অপর তিন জাতির দ্বারা শোষিত হ'ত,—কেননা তাদের পিতৃপুরুষেরা আর্য আক্রমণের বিরোধিতা করেছিল ও যুদ্ধে পরাস্ত হয়েছিল। আর্য সংস্কৃতির বৃত্তবহির্ভূত হওয়ার ফলে যজ্ঞে যেহেতু শূদ্রদের কোনো স্থানই ছিল না, তাই তাদের সম্পর্কে সমস্ত তথ্য নানা তির্যক উল্লেখের মধ্যে থেকে

প্রসঙ্গক্রমে পাওয়া যায়। তবে, 'ধর্মসূত্র' রচিত হওয়ার পূর্বে শূদ্রদের পৃথক বর্ণরূপে স্বীকার করা হয় নি ; রচনাগুলিতে তাদের সামাজিক অবস্থানের হীনতা সমর্থিত হয়েছে।

শূদ্রদের প্রতি সমাজের সর্বাধিক ঘৃণাসূচক মন্তব্য সম্ভবত তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণে [৫ : ৮ : ১১] পাওয়া যায় ঃ 'শূদ্র যজ্ঞের উপযুক্ত নয়, তার কোনো দেবতা নেই, কোনো দেবতা কখনো তাকে সৃষ্টি করেন নি ; সুতরাং শুধুমাত্র অন্য সকলের পদপ্রক্ষালন ক'রেই তাকে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়।' সমস্ত গ্রন্থই অন্তত এই ব্যাপারে একমত যে, শূদ্রের সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক তৈরি ক'রে কোনো দেবতাকে দূষিত করা উচিত নয়। শূদ্রের অনার্য উৎস ও ফলত আর্য দেবতার সঙ্গে তার সম্পর্কহীনতা, ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত ; ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের বহু অংশে দেবতাদের সঙ্গে সমস্ত ধরনের সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত ক'রে শূদ্রকে সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় প্রতিপন্ন করার সচেতন প্রয়াস স্পষ্ট ; কেননা, সে যুগে দৈবসম্পর্ক সামাজিক স্বীকৃতির প্রকৃত সমর্থনরূপে বিবেচিত হ'ত। শতপথ ব্রাহ্মণে [১৪ : ১০১ : ৩১] বলা হয়েছে ঃ 'নারী, শূদ্র, কুকুর ও কালো পাখি হ'ল অসত্য, পাপ ও অন্ধকার—তাই তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়।' রচয়িতা নারীবিদ্বেষী ছিলেন কিনা এবং নারীর প্রতি সত্যই দৃষ্টিপাত করা হ'ত না কিনা, এই নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে, কিন্তু শূদ্রের প্রতি অমানবিক ঘৃণা যে সমাজের প্রচলিত রীতি ছিল, তাতে কোনো সংশয় নেই।

মহব্রত যজ্ঞে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদের পারস্পরিক নিন্দাবাদের সময় শূদ্রেরা ব্রাহ্মণদের 'ধনী অদাতা' রূপে সম্বোধন করে থাকে। সমাজে জাতিভেদের মতোই ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিভাজনও সমান তীব্র ছিল ; স্পষ্টতই শূদ্রেরা উভয় দিক দিয়েই সর্বাধিক নিপীড়িত হ'ত। তাই, আমরা ধনী ব্রাহ্মণ, ধনী ক্ষত্রিয় ও ধনী বৈশ্যের কথা শুনি, কিন্তু প্রায় কখনোই ধনী শূদ্রের কথা শুনি না। ধন যে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের নিয়ামক হয়ে উঠছে, তার প্রমাণ পাই তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১ : ৪ : ৮ : ৪৫)। স্বাভাবিকভাবেই তখনকার সমাজে ধন ও স্বর্ণের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠেছিল এবং যজ্ঞ আয়োজনের পক্ষে তা বাস্তব প্রেরণারূপে সক্রিয় থাকত। গৃহ, আত্মীয়, শস্য, গোধন, অশ্ব, রথ ইত্যাদির প্রাপ্তিও যজ্ঞের ফলরূপে বিবেচিত হ'ত। সমাজের অল্পসংখ্যক লোকই যেহেতু ঐশ্বর্যবান হতে পারত, তাই অন্যদের মধ্যে ধনলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং ক্ষতি বা হানির বিরুদ্ধে এবং বিভিন্ন প্রকার শত্রুর বিরুদ্ধে প্রচুর প্রার্থনা রচিত হয়েছে। অসুর ও রাক্ষসদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত তীব্র নিন্দাসূচক উক্তিতে 'ব্রাহ্মণ'গুলি পরিপূর্ণ ; তাদের সঙ্গে শূদ্রদের একমাত্র পার্থক্য এই যে, প্রথমোক্তরা তখনও আর্যদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল ; কিন্তু

শূদ্ররা, বিশেষত ক্রীতদাসেরা, পরাজিত শত্রুরূপে এমন এক সন্ধিপত্রে অলিখিতভাবে স্বাক্ষর করেছিল, যার প্রত্যেকটি শর্ত তাদের পক্ষে হীনতাপূর্ণ অপমানকে চিরস্থায়ী করেছিল। সাধারণত তারা নিতান্ত সামান্য অর্থের বিনিময়েই পরিশ্রম করত, মাঝে মাঝে নামমাত্র বেতনই পেত। কিন্তু ক্রীতদাসদের জন্য কোনরকম বেতনের ব্যবস্থাই ছিল না। তীব্র দারিদ্র্য, অবিরাম দাসত্ব এবং ব্যক্তি বা সম্পত্তিতে অনধিকারের ফলে শোষক প্রভুদের বিরুদ্ধে ফলপ্রসূ বিদ্রোহ ঘোষণা করা তাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব হ'ত না।

তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণের অষ্টাদশ অধ্যায়ে ব্রাত্যদের সম্পর্কে একটি দীর্ঘ পরিচ্ছেদ রয়েছে। অথর্ববেদের পঞ্চদশ অধ্যায়েও ব্রাত্যদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ব্রাহ্মণে ব্রাত্যদের বর্ণনায় প্রত্যেকটি অনুপুঙ্খ স্পষ্টভাবে নির্দেশিত। যদিও ব্রাত্যদের সকলেই রাজপদবীর অধিকারী ছিলেন না, তবুও তাদের সম্বন্ধে বিবরণে সমৃদ্ধিশালী কৌম রাজার আড়ম্বরপূর্ণ বর্ণনা আমরা লক্ষ্য করি। গৃহস্থরা ব্রাত্যদের যে দানসামগ্রী অর্পণ করতেন, তাতে প্রত্যেকটি দ্রব্য ছিল বিলাসিতার প্রয়োজনে ব্যবহৃত। অতিথিরূপে ব্রাত্যদের অবস্থান থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, এরা প্রকৃতপক্ষে কোনো অবৈদিক আর্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অথর্ববেদেও ব্রাত্যরা সম্মানিত, বিশেষত জ্ঞানী ব্রাত্যের সাহচর্য আর্য রাজার পক্ষেও কাম্য ছিল। এই ব্রাত্যদের পরিচয় যাই হোক না কেন, অথর্ববেদে দেখি তাঁরা রক্ষণশীল বৈদিক ধর্মের অনুসরণ করতেন না। কিন্তু তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণে ব্রাত্যদের অবস্থান ভিন্নতর। সামগীতিপূর্ণ সোমযাগের মর্যাদা যখন খুবই প্রবল, সেই সময়কার একটি সামবেদীয় ব্রাহ্মণের ব্রাত্যদের অবস্থান সমাজের নিম্নতম সোপানের কাছাকাছি ব'লে নির্দেশিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এরা ব্রাহ্মণদের খাদ্য ও সম্পদ লুণ্ঠন করে, এদের ব্রাহ্মণ বা বৈশ্য শ্রেণীর অন্তর্গত করা যায় না। ব্রাত্যরা অদীক্ষিত হয়েও পবিত্র বৈদিক ভাষায় কথা বলে। কৃষিকার্য বা বাণিজ্য তাদের জীবিকা নয় এবং তাদের পোষাকও খুব উদ্ভট। এই ও ঘৃণার প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করতে পারা যায়, যদি ব্রাত্যদের আর্য জনগোষ্ঠীর প্রাচীনতর অর্থাৎ অবৈদিক অংশরূপে গ্রহণ করি, যারা বৈদিক আর্যদের পূর্বে কোনো প্রাচীনকালে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সংখ্যায় এদেশে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং প্রাগার্যদের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরিবর্তে তাদের সহৃদয় আতিথ্যলাভ করেছিলেন। বিখ্যাত গবেষক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই অভিমতই পোষণ করতেন। আদিম জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এই ব্রাত্যদের অধিকমাত্রায় সংমিশ্রণ ঘটেছিল ব'লে তারা বৈদিক আর্যদের শত্রুপক্ষে পরিণত হয়েছিলেন, আবার তাদের আর্য পরিচয়ও যেহেতু অক্ষুণ্ণ ছিল, তাই নবাগতদের পক্ষে তা অস্বস্তি ও বিরক্তির কারণ হওয়ায় দ্বিধান্বিত প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল।

সামাজিক আচার

আমরা জানি যে, প্রত্নকথার অন্যতম দায়িত্ব ছিল প্রচলিত সামাজিক রীতির বৈধতা প্রতিপাদন। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে তার বহু নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। তবে, প্রাথমিকভাবে যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ তথ্য দেবার কোনো সুযোগ ব্রাহ্মণ সাহিত্যের ছিল না। শতপথ ব্রাহ্মণের একটি দেব কাহিনীতে (১ : ৭ : ৪ : ৪) নিজ কন্যা উষার প্রতি প্রজাপতির কামাসক্তি, তার জন্য প্রজাপতির প্রতি দেবতাদের ক্রোধ এবং রুদ্র কর্তৃক প্রজাপতির শাস্তিদানের বর্ণনায় এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তৎকালীন সমাজে অবৈধ যৌন সম্পর্ক নিন্দিত হলেও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল না। অন্য একটি কাহিনীতে আমরা বুঝতে পারি যে, গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ না হলেও লোকসমাজে তার প্রচলন ক্রমে কমে আসছিল।

বিভিন্ন ব্রাহ্মণে ঋষিদের প্রতি সমাজের বিশেষ সম্মান বোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জীবনের চতুর্থাশ্রম অর্থাৎ সন্ন্যাস যে প্রবর্তিত হয়ে গেছে, তারও প্রমাণ আমরা এ সাহিত্যে পাই। সামাজিক রীতিনীতি জনপ্রিয় ধর্মের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। তবে, রক্ষণশীল বা প্রশাসন-অনুমোদিত ধর্ম থেকে লোকায়ত ধর্মের বৃত্তকে পৃথক করা সত্যই খুব দুরূহ ; বিভিন্ন তথ্য আমরা এ সম্বন্ধে কিছু কিছু অনুমান করতে পারি মাত্র। নির্দিষ্ট কয়েকটি ধর্মীয় আচারকে বৃহৎ ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত করা হয় নি বলেই আমাদের এই বিভাজন সম্পর্কে বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। ব্রাহ্মণ সাহিত্যের শেষ পর্যায়ে 'ব্রহ্মা' অর্থাৎ অথর্ববেদের পুরোহিতকে সমাজে গ্রহণযোগ্য ক'রে তোলার সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। অন্য তিন প্রধান পুরোহিতের মতো তার জন্য কোনো মুখ্য কর্তব্য যেহেতু নির্দিষ্ট করা যায়নি, তাই তাকে অধিকতর অপরিহার্য ক'রে তোলার একটি চেষ্টা চলেছিল. বিশেষত অথর্ববেদের ধারার মধ্যে। কৌষীতকি ব্রাহ্মণে (৫ : ১১) বলা হয়েছে যে, বাক্যের দ্বারা কর্ম অন্য পুরোহিতেরা করেন, কিন্তু মনের দ্বারা অনুষ্ঠেয় কর্ম শুধু ব্রহ্মাই ক'রে থাকেন। এই সঙ্গে আমরা এও বুঝতে পারি যে, এ সময় মন ও চিন্তার প্রাধান্যের প্রতি প্রবণতা ধর্মে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ; তা না হলে, ব্রাহ্মণের প্রাধান্য মনের সঙ্গে সম্পৃক্ত অনুষঙ্গের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হতে পারত না। রচনাকালের দিক দিয়ে যত আমরা অর্বাচীনতর ব্রাহ্মণগুলির সঙ্গে পরিচিত হই, ততই দেখি যে, তাদের মধ্যে অধিক সংখ্যক গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান গুরুত্ব পেয়ে যাচ্ছে; যেমন গোপথ ব্রাহ্মণে নিম্নোক্ত দ্বাদশ সংস্কার উল্লিখিত : গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, গোদান, চূড়াকরণ, উপনয়ন, আপ্লবন ও অগ্নিহোত্র। যে সমস্ত জনপ্রিয় ধর্মীয় উপাদান বহু শতাব্দী ধ'রে সামূহিক অবচেতনে নিহিত ছিল ও রক্ষণশীল যাজক-তান্ত্রিক ধর্মের সঙ্গে অসম্পৃক্ত সেই উপাদানগুলিই লোকায়ত ধর্মের সাক্ষ্য নিয়ে যজ্ঞধর্মে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল।

ঋগ্বেদে আমরা গন্ধর্বদের উল্লেখ পাই ; শতপথ-ব্রাহ্মণে বহু অপ্সরার অস্তিত্বও বিশেষভাবে লক্ষণীয় ঃ মেনকা, সহজন্যা, প্রম্লোচনী, অনুম্লোচনী, বিশ্বাচী, ঘৃতাচি উর্বশী ও পূর্বচিত্তি। এদের মধ্যে উর্বশীকে কেন্দ্র ক'রে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের বিখ্যাত সংবাদ-সূক্তটি গড়ে উঠেছে। অপ্সরার সম্পর্কে বিশ্বাস যে অন্ততপক্ষে ইন্দো-ইয়োরোপীয় ঐতিহ্যের মতো প্রাচীন, তা গ্রিক ও ল্যাটিন দেবকাহিনীগুলিতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ বিশ্বাস যে যজ্ঞধর্মে অনুপ্রবিষ্ট তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সম্ভবত লোকায়ত ধর্মের বিভিন্ন উপাদানের ইন্দ্রজাল ও জাদুবিদ্যার অস্তিত্বের মধ্যেই নিহিত, অর্থাৎ যে সমস্ত অনুষ্ঠানকে কোনও আপাত যুক্তির সাহায্যে যুক্তিসিদ্ধ ক'রে তোলার চেষ্টা দেখা যায় নি, তাও এর মধ্যে স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে, এখানে আমাদের স্মরণ করা প্রয়োজন যে, সমস্ত প্রাচীনপন্থী যাজক-তান্ত্রিক ধর্মেই ইন্দ্রজাল ও জাদুবিদ্যা অবিচ্ছেদ উপাদানরূপে স্বীকৃত। ব্রাহ্মণসাহিত্যে প্রতিফলিত লোকায়ত ধর্মকে এদের থেকে পৃথক করার একমাত্র মাপকাঠি হ'ল ছদ্মযুক্তির উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি।

সমাজের প্রত্যাশা ছিল এই যে, মানুষ সতর্কভাবে জীবনধারণ ক'রে তার শতবর্ষব্যাপী আয়ুষ্কালের পূর্ণ সদব্যবহার করবে এবং অবহেলায় তার পরমায়ুর কোনও অপচয় করবে না। মানুষ তিনটি ঋণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে ঃ দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ। দেবঋণ পরিশোধ করার জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন, ঋষিঋণ পরিশোধ করার জন্য বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন এবং পিতৃঋণ শোধ করতে হলে পুত্র উৎপাদন আবশ্যক।

শিক্ষার্থী অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর গভীর ও রহস্যময় তাৎপর্য সম্পর্কে গোপথ ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায় যে পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে পিতৃপুরুষের জ্ঞানচর্চার ধারা পরিশীলিত হত। অক্ষর-জ্ঞান আবিষ্কৃত হবার পূর্বস্তরে সমাজে সর্বপ্রকার জ্ঞানই মৌখিকভাবে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে প্রবাহিত হ'ত ; ফলে বিদ্যার্থী স্বভাবতই ঐতিহ্যগত বিদ্যার আধার ও সঞ্চরণের আধার হয়ে উঠত এবং ব্রহ্মচারীর উপর আধ্যাত্মিক কিছু অনুষঙ্গ আরোপিত হ'ত। ব্রহ্মচারীকে তপস্বীর কঠোর বিধি অনুসরণ করতে হ'ত, সংগীত উপভোগ বা নৃত্যে অংশগ্রহণ কিংবা উচ্চশয্যায় নিদ্রা ইত্যাদির অধিকার তার ছিল না। জ্ঞানলাভের জন্য অপূর্ব তৃষ্ণা ও সম্ভ্রমবোধ এবং জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা ব্রাহ্মণ গ্রন্থে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আবার একই সঙ্গে আমরা জ্ঞান ও আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে দ্বন্দ্বের আভাস পাই। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্গুলিতে জ্ঞানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত শ্রদ্ধার বিশেষ এক ধরনের তাৎপর্য লক্ষ্য করি।

দেবতা ও অসুর

ব্রাহ্মণ সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায় যে, যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেই দেবতারা দেবত্ব অর্জন করেছিলেন, এবং তাঁদের বিজয়লাভের মূল কারণও যজ্ঞ। সংহিতা পর্যায়ে কিন্তু

ধারণা ছিল ভিন্ন ধরনের ; সেখানে দেবতারা তাঁদের মহত্তর শৌর্য ও বীরত্বের দ্বারাই বিজয় অর্জন করেছেন। শতপথে কথিত হয়েছে যে, ছন্দের মধ্যে দিয়ে দেবতারা স্বর্গলাভ করেছিলেন ; কিন্তু সংহিতায় স্বর্গই তাঁদের চিরন্তন আবাস, কোনও কিছুর সাহায্যে তা অর্জন করতে হয় নি। সংহিতার দেবতাদের নূতনভাবে শ্রেণীবিভক্ত ক'রে পুনর্বিন্যাসের একটি প্রবণতা আমরা ব্রাহ্মণ সাহিত্যে লক্ষ্য করি। একটি দেবসঙ্ঘরূপে বিশ্বেদেবাঃ-র উত্থান এমনই একটি দৃষ্টান্ত যার মধ্যে আমরা কিছু কিছু গণদেবতার ব্যক্তি পরিচয়ের ক্ষয়ের নিদর্শন পাই। অনুষ্ঠান বিশেষজ্ঞদের মধ্যে দেবতা শব্দের প্রাচীন বিশেষণগুলিতে পৃথক ব্যক্তিত্ব আরোপের যে প্রবণতা দেখা গিয়েছিল, তারই ফলে দেবতাদের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এবং নূতনভাবে শ্রেণীবন্যাসের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে পড়ে। আবার বহু অনুষ্ঠানই দেবকাহিনীর মধ্যে দিয়ে প্রবর্তিত হয়েছে, যেখানে কোনও নির্দিষ্ট দেবতার মধ্যে প্রথম পর্যায়ে কোনও গুণ বা শক্তি বা অনুষ্ঠানের অভাব পরিলক্ষিত হয়। অন্যান্য দেবতারা নিজস্ব শক্তিতে কিংবা প্রজাপতির নির্দেশে কোনও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেই গুণ যুক্ত করেন বা অভাব পূরণ করেন। এ ধরনের কাহিনী সংহিতায় প্রতিফলিত স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান দেবতার সম্পর্কে ধারণাকে সফলভাবে খণ্ডন করেছে ; তাদের পূর্বতন গৌরব বহুলাংশে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় কখনও কখনও যজমান ভাবগতভাবে নিজেকে কোনো না কোনো দেবতার সঙ্গে একাত্ম ক'রে নিয়েছেন। সোমযাগে একটি নির্দিষ্ট সময়ে যজমান ইন্দ্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। বস্তুত, দেবতা ও মানুষের মধ্যবর্তী আধ্যাত্মিক ব্যবধান হ্রাস করার জন্য এটা একটি বিশেষ পদ্ধতি। তবে, সর্বাধিক শক্তিশালী যে বিবৃতির দ্বারা দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব, অসামান্যতা ও গৌরব সার্থকভাবে হ্রাস পেয়েছে, তা আমরা শতপথ ব্রাহ্মণে (১১ : ২ : ৩ : ৬) পাই ঃ "দেবতারা একদা মরণশীল ছিলেন ; 'ব্রহ্ম, লাভ ক'রে তাঁরা অমর হয়ে উঠলেন।" একদিক দিয়ে এটা দেবতার গৌরবকে সর্বাধিক ক্ষুণ্ণ করেছে, কেননা দেখা যাচ্ছে যে, তাঁরা স্বভাবত অমর নন ; ব্রহ্মের অলৌকিক শক্তির সাহায্যে তাঁরা অমরতা অর্জন করেছিলেন। আবার 'ব্রহ্ম' বা ঐন্দ্রজালিক শক্তি পুরোহিতদের ভাবমূর্তির পক্ষে বিশেষভাবে অনুভূত অভাববোধকে প্রকট ক'রে তুলেছিল। ঐ উক্তিতে পুরোহিতরা দেবতাদের সঙ্গে একই আধ্যাত্মিক উচ্চভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। পুরোহিতদের উন্নতমানা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই দেবতাদের স্বাধীনতা ও সর্বশক্তিমত্তার অবনমন ঘটেছে। যদি ব্রহ্ম ব্যতীত দেবতারা নিজেরাই তুচ্ছ মরণশীল মানুষের সমতুল্য হয়ে পড়েন, তাহলে যে জনগোষ্ঠীতে পুরোহিতদের মধ্যে ব্রহ্মশক্তির আধ্যাত্মিক সঞ্চয় পরিস্ফুট—তারও ভবিষ্যৎ যথার্থ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। দেবতারাও যেহেতু সত্যরূপ ব্রতপালন করেন শতপথ [১৪ : ১ : ১ : ৩৩] তাই তাঁরা সন্ন্যাস ও ব্রতের দ্বারা ঋষিদের আদি প্রত্নরূপে পরিণত হন। অলৌকিক ও নৈতিক শক্তির

শ্রেষ্ঠত্বই তাঁদের বিশেষ গৌরবের হেতু। বিশাল ও জটিল রাজ্যের বা সাম্রাজ্যের শাসকরূপে শক্তিশালী রাজাদের সম্পর্কে জনসাধারণের যে অভিজ্ঞতা গড়ে উঠেছিল, সম্ভবত তারই নিগূঢ় প্রবর্তনায় একেশ্বরবাদের জন্ম। ব্রাহ্মণ সাহিত্যের যুগে ভারতবর্ষের সামাজিক পরিস্থিতি যে বাস্তব ভিত্তিভূমি রচনা করেছিল, তারই প্রভাবে সার্বভৌম একেশ্বররূপে প্রজাপতির উত্থান। উপনিষদের পূর্ণ বিকশিত অদ্বৈতবাদের অব্যবহিত পূর্বে প্রায়-চূড়ান্ত ধর্মতাত্ত্বিক স্তর-রূপে একে গ্রহণকরা যেতে পারে। যদিও আমরা ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে একেশ্বরবাদের কথা শুনি, মোটামুটিভাবে প্রচলিত ধর্মীয় বাতাবরণ তখনও বহুদেববাদী থাকলেও বহুদেববাদ ততদিনে বহুলাংশে হৃতগৌরব ও দুর্বল হয়ে পড়েছিল, এবং একেশ্বরবাদী প্রবণতা দ্রুত প্রভাবে বিস্তার করেছিল। প্রজাপতি এমন একজন বিমূর্ত-দেবতারূপে ক্রম শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন যে, প্রত্নকথা ও আনুষ্ঠানিক রহস্যবাদী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরমেশ্বরের পক্ষে উপযুক্ত গুণাবলী যার উপর আরোপিত হচ্ছিল। শুভ ও অশুভের বিশ্বব্যাপ্ত সংঘাতরূপে দেবতা ও অসুরদের সংগ্রামকে স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করার প্রবণতা অবেস্তা গ্রন্থেও পাওয়া যায়—সেখানে আহুরমজ্‌দা ও আঙ্গ্রামৈন্যুর মধ্যে নিরন্তর প্রতিস্পর্ধিতা পরিস্ফুট হয়েছে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে দেবতা ও অসুররা ছিল প্রধান ভূমিকায়, লক্ষণীয় যে, উভয়েই প্রজাপতির সন্তান। বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, অসুরেরা সংখ্যায় অধিক, তাদের তুলনায় দেবতারা বয়ঃকনিষ্ঠ। ঋগ্বেদের মতো দেবতারা তত শক্তিশালী বীর নন, যাঁদের পরাক্রমের কাছে অসুররা পর্যুদস্ত। অসুর অর্থাৎ প্রাগার্যরা পরাজিত হলেও ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীরূপে তাঁরা ব্রাহ্মণ সাহিত্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব'লে চিত্রিত। তবে বারংবার অসুরদের কাছে দেবতাদের পরাজয়বরণের কাহিনীর উপস্থাপন ঋগ্বেদের চিত্রের বিরোধী এবং ব্রাহ্মণ-প্রতিফলিত এই নূতনতত্ত্বের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে কোনো নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তে আসা যায় না। দেবতাদের মহিমা ক্রমশ খর্ব হওয়ার ফলে অন্য কোনো উপাদান দায়ী, এই সিদ্ধান্ত মাত্র আংশিকভাবেই সত্য, প্রকৃতপক্ষে নূতন আধ্যাত্মিক শক্তির উৎসরূপে বিষ্ণু বা প্রজাপতির সঙ্গে একাত্মীভূতরূপে যজ্ঞের উপস্থাপনার ফলেই চিরাগত দেবতারা নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিলেন। ঋগ্বেদে বিষ্ণু প্রাচীন, গৌণ দেবতা হলেও ব্রাহ্মণ সাহিত্য তাঁর মহিমা এমন সতর্কভাবে গড়ে তোলা হয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত তিনি যজ্ঞের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েছেন।

প্রজাপতি যেহেতু যজ্ঞের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েছিলেন, তাই ব্রাহ্মণ সাহিত্যে তাঁর ভূমিকাকে একটু অন্যভাবে বিচার করা যেতে পারে ; প্রায়ই বলা হয়েছে যে, সৃষ্টির পরে প্রজাপতি যখন ক্লান্ত, তখনও কোনো নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেবতারা তাঁকে নূতনভাবে উজ্জীবিত করে তুলেছিলেন। সুতরাং যজ্ঞ স্বয়ং স্রষ্টা ও রক্ষাকর্তা প্রজাপতিরকেও নূতন জীবন দান করতে সমর্থ। তাঁর গৌরব ও তাৎপর্য যেহেতু

দ্রুত বেড়ে যাচ্ছিল এবং অন্যান্য দেবতারা সমানুপাতিকভাবে নিজেদের মাহাত্ম্য হারিয়ে ক্রমশ হীনপ্রভ হয়ে পড়ছিলেন, তাই একদিক থেকে সমগ্র দেবসঙ্ঘে একেশ্বরবাদের দিকে অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণযুগের ধর্ম যেহেতু মূলত যজ্ঞমূলক তাই যেখানে বহুদেবতার উদ্দেশে আহুতি অর্পিত হয়—সচেতনভাবে কোনো একেশ্বরবাদী প্রবণতা ঘনীভূত হয়ে ওঠেনি। যজ্ঞমূলক ধর্মের প্রয়োজনে ধর্মতাত্ত্বিকগণ অসংখ্য দেবকাহিনীতে প্রজাপতির ভাবমূর্তিকে এমনভাবে মহিমান্বিত ক'রে তুলেছিলেন যে, অন্যান্য দেবতারা তাঁরই মহিমা ও করুণায় আশ্রিত হয়ে রইলেন। সংহিতা সাহিত্যে যেহেতু এরকম কোনো দেবতার সন্ধান পাওয়া যায় না, অন্তিম পর্যায়ের রচনায় অর্থাৎ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল ও অথর্ববেদে প্রাপ্ত ব্রহ্মা, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি, হিরণ্যগর্ভ, পুরুষ, আত্মা, স্কম্ভ বা কালের দেবতাকে তাই পুনর্বিন্যস্ত ক'রে একজন সর্বোত্তম পরাৎপর দেবতার ভাবমূর্তি নির্মাণ করা হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত তিনিই যুগের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় তত্ত্ব অর্থাৎ যজ্ঞের দেবরূপ হয়ে উঠলেন। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে প্রজাপতি সর্বজ্যেষ্ঠ দেবতারূপে বর্ষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছিলেন—এই বর্ষ কৃষিজীবী সমাজে কালগত একটি সম্পূর্ণ এককের প্রতিনিধি।

সময় সম্পর্কে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের ধারণা কতকটা জটিল—এর মধ্যে একধরনের স্ববিরোধিতা রয়েছে, যার প্রাথমিক আভাস সংহিতা সাহিত্যে উষা-সূক্তগুলিতে পাওয়া গিয়েছিল। সেখানে উষা স্বয়ং নিত্যনবীনা অথচ মানুষের জরার সে-ই হেতু, যেহেতু প্রতি প্রত্যূষে মানুষের পরমায়ু একদিন ক'রে কমে যায়। ব্রাহ্মণসাহিত্যে প্রজাপতি যে একই সঙ্গে খণ্ডকাল ও অনন্তকালের প্রতিভূ হয়ে উঠেছেন, তাতেই তাঁর সর্বোত্তম মহিমা প্রমাণিত। কালের বিভিন্ন মাত্রা সম্পর্কে এই সচেতনতার ফলে জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে নূতন চিন্তাধারার সৃষ্টি হ'ল। স্থায়িভাবে নির্দিষ্ট কৃষিজীবীর মনস্তত্ত্ব স্থায়িত্ববোধের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত। সম্পদ সঞ্চিত হবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাধিকারীদের জন্য সেই সম্পদ সংরক্ষণ করার একটি নূতন আগ্রহ দেখা গেল। জ্যোতির্বিদ্যা, বিশেষত নক্ষত্রমণ্ডলী সম্পর্কে নূতন উৎসাহ, সেই যুগের একটি বিশিষ্ট চরিত্র লক্ষণ, কারণ তৎকালীন মানুষ নিরবচ্ছিন্নতা ও চিরস্থায়িতা সম্পর্কে আগ্রহী ছিল বলেই নক্ষত্রমণ্ডলী তাদের কাছে স্থায়িত্বের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। এসব অতিজাগতিক উপাদানের বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে নিজের নশ্বরতাকে মানুষ যেন নতুনভাবে উপলব্ধি করল। একদিকে মানুষের জরা এবং মৃত্যু এবং অন্যপ্রান্তে দিন ও রাত্রির আবর্তনের হেতুরূপ সূর্যকে পর্যবেক্ষণ ক'রে তৎকালীন মানুষ সূর্যকে জরা ও মৃত্যুর প্রেরয়িতারূপে গ্রহণ করেছিল। বর্ষ হয়ে উঠল সময়ের প্রথম সসীম ও সম্পূর্ণ একক, একই সঙ্গে আবর্তনশীল ঋতুচক্র ও বর্ষ যেহেতু চিরবহমান কালের দ্যোতক—তার মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অবিনাশী রূপও আভাসিত হ'ল। এই প্রসঙ্গে মানুষের নিজস্ব মৃত্যুবোধও তীক্ষ্ণতর অভিব্যক্তি লাভ করল।

ব্রাহ্মণ সাহিত্যে ক্ষুধা জীবন্ত মৃত্যুরূপে বর্ণিত হয়েছে শতপথ [১০ : ৬ : ৫ : ২]। ক্রমবর্ধমান মৃত্যু-চেতনার ফলে ক্রমশ মৃত্যু মূর্ত, প্রায় মানবায়িত হয়ে উঠেছিল। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের [৩ : ৯ : ১৫ : ৫৩-৫৬] বক্তব্য থেকে আমরা অনেক নূতন ও আপাত-বৈপ্লবিক ধারণার উদ্ভব সম্পর্কে অবহিত হয়ে উঠি। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল, আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রাথমিক ভাবনার উন্মেষ, পবিত্র কর্মের বদলে জ্ঞানের মাধ্যমে অমরত্ব লাভের বিশ্বাস, আত্মার পুনর্জন্ম গ্রহণের আভাস ইত্যাদি। বস্তুত, উপনিষদে যে সমস্ত ভাবনার চূড়ান্ত বিকাশ হয়েছিল, ব্রাহ্মণ রচনাব অন্তিম পর্যায়েই তাদের প্রাথমিক উদ্ভবের সূচনা। নিঃশ্বাসরূপে প্রাণ (তখনও এক বচনে প্রযুক্ত) ধীরে ধীরে ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব অর্জন করেছে ; জৈবিক অস্তিত্ব অপেক্ষা তার ভূমিকা যে ভিন্নতর তা ব্রাহ্মণে আভাসিত। জৈমিনীয় উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ [৩ : ১ : ১ : ১৯] অনুযায়ী প্রাণদ্বারা যুক্ত হলে কেউ পাপ চিন্তা করে না, পাপ দর্শন করে না বা পাপের ঘ্রাণ নেয় না। অন্যভাবে বলা যায়, যখন ইন্দ্রিয়গুলি পাপ প্রত্যক্ষ করে জীবনের উপাদান তাদের থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, জীবন মূলত কল্যাণময় ঃ এই বিশ্বাস তখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে অতিজাগতিক জীবনীশক্তির সঙ্গে একাত্ম হয়েই প্রাণ সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। অগ্নি, বায়ু, সূর্য, অন্ন, বাক্— সমস্ত কিছুর প্রেরয়িতা হ'ল প্রাণ জৈমিনীয় [৮ : ২ : ৬]। অন্যভাবে বলা যায়, মানুষের নিজস্ব অনুবিশ্বে এবং ব্রহ্মাণ্ডের বিপুল জগতে একই জীবনধারা সক্রিয়, যার অভাবে সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। আবার, এর মধ্যে যে জ্ঞানতাত্ত্বিক সংশয় ও তৎপ্রসূত রহস্যময়তার উপাদান নিহিত, তা সেই যুগের ক্রমশ প্রসারিত ধর্মবোধের বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণ। নূতন ধর্মভাবনার উপযোগী তত্ত্ব ও আধ্যাত্মবিদ্যার কাঠামো গড়ে তোলার অনিবার্য তাগিদে অতীন্দ্রিয় আন্তঃসম্পর্ক কখনও কখনও ছদ্মযুক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছিল, আধুনিক পাঠকের কাছে যা হয়তো এমন হাস্যকর ব'লে প্রতিভাত হতে পারে। যাজকতান্ত্রিক ধর্মে যে নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ ভাষাব্যবহার অপরিহার্য উপাদানরূপে স্বীকৃত, ব্রাহ্মণ সাহিত্যে তার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়।

নীতিবোধ

ব্রাহ্মণ সাহিত্যে প্রাথমিক স্তরের নীতিবোধের উন্মেষ দেখা যায়। যদিও যজ্ঞমূলক আনুষ্ঠানিক ধর্মে নীতিবোধ যজ্ঞের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবেই গ্রথিত, তবু সামাজিক সমন্বয়ের পক্ষে সঙ্গতিপূর্ণ নৈতিক মূল্যবোধ নিশ্চয়ই সর্বদা বিদ্যমান ছিল। ব্রহ্মচারী ও পুরোহিতদের উদ্দেশে দানের উল্লেখ বহুস্থানে পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে [১১ : ৫ : ৬ : ২] বলা হয়েছে যে, প্রত্যেককেই প্রতিদিন পঞ্চবিধ অবশ্যপালনীয় নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান করতে হবে ; বেদাধ্যয়ন, পিতৃপুরুষের তর্পণ,

যজ্ঞানুষ্ঠান, প্রাণীদের উদ্দেশে অন্নদান এবং অতিথিসেবা। সুতরাং অতীত ঐতিহ্য, দেবতা, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, মানুষের বহির্জগৎ এবং সকল প্রাণিজগতের সঙ্গে জীবন্ত যোগসূত্র রক্ষা করা হ'ত। সে-যুগে আত্মসংস্কৃতির একমাত্র উপায় অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন থেকে লব্ধ সুফল সম্পর্কে ব্রাহ্মণ সাহিত্যে প্রচুর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বলা হয়েছে যে, বেদাধ্যয়ন মনকে পরিশীলিত করে, মনোনিবেশে সহায়ক হয় এবং যেহেতু জ্ঞানই মুক্তি দেয়, তাই শিক্ষার্থী স্বাধীন, আত্মনিয়ন্তা, জ্ঞানে পরিণত এবং ক্রমে যশস্বী হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণের পক্ষে কাম্য চারটি বস্তু হ'ল : উত্তম বংশপরিচয়, জ্ঞান অর্জন, খ্যাতি ও জনসাধারণের মনকে জ্ঞানে আলোকিত করার দায়িত্ব পালন। নিজ কর্তব্য পালন ক'রে ব্রাহ্মণ জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন, দান গ্রহণের উপযুক্ত হয়ে ওঠেন এবং সেই সঙ্গে তাদের অন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উপযোগী পুরোহিত হওয়ার গুণাবলী অর্জন ক'রে মৃত্যুদণ্ডের পরিসরের বহির্ভূত থাকতে পারেন। [শতপথ, ১১ : ৫ : ৭ : ১-২] ব্রাহ্মণের সমস্ত কর্তব্যের মধ্যে বেদাধ্যয়ন অর্থাৎ বেদ বিদ্যাকরাকেই অধিগত সর্বোত্তম ও যোগ্যতম রূপে প্রশংসা করা হয়েছে।

সত্য নৈতিক মূল্যের অন্তর্গতি ; সত্যই ব্রহ্ম কিংবা দেবতাই সত্য ; মানুষ অসত্য : ব্রাহ্মণে এধরনের কথা প্রায়ই শোনা যায়। অতিজাগতিক স্তরে সত্য হ'ল ঋত, যার প্রভাবে প্রকৃতি নির্দিষ্ট ছন্দে নিজেকে ব্যক্ত করে : এ যেন দেবতাদের অকথিত চুক্তি অথবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক অব্যর্থ অলঙ্ঘনীয় অপরিবর্তনীয় ও অমোঘভাবে সক্রিয় সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। এই বক্তব্যের নৈতিক তাৎপর্য এই যে, সত্যের অতিজাগতিক নিয়ম সকলকেই আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করতে হবে, বাক্যে সত্যের অপলাপ বা কার্যে চুক্তিভঙ্গ পরিহার করতে হবে। বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে উদ্ভূত নূতন ভাববস্তুগুলির অন্যতম হ'ল শ্রদ্ধা ; ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে প্রথম এর সাক্ষাৎ পাই ব'লে একে প্রাচীনতর ব্রাহ্মণগুলির সমসাময়িক রূপেই গ্রহণ করা যায়। আক্ষরিক ভাবে এর অর্থ হল 'বিশ্বাস'—ইন্দো-ইয়োরোপীয় একটি যে ধাতু (cred ১৪) থেকে এই শব্দটি উদ্ভূত ; তার অর্থই বিশ্বাস। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে শ্রদ্ধাকে বিশেষভাবে প্রশংসা করা হয়েছে। যে যুগে কেউ কেউ যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযোগিতা সম্পর্কে অসংকোচে সংশয় প্রকাশ করেছিল, সেই যুগে শ্রদ্ধা স্বভাবতই একটি নূতন তাৎপর্য অর্জন করেছিল। ব্রাহ্মণযুগে তপঃশক্তিকে ব্রহ্মের চূড়ান্ত প্রকাশরূপে গ্রহণ করার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। তপঃশক্তির মধ্যে দিয়েই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বিকাশ। তত্ত্ববিদ্যা, উদ্দেশ্যবাদ ও প্রেততত্ত্ব সম্পর্কে বেশ কিছু নূতন মূল্যবোধও একই সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করেছিল। পরবর্তী যুগে অর্থাৎ উপনিষদ্ রচনায় এই সব নূতন চিন্তা দৃঢ়তর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মৃত্যু ও মরণোত্তর জীবন সম্পর্কে নূতন ধরনের চিন্তার উল্লেখ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় হবার উপায় সম্পর্কেও অভিনিবেশের সূচনা

হয়। ব্রাহ্মণযুগে অবশ্য আনুষ্ঠানিক দৃষ্টিকোণই প্রাধান্য লাভ করেছিল। অন্ত্যেষ্টি সংস্কার সম্পর্কে চিন্তাভাবনার সূত্রে জন্মান্তরবাদেই আত্মসম্পর্কিত দার্শনিক প্রক্রিয়ার উদ্ভব ঘটে। সেই সঙ্গে দেখা দেয় পাপ সম্পর্কে নূতন সচেতনতা ; মরণোত্তর জীবনে পাপমুক্তির সম্ভাব্য প্রক্রিয়া সম্পর্কেও ব্রাহ্মণ সাহিত্যে মননের সূচনা হয়। পাপ-পুণ্য এবং পরলোক সম্পর্কে যে ভাবনা এতে অভিব্যক্ত হয়েছিল যেমন—শতপথ (১১ : ২ : ৬ : ১৩ ও ১১ : ২ : ৭ : ৩৩), তার সঙ্গে আমরা মিশরীয় ভাবনার তুলনা করতে পারি। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় যে, ব্রাহ্মণযুগেই মিশর ও মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে নৌবাণিজ্য সামরিক বিরতির পরে আবার নূতন এক পর্যায়ে শুরু হয়েছিল। সম্ভবত, তারই ফলে মিশরীয় প্রেততত্ত্বের কিছু কিছু প্রভাব ব্রাহ্মণ সাহিত্যে দেখা দেয়। অবশ্য স্বতন্ত্রভাবেও এর উদ্ভব হওয়া অসম্ভব নয়। ব্রাহ্মণযুগের প্রেততত্ত্বে মোটামুটি তিনটি ধারণার প্রকাশ ঘটেছে। প্রথমত, পবিত্র যজ্ঞানুষ্ঠানের বিকল্পরূপে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত ; দ্বিতীয়ত, নির্দিষ্ট যজ্ঞানুষ্ঠান পালনে ব্যর্থ বা পাপকর্মে নিরত ব্যক্তির জন্যই পুনর্জন্ম নির্দিষ্ট ; তৃতীয়ত, পুণ্যাত্মা ব্যক্তির জন্য পুরস্কাররূপে পুনর্জন্মের নিবারণ নির্দিষ্ট অধিকার, অর্থাৎ চিরন্তন কোনো সত্তার জগতে সেই ব্যক্তির পুনর্জাগরণ। ব্রহ্মে বিলীন হওয়া সম্পর্কিত ধারণার সূত্রপাত তখনো হয়নি ; তখনো সবচেয়ে আকাঙ্খিত ভবিষ্যৎ হ'ল আনন্দময় কোনো লোকে অমর মৃত্যুহীন অস্তিত্ব। বস্তুত সুখী পার্থিব জীবনের ভাবগত সম্প্রসারণের দ্বারাই মৃত্যু-অতিক্রান্ত শাশ্বত জীবনের কল্পনা গড়ে উঠেছিল।

আরণ্যক

সাধারণত প্রথাগতভাবে বৈদিক সাহিত্যকে দুটি প্রধানভাগে বিভক্ত করা হয়,—কর্মকাণ্ড (সংহিতা ও ব্রাহ্মণ) এবং জ্ঞানকাণ্ড (আরণ্যক ও উপনিষদ্)। এই বর্গীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বেদের অন্য একটি সংজ্ঞাও স্মরণ করতে পারি : 'মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্', যেখানে বেদের দুটি ভাগ কল্পিত হয়েছে, মন্ত্র (বা সংহিতা) ও ব্রাহ্মণ। এই বিভাজনে আপাতদৃষ্টিতে আরণ্যক ও উপনিষদ্ উল্লেখিত হয় নি। দুটি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই প্রচুর সত্য রয়েছে, তবে, দ্বিতীয় বর্গীকরণে বিষয়বস্তু অপেক্ষা আঙ্গিকের উপরেই যেন অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। কেননা, সংহিতা নিঃসংশয়ে একটি সাহিত্যমাধ্যম ; পরবর্তী রচনাগুলির চরিত্রবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কোনো সাদৃশ্যই তার নেই। ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক কিংবা আরণ্যক ও উপনিষদ্ কিংবা ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের মধ্যে আমরা তেমন কোনো স্পষ্ট রচনাভঙ্গিগত ভেদরেখা কল্পনা করতে পারি না ; মাঝে মাঝে এই তিন শ্রেণীর রচনা পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশ্রিত হয়ে পরস্পরের সীমা লঙ্ঘন করেছে। ফলে, মাধ্যমগত বিন্যাস অনুযায়ী আমাদের নিকট দুটি প্রধান ও স্পষ্ট শ্রেণী প্রকট হয়েছে,—সংহিতা ও সংহিতা-পরবর্তী সাহিত্য, যাতে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ ইচ্ছামতো সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে, শ্রেণীবিন্যাসের দ্বিতীয় রীতি অর্থাৎ সংহিতা পরবর্তী সাহিত্যই অধিক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এতে দুটি ভিন্ন যুগ, অঞ্চল বা ধর্মীয় দর্শনের মূল প্রতিফলিত হয়েছে। জ্ঞানকাণ্ডের সমগ্র যুগ ধ'রে যজ্ঞানুষ্ঠানের ক্রমাগত অবমূল্যায়নের ফলে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

যদিও প্রত্যেক সংহিতার এক বা একাধিক পৃথক ব্রাহ্মণ রয়েছে, তবু প্রত্যেক সংহিতার কিন্তু নিজস্ব আরণ্যক বা উপনিষদ্ নেই। কয়েকটি গ্রন্থ ব্রাহ্মণ অংশেই সমাপ্ত, আবার কয়েকটি গ্রন্থের সমাপ্তি ঘটেছে আরণ্যকে। তেমনি কয়েকটি সংহিতার অব্যবহিত পরবর্তী অংশ হ'ল উপনিষদ্, আবার কয়েকটিতে কোনো আরণ্যকই নেই। শুধুমাত্র তিনটি ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্—সবই পাওয়া যাচ্ছে : ঋগ্বেদের ঐতরেয় ও কৌষীতকি এবং যর্জুবেদের তৈত্তিরীয়। সুতরাং যে শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী রচনার প্রধান এবং সর্বতোভাবে পরস্পর-নিরপেক্ষ দুটি মাধ্যম অর্থাৎ সংহিতা ও ব্রাহ্মণকে নির্দেশ করা হয়েছে, তারই যুক্তিযুক্ততা অবশ্যই স্বীকার করা উচিত।

শেষোক্ত সাহিত্যরীতির তরলায়িত অবস্থা একটি গ্রন্থের যৌগিক নামকরণে ব্যক্ত হয়েছে : কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপণিষদ্ ; লক্ষণীয় এই যে, এতে আরণ্যক উল্লেখিত হয় নি। তেমনি জৈমিনীয় উপনিষদ্ ব্রাহ্মণেও আরণ্যকের উল্লেখ নেই ; তাছাড়া 'ব্রাহ্মণ' শব্দটি এখানে উপনিষদের পরে ব্যবহৃত হয়েছে। সমগ্র গ্রন্থটি বিচার করলে দেখা যায় যে, তলবকার শাখার আরণ্যকের বৈশিষ্ট্য এই গ্রন্থে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এসব থেকে সেই স্তরের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, যখন লেখকেরা নতুন ধরনের সাহিত্যিক প্রবণতা সম্পর্কে ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠছিলেন, কিন্তু পৃথক মাধ্যমরূপে নতুন রচনাগুলি তখনও নির্দেশিত বা বর্গীকৃত হয় নি। 'আরণ্যক' নামটি সম্ভবত শুধু রচনার স্থানগত তাৎপর্যই বহন করছে, অর্থাৎ অরণ্যভূমি যা বহু অনুপুঙ্খযুক্ত সুদীর্ঘ যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত ছিল না ; সেখানে অবসরপ্রাপ্ত গৃহস্থদের উপযুক্ত ন্যূনতম কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সম্ভবত হ'ত, যার মধ্যে সম্ভবত ছিল অগ্নিহোত্র ও কিছু কিছু সরল গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান। এখানে যজ্ঞ থেকে উত্তীর্ণ ধর্মাচারণ অর্থাৎ তত্ত্বান্বেষণের চর্চাই হ'ত।

বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ গোল্ডষ্টুকের আমাদের এই তথ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, শুধু অরণ্যে বসবাসকারী ব্যক্তি অর্থেই পাণিনি 'আরণ্যক' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। 'অরণ্যে রচিত গ্রন্থ' অর্থে 'আরণ্যক' শব্দের প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন কাত্যায়ন—আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ; সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, ঐ সময়ের কাছাকাছি 'আরণ্যক' পৃথক প্রকাশ মাধ্যমরূপে স্বীকৃত হয়ে গিয়েছিল। আঙ্গিক ও মূলভাবের বিচারে আরণ্যক ও উপনিষদ্‌কে যুগ পরিবর্তনের সাহিত্য ব'লে গণ্য করা যায়। আরণ্যকের প্রবণতা অরণ্যভূমির অধিবাসীদের জ্ঞান ও সন্ন্যাসের অন্বেষণের প্রতি, কারণ তখনও স্পষ্টভাবে কোনো মতবাদ এরা প্রচার করে নি ; অথচ পরবর্তী যুগের উপনিষদে কখনো নূতন মতবাদ প্রকাশের তাগিদ পরিস্ফুট হয়েছে।

বিষয়বস্তু

ঐতরেয় আরণ্যকের প্রথম ও শেষ অধ্যায়গুলিতে মহাব্রত অনুষ্ঠান আলোচিত হয়েছে, যা চরিত্রগতভাবে ব্রাহ্মণের সঙ্গে তুলনীয়। চতুর্থ অধ্যায়ে অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত নয়টি ঋক্ (শাক্বর ও মহানাম্নী) বিবৃত হয়েছে ; বিষয়বস্তুর বিচারে অন্তত এই অংশটি ব্রাহ্মণতুল্য। শুধু দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়কেই যথার্থ আরণ্যক লক্ষণযুক্ত ব'লে গ্রহণ করা যায়। গভীরতর বিচারে দেখা যায় যে, এই আরণ্যক বস্তুত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অন্তর্গত উপবিভাগ বা কাণ্ডমাত্র। যথার্থ ব্রাহ্মণ সাহিত্যের ঐতিহ্য অনুযায়ী পাঁচটি অধ্যায়ের মধ্যে তিনটিতে যজ্ঞানুষ্ঠান আলোচিত হয়েছে, নিতান্ত প্রসঙ্গক্রমে

তাতে কাল্পনিক ব্যুৎপত্তি ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যায়। চিত্রকল্পগুলিতে ব্যবহৃত ব্যাকরণগত অনুপুঙ্খসমূহের সঙ্গে পরিচিতির ইঙ্গিত থাকায় ঐতরেয় আরণ্যকের অর্বাচীনতা স্পষ্ট।

ঋগ্বেদের অপর আরণ্যকের নাম শাঙ্খায়ন বা কৌষীতকি আরণ্যক, এর পনেরোটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম দুটিতে মহাব্রত অনুষ্ঠান বিবৃত হয়েছে এবং তা ব্রাহ্মণ অংশেরই অন্তর্গত। তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে যজ্ঞানুষ্ঠানের তাৎপর্য সম্পর্কে চিত্রগার্গ্য ও শ্বেতকেতুর মধ্যে সংলাপ। চতুর্থ অধ্যায়ে কৌষীতক পৈঙ্গেয় ও শুষ্কভৃঙ্গারের মধ্যে একটি সংলাপে একটি সাধারণ বিষয়বস্তু—প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহের প্রতিযোগিতা চিত্রিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে প্রতর্দন ও ইন্দ্রের সংলাপ এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে গার্গ্য ও অজাতশত্রুর সংলাপ। শেষ অধ্যায়ের একটি অংশে এই আরণ্যক স্পষ্টত নতুন সাহিত্যাদর্শের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে প্রতীকী বিশ্লেষণের প্রতি প্রবণতার মধ্যে। বিষয়বস্তুর মধ্যেও ঔপনিষদিক ভাবধারার উন্মেষের আভাস পাওয়া যায়: সপ্তম অধ্যায়ে বিবিধ বিষয়বস্তু, অষ্টম ও নবমে প্রাণের উপাসনা, দশমে আধ্যাত্মিক অগ্নিহোত্র এবং একাদশে প্রজাপতি কর্তৃক পুরুষের মধ্যে দেবতাদের প্রতিষ্ঠা বিবৃত হয়েছে। শেষোক্ত অধ্যায়ে সেই সঙ্গে স্বপ্ন ও অশুভ লক্ষণসমূহ আলোচিত হয়েছে ব'লে এর পৃথক গুরুত্ব রয়েছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে আশীর্বাদ ও সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য অনুষ্ঠান আলোচিত হয়েছে। ত্যাগের মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ রয়েছে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে। চতুর্দশ অধ্যায়ে বেদাধ্যয়নের মহিমা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে অবহেলাকারীর উদ্দেশে নিন্দাবাদও বর্ষিত হয়েছে। পঞ্চদশ অধ্যায়ে বহুপ্রজন্ম-ব্যাপী শিক্ষকদের নামের এক সুস্পষ্ট তালিকা আছে। বহু অংশেই আসন্ন মৃত্যুর লক্ষণসমূহ এবং পরলোক ও প্রেততত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে।

প্রচলিত আরণ্যকগুলির মধ্যে তৃতীয় ও শেষ রচনা হল তৈত্তিরীয় আরণ্যক; স্বভাববৈশিষ্ট্যেই এটি ভিন্ন, কারণ এতে এমন কিছু উপাদান আছে যা এই শ্রেণীভুক্ত অন্য দুটি গ্রন্থে পাওয়া যায় না। দশ অধ্যায়ে বিন্যস্ত গ্রন্থটির অন্তত এক-তৃতীয়াংশ নানাধরনের বিষয়বস্তু বিবৃত করেছে। বিভিন্ন প্রকারের নামের দীর্ঘ তালিকা, প্রতিশব্দ, নৈসর্গিক বস্তুর শ্রেণীবিভাজন এবং স্বাস্থ্য, ধন, সন্তান, পরমায়ু, বিজয় ও স্বর্গলাভের জন্য সংহিতার দেবতাদের কাছে অসংখ্য সংহিতা-জাতীয় প্রার্থনা। এছাড়া এতে ধর্মসূত্রের উপযোগী বিষয়বস্তুও খুঁজে পাওয়া যায়। এটা আরও স্পষ্ট, কারণ ইতোমধ্যে জাতিভেদ প্রথা স্বীকৃত সামাজিক সত্য হয়ে উঠেছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যক তিনটি ভিন্ন বর্ণের জন্য এমন সব ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম গ্রথিত করেছে, যার মধ্যে ধর্মসূত্রের প্রত্যক্ষ পূর্বাভাস পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে বহু স্তোত্র এবং ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদের কিছু কিছু সম্পূর্ণ সূক্ত খুঁজে পাওয়া যায়। এমন কি যজুর্বেদীয় ধারার জাদুবিদ্যা সূচক পুনরাবৃত্তিপূর্ণ বহু গীতিও এতে আছে।

আঙ্গিক

প্রাচীন দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদিত সূক্তগুলি সাধারণভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পঙ্‌ক্তিতে গ্রথিত, আহুতি গ্রহণের জন্য সেখানে দেবতাদের অনুরোধ জানানো হয়েছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সর্বত্রই প্রকৃত যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রক্ষিত হয়েছে। অন্যের পক্ষে ক্ষতিকর ইন্দ্রজাল এতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে ; চতুর্থ অধ্যায়ের অধিকাংশ স্থানেই ভবিষ্যদবাণী, শুভাশুভ লক্ষণ গণনা, ব্যাধি ও স্বপ্ন আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া, লোকায়ত ধর্মের উপাদানলব্ধ অসুর এবং রাক্ষস-রাক্ষসী প্রাধান্য পেয়েছে।

যথার্থ আরণ্যক অংশগুলিতে ব্রাহ্মণ্য অনুষ্ঠানসমূহ একধরনের ছদ্মযুক্তি বিস্তারের মাধ্যমে ব্যাঘাত হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ের সূচনা ব্যাকরণ ও শিক্ষা আলোচনা দিয়ে, কিন্তু অল্প পরেই এই প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে যে, সংহিতার 'উপনিষদ্' ব্যাখ্যা করা হবে। এই কথাটি বিশেষ তাৎপর্যবহ, কারণ এখানে সর্বপ্রথম বলা হল যে, সংহিতাগুলির একটি গোপন তাৎপর্য (উপনিষদ্) আছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যক অতীন্দ্রিয় রহস্যযুক্ত আধ্যাত্মিক বিবৃতিকে উপনিষদ্ নামে অভিহিত করেছে। সপ্তম অধ্যায় পাঁচটি বিভাগে বিন্যস্ত—প্রাকৃতিক, অতিজাগতিক, বিদ্যাচর্চা বিষয়ক, পারিবারিক ও আধ্যাত্মিক ; শেষোক্ত অধ্যায়ের লক্ষ্য হ'ল উন্নততর জ্ঞান অর্জন ও প্রজ্ঞার অনুশীলন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের কিছু কিছু শ্লোক কয়েকটি উপনিষদেও পাওয়া যায় ; তবে, এসব ক্ষেত্রে পারস্পরিক ঋণ গ্রহণের সম্ভাবনার চেয়ে জনসমাজে দীর্ঘকালব্যাপী ভাসমান আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির সাহিত্যভাণ্ডার থেকে এদের উৎপত্তির সম্ভাবনাই প্রবলতর। ঋগ্বেদের বিভিন্ন সূক্ত থেকে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ইচ্ছামতো উদ্ধৃত ক'রে পরস্পরের সঙ্গে মিশ্রিত করার সময়ে কখনো কখনো সেগুলির ঈষৎ পরিবর্তনও করা হয়েছে।

দশম অধ্যায়ে একটি কৌতূহলজনক ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন দেবতা নারায়ণের গৌরবায়নের অব্যবহিত পরে রুদ্রের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। ফলে, এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে পড়ে যে, সংহিতার প্রাচীনতর দেবতারা এই পর্বে পৃথক পৃথক ধর্মগোষ্ঠীগত ধর্মচর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়েছেন। সমাজে অনিবার্যভাবে যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হচ্ছিল,—তা ধর্মতত্ত্বের স্তরে এবার প্রতিফলিত হ'ল।

আঙ্গিক ও ভাষাগত বিচারে ঐতরেয় আরণ্যক সম্পূর্ণতই ব্রাহ্মণচরিত্রযুক্ত, যদিও এর বহু আঙ্গিকগত দিক ঋগ্বেদীয় পর্যায় থেকে উদ্ভূত এবং স্পষ্টত এতে

সেই সময়ের অভিব্যক্তি ঘটেছে যখন যজ্ঞীয় ধর্ম পরিপূর্ণভাবে বিকশিত। রচনার সাধারণ কাঠামো হ'ল কোনো নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক মন্ত্রসমূহের উদ্ধৃতি এবং পরে সেই অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যা। উদীচ্য বা উত্তরাঞ্চলের উপভাষার তখনও প্রাধান্য আছে, 'র' ধ্বনির বিকল্পরূপে খুব কম ক্ষেত্রেই 'ল' ধ্বনির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, তবে মধ্যদেশের উপভাষার প্রভাব বহুক্ষেত্রে প্রত্যক্ষগোচর। তখনও উপসর্গ ক্রিয়াপদ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। ব্রাহ্মণ সাহিত্যের ঐতিহ্যনুযায়ী শব্দসমষ্টির পুনরাবৃত্তি তখন পর্যন্ত সাধারণভাবে প্রচলিত। কখনো কখনো কয়েকটি নূতন ছন্দও ব্যবহৃত হয়েছে।

শাঙ্খায়ন আরণ্যকের মধ্যে আমরা ব্যাকরণ-সচেতনতার প্রমাণ পাই, ঐতরেয় আরণ্যকের রচনা-শৈলীর মতো এই গ্রন্থের শৈলী ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সর্বতোভাবে গতানুগতিক এবং একই কারণে এখানে সূত্রকারে দীর্ঘস্তবকের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে বহু শ্লোক গ্রথিত হয়েছে, কিন্তু গদ্য সাধারণভাবে নিষ্প্রাণ। পরবর্তীকালের অধিকাংশ ব্রাহ্মণের সমসাময়িক পাণিনির নিয়মাবলীর সঙ্গে এই আরণ্যকে প্রতিফলিত ব্যাকরণের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রধান ছন্দ হ'ল অনুষ্টুপ্, এই তথ্য থেকে সম্ভবত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, আলোচ্য আরণ্যকের শ্লোকগুলি পরবর্তীযুগের মহাকাব্য এবং সমাজদেহে ভাসমান গীতিকাগুলির ভিত্তি রচনা করেছে। আলোচ্য আরণ্যকে কিছু কিছু কাব্যগুণান্বিত চিত্রকল্প পাওয়া যায় ; মোটামুটিভাবে ভাষার প্রাচীনতার অনেক লক্ষণ থাকায় তার সঙ্গে অব্যবহিত উত্তরসূরীর উপনিষদ্ অপেক্ষা সংহিতার সঙ্গে অধিকতর সাদৃশ্য পরিস্ফুট হয়েছে। ভাষা ব্যবহারের অভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকে মধ্যদেশের উপভাষার প্রমাণ পাওয়া যায়। গায়ত্রী যে ইতোমধ্যে বিধিবদ্ধ হয়ে পড়েছে, তা এর বহু বিকল্প প্রয়োগ থেকে সুস্পষ্ট।

আরণ্যকের সাহিত্যগত তাৎপর্য যদিও নিতান্ত ক্ষীণ, তবুও কখনো কখনো কাব্যিক সৌন্দর্যের আভাস পাওয়া যায়, যা অভিজ্ঞতার গভীরতা ও মহিমা এবং জীবন সম্পর্কিত অন্তর্দৃষ্টির উপর অধিকমাত্রায় নির্ভরশীল ; শুধু আলঙ্কারিক প্রয়োগ বা প্রকৃতি-বর্ণনাকে এতে পৃথক গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। তবে, অতি দীর্ঘায়িত সূত্র এবং ঐন্দ্রজালিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত শব্দা স্বরের পুনরাবৃত্তি অধিকস্থান অধিকার করার ফলে চিত্রকল্প ও প্রেরণালব্ধ রচনার মান রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। বহু সীমাবদ্ধতার মধ্যে দৈনন্দিন জীবন থেকে আহৃত উপমা কিংবা পর্যবেক্ষণলব্ধ বর্ণনা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সমাজচিত্র

আনুষ্ঠানিক বা আধ্যাত্মিক আলোচনা উত্থাপন করার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাখ্যান ও লোকশ্রুতি একত্র ক'রে আমরা আরণ্যকের সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। ঐতরেয় আরণ্যকে বলা হয়েছে যে, ইন্দ্র যখন উপদেশের জন্য বিশ্বামিত্রের নিকট গমন করেছিলেন, তখন ঋষি বলেছিলেন যে, অন্নই হ'ল শ্রেষ্ঠ। তত্ত্ব [২ : ২ : ৪] শাঙ্খায়নেও এই ধারণার পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায় [৮ : ২ : ১, ৯ : ৭ : ১, ৯ : ৯ : ১]।

অনুরূপভাবে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছে যে, ভৃগু যখন তাঁর পিতা বরুণের নিকট উপদেশ চেয়েছিলেন, বরুণ তখন তাঁকে অন্ন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বেশকিছু তত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন (৯ : ১১)। এভাবে বিভিন্ন আরণ্যকের বিচ্ছিন্ন কিছু উপাখ্যান থেকে আমরা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তৎকালীন সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই।

ইতোমধ্যে সন্ন্যাস যে মহান্ ও গৌরবজনক একটি আধ্যাত্মিক চর্চার উপায় ও ধর্মস্পদরূপে স্বীকৃত, আরণ্যকে তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐতরেয়তে ভরদ্বাজকে সর্বাধিক বিদ্বান, সর্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী এবং ঋষিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে (১ : ২ : ২ : ৪)। আরণ্যকে জাতিভেদ প্রথা সামাজিক বাস্তবরূপে প্রতিষ্ঠিত ; বহুস্থানে আমরা বিভিন্ন বর্ণের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে তির্যক্ কিছু উল্লেখ দেখতে পাই। পারস্পরিক অভিবাদনের রীতি সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায়, পরবর্তী ধর্মসূত্রের সঙ্গে তাদের বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী ব্রাহ্মণদের মধ্যেও যে শ্রেণীভেদ ছিল, তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত চোখে পড়ে। অরণ্য-মধ্যবর্তী আশ্রম নিবাসী শিক্ষকদের সঙ্গে রাজ-পুরোহিতদের যে বৈষম্য প্রকট হয়ে উঠেছিল তাও এতে বেশ স্পষ্ট। বিদ্যাদাতা ব্রাহ্মণরা অরণ্যবাসী হওয়ার ফলে সাধারণভাবে ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত ছিলেন, কিন্তু অন্য একটি কারণে তাঁরা ছিলেন অধিকতর সম্মানিত ; কারণ ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁরা পুত্র বা শিষ্য ব্যতীত অন্য কাউকে শিক্ষা দিতেন না, বিশেষত অযজমান ব্যক্তিকে কখনোই ব্রহ্মবিদ্যা দান করা যেত না। অতএব, গুরুপরম্পরা বা প্রজন্মক্রমে এইসব গূঢ়তত্ত্বের আচার্যরা সমাজমানসে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

আনুষ্ঠানিক অনুপুঙ্খের সঙ্গে সম্পর্কিত বহু প্রাচীনতর শাস্ত্রবিশেষজ্ঞদের বক্তব্য উদ্ধৃত হওয়ায় দীর্ঘ ধর্মতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের জটিলতা ও পরিণতিই প্রমাণিত হয়েছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে [১ : ১১ : ৮] বলা হয়েছে যে, জ্ঞানই মানবজাতির পক্ষে সর্বাধিক বাঞ্ছনীয় বস্তু ; জ্ঞানী ব্যক্তিরাই প্রকৃত সজ্জন। নর-নারীর পারস্পরিক

সান্নিধ্যের সম্বন্ধে কতকটা উদার মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে ঃ বিবাহিত ও অবিবাহিত—এই উভয়বিধ নারীর গর্ভস্থ সন্তানকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা নিবেদিত হয়েছে।

এই পর্যায়ে জাতীয় সম্পদ মূলত কৃষিকার্য থেকে উদ্ভূত হ'ত ; ভারবাহী পশু, কৃষক, লাঙল, চাবুক ও চামড়ার পাতলা ফালির স্পষ্ট উল্লেখ ছাড়াও পৃথিবীর উদ্দেশ্যে উচ্চারিত একটি দীর্ঘ সূক্তে প্রচুরতর শস্যের আকাঙ্খায় রচিত প্রার্থনার মধ্যে কৃষিকার্যের সীতা শুনাসীরের উপর দেবত্ব আরোপিত হয়েছে। লক্ষণীয় যে, পর্যাপ্ত শস্য-উৎপাদক পৃথিবীকে এই পর্যায়ে নিম্নোক্ত বিশেষণসমূহে ভূষিত করা হয়েছে ঃ বসুন্ধরা, ধরণী, লোকধারিণী, গন্ধদ্বারা, দুরাধর্ষা, নিত্যপুষ্টা ও করীষিণী শাঙ্খায়ন আরণ্যক, [১০ : ১]। এসব বিশেষণ থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হচ্ছে যে, তখনকার জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা প্রাথমিকভাবে কৃষিনির্ভর ছিল। তবে খাদ্যের জোগান পর্যাপ্ত বা নিয়মিত ছিল না ; দারিদ্র্যের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়,—দারিদ্র্যের গ্রাস থেকে মুক্তি পাওয়ার আশাই বহু প্রার্থনার মর্মবস্তু। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা তখনো প্রবল শত্রুরূপে গণ্য (অশনায়া ও পিপাসা অর্থাৎ ক্ষুধা ও তৃষ্ণা) ; প্রজাপতি সৃষ্টি করার পরে তারা মানুষের শরীরে প্রবিষ্ট হয়েছিল। সংহিতার মতো আরণ্যকেও হৃতস্বাস্থ্যের উদ্ধার, কার্যশক্তির বৃদ্ধি, চমৎকারিত্ব এবং উত্তম সন্তান লাভের জন্য প্রার্থনা সাধারণভাবে ব্যক্ত হয়েছে। অত্যন্ত কঠোর রীতিতে বিধিবদ্ধভাবে বিশেষ ধরনের কুবের-পূজার বিধান দেওয়া হয়েছে ; দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সর্বহারাকে এই পূজা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ক'রে অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য প্রেরণাও দেওয়া হয়েছে। পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্যতম 'নৃযজ্ঞ' ইতোমধ্যে কেবল ব্রাহ্মণদের উদ্দেশে অন্নদানের সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। বেদাধ্যয়ন অরণ্যে থেকেই অভ্যাস করতে হবে, এমন কথাও পড়ি। দুর্বল ও অশক্ত ব্যক্তিদের জন্য নানাবিধ বিকল্প যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধান দেওয়া হয়েছে। এটা এমন একটা সময় যখন প্রাচীন ধর্ম নানা রকম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নূতন একটি রূপ পরিগ্রহ করেছিল। উপাসনা পদ্ধতিরূপে পূজার প্রবর্তন, গুরুত্বপূর্ণ নূতন দেবতারূপে কুবেরের আবির্ভাব ইত্যাদি ছাড়াও ভাবী অমঙ্গলের লক্ষণ, স্বপ্ন, কবচ ও কবচ নির্মাণ ও পরিধানের ঐন্দ্রজালিক আচার সাহিত্যের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এ সময় ভৌগোলিক পরিসর আরও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিস্তৃত হয়েছে, কারণ গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী জনসাধারণই অপেক্ষাকৃত শ্রদ্ধেয়রূপে পরিগণিত। আমরা কুরু পাঞ্চাল, উশীনর, মৎস্য, কাশী ও বিদেহের কথা শুনতে পাই, যে সব অঞ্চল পরবর্তীকালে 'মধ্যদেশ' নামে পরিচিত হয়েছিল। সামাজিক জীবন সম্পর্কে সাধারণ চিত্রটি হ'ল তুলনামূলকভাবে শান্তিবৃদ্ধি ও সাংস্কৃতির। তৈত্তিরীয়ে বীণা সম্পর্কিত (দৈব ও মানবিক—এই উভয়বিধ) একটি

দীর্ঘ আলোচনা (২ : ৩ : ১) থেকে অনুমান করা যায় যে, সে সময় ললিতকলার, বিশেষত সঙ্গীতের চর্চা প্রচলিত ছিল।

আরণ্যকে প্রতিফলিত নীতিচিন্তা মুখ্যত সত্য ও অসত্য সম্পর্কে কাব্যিক অভিব্যক্তির মধ্যে আভাসিত হয়েছে। নারী-সমাজের শুচিতার সঙ্গে সতীত্বের ধারণা তখন থেকেই সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছে। পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে পাপ সম্পর্কে নূতন চিন্তার সূত্রপাত লক্ষ্য করা যায়, বিশেষত কুসীদ প্রত্যর্পণে ব্যর্থতার জন্য ক্ষয়-রোগ ও মৃত্যুদণ্ড নিরূপিত হয়েছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ঋণপরিশোধ ও শাস্তি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে ধর্মবোধ ও মুক্তির নতুন চিন্তাও আভাসিত (২ : ৬) তবে, কৃষিজীবী সমাজের কাছে পাপ-পূণ্য যে সব সামাজিক প্রয়োজন অনুযায়ী নিরূপিত হচ্ছে, তার ইঙ্গিত স্পষ্ট। একই কারণে যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিও তাৎপর্যপূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিল। নতুন একটি সাহিত্য শ্রেণীরূপে আরণ্যকের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য এই যে, সর্বপ্রথম যজ্ঞানুষ্ঠানগুলি এতে অতিপ্রাকৃত ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী নতুনভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। দেবকাহিনী অনুষ্ঠান ও প্রার্থনা সম্পর্কিত পূর্ববর্তী চিন্তাভাবনা পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতিতে এখন যেন অপর্যাপ্ত ব'লে বিবেচিত হয়েছে। আরণ্যকে পূর্ববর্তী ধর্মচর্চার পুনর্বিশ্লেষণের পশ্চাতে যে যুক্তিবোধ ক্রিয়াশীল তা মূলত অতীন্দ্রিয় রহস্যজাত। ব্রাহ্মণ পর্যায়ের যজ্ঞ বিশ্লেষণে এর প্রাথমিক বীজ অঙ্কুরিত হলেও এ ক্ষেত্রে তা নিশ্চিতভাবে ভিন্ন দ্যোতনাযুক্ত।

আরণ্যকে ঐতিহ্যগত বিষয়বস্তুর প্রতীকী পুনর্বিশ্লেষণের মধ্যে উপনিষদের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। স্বাধ্যায়ের উপর আরোপিত বিশেষ গুরুত্ব, তার গৌরবায়ণ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ে অনধ্যায় সম্পর্কিত নতুন নিয়মাবলী সম্পূর্ণত নতুন দৃষ্টিভঙ্গির-ই পরিচয় বহন করছে। আরণ্যক পর্যায়ে স্বাধ্যায় যেন বিশেষ এক ঐন্দ্রজালিক পবিত্রতা অর্জন করেছে। স্পষ্টত স্বাধ্যায়ের মূল অর্থ ছিল দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যদের দ্বারা ঋগ্বেদ সংহিতার আবৃত্তি ; পরবর্তী পর্যায়ে এর অর্থ দাঁড়াল ঋগ্বেদের অংশ বিশেষ এবং আরো পরবর্তী কালে শুধু গায়ত্রীমন্ত্র আবৃত্তি করা। কালক্রমে তাই আরণ্যকের নির্দেশক বক্তব্যে পরিণত হ'ল। ঐতরেয় আরণ্যকের একটি প্রাসঙ্গিক বক্তব্যের (৫ : ৩ : ২) তাৎপর্য একাধিক স্তরে প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত, স্বাধ্যায় একসময় বহু ব্যক্তিদ্বারা অবহেলিত হয়েছিল ব'লে এখানে তার সামাজিকভাবে পুনর্বাসনের চেষ্টা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, স্বাধ্যায়ের অনুশীলন থেকে আত্মজ্ঞান ও সত্যবোধ অর্জিত হয় ; এর দ্বারা বুঝি যে জ্ঞান তৎকালীন সমাজে আকাঙ্ক্ষিত আধ্যাত্মিক মূল্য পেয়ে গেছে। তৃতীয়ত, এই বক্তব্য মহাব্রত অনুষ্ঠান

সম্পর্কিত নির্দেশাবলীর উপসংহারে রয়েছে যে, অনুষ্ঠান নাকি স্বাধ্যায় ব্যতীত অসম্পূর্ণ—আনুষ্ঠানিক প্রসঙ্গে এধরনের বিবৃতি কতকটা অপ্রত্যাশিত।

বর্ষকালব্যাপী গবাময়ন যজ্ঞের অন্তর্গত একদিবসীয় মহাব্রত অনুষ্ঠানটি বিশেষভাবে ঋগ্বেদের ঐতরেয় ও শাঙ্খায়ন আরণ্যকে পুনর্বিশ্লেষিত হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, অর্বাচীন যজ্ঞগুলির অন্যতম গবাময়নকে বৈদিক ধর্মের কর্মমূলক ও জ্ঞানমূলক স্তরের মধ্যে সেতুবন্ধন করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এই দিক দিয়ে দেখা যায়, জ্ঞানতৃষ্ণা অন্ততপক্ষে ব্রাহ্মণ যুগের সমকালীন। তবে, আরণ্যক পর্যায়ে মৌলিক গুরুত্ব অর্জন করবার পূর্বে তা গবাময়নকে, বিশেষত এর অন্তর্গত মহাব্রত অনুষ্ঠানকে যজ্ঞানুষ্ঠান ও জ্ঞানচর্চার সেতুরূপে গ্রহণ করেছে, এই প্রক্রিয়ার পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং তৎকালে উদীয়মান আধ্যাত্মিক প্রবণতার উপযোগী একটি বিশেষ ও অপেক্ষাকৃত নূতন অনুষ্ঠানকে অভিনব দৃষ্টিভঙ্গিতে পুনর্বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। এ ধরনের পুনর্বিশ্লেষণ যুক্তিনিষ্ঠ না হয়ে অতীন্দ্রিয় দ্যোতনাযুক্ত হয়েছে ; বিশ্লেষণের এই [illegible] ব্রাহ্মণ ঐতিহ্যেরই প্রত্যক্ষ উত্তরসূরী। ঐতরেয় ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকের বহুস্থানে এর নিদর্শন রয়েছে। বৈদিক যজ্ঞের প্রতীকায়ণ ও মানস যজ্ঞানুষ্ঠানের বিবৃতিতে কিছু কিছু বেদোত্তর লোকায়ত ধর্মচর্চার মৌলিক অভিব্যক্তির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। প্রত্ন-অধ্যাত্মভাবনার পাশাপাশি আমরা অকৃত্রিম জাদুচর্চার প্রবণতারও আভাস পাই। জীবনের সম্বন্ধে ঐন্দ্রজালিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যক্ষ নিরবছিন্ন প্রকাশরূপে দেহ, মন ও আত্মার অতীন্দ্রিয় বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায়। এই প্রবণতাই আরো পরবর্তীকালে তন্ত্রসাহিত্যে সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল।

দেবসঙঘ

ধর্মভাবনায় নূতনতর প্রবণতার উন্মেষের ফলে বৈদিক দেবতারা তাঁদের প্রাচীন মহিমার কিয়দংশ হারিয়ে ফেলেছিলেন। ব্রাহ্মণ যুগে এই প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয়ে, সেই যুগেই তা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হলেও, আরণ্যকে তার ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়া অব্যাহত। ঐতরেয় আরণ্যকে (২ : ১ : ৮) বলা হয়েছে যে, পৃথিবীতে মানুষের প্রদত্ত খাদ্যসামগ্রীর উপরই দেবতারা নির্ভরশীল। এই পর্যায়ে দুটি স্পষ্ট প্রবণতা লক্ষণীয় ; প্রথমত, লোকায়ত অনৈষ্ঠিক দেবতাদের প্রবর্তন এবং দ্বিতীয়ত, সমস্ত দেবতার এমন এক সর্বোত্তম দেবতার মধ্যে আশ্রয়লাভ, যিনি সমস্ত প্রাচীন দেবসঙ্ঘের সম্পূরক হয়ে উঠেছেন। কুবের বৈশ্রবণ এখন হোমের পরিবর্তে বলিভুক। এই নির্দেশের পরবর্তী স্তোত্রে ধর্ম সম্পর্কে পুরাণ-কথিত উপাসনাপদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আভাসিত হয়েছে। রতি বিশ্বাবসু, দণ্ডী, গরুঢ়, দুর্গা, তৎপুরুষ, কন্যাকুমারী, নারায়ণ ও বাসুদেবের উদ্ভব ঘটেছে। একই স্তবকে অগ্নিতুল্য উজ্জ্বল ও দুর্গতিতারিণী

দুর্গাদেবীকে আহ্বান করা হয়েছে। নারায়ণের উদ্দেশে নিবেদিত সূক্তটিতেও দেখি নূতন বৈশিষ্ট্য ; সমুদ্রনিবাসীরূপে তিনি এখানে বর্ণিত। বস্তুত, এখানেই মহাকাব্য ও পৌরাণিক ঐতিহ্যের অন্যতম কেন্দ্রীয় দেবতা নারায়ণের প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া গেল।

অম্বিকার পতিরূপ রুদ্র আহূত হয়েছে—শুক্ল যজুর্বেদে (১৬শ) তিনি অম্বিকার ভ্রাতা ও উমার স্বামী ; স্বয়ং উমাকে পাওয়া গেছে কেনোপণিষদে। অদিতির উদ্দেশে নিবেদিত একটি আগ্রহোদ্দীপক সূক্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ—সেখানে তাঁকে সকল প্রাণী, পৃথিবী এবং পরমপুরুষের মাতারূপে সম্বোধন করা হয়েছে, আমাদের কাছে সেই পরমা মাতৃকাদেবীর উত্থান এখানে আরও স্পষ্টতর হয়ে ওঠে, পৃথিবী যাঁর ভিত্তিভূমি ; কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীর পক্ষে তা-ই স্বাভাবিক—অথচ ইনি অন্যান্য মাতৃকাদেবীদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যও আত্মস্থ করে নিয়েছেন। এই সঙ্গে আমরা যখন মনে রাখি যে, সংহিতা-ব্রাহ্মণ যুগের দেবসঙ্ঘে পুরুষদেবতাদের প্রাধান্য ছিল তর্কাতীত, তখন প্রাগুক্ত পরমা মাতৃকার উত্থান অধিকতর তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে ; কারণ এই দেবী এখন আর অন্য কোনো পুরুষ দেবতার সঙ্গিনী নন, আপন অধিকারেই তিনি বিশিষ্টা মাতৃকা।

ব্রাহ্মণ সাহিত্যে প্রজাপতির উত্থানের মধ্য দিয়ে একেশ্বরবাদী প্রবণতার সূত্রপাত হয়েছিল, কিন্তু আরণ্যক পর্যায়ে আরো বহু নূতন উপাদান যুক্ত হওয়ায় এই প্রক্রিয়া শক্তিশালী হয়ে উঠল, যে সমস্ত প্রাচীনতর রচনায় পুরুষ, অক্ষর, ওম্, ব্রহ্ম ইত্যাদি মহিমান্বিত হয়েছিলেন সেসব ক্ষেত্রে এদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় অস্তিত্ব ছিল স্বীকৃত ; কিন্তু এই পর্যায়ে তাঁদের একীভূত করে তোলার সচেতন প্রয়াস দেখা গেল। পরম দেবতার নাম যদিও তখনো পর্যন্ত অনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনশীল, 'সমস্ত দেবতাই পুরুষে প্রতিষ্ঠিত' (শাঙ্খায়ন ১০ : ১) তবুও এমন বিবৃতি সাধারণভাবে লভ্য এবং তাতে ক্রমবর্ধমান একেশ্বরবাদী প্রবণতারই পরিচয় স্পষ্ট।

জ্ঞান ও জ্ঞানতত্ত্ব

আরণ্যক ও উপনিষদকে যে 'জ্ঞানকাণ্ড' ব'লে অভিহিত করা হয়, তা যুক্তিযুক্ত ; কারণ, ইতোপূর্বে জ্ঞানের প্রতি কখনো এত শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয় নি। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে জ্ঞান অর্জনের পুরস্কার সর্বতোভাবে ছিল পার্থিব—কেননা পার্থিব আনন্দের চিরায়িত, মহিমান্বিত, পরিবর্তিত প্রকাশই স্বর্গকল্পনার ভিত্তি ; কিন্তু আরণ্যক পর্বে এর তাৎপর্য সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। ব্রাহ্মণ সাহিত্যের লক্ষ্য ছিল, যজ্ঞানুষ্ঠানের নিগূঢ় রহস্যবাদী দুর্জ্ঞেয় ব্যাখ্যা বা স্তোত্রসমূহের অতীন্দ্রিয় তাৎপর্যনির্ণয়, কিন্তু আরণ্যকের উৎসাহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নির্যাস ও মানবজীবনের আধ্যাত্মিক ও উত্তবতত্ত্বমূলক তাৎপর্য আবিষ্কারে।

এই যুগে অন্য যে নূতন দিকে আগ্রহ দেখা গেল, তা হ'ল জ্ঞানতত্ত্ব। সময় জ্ঞানের নূতন নূতন ক্ষেত্র উন্মোচিত ও প্রসারিত হচ্ছিল—জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত প্রাথমিক অনুমান-নির্ভর আলোচনা, ধাতুবিদ্যা ও স্বভাবত প্রাথমিক পর্যায়ের রসায়ণবিদ্যা, কিছু কিছু ভূতত্ত্ব, অস্থিসংস্থান বিদ্যা, শরীরবিদ্যা, মনস্তত্ত্ব, ভাষাতাত্ত্বিক দর্শন (ব্যাকরণ ও নিরুক্তি), অধিকতর সুবিন্যস্ত ধর্মতত্ত্ব ও অনুষ্ঠান-বিদ্যা, সঙ্গীত এবং অন্যবিধ শিল্পকলা। সুতরাং জ্ঞানচর্চার মূল্য এযুগে সাধারণভাবে উন্নতমানের স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

আরণ্যকের বহুস্থানে জ্ঞানের জন্য নবজাগ্রত তৃষ্ণা অভিব্যক্ত হয়েছে। এমন কিছু জ্ঞানের জন্য আগ্রহ তখন দেখা গেছে যেগুলির সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য অনুষ্ঠান বা ঔপনিষদীয় অধ্যাত্মবিদ্যার কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন, প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণের উপায় কিংবা প্রকৃতি ও জীবনের মর্মগত বাস্তবতার সন্ধান। আবার যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পর্কিত প্রাচীন জ্ঞান যেহেতু এযুগে অপর্যাপ্ত ও অতৃপ্তিকর ব'লে বিবেচিত হল, পরম সত্য অনুভবের আকাঙ্ক্ষা তাই বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে গেল—বস্তুজীবন থেকে অধ্যাত্মজীবনের তাৎপর্য সন্ধানের উত্তরণ প্রবলতর হ'ল। ইন্দ্র, সরস্বতী ও অশ্বীদের উদ্দেশে মেধার জন্য প্রার্থনা আরণ্যকের এক নূতন বৈশিষ্ট্য। সম্ভবত, এর মধ্যে নিহিত রয়েছে, সে যুগে পুরোহিতদের বর্ধিতভাবে বুদ্ধি-আয়ত্ত সূক্ত অনুষ্ঠানবিদ্যা মুখস্থ করার কৌশল এবং উপলব্ধি বর্জিত জ্ঞানের অন্তঃসারশূন্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানসতা।

সৃষ্টিতত্ত্ব ও হেতুসন্ধান সম্পর্কিত জ্ঞানের জন্য যে অন্বেষণ শুরু হয়েছিল, আরণ্যকে তা অব্যাহত থাকে। তবে, বিভিন্ন প্রত্নকথায় বিশ্বস্রষ্টা সম্পর্কে ধারণা যেমন পরিবর্তিত হয়েছে, তেমনি সেগুলির উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি কোথাও এক নয়। কোথাও বলা হয়েছে, আত্মার আকাঙ্ক্ষায় সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছিল, কোথাও বা প্রজাতির সৃষ্টি-আকাঙ্ক্ষা, তাঁর তপস্যা ও তৎপ্রসূত সৃষ্টি পরম্পরা বর্ণিত হয়েছে। কোথাও সৃষ্টির অব্যবহিত পরে প্রজাপতির ক্লান্তি ও ছন্দের সাহায্যে বর্ষকাল পরে তাঁর পুনরুজ্জীবন বর্ণনা করা হয়েছে। কোনো উপাখ্যানে বলা হয়েছে যে, অসৎ বা নাস্তি থেকে সৃষ্টির উদ্ভব ঘটেছিল। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সাহিত্যে সৃষ্টি যেখানে যজ্ঞসম্ভূত, আরণ্যকে এই প্রথম সর্বতোভাবে নূতন সৃজনশীল উপাদানরূপে কামনা জ্ঞান ও 'তপস্'-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হল। 'তপস্' যজ্ঞের সম্পূর্ণ বিপরীত, কারণ তার দ্বারা যজ্ঞের মৌল বস্তুটি অর্থাৎ কর্ম প্রত্যাখ্যাত হয় ; তীব্র ধ্যানের উপর আরণ্যকের নূতন তত্ত্বটি লক্ষ্যকে কেন্দ্রীভূত করেছে। দ্বিতীয় তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল, স্রষ্টার সৃষ্টি করার আকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষাই এখন সৃজন-প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ।

শরীরবিদ্যা চর্চার সূত্রপাত হওয়ায় মানুষ যেহেতু মৃত্যুর কারণ ও মরণোত্তর অবস্থান সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল, তাই এই যুগের চিন্তায় প্রাণবায়ু বিশেষ প্রাধান্য রয়েছে। একটি জনপ্রিয় দেবকাহিনীতে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার মধ্যে চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব ও অপরিহার্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ-সময় থেকে প্রাণের নূতন নূতন বিশেষণ আবিষ্কৃত হতে থাকে, যা পরম দেবতার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। যুক্তিযুক্তভাবে পরবর্তী স্তরে প্রাণই স্রষ্টার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হ'ল (ঐতরেয় আরণ্যক ২ : ১ : ৭)। আরণ্যকের অধ্যাত্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে তাই প্রাণ, যজ্ঞানুষ্ঠান ও অধ্যাত্মভাবনার মধ্যবর্তী যোগসূত্ররূপে প্রতীকে মূল্য অর্জন করেছিল। কৌষীতকি ও পৈঙ্গ্য অনুযায়ী প্রাণ ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মীভূত।

বিমূর্তায়নের ক্রমবর্ধমান যে প্রবণতা বৈদিক যুগের শেষ পর্বে সুরু হয়েছিল, তা আরণ্যকে অধিকতর পরিস্ফুট। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে 'শ্রদ্ধা ও কাল'-এর মতো বিমূর্ত ধারণার উদ্ভব ; তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সূচনায় 'কাল' সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে। সেখানে অত্যন্ত প্রবল অধ্যাত্মবাদী ধারণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অবিভাজ্য মহাকালকে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতালব্ধ সময় থেকে পৃথকরূপে দেখা হয়েছে ও সমুদ্র ও নদীর তুলনা করা হয়েছে। মানবজীবনের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে অনুরূপ পার্থক্য প্রদর্শন প্রসঙ্গে দেহ ও মনের দ্বৈততা আলোচিত হয়েছে। দেহের নশ্বরতার সঙ্গে সঙ্গে আত্মার অমরতার দ্যোতনাও এখানে পাওয়া যায়। শাঙ্খায়ন আরণ্যক প্রাচীনতর ঐতিহ্যের উল্লেখ ক'রে অতিজাগতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উপাদানসমূহের মধ্যে প্রায়-যৌন সম্পর্কের অবস্থা কল্পনা করেছে। সমস্ত কিছুর মধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের তৃষ্ণা অভিব্যক্ত। তবে, নূতন প্রবণতার মধ্যে দেহ ও আত্মার দ্বৈতবোধ সম্পর্কে সচেতনতা নিয়ত উপস্থিত ; দৈহিক ক্রিয়া ও তথ্যকে সতর্কভাবে মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্তর থেকে পৃথক ক'রে নেওয়া হয়েছে। অবশ্য এই নবজাগ্রত অধ্যাত্মবাদী চিন্তা কখনো কখনো তৎকালীন লোকায়ত কুসংস্কারের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। তাই, আন্তরিকভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পর্যবেক্ষণ শুরু ক'রেও বহু জ্ঞানান্বেষণ প্রক্রিয়া নানাবিধ সংস্কারের জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। বাস্তবতা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক মননের পরিচয় যেমন আছে, তেমনি পাশাপাশি রয়েছে ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাসে প্রণোদিত দৃষ্টিভঙ্গি।

বৈদিকযুগের শেষ পর্বের সূচনায় চিন্তাশীল ও ধর্মতত্ত্ববিদরা মরণোত্তর জীবন সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে [১ : ৮ : ৪ ; ৫] চার ধরনের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে ; স্বাভাবিক, সোম, অগ্নি ও চন্দ্র। একই গ্রন্থে চার ধরনের নরকও বর্ণিত [১ : ১৯ : ১] : বিসর্পী, অবিসর্পী, বিষাদী ও অবিষাদী। এরই বিপরীত মেরুতে রয়েছে স্বর্গকল্পনা [২ : ৬ : ১] ; প্রাচীন মানুষের ভাবনায় ব্যাধি

থেকে মুক্ত এবং অতীত ও আগামী প্রজন্মগুলি দ্বারা ভোগ্য এমন একটি কল্পরাজ্য বর্ণিত হয়েছে, যা সুকর্মের দ্বারা অর্জন করা যায়। আবার শাঙ্খায়ন আরণ্যকে [৩ : ১ : ৭] সদ্য স্বর্গে উপনীত আত্মার বর্ণনায় ব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার একাত্মীভবন বিষয়ে উপনিষদের প্রধান ভাবনার অন্যতম প্রাচীনতর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে। প্রজ্ঞানের মাধ্যমে স্বর্গলাভ করা যায়—এরকম নূতন চিন্তাধারার উন্মেষও আরণ্যকে ঘটেছে। লক্ষণীয় যে, কর্মের পরিবর্তে এখানে জ্ঞানের মাধ্যমে আকাঙ্ক্ষা পূরণ ও অমরতা লাভের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু, সংহিতা ব্রাহ্মণের যুগে শুনি যে, শুধু জ্যোতিষ্টোমের মতো নির্দিষ্ট কিছু যজ্ঞ করার মধ্যে দিয়ে স্বর্গলাভ করা যায়। আরণ্যক ও উপষিদের যুগে জ্ঞানের দ্বারা পুনর্জন্মধারা থেমে মুক্তিলাভের কথা বিবৃত হয়েছে। এটা স্পষ্ট যে, আরণ্যক যুগ-সন্ধিক্ষণের সাহিত্য যখন প্রাচীনতর উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি নূতনতর ভাবনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংমিশ্রিত হচ্ছিল। স্বর্গলাভের তপস্যার ভূমিকা যেমন স্বীকৃত তেমনি 'বৈরাগ্য'-ও দেহশুদ্ধি ও মৃত্যুজয়ের উপায় রূপে বর্ণিত হয়েছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যক দেবযান ও পিতৃযাণের কথা বলেছে ; আত্মা প্রথম মার্গ দিয়ে যাত্রা করে ও দ্বিতীয় মার্গ দিয়ে পুনর্জন্মে উপনীত হয়। পরবর্তী সাহিত্যে যে পুনর্জন্ম অবিমিশ্র অমঙ্গলের প্রকাশ, আরণ্যকে তাকে সাধারণভাবে এড়িয়ে যাওয়া হলেও এ সম্পর্কে কোন স্পষ্ট বক্তব্য এখনো রূপ নেয়নি। তেমনি মুক্তি সম্পর্কিত ভাবনাও অস্পষ্ট অবস্থায় ছিল ; কখনো মুক্তি মৃত্যুজয়ের সমার্থক, কখনো বা এর তাৎপর্য হ'ল দেব-সান্নিধ্য।

জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে ও আনন্দময় চূড়ান্ত অবস্থানে উপনীত হওয়ার নির্ভরযোগ্য পথের বিষয়ে আরণ্যক শেষ পর্যন্ত অনিশ্চিত রয়ে গেছে ব'লেই মুক্তি সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে বেশ কিছু পরস্পরবিরোধী বক্তব্য উপস্থাপিত করেছে। 'ব্রহ্ম' শব্দের পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গগত প্রয়োগের মধ্যে কোনো স্পষ্ট ভেদরেখাও দেখা যায় না। তবে পুংলিঙ্গগত ব্রহ্মের অবশিষ্ট দেবকাহিনী ও নবরূপগত বৈশিষ্ট্য ক্রমশ লুপ্ত হওয়ায় তাকে অধিকতর ছায়াবৃত মূর্তিতে শুধু আধ্যাত্মিক সত্তাতেই দেখা যায়। ইন্দ্রজাল বা অলৌকিক ক্ষমতাযুক্ত শব্দ অর্থে 'ব্রহ্ম'-এর পুরাতন প্রয়োগ যদিও অক্ষুণ্ণ ছিল, তবুও তাৎপর্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের লক্ষণও কতকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যেহেতু ধর্মতত্ত্ববিষয়ক আলোচনার অন্তর্বস্তুরূপেই এই শব্দটি আরণ্যকে ব্যবহৃত নিয়েছে। ব্রহ্মবাদী শব্দে ব্রহ্মের মৌল তাৎপর্য অর্থাৎ অনুপ্রাণিত বাক্ নিহিত রয়েছে ; বৈদিক সমাজের আধ্যাত্মিক সম্পদের অভিভাবকরূপে পরিচিত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীরই শুধু ব্রহ্মবাদীর বিরল সম্মান লাভ করার অধিকার ছিল। যজ্ঞের প্রতীকী বিশ্লেষণ করা ছিল তাঁদের দায়িত্ব। আরণ্যকে ব্রহ্মবাদীরা যজ্ঞের নিয়মাবলী প্রণয়ন করতেন ; অনুষ্ঠানসম্পর্কিত সমস্যা ও সংশয় নিরসনের বিশেষজ্ঞরূপে তাঁরা উদ্ধৃত হতেন।

তবু, অন্তত দেবকাহিনীর দৃষ্টিকোণ থেকে, ব্রহ্মের প্রকৃতরূপ অস্পষ্টই থেকে গিয়েছিল। ব্রহ্মকে সত্য, জ্ঞান ও অনন্তরূপে অভিহিত করা হয়েছে ; তাঁর অনির্দেশ্য বিমূর্ত সত্তার বৈশিষ্ট্য সন্ধানের প্রবণতা ক্রমাগত প্রবল হয়ে উঠেছে। সমস্ত সমুন্নত দেবকাহিনী ও অধ্যাত্মবাদ-সঞ্জাত ধ্যানধারণা ক্রমশ ব্রহ্মের একক অস্তিত্বে এসে আশ্রয় পেয়েছে।

অন্যদিক থেকে এ সময় আত্মার দার্শনিক ভাবমূর্তি নির্মাণের প্রয়াসও শুরু হয়েছে ; যা পরবর্তী স্তরে অর্থাৎ উপনিষদে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অবশ্য উপনিষদের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে জীবনের মর্মসন্ধানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা যে আরণ্যকে প্রতিফলিত হয়েছে, তাতে কোনো সংশয় নেই। তখন পুরাতন মূল্যবোধ সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ায় তা অপর্যাপ্ত ব'লে বিবেচিত হচ্ছিল ; ফলে, জীবনের পুনর্মূল্যায়নের প্রেরণা অনিবার্য হয়ে উঠলো। প্রথম স্তরে প্রশ্নগুলি ছিল মূলত প্রকৃতি, কাল ও বিশ্বজগতের সমর্থন সম্পর্কিত ; ঐ সময় আর্যদের মধ্যে মৃৎকুটির নির্মাণের প্রাথমিক জ্ঞান পরিণততর হওয়ায় পরবর্তী পর্যায়ে দগ্ধ ইষ্টক (বা পক্কেষ্টক) নির্মিত জটিলতর গৃহনির্মাণ পদ্ধতির সূচনা হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও স্থাপত্য-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অনুপুঙ্খ সম্পর্কে আগ্রহ এ যুগের বিশিষ্ট লক্ষণ। দ্বিতীয় স্তরের প্রশ্নগুলো ছিল মূলত নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং প্রেততত্ত্ব বিষয়ক। অনেক ক্ষেত্রে অভিব্যক্তিতে স্পষ্টতার ও সামঞ্জস্যবোধের অভাব পরিলক্ষিত হয় ; বহু বিবৃতি ও সিদ্ধান্ত পরস্পরবিরোধী। সম্ভবত তৎকালে প্রচলিত লোকায়ত আরণ্যক সংস্কৃতির রহস্যবাদী প্রবণতার প্রভাবেই জ্ঞানচর্চা সর্বসাধারণের পক্ষে প্রতিবিদ্ধ হতে শুরু করে।

যুগসন্ধিক্ষণের সাহিত্য ব'লেই আরণ্যকের তাৎপর্য সম্পূর্ণ পৃথক, যদিও আয়তনের দিক থেকে বৈদিক সাহিত্যে এটি ক্ষুদ্রতম। ব্রাহ্মণে যজ্ঞানুষ্ঠানগুলির প্রতীকী ব্যাখ্যা ছিল ; কিন্তু পরবর্তী আরণ্যক সাহিত্যেই প্রথম যজ্ঞপরায়ণ-জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগত আদর্শ থেকে বিচ্ছেদের সূত্রপাত হ'ল। যজ্ঞানুষ্ঠানের সীমাবদ্ধ গণ্ডী অতিক্রম ক'রে অতিপ্রাকৃত বা অধ্যাত্মবাদী প্রতীকায়ণের প্রতি রচয়িতারদের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিবদ্ধ হতে শুরু করল। তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতে আরণ্যকে একটি দুঃসাহসিক পদক্ষেপ ; কারণ পাঁচ শতাব্দীরও বেশি সময় ধ'রে জনগোষ্ঠীর শ্রদ্ধা ও সমর্থনধন্য দেবকাহিনী ও অনুষ্ঠানমূলক ধর্মবোধের বৃত্ত-বহির্ভূত ক্ষেত্রে তার বিচরণের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। লঘু ঐতিহ্য ও লোকায়ত ধর্মের বিভিন্ন উপাদানের নিঃসংকোচে আত্মস্থ ক'রে আরণ্যক শুধু বিশিষ্টই হয়ে ওঠেনি, পরবর্তী স্তরের বহুবিধ প্রবণতার প্রাথমিক উন্মেষের ক্ষেত্রও প্রস্তুত করেছে।

উপনিষদ্

বৈদিক সাহিত্যের শেষতম অংশ হ'ল উপনিষদ্ ; আরণ্যকের সঙ্গে একত্রে এটি জ্ঞানকাণ্ডরূপে পরিচিত। পরবর্তী ভাষ্যকাররা 'উপনিষদ্' শব্দটিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তবুও এর ব্যুৎপত্তিগত মৌলিক অর্থ ছিল গুরুর নিকটে উপবেশন ক'রে অর্জিত জ্ঞান। তবে সমালোচকদের মতে ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যা ইতিহাস বা ভাষাতত্ত্ব অনুমোদিত নয়। উপনিষদ্ নামধারী বহু রচনার সন্ধান পাওয়া গেলেও এদের অতি ক্ষুদ্র অংশই যথার্থ উপনিষদ্। বৃহৎ উপনিষদ-সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে দ্বিবিধ - বৈদিক ও অবৈদিক ; কেবল বৈদিক উপনিষদ্গুলিই স্বভাবত আমাদের আলোচ্য বিষয়। এই চৌদ্দটি উপনিষদ্ পরবর্তীকালে বিখ্যাত হয়েছিল ; এগুলি হ'ল : ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ড(ক), মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, কৌষীতকি, শ্বেতাশ্বতর, মৈত্রায়ণীয় ও মহানারায়ণীয়। এদের নির্দিষ্ট রচনাকাল নির্ণয় করা খুবই দুরূহ ; আমরা শুধু এটুকু বলতে পারি যে, এদের রচনাকালের উচ্চতম ও নিম্নতম সীমা যথাক্রমে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম ও চতুর্থ শতাব্দী ; সুতরাং এই চৌদ্দটি উপনিষদের মধ্যে কয়েকটি প্রাক্-বুদ্ধ এবং কয়েকটি বুদ্ধোত্তর যুগে রচিত।

বিষয়বস্তু

গবেষকরা মনে করেন যে, দীর্ঘতম দুটি উপনিষদ্ই প্রাচীনতম, ব্যাপকতম এবং সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ এবং উভয়ই ব্রাহ্মণ সাহিত্যের নিরবিচ্ছিন্ন ধারারূপে গদ্যে রচিত ; এরা হ'ল বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য। শুক্ল যজুর্বেদের অন্তর্গত বৃহদারণ্যকে প্রবর্গ্য অনুষ্ঠান সম্পর্কে তিনটি প্রাথমিক আরণ্যক বৈশিষ্ট্যযুক্ত অধ্যায় রয়েছে ; এর দুটি উপনিষদ্-ধর্মীয় অধ্যায়ের মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়কে যথার্থ উপনিষদের উপাদানযুক্তরূপে গ্রহণ করা যায়। প্রথম অধ্যায় প্রাণ, মৃত্যু ও পুরুষের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছে ; উপদেশমূলক ক্ষুদ্র আখ্যান ও সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্য দিয়ে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে গার্গ্য ও অজাতশত্রুর সংলাপ। এখানে আমরা যাজ্ঞবাল্ক্য ও দধ্যঙঅথর্বণের মতো বিখ্যাত ঋষির সঙ্গে পরিচিত হই ; এতে রয়েছে বাণপ্রস্থে উদ্যত যাজ্ঞবাল্ক্য ও তাঁর জ্ঞানপিপাসু পত্নী মৈত্রেয়ীর সুপরিচিত সংলাপ। তৃতীয় অধ্যায়ে রাজা জনকের সভায় সমবেত দার্শনিকদের সঙ্গে যাজ্ঞবাল্ক্যের

ও চতুর্থে জনক ও যাজ্ঞবাল্ক্যের সংলাপ। পঞ্চম অধ্যায়ে সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রেততত্ত্ব ও নীতি-বিদ্যার মতো জটিলতর বিষয় বর্ণিত। শেষ অধ্যায়ে পাওয়া যায় পরস্পর-অসম্পৃক্ত বিবিধ বিষয়বস্তু। যথার্থ আধ্যাত্মিক বিষয়, যেগুলি উপনিষদের ভাবকেন্দ্র গঠন করেছে, সেগুলি প্রথম ও শেষ দুটি অধ্যায়ে সম্ভবত পূর্বগঠিত রচনার সঙ্গে সংযোজিত হয়েছিল।

সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্য উপনিষদের ক্ষেত্রে অবস্থা ছিল পুরোপুরি ভিন্ন ; এখানে প্রকৃত উপনিষদের অংশটি রয়েছে শেষ তিনটি অধ্যায়ের উপসংহারে। প্রথম তিনটি অধ্যায় সম্পূর্ণত ব্রাহ্মণ্য বৈশিষ্ট্যযুক্ত ; এতে যজ্ঞানুষ্ঠান বিধি ও তৎসম্পর্কিত মতবাদগুলি আলোচিত হয়েছে ; এতে একটি সংক্ষিপ্ত সৃষ্টিতত্ত্বমূলক অংশ ও একটি অধ্যাত্মবাদী বিবরণ রয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা একটি প্রতীকী তাৎপর্যযুক্ত দেবকাহিনী পাই, যাতে সূর্যকে বিশাল মধুচক্র ও পৃথিবীকে বিরাট মঞ্জুষা রূপে বর্ণনা ক'রে সূর্যের উৎস ও উপাসনা আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে রৈক্ক, জবাল ও উপকৌশলের প্রতি সত্যকামের উপদেশ বিবৃত। পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে প্রেততত্ত্ব সম্পর্কে জৈবলির আলোচনা ; এর সঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদের অনুরূপ বিবৃতির নিবিড় সাদৃশ্য চোখে পড়ে। ছ'জন দার্শনিক সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ব্যক্ত করার পর, উপসংহারে জৈবলি এদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। প্রকৃত অধ্যাত্মবাদী অংশের সূচনা ষষ্ঠ অধ্যায়ে যেখানে উপনিষদের মহাবাক্যরূপে পরিচিত ভাবনাটি—'তৎ ত্বম্ অসি' বা 'তুমি-ই সেই' অভিব্যক্ত হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণে প্রখ্যাত ঋষিদের অন্যতম আরুণি তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুকে গূঢ়বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। প্রসঙ্গত বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, বৃহদারণ্যক উপনিষদে অধিকতর অতীন্দ্রিয়বাদী সত্যের উপস্থাপয়িতা যাজ্ঞবাল্ক্য এই আরুণিরই শিষ্য ছিলেন। সপ্তম অধ্যায়ে নারদ ও সনৎকুমারের সংলাপে প্রধানত ধ্যানের মনস্তত্ত্ব ও ভূমার কথা আলোচিত হয়েছে। শেষ অধ্যায়ে ব্রহ্মোপলব্ধি অর্জনের উপায় ও ব্রহ্মের প্রকৃতি সম্পর্কে নির্দেশ রয়েছে। এক্ষত্রে প্রথম পাঁচটি অধ্যায়ের বিবিধ বিষয়বস্তুই যেন ক্রমে শেষ তিনটি অধ্যায়ে নিহিত মৌলিক উপনিষদীয় ভাবনায় পরিণতি লাভ করেছে। পরবর্তীকালে যজুর্বেদের উপনিষদ্‌গুলি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল ; তাই মহাকাব্যগুলি তাদের মধ্য থেকেই সবচেয়ে বেশি উদ্ধৃতি চয়ণ করেছে।

শুক্ল যজুর্বেদের অন্তর্গত ঈশোপণিষদ্ এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে ক্ষুদ্রতম ; এতে মাত্র আঠারটি শ্লোক রয়েছে। এই রচনায় কর্ম ও জ্ঞানের দ্বৈতবোধকে উন্নততর আধ্যাত্মিকপ্রাপ্তির স্তরে সমন্বিত করার চেষ্টা রয়েছে ; সেইসঙ্গে প্রথম আমরা ক্ষুদ্র একটি বর্ণনীয় দার্শনিক স্থৈর্যসম্পন্ন পুরুষ অর্থাৎ স্থিতধীর সাক্ষাৎকার লাভ করি, পরবর্তীকালে যার ভাবরূপ ভগবদ্‌গীতায় বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছিল।

সামবেদের কেনোপনিষদে যে চারটি অধ্যায় আছে, তাদের মধ্যে প্রথম দুটি ছন্দে রচিত এবং তাতে সৃষ্টিতত্ত্ব ছাড়াও ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতার মৌল প্রেরয়িতারূপে আত্মার ভূমিকা বিবৃত হয়েছে। শেষ অংশটিতে আত্মার জ্ঞানতত্ত্ব রহস্যগূঢ়ভাবে আলোচিত হয়েছে। গদ্যে রচিত শেষ দুটি অধ্যায়ে পরমাত্মা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য দেবতাদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা বর্ণিত ; পরমাত্মা বিষয়ক জ্ঞান লাভে পর পর সবকটি দেবতার ব্যর্থতার পর উমা হৈমবতী ঘোষণা করলেন, এই হ'ল ব্রহ্ম।

ঋগ্বেদের ঐতরেয় উপনিষদে তিনটি অধ্যায় আছে। প্রথমটিতে বিরাজের মাধ্যমে আত্মা থেকে সৃষ্টি ও সেইসঙ্গে সৃষ্টির বিভিন্ন উপাদান এই প্রথমবার বিবৃত ; উপনিষদের মৌলিক মতবাদগুলির অন্যতম যে অণুবিশ্ব ও ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সাযুজ্যবোধ—তা এখানে প্রতিফলিত। সংক্ষিপ্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ে মানুষের ত্রিবিধ জন্ম—গর্ভাধান, স্বাভাবিক জন্ম ও পুত্রের মধ্যে আত্মসম্প্রসারণে যে জন্ম, তা আলোচিত হয়েছে। শেষ অধ্যায়ে আত্মার ইন্দ্রিয়াতীত প্রকৃতি ও বুদ্ধির সঙ্গে তার সম্পর্ক বামদেব ব্যাখ্যা করেছেন।

কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় উপনিষদেও তিনটি অধ্যায় আছে। ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা দিয়ে শুরু হয়ে পরে অতিজাগতিক, জ্যোতির্বিদ্যাগত, বোধিগত, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উপাদানসমূহের মধ্যে প্রায় অতীন্দ্রিয় সম্পর্ক বিবৃত করেছে। এতে রয়েছে ত্রিশঙ্কুর দুটি নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ বিবৃতি। শেষ অধ্যায়ে বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে ব্রহ্মাকে উপমিত করা হয়েছে ; এগুলি হল অন্ন, প্রানবায়ু, মন, জ্ঞান ও আনন্দ ; বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে প্রশ্ন। শেষ অধ্যায়ের বিভিন্ন অংশে আরণ্যক ও ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

ঋগ্বেদের কৌষীতকি উপনিষদে যে চারটি অধ্যায় রয়েছে, তার মধ্যে প্রথমটিতে পিতৃযান ও দেবযান আলোচিত। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত বিবিধ বিষয়গুলির রচয়িতারূপে কৌষীতকি, পৈঙ্গ্য ও শুষ্কভৃঙ্গারের নাম উল্লিখিত হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে তাতে বহু সমসাময়িক সামাজিক রীতিনীতিও প্রতিফলিত হয়েছে। ঋগ্বেদীয় উপনিষদ্ ব'লেই কৌষীতকির সঙ্গে ইন্দ্র সম্বন্ধে দেবকাহিনীগুলির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে ; ইন্দ্রকে তাঁর পূর্বতন অভিযানের জন্য দম্ভ প্রকাশ করতে দেখা যায়। এখানে বলা হয়েছে যে, ইন্দ্রকে জানা-ই সর্বোত্তম কল্যাণের কারণ। তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাণের মহিমা কীর্তিত ; শেষ অধ্যায়ে বালাকি-অজাতশত্রুর কাহিনী পুনরাবৃত্ত হয়েছে যা ইতিপূর্বে বৃহদারণ্যকে উপনিষদে কথিত। শেষ অধ্যায়ে স্বপ্নের বিশ্লেষণও গুরুত্ব পেয়েছে, তবে তার প্রধান বর্ণনীয় বিষয় হ'ল প্রেততত্ত্ব, আরো স্পষ্টভাবে বলা যায়, পুনর্জন্মবাদ।

কঠ, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর অর্বাচীনতর, পদ্যে গ্রথিত উপনিষদ্ এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাববস্তুর বিচারে পরস্পরের নিকটবর্তী। এদের মধ্যে কঠোপনিষদের দুটি অধ্যায় আছে, তবে এটা স্পষ্ট যে, মূল বচনাটি তিনটি অংশে বিন্যস্ত প্রথম অধ্যায়েই সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে প্রথম অধ্যায়ে উত্থাপিত একটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে। তাই মনে হয় যে, প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যবর্তী অংশ পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল।

অথর্ববেদের অন্তর্গত মুণ্ডক উপনিষদ্ সম্ভবত কোনো মুণ্ডিত-মস্তক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের দ্বারা বা তাদের জন্য রচিত হয়েছিল ; গদ্যে ও পদ্যে গ্রথিত এই উপনিষদের সঙ্গে যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রক্রিয়ার নিবিড় সম্পর্ক থাকলেও এতে প্রচুর অতীন্দ্রিয়-প্রবণতা নিহিত রয়েছে। মুণ্ডক এবং কেন—এই উভয় রচনাতেই বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এবং সেই সঙ্গে শৈব প্রবণতার অভিব্যক্তি স্পষ্ট। তিনটি অধ্যায়যুক্ত মুণ্ডক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে বিবৃত আনুষ্ঠানিক প্রতীকায়নের প্রবণতা সত্যের বহু প্রতীকী উপস্থাপনার মাধ্যমে অধ্যাত্মবাদে উপনীত হয়েছে। শেষ অধ্যায়টি চরিত্রগত বিচারে অধিকতর অতীন্দ্রিয়বাদী ও অধ্যাত্মবাদী এবং তা ব্রহ্মের স্বভাব ও পরম উপলব্ধির জন্য ব্রহ্ম-সান্নিধ্য লাভের উপায় বর্ণনা করেছে।

অথর্ববেদের জন্য একটি উপনিষদ্—মাণ্ডুক্য মাত্র বারোটি সংক্ষিপ্ত বিভাগের মধ্যে পরবর্তীকালের বেদান্ত দর্শনের মৌলিক মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য গ্রথিত গদ্যে এই উপনিষদ্ ব্রহ্ম সম্পর্কে উপদেশ প্রচার করেছে ; অন্তর্বস্তুর বিন্যাসের ক্ষেত্রে রচনাটি অধিকতর নিগূঢ় রহস্যদ্যোতক।

কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্তর্গত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে শৈব বিষয়বস্তু লক্ষণীয় ; গ্রন্থের দু'টি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথমটিই সম্ভবত মৌলভাবকেন্দ্রকে ধারণ করেছে, কারণ তাতে কেন্দ্রীয় বাক্যাংশটি পুনরাবৃত্ত হয়েছে, যা রচনার সমাপ্তিসূচক। এই অধ্যায়ে সমসাময়িক মতবাদগুলি পর্যালোচিত—এমনকি তৎকালীন ক্রমবিবর্তিত আত্মতত্ত্বও এর মধ্যে আছে—কিন্তু বিচারে প্রত্যেকটি মতবাদ যেহেতু অপর্যাপ্ত বিবেচিত হয়েছে, তাই শেষ পর্যন্ত সুস্পষ্ট সাংখ্য-প্রবণতাযুক্ত শৈব মতবাদই এতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এর ঈশ্বরভাবনায় বেদান্তের ব্রহ্ম যেন সাংখ্যের পুরুষের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমীপবর্তী যোগতত্ত্বকে লক্ষ্যপ্রাপ্তির উপায়রূপে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী তিনটি অধ্যায়ে সাংখ্য-যোগ মতবাদ ব্যাপকতরভাবে বিশ্লেষিত। ষষ্ঠ অধ্যায়ে সরূপ ঈশ্বরের অভিব্যক্তিরূপে এমন দেবতাকে উপস্থাপিত করা হয়েছে যিনি পরবর্তীকালে গুরুবাদ ও ভক্তিবাদ-সংশ্লিষ্ট পূজা-পদ্ধতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। অবশ্য তখনো পর্যন্ত অস্পষ্ট ধারণার স্তরে বিরাজমান সাংখ্য মতবাদ 'প্রধান'কে বিমূর্ত তত্ত্বরূপে উপস্থাপিত না ক'রে দেবতারূপেই তুলে ধরেছে ;

তেমনি প্রারম্ভিক স্তরে বিদ্যমান বেদান্ত দর্শনের 'মায়া' এখানে সাংখ্যে কথিত প্রকৃতিরূপে উপস্থিত। পুরুষ, প্রকৃতি ও তিনগুণের মতো মৌলিক সাংখ্য উপাদানগুলি এখানে পাওয়া যাচ্ছে ; সৃষ্টি ও বিবর্তনরূপে বর্ণিত এবং মনস্তত্ত্ব ও অধ্যাত্মবিদ্যার প্রতি সাংখ্য দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়।

কৃষ্ণ-যজুর্বেদের মৈত্রায়ণীয় বা মৈত্রী উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ-শৈলীর গদ্যময় বাক্যে রচিত ক্ষুদ্র একটি গ্রন্থ। উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে অর্বাচীনতম এই রচনাটি সাতটি প্রপাঠকে সম্পূর্ণ, তবে স্পষ্টতই এটি বহিরাগত উপাদানের দ্বারা ক্রমাগত পরিবর্ধিত হয়েছিল। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবিধ বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে, যা প্রসঙ্গত সেই যুগের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকপাত করে। সাংখ্য ও যোগ যেমন প্রধান্য পেয়েছে, তেমনি ত্রয়ী দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব তাঁদের ত্রিবিধ গুণ ও তিনটি ভিন্ন ধরনের অতিজাগতিক ক্রিয়াকলাপসহ উপস্থাপিত হয়েছেন। দ্বিতীয় অংশে অর্বাচীনতার লক্ষণ পাওয়া যায়,—জ্যোতির্বিদ্যা প্রণোদিত অনুমান, সূর্যপূজা, সামাজিক নৈতিকতা, হঠযোগ ও যোগাভ্যাসের সময়ে ধ্যানরত ব্যক্তি যে সাত প্রকার অতীন্দ্রিয় ধ্বনি শোনেন, তার বর্ণনা ইত্যাদি। স্পষ্টতই এগুলি উপনিষদ্ বহির্ভূত বিষয়বস্তু, যাদের মধ্যে লোকায়ত ধর্মের ও বিশ্বাসের নানাবিধ উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটেছে ; তখন সর্বজনগ্রাহ্য ধর্মীয় ভাবনায় এসব ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। সহজেই অনুমান করা যায় যে, আলোচ্য উপনিষদটি রচিত হওয়ার পিছনে নানাবিধ পূর্বাগত অরক্ষণশীল, অব্রাহ্মণ্য ধর্মমতের অপ্রতিরোধ্য প্রভাব ছিল, যদিও রচনায় সেসব প্রত্যাখ্যান করার ক্ষীণ ও বিশৃঙ্খল প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ফলে আমরা পুঞ্জীভূত পরস্পর অসম্পৃক্ত, পারম্পর্যহীন ও অস্পষ্ট কলেবর একটি রচনা পেয়েছি। মৈত্রায়ণীর উপনিষদের অর্বাচীনতার প্রমাণ হিসাবে তার মধ্যে বহু দেবকল্পনার উল্লেখের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় ; এদিক দিয়ে তা প্রধান উপনিষদ্‌গুলি অপেক্ষা আস্তিক্যবাদী উপনিষদ্ অর্থাৎ শ্বেতাশ্বতরের বেশি কাছাকাছি।

কৃষ্ণ-যজুর্বেদের মহানারায়ণীয় বা বৃহন্নারায়ণীয় উপনিষদ্ প্রকৃতপক্ষে তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম অধ্যায়। পদ্যে গ্রথিত ও পাঁচটি অধ্যায় বিন্যস্ত এই গ্রন্থ বহু পরবর্তী কালে রচিত। এতে পরবর্তীকালে সৃষ্ট মহাকাব্যিক ছন্দ অনুষ্টুপ-এর একটি অনিয়ন্ত্রিতরূপ এবং মিশ্র উপজাতি ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যথার্থ ব্রাহ্মণ্য রীতি অনুযায়ী এ গ্রন্থ সৃষ্টিশীল পরম সত্তারূপে প্রজাপতিকে মহিমান্বিত করে তাঁর সৃষ্টিকে বিবৃত করেছে। দেবসঙ্ঘও এখানে অর্বাচীনতার প্রমাণ বহন করছে, শিব, সূর্য, বিষ্ণু ও কার্তিকেয়র মতো অধিকাংশই অর্বাচীন : মহাকাব্য-পুরাণ-বৃত্তের দেবতা ছাড়াও বিভিন্ন নামে দুর্গাকেও উপস্থাপিত করেছে এবং ইচ্ছামতো দানব, যক্ষ ও পিশাচদের উল্লেখ করেছে। বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে স্তোত্রগুলির সঙ্গে মহাকাব্য-পুরাণবৃত্তের বিষয়গুলির

যেমন নিবিড় সাদৃশ্য রয়েছে, তেমনি পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে জনপ্রিয় হয়ে-ওঠা যজ্ঞানুষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রেও এই সাযুজ্য চোখে পড়ে। স্পষ্টতই এই গ্রন্থ সংহিতার সূক্তিগুলির প্রতি শ্রদ্ধাশীল, ইচ্ছামতো পূর্বতন রচনাসমূহ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে এবং সবগুলি প্রধান উপনিষদের সঙ্গে এটি পরিচিত। পৌরাণিক রীতি অনুযায়ী ধ্যানের নির্দেশ দিয়ে, যজ্ঞে ত্রুটির জন্যে সমাজচ্যুতির দণ্ড বিধান ক'রে, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার সুপ্রচুর অতীন্দ্রিয়বাদী ব্যাখ্যা দিয়ে ও নারায়ণের জন্য যথার্থ পৌরাণিক বিধি অনুযায়ী পূজার ব্যবস্থা ক'রে, গ্রন্থটি পৌরাণিক শাস্ত্রের অধিকতর নিকটবর্তী হয়েছে। এব সঙ্গে প্রধান উপনিষদ্‌সমূহের একটা সাধারণ ব্যবধান রচিত হয়েছে। এর প্রত্নকথা ও উপাখ্যানগুলি সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট গোষ্ঠী-চরিত্রযুক্ত হওয়াতে এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য হয় যে, শ্বেতাশ্বতর ও মহানারায়ণীর একটি পৃথক শ্রেণীর রচনা ; বস্তুত, এদের প্রাচীনতম সাম্প্রদায়িক উপনিষদ্‌রূপে গণ্য করা চলে। পরবর্তীকালে এই প্রবণতা অসংখ্য শৈব ও বৈষ্ণব উপনিষদের মধ্যে অব্যাহত ছিল ; এসব যদিও প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক পুরাণগুলিরই সমসাময়িক, এধরনের গ্রন্থগুলি নিজেদের উপনিষদ্‌রূপে পরিচয় দিতে যত্নবান ছিল, কেননা এই নামের সঙ্গে তখনো আধ্যাত্মিক গৌরব সংশ্লিষ্ট ছিল।

মহানারায়ণীয় উপনিষদ্ সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম ও তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়েছিল ; তবে শঙ্করাচার্য এই গ্রন্থের কোনো ভাষ্য প্রণয়ন করেন নি। সম্ভবত, নারায়ণভক্তদের জন্য প্রার্থনাপুস্তকরূপে এটি রচিত হয়েছিল ব'লেই নারায়ণের উদ্দেশ্যে বহু সূক্ত এতে নিবেদিত হয়েছে। বৌধায়ন-ধর্মসূত্রেও এই ঐতিহ্য জাগরূক ছিল এবং বৈখানস স্মার্ত সূত্রকে এর প্রত্যক্ষ উত্তরসূরী ব'লে মনে হয়। অন্যভাবে বলা যায়, এই রচনা নারায়ণীয় চর্যার অস্তিত্বকে প্রতিফলিত করেছে এবং শেষপর্যন্ত বিশিষ্ট সাম্প্রদায়িক বিষয়বস্তু-সম্পন্ন পৃথক একটি ধারার তাৎপর্য অর্জন করে।

অথর্ববেদের অন্তর্গত ও ছ'টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত প্রশ্ন উপনিষদে সুপরিকল্পিত রচনা লক্ষ্য করা যায় ; ছ'জন ঋষি পিপ্পলাদ ঋষির কাছে ছ'টি প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, সেসব প্রশ্নের উত্তর এই উপনিষদের অবয়ব নির্মাণ করেছে। এই প্রশ্নগুলির মধ্যে তৎকালে প্রচলিত দার্শনিক অনুসিন্ধৎসার প্রকৃতি অভিব্যক্ত হয়েছে।

রচয়িতা

প্রধান উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে অধিকাংশ যেহেতু সংলাপ-রচনার আঙ্গিকে বিন্যস্ত, তাই কথোপকথনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিকেই রচয়িতারূপে ধ'রে নিতে হয়, কারণ লেখক হিসাবে কেউ স্পষ্টভাবে উল্লিখিত নন। এটি অবশ্যই পদ্ধতি হিসাবে

অসন্তোষজনক, কেননা বহু রচনাতে সংলাপমূলক আঙ্গিকের উপস্থিতি নেই— যেমন : ঈশ, শ্বেতাশ্বতর, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয় ও ঐতরেয় ; তাছাড়া কথোপকথনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অনেকে বাস্তব জগতের অধিবাসী নন, দেবলোক থেকে তাঁদের সৃষ্টি, যেমন যম, ইন্দ্র, প্রজাপতি। আমরা রচনা থেকে মোটামুটিভাবে যে তথ্য সর্বজনগ্রাহ্যরূপে গ্রহণ করতে পারি, তা হল এই যে, স্রষ্টারূপে যাঁদের নাম উল্লিখিত হয়েছে সাধারণত তাঁরা অকৃত্রিম।

প্রতিদ্বন্দ্বী চিন্তাধারা এবং বিভিন্ন প্রাচীন বা শ্রদ্ধেয় বিশেষজ্ঞদের নাম উল্লিখিত হয়েছে, যাঁদের অবদানেই সম্ভবত নব্য ভাবধারা গড়ে উঠেছিল। তবে, সর্বাধিক বিখ্যাত ব্যক্তির নাম হল যাজ্ঞবল্ক্য, যিনি বৃহদারণ্যকের আধ্যাত্মিক ভাবকেন্দ্র রচনা করা ছাড়াও অন্য একটি ভাবধারার প্রথম প্রবক্তা হয়েছিলেন—পরবর্তীকালে যা 'বেদান্ত' নামে পরিচিত হ'ল। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নামগুলি হল শাণ্ডিল্য—বিখ্যাত 'তজ্জলান্' তত্ত্বের প্রবক্তা, দধ্যঙ্—মধুবিদ্যার প্রণেতা এবং আরুণি, মনস্তত্ত্ব এবং নাম ও পদার্থতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ। উপনিষদের মতবাদগুলির প্রবক্তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি—তাঁরা অরণ্যেই থাকুন বা গৃহবাসীই হোন বা রাজা জনকের মতো প্রাসাদনিবাসী হোন, এই মর্যাদালাভে তাঁদের কোনো বাধা ছিল না।

আঙ্গিক ও ভাষা

প্রাচীনতম গদ্য উপনিষদ্গুলিতে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের অনুরূপ গদ্য যেমন প্রধান আঙ্গিক, তেমনি পদ্যে রচিত উপনিষদ্গুলির রচনাশৈলীতে আখ্যানকাব্য ও মহাকাব্যসমূহের পূর্বাভাস সূচিত হয়েছে। এদের মধ্যে মৌখিক সাহিত্যের বহু বৈশিষ্ট্য বর্তমান, যদিও অর্বাচীনতম উপনিষদ্গুলি রচিত হবার পূর্বেই সম্ভবত লেখন-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল, অনুমান করা যেতে পারে। ধর্মীয় সাহিত্য ও শাস্ত্রের ক্ষেত্রে সম্ভবত লেখা তখনো প্রযুক্ত হয় নি, যেহেতু ঐ সব রচনা শ্রুতিকাব্যরূপে প্রণীত ও মৌখিকভাবে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হচ্ছিল। তাই, গদ্য ও পদ্য উভয়ের মৌল চরিত্রলক্ষণ ছিল সংক্ষিপ্ততা ও ঋজুতা ; এমন কি সংলাপাত্মক, বর্ণনাত্মক অংশেও নির্দিষ্ট প্রণালীবদ্ধ রচনাগঠনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

ধ্রুবপদ এবং বাক্যাংশ ও বিশিষ্টার্থক পদ, এমন কি সম্পূর্ণ বাক্য প্রয়োগে যে ধরনের পুনরাবৃত্তি মৌখিক সাহিত্যে স্মৃতিসহায়করূপে গণ্য হয়,—সেসব উপনিষদে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কোনো বাক্যাংশে শুভসূচক বা সুখপ্রদ ব'লে পরিগণিত হলে বহুবার তা পুনরাবৃত্ত হয়ে থাকে। স্মৃতিতে ধারণ করার জন্য যেহেতু সর্বাধিক সংক্ষিপ্ততা আবশ্যিক, বর্ণানাংশেও তেমনি চূড়ান্ত বাচনিক সংযম দেখা যায়।

কিছু কিছু বাক্য অত্যন্ত দুর্বোধ্য, তবে সাধারণভাবে রচনাশৈলী ব্রাহ্মণানুগ এবং একই ধরনের বাচনিক সংযম এখানে রয়েছে। কখনো কখনো এই চূড়ান্ত সংক্ষিপ্ততার ফলে অভিপ্রেত অর্থ সম্পর্কে সংশয় দেখা দেয়, কারণ সংযোগকারী শব্দ বা বাক্য প্রায়ই পাওয়া যায় না। তবে কখনো কখনো নিগূঢ় রহস্যবাদী প্রবণতার ফলে 'তজ্জলান্'-এর মতো বাক্যাংশে তির্যক তাৎপর্য যুক্ত হয় ; অতীন্দ্রিয়বাদী উপাদান সংরক্ষিত করার জন্য নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র সংকেতসূত্র জাতীয় অভিব্যক্তি [যেমন তত্ত্বমসি, সোঽহম্, অতোঽন্যদার্তম্] তাদের সুপরিমিত আঙ্গিক ও প্রসঙ্গের গভীরতার মধ্য দিয়ে দ্বীবক-সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

গদ্যস্তবকগুলি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যে বিভক্ত হওয়ায় সহজে স্মৃতিতে ধারণের উপযুক্ত ছিল। গদ্যের ব্যাকরণ ও শৈলী পতঞ্জলির সমীপ্যবর্তী—যিনি খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের শেষ শতাব্দীগুলিতে সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ গদ্যশৈলী সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং পরবর্তী কয়েকটি শতাব্দীতে কোনো প্রধান পরিবর্তন ছাড়াই তা নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্তমান ছিল। যতিসমূহ ব্যাকরণগত বা প্রবন্ধগঠনগতভাবে নির্ধারিত নয় ; নিতান্তই শ্বাসাঘাতজনিত যতি, যা মৌখিক সাহিত্যের একটি আবশ্যিক লক্ষণ। মৌখিক সাহিত্যের অন্য লক্ষণ দেখা যায় বিষয়বস্তুর আকস্মিক পরিবর্তনে, আমরা যদি মনে রাখি যে, রচনার অন্তবর্তী ফাঁকগুলি মৌখিকভাবে উপযুক্ত ইঙ্গিতপূর্ণ ভঙ্গি ও শব্দদ্বারা আচার্য তাঁর শিক্ষাদানের সময় পূরণ করে নিতেন, তাহলে এই পরিবর্তনের তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শুধুমাত্র রচনার স্মরণীয় অংশটুকুই সংরক্ষিত হ'ত। একইভাবে ভৃগু ও বরুণের সংলাপে প্রশ্নকর্তাকে পূর্বনির্ধারিত সংকেতসূত্র দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে জ্ঞানের জন্য পুত্রের সাগ্রহ আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত হয়েছে—এতেও মৌখিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যই স্পষ্ট। সাধারণভাবে উপনিষদ্‌গুলি স্বরযুক্ত নয়।

বহু উপনিষদে সংলাপ-আঙ্গিকে রচিত দীর্ঘ অংশ রয়েছে। উপনিষদের মধ্যে এগুলিকে চমৎকার 'জীবন্ত' আঙ্গিকরূপে গ্রহণ করা যায়, কারণ এগুলি প্লেটোর বিখ্যাত সংলাপশৈলীর ধরনে জিজ্ঞাসু ও প্রবক্তাদের মধ্যে সংঘটিত প্রকৃত সংলাপগুলিকে রক্ষা করেছে। এই আচার্যরা ছিলেন তাঁদের সময়ের অগ্রগামী চিন্তাবিদ। বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপিত হ'ত এবং প্রবীণ আচার্য বা ঋষি সেসবের উত্তর দিতেন। এধরনের প্রশ্নোত্তরমূলক দ্বান্দ্বিক রচনাশৈলীর সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায় প্রশ্নোপনিষদে ; খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম থেকে পঞ্চম বা চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে প্রচলিত দ্বন্দ্বমূলক আধ্যাত্মিক ভাবনার দিকপরিবর্তন এতে সূচিত হয়েছে। অদ্বন্দ্বমূলক কথকতাধর্মী আলোচনায় সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ রচনাশৈলী অনুসৃত হ'ত, সাধারণত

সমাজে ভাসমান জ্ঞানগর্ভ শ্লোকভাণ্ডারের উত্তরাধিকার থেকে লব্ধ নীতিমূলক রচনা কখনো কখনো প্রাগুক্ত শৈলীতে ব্যবহৃত হ'ত। মাঝে মাঝে এদের মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা সম্পর্কে আশ্চর্য সজীব অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। জিজ্ঞাসু বিদ্যার্থী প্রায়ই যে-ভাবে গুরুর কাছে অর্ন্তদৃষ্টি উদ্ভাসনের আবেদন জানিয়েছে, আচার্যের উত্তরে সংকেতসূত্রের রূপে নিবদ্ধ তত্ত্বগুলি তৎকালীন জ্ঞানতৃষ্ণার ঐকান্তিকতা প্রমাণ করেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ শ্লোকসমষ্টি উপস্থাপনার পূর্বে গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত ভূমিকারূপে কিছু গদ্য স্তবকের পুনরাবৃত্তি করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে (যেমন ঃ ২ : ৫ ১৬-১৯) সংহিতার শব্দভাণ্ডার এ ব্যাকরণরীতি যখন অনুসৃত হয়েছে, তাকে প্রাচীনতর রচনারূপে গ্রহণ করা যায় ; আবার, কোথাও সমসাময়িক অর্থাৎ উপনিষদ্‌যুগের ভাষা প্রয়োগের লক্ষণ স্পষ্ট। পরবর্তী পর্যায়ে ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যার বহু পারিভাষিক শব্দ অর্বাচীনতর উপনিষদ্‌গুলিতেই প্রথম প্রবর্তিত হয়েছিল।

উপনিষদ্ যুগেব বৈদিক ভাষায় নিজস্ব কোনো ব্যাকরণ যদিও ছিল না, তবুও আমরা প্রাচীনতর বৈদিক পর্যায় থেকে মহাকাব্যযুগের দিকে ব্যাকরণগত বিবর্তনের আভাস এখানে লক্ষ্য করি। শব্দরূপ, উপসর্গ, ক্রিয়াপদ, ছন্দ ইত্যাদির প্রয়োগে প্রাচীন ও নবীনের সহাবস্থান চোখে পড়ে। উপনিষদ্ রচনার শেষ পর্বে উদ্ভূত অন্যান্য চরিত্রলক্ষণ হ'ল, গ্রন্থশেষে—'মাহাত্ম্য' অংশগুলি, যাতে আছে—রচনা-পাঠ ও শ্রবণের ফলশ্রুতির বর্ণনা। কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের শেষে ও গ্রন্থের উপসংহারে এবং শ্বেতাশ্বতরে গ্রন্থশেষে এধরনের অংশ পাওয়া যায়। বহু উপনিষদের সূচনায় ও সমাপ্তিতে পূর্বনির্ধারিত সংকেতসূত্র জাতীয় প্রশস্তিমূলক অংশগুলিতে কখনো কখনো জিজ্ঞাসুদের প্রার্থনাপূরণের আকাঙ্খা অভিব্যক্ত হয়েছে। এগুলি মাঝে মাঝে সংহিতা বা ব্রাহ্মণ থেকে চয়ন করা হয়েছে। এটি যে পরবর্তীকালে উদ্ভূত রীতি, তার প্রমাণ হ'ল, প্রাচীনতম দুটি উপনিষদে এটি অনুপস্থিত। ছান্দোগ্য উপনিষদে একটি গুরু ও শিষ্যের তালিকা এবং বৃহদারণ্যকে একটি বংশতালিকা পাওয়া যায়। প্রাথমিকভাবে দার্শনিক রচনা হলেও উপনিষদ্‌গুলিতে নিছক মতবাদ ছাড়াও অনেক অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সারবস্তু নিহিত রয়েছে। ব্রাহ্মণগুলির মতো উপনিষদেও কাল্পনিক ব্যুৎপত্তি, গুরু-শিষ্য-তালিকা, বংশতালিকা, অনুষ্ঠানসমূহের পুনর্বিশ্লেষণ এবং অসংখ্য উপকথা, কাহিনী ও কিংবদন্তী পাওয়া যায় এসব কাহিনীর মাধ্যমে আমরা তৎকালীন সমাজের সঙ্গে পরিচিত হই। প্রধান বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা থাকায়, এদের মধ্যে সমাজ, রীতিনীতি, ব্যবহারবিধি, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের নির্ভরযোগ্য একটি চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে।

শিক্ষাব্যবস্থা

বৈদিকযুগের সৃষ্টিশীল রচনাপর্যায়ের পরিসমাপ্তি সূচনা করে যে উপনিষদ্ সাহিত্য, তাতে বৈদিক মানুষের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। ইতোমধ্যে গবেষক ও আচার্যদের কয়েক শতাব্দী ব্যাপী দীর্ঘ পরম্পরার ঐতিহ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। বহু উপনিষদে প্রাচীন বিশেষজ্ঞ, ঋষি ও আচার্যরা উদ্ধৃত হয়েছেন এবং দ্বিবিধ বিদ্যা অর্থাৎ পরা ও অপরা বিদ্যার প্রবক্তা আচার্য ও চিন্তাবিদদের দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। চতুর্বেদ অপরা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত ; লক্ষণীয় যে, অথর্ববেদ ইতোমধ্যে শাস্ত্ররূপে স্বীকৃত হয়ে গেছে। অপরা বিদ্যার মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ (মণ্ডুক ১ : ১ : ৫, বৃহদারণ্যক ২ : ৪ : ১০ ; এছাড়া, ইতিহাস, পুরাণ, উপনিষদ্, শ্লোক, ভাষ্য-সাহিত্য ও ভেষজবিদ্যা। এসব জনসাধারণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যরূপে আরও পূর্ব থেকে বর্তমান ছিল।

প্রথম দিকে বেদাধ্যয়ন তিনটি আর্যবর্ণের পক্ষে অবশ্যপালনীয় কর্তব্য ছিল। অবশ্য শাস্ত্রগুলির দ্রুত বিস্তারের পরে সমগ্র বেদের জ্ঞান অর্জনের থেকে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের অব্যাহতি দেওয়া হল ; যে কোনো বেদের কিয়দংশ অধ্যয়ন করা তাদের নিকট প্রত্যাশিত ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণকে নিজ পরিবারে প্রচলিত বেদের নির্দিষ্ট শাখাটি অধ্যয়ন করতে হ'ত। কালক্রমে প্রয়োজনের পরিধি সঙ্কুচিত হয়ে এল, হয়তো বা ক্রমবর্ধমান বৈদিক সাহিত্যও পরিমাণে এত বিপুল কলেবর হ'ল যে, একজনের পক্ষে আয়ত্ত করা দুঃসাধ্য এবং শেষ পর্যন্ত তা গায়ত্রী শ্লোকের তিনটি ক্ষুদ্র চরণ জানার মতো অবিশ্বাস্য ন্যূনতম প্রয়োজনে পর্যবসিত হ'ল। এমন কি, উপনিষদের যুগেও কোনো কোনো ব্রাহ্মণ পরিবারে যে বেদাধ্যয়নের প্রতি অবহেলা দেখানো হ'ত, তা ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি অংশে (৬ : ১ : ১) স্পষ্ট। সেখানে শ্বেতকেতুকে তাঁর পিতা বেদাধ্যয়নের উপদেশ দিয়ে বলেছেন, তাঁদের পরিবারে বেদজ্ঞানবিবর্জিত 'ব্রহ্মবন্ধু'র কোনো অস্তিত্ব নেই। বিখ্যাত বিদ্বান ব্রাহ্মণরা বাস্তবজীবনেও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন ; তাই, একটি সাধারণ শব্দবন্ধ পাওয়া যায়, 'মহাকাল মহাশ্রোত্রিয়'। প্রচলিত সামাজিক রীতি অনুযায়ী উপনয়নের পরে কিশোর বিদ্যার্থী কয়েক বছরের জন্য গুরুর আশ্রমে যেত ; গৃহে প্রত্যাবর্তনের পরে সে বিবাহ ক'রে গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করত। বলা, বাহুল্য, কয়েক শতাব্দী ধ'রে সঞ্চিত বিদ্যাকে, সেই অক্ষরজ্ঞান আবিষ্কৃত হবার পূর্ববর্তী দিনগুলিতে, সংরক্ষিত করার একমাত্র উপায়ই ছিল সমগ্র রচনা কণ্ঠস্থ ক'রে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এই বিদ্যার উৎস সম্ভবত ইন্দো-ইয়োরোপীয়দের মূল বাসভূমি থেকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ার পূর্বে বিদ্যমান ছিল। কালক্রমে লেখন-পদ্ধতি যখন আবিষ্কৃত হ'ল, তখন সংরক্ষণের অন্য উপায় দেখা গেল। ভিন্ন ভিন্ন পরিবার ভিন্ন ভিন্ন বেদ—এমন কি তাদের পৃথক পৃথক শাখাগুলিও

সংরক্ষণ করত ; ফলে, কোনো একটি ব্যক্তির স্মরণশক্তির উপর চাপ কমে গিয়েছিল। তবে, সমস্ত যুগেই এমন কিছু পরিবার ছিল, যারা চতুর্বেদ আয়ত্ত করত। শাস্ত্রসমূহে সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস, ক্রিয়াকলাপ, মূল্যবোধ—সামগ্রিক জীবনযাপন প্রণালী সংরক্ষিত হয়েছিল। জনসাধারণের স্মৃতিতে নিবদ্ধ হওয়া ছাড়াও এসব শাস্ত্র সমগ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে সমন্বয় বিধানের একটি উপাদান হয়ে উঠেছিল ; ততদিনে অসংখ্য বৈচিত্রসহ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক রচনারূপে এগুলি বিপুল অঞ্চলে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল।

অবশ্য বেদবিষয়ক জ্ঞান আকাঙ্ক্ষাপূরণের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল ; আকাঙ্ক্ষিত ফলদানে অঙ্গীকারবদ্ধ যজ্ঞগুলিতে বৈদিক সাহিত্য আবৃত্তির প্রচলিত ফলদানে অঙ্গীকারবদ্ধ যজ্ঞগুলিতে বৈদিক সাহিত্য আবৃত্তির প্রচলিত ঐতিহ্য থেকেই সম্ভবত এই ধরনের ধারণার উৎপত্তি; তাই, বৃহদারণ্যকে উপনিষদের অন্তিম অধ্যায়ের পূর্ববর্তী অংশে বিভিন্ন রূপ ও গুণ সমন্বিত সন্তান লাভের জন্য অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার সঙ্গে বিভিন্ন বেদের সম্পূর্ণ বা আংশিক আবৃত্তির বিধান দেওয়া হয়েছে।

আর্থনীতিক জীবন

বিদ্যালাভের বিপুল আগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ব্যাপারেও আর্যরা সমান আগ্রহী ছিলেন ; খাদ্য বা অন্নের প্রতি তাঁরা শুধু প্রবলভাবে মনোযোগী-ই ছিলেন না, প্রকৃতপক্ষে অন্ন যেন এখানে (যেমন তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ৩ : ৭-১০) পূজাই পেয়েছে। ঐতরেয় উপনিষদে (১ : ৩ ১-১০) বলা হয়েছে যে, মানুষ ও পশুর সৃষ্টির পরে বিশ্বস্রষ্টা খাদ্যসৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু সৃষ্টির পরে অন্ন মানুষের আয়ত্তাধীন রইল না। বাক্ ও বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মানুষ তাকে পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বায়ুর সাহায্যে মানুষ অন্নকে অধিকার করতে পারল। এই সহজ প্রত্নকথার মধ্যে অন্ন উৎপাদনে আদিম মানুষের সমস্যা আভাসিত হয়েছে। খাদ্যসংগ্রহ ও শিকারের স্তরে যে তীব্র অনিশ্চয়তাবোধ আদিম মানুষকে পীড়িত করত, কিংবা কৃষিজীবী মানুষ যে খরা ও শস্যহানির ফলে খাদ্যবিরলতা ও দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় ত্রস্ত হ'ত, সে-সব যৌথ অবচেতনায় নিয়ত জাগরূক ছিল ব'লে প্রত্নকথার মধ্যে তা এভাবে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। দ্রুত অন্নবৃদ্ধিই তাই কাম্য এবং অন্ন তাই সর্বজনপূজ্য।

ছান্দোগ্য উপনিষদে (১ : ১৯) পঙ্গপাল-জনিত দুর্ভিক্ষের চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়, যখন এক ব্রাহ্মণ নিম্নবর্ণীয় ব্যক্তির নিকট সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ খাদ্য ভিক্ষা করছে। সেই ব্যক্তিই পরে রাজকীয় যজ্ঞানুষ্ঠানে দরকষাকষির মাধ্যমে কোনো

দায়িত্বভার গ্রহণ ক'রে উপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে অন্নের গূঢ় তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছিল। সহৃদয় রাজা জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ সর্বসাধারণের জন্য বহু অন্নসত্র নির্মাণ ক'রে নিঃস্ব ব্যক্তিদের মধ্যে অন্ন বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। অন্নবিতরণ তখন পুণ্যপ্রসূ ও খ্যাতিলাভের উপায়রূপে বিবেচিত হ'ত। ক্ষুধা ও তৃষ্ণার (অশনায়া-পিপাসার) বিপুল ভয়কে বার বার প্রধান শত্রুরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐতরেয় উপনিষদ্ (১ : ২) অনুযায়ী মানবদেহে অবস্থানকারী ক্ষুধা ও তৃষ্ণাকে দেবতার মতো প্রসন্ন করতে হয়।

পারিবারিক চিত্র

সম্ভবত উপনিষদের যুগেও পারিবারিক কাঠামো একান্নবর্তী বা প্রসারিত অবস্থায় রয়ে গিয়েছিল, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অটুট ছিল। সন্তানের প্রতি স্নেহ ও পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধার প্রশংসা করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশিবার নারীর প্রতি উচ্চারিত আশীর্বাণী হ'ল ঃ 'এই নারী কখনো পুত্রেব মৃত্যুতে রোদন করে না।' নিজ বংশকে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত রাখা আবশ্যিক দায়িত্বরূপে গণ্য হ'ত ; দীর্ঘ বংশতালকাগুলি এই মানসতার প্রমাণ বহন করে। মরণোন্মুখ পিতা তাঁর সমস্ত গুণাবলী, কীর্তি ও শরীর-মনের সব শক্তি পুত্রকে অর্পণ ক'রে বংশকে অবিচ্ছিন্ন রেখে যাবার ব্যবস্থা করেন। পরিবারে নারীর স্থান পুরুষের তুলনায় হীন ; বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৬ : ৪ : ২) দেখি যে, এই হীনতার যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য পরিকল্পিত-একটি প্রত্নকথার দাবি করা হয়েছে, স্রষ্টাই স্বয়ং নারীকে পুরুষের অপেক্ষা হীনতর অবস্থানে স্থাপিত করেছেন। অবশ্য ব্যতিক্রমী পরিপ্রেক্ষিতে নারীকে কখনো কখনো আধ্যাত্মিক আলোচনায় যোগদান করার অনুমতি দেওয়া হ'ত। তাই, গার্গী বিখ্যাত ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন ; কিন্তু গার্গীর সূক্ষ্ম ও অন্তর্ভেদী প্রশ্নে বিরক্ত বোধ ক'রে ঋষি তাঁকে শিরশ্ছেদের ভয় দেখিয়ে কার্যোদ্ধার করলেন (বৃহদারণ্যক ৩ : ৬ : ১)। যাজ্ঞবল্ক্য অবশ্য পত্নী মৈত্রেয়ীকে আত্মজ্ঞান দান করেছিলেন, কারণ তিনি ধনসম্পত্তি প্রত্যাখ্যান ক'রে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্যেই প্রার্থনা জানিয়েছিলেন।

যজ্ঞানুষ্ঠান পরিচালনা করতে হলে উপনয়ন ও বেদজ্ঞান ছিল আবশ্যিক, কিন্তু এই উভয় অধিকার থেকেই সুপরিকল্পিতভাবে নারীকে বঞ্চিত করা হ'ত ; কারণ, কখনো কখনো আর্যের পত্নী ছিল অনার্য-কন্যা অর্থাৎ সামাজিক বিচারে হীনতর, উপনয়ন ও বেদবিদ্যায় যে অনধিকারিণী। অনার্য নারীর গর্ভজাত পুত্র অবশ্য পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত ; ফলত, উপনয়ন লাভ ক'রে যজ্ঞানুষ্ঠানে অধিকারী হতে তার পক্ষে কোনো বাধা ছিল না। উপনিষদে যজ্ঞানুষ্ঠান যেহেতু নূতন

ধরনের অনুষ্ঠান-বর্জিত একটি বিমূর্তরূপ পরিগ্রহ করেছে, তাই নারীকে তার থেকে বঞ্চিত করার জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট বিধির প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু সাধারণভাবে নারী ব্রহ্মচর্চায় যোগ দিতে পারত না , গার্গী ও মৈত্রেয়ী সর্বতোভাবেই ছিলেন ব্যতিক্রম। আর্য মাতা ও অনার্য পিতার পুত্ররা সম্ভবত মাতৃগোষ্ঠীর নাম বা পদবী লাভ কবতেন (যেমন জাবাল)।

পত্নীরূপে নারী সম্পূর্ণ স্বামীর অধীন ছিল, পুরুষ তাকে শয্যাসঙ্গিনী করার জন্য নানাবিধ দান উৎকোচরূপে অর্পণ করত। কোনো নারী অস্বীকার করলে তাকে লাঠি দিয়েও প্রহারের বিধান দিয়েছেন যাজ্ঞবল্ক্য। (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৬ : ৪ : ৭) নারীকে দমন ও উপভোগ করার নানাবিধ উপায়ের কথাই এখানে আছে।

নীতিবোধ

ভারতবর্ষে নীতিশাস্ত্রকে কখনো পৃথক চর্চার শাস্ত্ররূপে গণ্য করা হয় নি ; প্রচলিত ধর্মীয় ভাবনার অন্তর্লীন ধারারূপেই তার অস্তিত্ব স্বীকৃত। যজ্ঞ যতদিন পর্যন্ত সর্বজনগ্রাহ্য ধর্ম ছিল, যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজনকেই সৎকর্মরূপে গ্রহণ করা হ'ত। সামাজিক ব্যবহারের ঔচিত্য-অনৌচিত্য সম্পর্কে জনসাধারণের নিজস্ব ধারণা নিশ্চিত ছিল, যদিও বিশেষভাবে যজ্ঞের আলোচনায় পূর্ণ শাস্ত্রসমূহে সুনির্দিষ্ট কোনো নীতির মানদণ্ড তৈরি হয় নি। কিন্তু, কালক্রমে যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পর্কে মনোযোগ যত শিথিল হ'ল এবং বহুজাতিক এ সমাজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল, ততই সামাজিক ব্যবহার বিধি অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করল। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের পরিধিতে একমাত্র উপনিষদেই নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে উত্তম একটি বিবরণ পাওয়া যায়।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের একটি বিখ্যাত অংশে (১ : ১১ : ১-৪) আমরা যে সুস্পষ্ট নৈতিক ভাবাদর্শের সম্মুখীন হই, তা প্রকৃতপক্ষে কিছু বিচ্ছিন্ন ভাবনারই অভিব্যক্তি এবং অনেকাংশে অভিনব। এতে সত্য ও ধর্ম—এই দু'টি মৌলিক তত্ত্বের উপর সম্পূর্ণ নূতনভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের উপসংহারে বৈদিক আর্যজীবনের আদর্শটি উপস্থাপিত হয়েছে (৮ : ১৫ : ১)। এতে কৌতুহলজনক দিকটি হ'ল, পুনর্জন্ম নিবৃত্তির সঙ্গে এই আদর্শটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিদ্যা, আচবণ ও সৎকর্ম সামাজিক মূল্যবোধের অঙ্গ ; আবার এগুলি পিতৃলোক ও দেবলোক অর্জন করারও উপায় (বৃহদারণ্যক ১ : ৪ : ১৬ ; ১০ : ৩ ও ছান্দোগ্য ৫ : ১০ : ২) উপনিষদে পিতৃযান ও দেবযানের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাতে গ্রাম ও অরণ্যের মধ্যবর্তী দ্বন্দ্ব ছাড়াও দ্বিবিধ লক্ষ্য, দ্বিবিধ পথ ও দ্বিবিধ গন্তব্যের

মধ্যে বিরোধ আভাসিত হয়েছে। পাপ ও পুণ্যের দ্বন্দ্বও এই পর্বে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে (বৃহদারণ্যক ৩ : ২ : ১৩ ; কঠ ১ : ২ : ১) সত্য ও ধর্ম এখন একার্থবহ ও অলঙ্ঘনীয়।

কর্ম, তপ, আত্মসংযম, সত্য, শ্রদ্ধা ইত্যাদি নবোদ্ভূত ভাবাদর্শগুলি এই যুগে অবশ্য পালনীয় সামাজিক মূল্যবোধরূপ স্বীকৃত ও সম্মানিত হয়েছে (কেন ৪ : ৮ : ৭ ; মুণ্ডক ৩ : ১ : ৭) পার্থিব সম্পদ সম্পর্কে নিরাসক্তি, জীবনের প্রতি যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গির সূচক হয়ে উঠেছে (ঈশ ঃ ১)। কর্ম যেহেতু দোষাবহ ব'লে গণ্য, আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করা তাই কাম্য ; নিষ্কাম কর্মী তাই শতায়ু হয়, এই বিশ্বাস জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। একটি প্রত্নকথায় দেবতা, মানুষ ও অসুরের মধ্যে নিহিত ব্যবধান ত্রিবিধ সামাজিক মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদর্শিত হয়েছে (বৃহদারণ্যক ৫ : ৪ : ৫)। কিন্তু এতে যজ্ঞকেন্দ্রিক মূল্যবোধের পরিবর্তে সন্ন্যাসীর উপযুক্ত অহিংসা, উদারতা ও দয়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এতে মনে হয়, নৈতিক মূল্যবোধ ও আচরণবিধি মূলত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়গুলিরই সৃষ্টি ; এই ধারায় বহু চিন্তাবিদ মনীষী ও দার্শনিকের সৃষ্টি হয়েছিল।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়

বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে বর্ণভেদ ক্রমশ শিলীভূত হয়ে যাচ্ছিল ; যথাযথ শ্রেণীর উৎপত্তি হয়তো তখনো হয় নি, কিন্তু নিঃসন্দেহে সমাজ দৃঢ়পদে সেদিকেই অগ্রসর হচ্ছিল। লোহার স্বল্পতা এবং উপযুক্ত সৈন্যবাহিনী, মুদ্রাব্যবস্থা ও পূর্ণবিকশিত শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উত্থানের পক্ষে সহায়ক সামাজিক-রাজনীতিক গঠন-সংস্থানের অভাব, এ-সমস্তই অর্ধ-কৌম ও প্রাক্‌মুদ্রা সমাজব্যবস্থার চরিত্রলক্ষণ ; খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের প্রথমার্ধে সেসমাজের কৃষিকার্যে লোহার স্বল্প পরিমাণ প্রয়োগ করা হ'ত। মৌলিক পরিবর্তনের দিকে প্রবণতার সূত্রপাত হয়েছিল বটে, কিন্তু তখনো তা সম্পূর্ণতা পায় নি। বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, এ-সময় লোহা ব্যবহারের দ্বিতীয় পর্যায় চলছিল ; আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ থেকে উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল ও বিহারে যখন কুটীরশিল্প ও কৃষিকার্যে তার প্রয়োগ শুরু হ'ল কারিগর ও কৃষি-শ্রমিকের শ্রেণী সামাজিক ও বৃত্তিগতভাবে পুরোহিত ও যোদ্ধা শ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। সামাজিক অক্ষমতা ও অর্থনৈতিক দায়ের ভারে জনসাধারণ পিষ্ট হ'ত ; একদিকে নির্দিষ্ট সৈন্যবাহিনী ও অন্যদিকে প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রেণী-নিষ্পেষণ অব্যাহত রাখা হ'ত—প্রশাসন রাজস্ব আদায় করত এবং পরিবার, সম্পত্তি ও সামাজিক শৃঙ্খলার বিধি-লঙ্ঘনকারীর শাস্তি বিধান করত।

উপনিষদ্ সম্পর্কে অন্যতম প্রধান বিতর্ক এই প্রশ্নকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছে ঃ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে কার বেশি প্রাধান্য। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ—যাজ্ঞবল্ক্য আবার তাঁদের মধ্যেও অগ্রগণ্য, যেহেতু উপনিষদের মৌল ভাবাদর্শ তিনিই শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং সেইসঙ্গে দীর্ঘতম ও সম্ভবত সর্বাপেক্ষা অধিক তাৎপর্যপূর্ণ উপনিষদেরই তিনি রচয়িতা। আবার এই সঙ্গে এও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ক্ষত্রিয়রা বিশেষত রাজন্য ও রাজারা, নূতন জ্ঞান বিধিবদ্ধ ও চতুর্দিকে তা প্রচার করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ; এমন কি, উপনিষদে কখনো কখনো এও শোনা গেছে যে তাঁরা নবলব্ধ জ্ঞানকে গোপন রহস্যরূপে সতর্কভাবে নিজের শ্রেণীর মধ্যেই একান্তভাবে রক্ষা করতে চাইছেন, অক্ষত্রিয়দের কাছে জ্ঞান-বিস্তারে তাঁরা নিতান্ত অনিচ্ছুক। অবশ্য ব্রাহ্মণ যুগেই এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের আভাস আমরা পেয়েছিলাম (যেমন, কৌষীতকি ২৬ : ৫ ; শতপথ, ১১ ; ঐতরেয় ২ : ১৯)।

আরুণি যখন রাজা প্রবহণ জৈবলিকে এই নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞান দানের অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তখন রাজা দ্ব্যর্থহীনভাবে তাঁকে জানিয়েছিলেন, এই বিদ্যা আরুণিই ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রথম লাভ করছেন (ছান্দোগ্য ৪ : ৩ : ৭)। পাঁচজন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব উদ্দালক আরুণির কাছে ব্রহ্মজ্ঞান অর্জনের জন্য গিয়েছিলেন ; কিন্তু নিজের অপর্যাপ্ত জ্ঞান সম্পর্কে সচেতন ছিলেন ব'লে আরুণি তাঁদের ক্ষত্রিয় রাজা অশ্বপতির নিকট নিয়ে গেলেন। অর্থাৎ চিন্তাবিদরূপে ক্ষত্রিয় অশ্বপতি ছিলেন ব্রাহ্মণ আরুণির তুলনায় অগ্রণী (ছান্দোগ্য ৫ : ১১)।

রাজন্যরূপে তৎকালীন উন্নতিশীল ভূপতিদের সঙ্গে ক্ষত্রিয়দের নিবিড় সম্পর্ক ছিল ; তাঁরা হয় রাজাদের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে বদ্ধ ছিলেন, নয়ত তাঁরা ছিলেন রাজসভা বা রাজপরিষদের অন্যতম সদস্য। অহংকারী ব্রাহ্মণ বালাকির জ্ঞানের গর্ব কিভাবে ক্ষত্রিয় রাজা অজাতশত্রু চূর্ণ করেছিলেন, বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২ : ১ : ১৫) তার মনোজ্ঞ বিবরণ রয়েছে। আবার, ঐ গ্রন্থে দেখি, পুত্র শ্বেতকেতুর ব্যর্থতার কথা জেনে গৌতম রাজা প্রবহণ জৈবলির কাছে তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য শিষ্যত্ব গ্রহণ করছেন (তদেব, ৬ : ২ : ৮)। এসব বৃত্তান্ত থেকে আমাদের মনে হয় যে, অন্তত প্রাথমিক স্তরে তত্ত্বজ্ঞানে ক্ষত্রিয়দের একাধিপত্য ছিল। শতপথ ব্রাহ্মণের একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৃত্তান্তের (৫ : ৩ : ৬ : ৭) কথা আমাদের মনে পড়ে, যেখানে রাজা জনকের বিতর্কসভায় যোগদানে ইচ্ছুক ব্রাহ্মণদের প্রতি যাজ্ঞবল্ক্য এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে, ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয়ের কাছে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হতে পারেন।

স্পষ্টত জীবনের বহু ক্ষেত্রে সে-যুগে ক্ষত্রিয়দের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এমন এক সময় ক্ষত্রিয়দের ভূমিকা প্রাধান্য অর্জন করেছিল যখন ক্ষমতাশালী রাজারা

প্রতিবেশী অঞ্চলগুলি অধিকারের অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাছাড়া, দেশের সীমাতিযায়ী ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যের জন্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা আবশ্যিক হয়ে উঠেছিল—ভ্রাম্যমান বণিকদের যাত্রাসঙ্গীরূপে একমাত্র বেতনভোগী ক্ষত্রিয় প্রহরীরা সেই নিরাপত্তা বিধানে সমর্থ ছিল। সমাজে ক্ষত্রিয়দের ক্রমোত্থানের ব্যাখ্যা এবং শক্তিবৃদ্ধি করার প্রয়োজনে উপযুক্ত প্রত্নকথা আবিষ্কৃত হয়েছিল (যেমন বৃহদারণ্যক. ১ : ৪ : ১১)। অবশ্য এই প্রত্নকথায় যেহেতু ব্রাহ্মণ কর্তৃক ক্ষত্রিয়কে পূজ্য-মর্যাদাদান কিংবা ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়ের গর্ভ-রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, তাই আমরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পারস্পরিক সহাবস্থান ও দ্বন্দ্ব দুয়েরই আভাস পাই। আবার ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়ের শক্তির উৎস বা চূড়ান্ত আশ্রয় রূপে বর্ণনা করার মধ্যে দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের পরবর্তীকালের প্রচেষ্টাও ব্যক্ত হয়েছে। পাশ্চত্য দেশগুলির মতো ভারতবর্ষে কখনো কোনো সুসংগঠিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ছিল না ; রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের যে ধ্রূপদী সংগ্রাম বহু শতাব্দী ধ'রে ইয়োরোপকে আলোড়িত করেছিল, এটা যেন তার সর্বাধিক নিকটবর্তী রূপ। ভারতবর্ষে আমরা দেখি সামাজিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য অর্জনের সংগ্রাম ব্রাহ্মণ ও রাজন্যের মধ্যে।

বৈদিক যুগের অন্তিম পর্যায়ে বহুবিধ পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। অথর্ববেদ বিষয়ক আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি যে, একটি বিশেষ সময় পরিধিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সার্বভৌম রাজ্যের উত্থান হচ্ছিল—এটা প্রকৃতপক্ষে সেই যুগেরই বৈশিষ্ট্য যার সূচনায় ঋগ্বেদের প্রথম ন'টি মণ্ডল সংকলিত এবং উপসংহারে উপনিষদ্‌গুলি রচিত হয়েছিল। সার্বভৌম রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংগঠনগুলি বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে উত্থিত হয়ে সংলগ্ন রাজ্যসমূহ অধিকার ক'রে নিচ্ছিল। বৈদিক যুগের অন্তিম পর্যায়ের বিশিষ্ট লক্ষণরূপে সার্বভৌম রাজ্যসমূহের উত্থান অথর্ববেদ এবং ব্রাহ্মণ সাহিত্যে সূচিত হয়েছে ; সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এসব রাজ্যই ক্রমে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক চিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করছিল।

যদিও খ্রিস্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে লোহার ব্যবহার প্রবর্তিত হয়েছিল, তবু খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম (মতান্তরে সপ্তম) শতাব্দীর অন্তভাগের পূর্বে সম্ভবত লাঙলে লোহার ব্যবহার হয়ে ওঠে নি। কিন্তু যখন সে-ধরনের প্রয়োগ শুরু হ'ল, অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক মানুষের সাহায্যে ও স্বল্পতর প্রচেষ্টায় অনেক বেশি জমি চাষ করা সম্ভব হয়ে উঠল। আবার, জমি যদি সমগ্র কৌমের পরিবর্তে একক পরিবারগুলির স্বত্বাধীন হয়, কেবল তখনই এই অবস্থা লাভজনক হতে পারে, কারণ, তখন ন্যূনতম চাহিদা অপেক্ষা অধিক মাত্রায় উৎপাদনের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কৌম গোষ্ঠীর মধ্যে উৎপাদিত বস্তু সমানভাবে বণ্টন করার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তিলাভের পরে অর্থাৎ ব্যক্তি বা পরিবারের এককভাবে বাণিজ্য-প্রচেষ্টার সম্ভাবনায়। বস্তুত

প্রকৃত লোহার লাঙল প্রবর্তনের প্রভাব সত্যই সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। খাদ্য-উৎপাদনের পরিমাণ বহুলাংশে বর্ধিত করা ছাড়াও অনেক প্রতিক্রিয়া-পরম্পরার জন্ম দিয়েছিল যা শেষ পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে দেশের সাংস্কৃতিক চিত্রকে আমূল পরিবর্তিত ক'রে দিয়েছিল।

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে উত্তর-কোশল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তী শতাব্দীতে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন আরও লক্ষ্যগোচর হয়ে উঠল। বিম্বিসারের সময় থেকে (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫২০) মগধ ক্রমশ রাষ্ট্রক্ষমতা ও রাজ্যসীমা বিস্তার করতে শুরু করেছিল, ফলে খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০-এর মধ্যে অঙ্গ, বিদেহ, কাশী ও কৌশল মগধের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময়ে সম্পূর্ণ গাঙ্গেয় উপত্যকা অর্থাৎ আধুনিক উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও বঙ্গ নন্দ সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়েছিল।

কৌম জীবন ভেঙে যাওয়ার পরেই এধরনের পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে, কেননা তখন কৌম বা গোত্রের পরিবর্তে পরিবার-ভিত্তিক ভূমির সত্ত্বাধিকার দেখা দিয়েছিল। পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বাণিজ্যপথের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে ; অন্যদিকে দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে বিশেষভাবে তামা ও লোহার খনি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলেই সেদিকে জনসাধারণের বসতি বিস্তার করার প্রেরণা এসেছিল। পথিমধ্যে গভীর অরণ্যকে অগ্নিদগ্ধ ক'রে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও বিহার অঞ্চলের বিস্তৃত ভূমিকে কৃষিকার্যের উপযুক্ত ক'রে তোলা হয়েছিল। লোহার লাঙল ব্যবহারের ফলে উদ্বৃত্ত খাদ্য দ্বারা সেইসব অনুৎপাদক নগর ও তাদের দুর্গসমূহের জন্য আহার সংস্থান করা সম্ভব হল, যেগুলি দ্রুত বর্ধমান সার্বভৌম রাজ্যসমূহের কেন্দ্র। সেসব স্থানে বণিকরা বাস করত যাদের বহুদূর অবধি ভ্রমমাণ বাণিজ্য শকট ক্ষত্রিয়দের দ্বারা রক্ষিত হ'ত। রাজারা এধরনের বণিকদের আশ্রয় দিয়ে ও মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন ক'রে লাভবান হতেন। কারুশিল্পীদের বিভিন্ন সঙ্ঘের কথা আমরা শুনি ; প্রতিটি শিল্পের একজন 'জেট্ঠক' বা নেতা থাকতেন। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের তখন নতুনভাবে প্রসার হচ্ছিল। এই যুগেই শেষ-পর্বের উপনিষদ্‌গুলি রচিত হয়েছিল।

ব্যাপক বাণিজ্যের পক্ষে বিনিময়ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেহেতু খুব একটা সহায়ক ছিল না. তাই ধীরে ধীরে মুদ্রাব প্রবর্তন হ'ল। বিভিন্ন ধাতুর খনি আবিষ্কৃত হওয়ার পরে ধাতুশিল্প যখন সুসংবদ্ধ রূপ নিল, সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর শেষদিকে বাণিজ্যিক ও রাজকীয় মুদ্রার প্রচলন শুরু হ'ল। বাণিজ্য-ভিত্তিক অর্থনীতি ও রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত মুদ্রা ব্যবস্থা সমৃদ্ধির ফলে উদ্বৃত্ত উৎপাদন মুষ্টিমেয় লোকের লাভের পথ প্রশস্ত করল ; শ্রেষ্ঠী এবং সার্থবাহদের প্রাধান্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ব'লে বৌদ্ধ

সাহিত্যে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখা গেল। বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনীতি যখন সমুন্নত হয়, তা শুধু সম্পদের উৎসই হয় না, ভাবাদর্শ ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও স্বীকৃত শক্তি হয়ে উঠে। তাই, তৎকালীন বণিকশ্রেণী যেহেতু প্রচলিত যজ্ঞধর্মের পরিবর্তে উদীয়মান নব্য ধর্মীয় ও দার্শনিক মতগুলিকে সমর্থন জানিয়েছিল এবং বিভিন্ন শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল, তাই সমসাময়িক সমাজের উপসংগঠনে এর প্রবল প্রভাব দেখা গেল।'

সমাজের কৌম-চরিত্র ভেঙে পড়ার পরে মগধের উত্থান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, নূতন উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন-সম্পর্ক সূচনার সঙ্গে তা অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত। নব্যচিন্তাধারার প্রতিষ্ঠাতাদের অধিকাংশ যে মগধ এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন তা মোটেই আকস্মিক ঘটনা নয়। কৌম-অন্তর্বর্তী পুরাতন সামাজিক সম্পর্কগুলি শৃঙ্খলে পরিণত হয়েছিল বলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতির স্বার্থে সেগুলি চূর্ণ করতে হ'ল। প্রাথমিকভাবে মগধে খ্রিস্টপূর্ব ৫২০ থেকে ৩৬০ অব্দের মধ্যে সমাজ-সংস্থায় নতুন বৈশিষ্ট্যের সূত্রপাত হয়েছিল।

বর্ণভেদ তখনো পর্যন্ত কতটা শিথিল ও সঞ্চরণশীল থাকায় রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক বাণিজ্য থেকে লব্ধ অর্থ তিনটি উচ্চতর বর্ণের যে কোনো একটির হাতে সঞ্চিত হতে পারত। পূর্ণবিকশিত মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি অবশ্য আরো পরবর্তীকালে আবির্ভূত হয়েছিল ঃ মুদ্রার পরিবর্তে তখনো হুণ্ডির প্রচলন ছিল। কিন্তু তাতেও উদ্বৃত্ত উৎপাদনের প্রমাণ পাওয়া যায়, যার সঙ্গে শোষণের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য ; কারণ, কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় উদ্যমী ব্যক্তি বাণিজ্য করত এবং ধনাঢ্য হয়ে উঠে তারা দরিদ্রদের বাণিজ্য ও উৎপাদন উভয়কর্মেই নিযুক্ত করত। লোভ হয়ে উঠল প্রধান মানসিক বৃত্তি ; ফলে কৌম অর্থনীতি ভেঙে যাওয়ার পরে সম্পদের অসম বণ্টন বিপুল জনতার মধ্যে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের সূচনা করল। এই ভাগ্যহীন শোষিত জনতার মধ্যে এক ধরনের নৈরাশ্যবাদ ও হতাশা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল ; জীবনে শেষ পর্যন্ত কোথাও ন্যায়বিচার নেই ব'লেই তাদের কাছে প্রতিভাত হ'ল ; অস্পষ্টভাবে জনসাধারণের মধ্যে এই উপলব্ধির সূচনা হ'ল যে, মুষ্টিমেয় ব্যক্তির লোভ সর্বনাশের কারণ হয়ে উঠছে। মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির প্রাথমিক স্তরের উন্মেষ হয়েছিল এই পর্বে।

এটা মোটেই আকস্মিক নয় যে, তৈত্তিরীয় উপনিষদের পুনরাবৃত্ত ধ্রুবপদগুলির অন্যতম হ'ল 'নির্লোভ শ্রোত্রিয়' কিংবা ঈশোপনিষদের প্রারম্ভে রয়েছে ধনলিপ্সার প্রতি নিষেধবাণী ; তেমনি প্রজাপতি অলৌকিক অভিব্যক্তির মাধ্যমে মানুষকে দানশীল হতে আহ্বান জানিয়েছেন। শূদ্রেরা এই পর্যায়ে নিতান্ত ভরণপোষণের বিনিময়ে যথাসাধ্য শ্রমশক্তির জোগান দিয়েছে ; ফলে মুষ্টিমেয় ভূম্যধিকারী ধনী ব্যক্তির হাতে

পুঞ্জীভূত সম্পদ প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেল। উৎপাদন যখন এমন স্তরে উপনীত হ'ল যে তা অনুৎপাদক নগরগুলির ভরণপোষণ করতে পারে এবং অন্তর্দেশীয় ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় উদ্বৃত্ত খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী জোগান দিতে পারে, তখনই জনসাধারণের বিপুল অংশের পক্ষে জীবন এই প্রথম অনিবার্য অমঙ্গলেব প্রতিমূর্তি হয়ে উঠল, যার থেকেই পলায়ন-ই কাম্য ব'লে মনে হ্ল।

কৃষিব্যবস্থার উন্নতি ও বিপুলভাবে কৃষিব্যবসায়ের সম্ভাবনা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারবাহী পশু নূতন গুরুত্ব লাভ করল ; ফলে, ক্রমবর্ধমান যজ্ঞগুলিতে তাদের অনিয়ন্ত্রিত হত্যা এই পর্যায়ে অযৌক্তিক অপচয়রূপে প্রতিভাত হ'ল। বিপুল কৃষিব্যবসায়ের প্রমাণ বৌদ্ধ জাতকে পাওয়া যায়—জাতকের সমাজ মোটামুটিভাবে উপনিষদের সমসাময়িক। জাতকের কাহিনীতে (৩ : ২৯৩ ; ৪ : ২৭৬) আমরা ৮,০০০ একর ব্যাপ্ত কৃষিখামারের কথা শুনি, যাতে ৫০০টি লাঙল ব্যবহৃত হ'ত। সুত্তনিপাতে (১ : ৪) বলা হয়েছে যে, এই জমি সাধারণত ব্রাহ্মণদের অধিকারে ছিল। জরথুস্ত্র যে ধর্মীয় আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন, তাও এই বিপুল কৃষিখামারের সহগামী ; অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পশুর অর্থহীন অপচয় পরোক্ষভাবে বন্ধ করার তাগিদ থেকে ঐ আন্দোলনের সূত্রপাত। সম্রাট অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পিছনেও উৎপাদনব্যবস্থায় অপচয় রোধ করার জন্য তৎকালীন সমাজের পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে। সেইসঙ্গে সমস্ত ধরনের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের উত্থানের মধ্যে তৎকালীন অনুষ্ঠানসর্বস্ব সমাজে বিপুল আড়ম্বর ও ঐশ্বর্যের সঙ্গে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর নিদারুণ দারিদ্র্যের সহাবস্থানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছে। যজ্ঞধর্ম যদিও তখনো পর্যন্ত অবশ্য পালনীয়রূপে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, সেসময়ে আজীবিক, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের মতো প্রতিবাদী ধর্মমতগুলি যজ্ঞের অপ্রয়োজনীয়তা ও নৈতিকভাবে অহিংসার একান্ত আবশ্যকতা প্রচার করেছিল। লক্ষণীয় যে, উপনিষদ্ পর্যায়ের ব্রাহ্মণ্যধর্মও যজ্ঞকে 'অদৃঢ় তরণী' ব'লে বর্ণনা করেছে (মুণ্ডক ১ : ২ : ৭)।

জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশ ব্যয়বহুল যজ্ঞের কেবল নিষ্ক্রিয় দর্শকরূপেই বিদ্যমান ছিল, কেননা যজ্ঞ মূলত রাজাদের এবং নব্য ধনিক সম্প্রদায় অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হ'ত। পুরোহিত সম্প্রদায় ও তাদের সহকারীরা জনসাধারণের সংখ্যালঘু অংশ মাত্র ছিলেন ; কেবল তাঁরাই যজ্ঞ থেকে লাভবান হতেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতি ফলদানে যজ্ঞগুলির বারংবার ব্যর্থতাও নিশ্চিতভাবে তাদের উপযোগিতা সম্পর্কে কতকটা সংশয়ের জন্ম দিচ্ছিল। তবে যজ্ঞ পার্থিব জীবনে সমৃদ্ধি এবং পরলোকে পার্থিব আনন্দের নিরবিচ্ছিন্ন অনুব্যাপ্তির আশ্বাস দিত। কিন্তু এই পর্যায়ে জীবন যেহেতু মুখ্যত দুঃখময় ও অবাঞ্ছনীয় ব'লে প্রতিভাত হচ্ছিল এবং

ইহলোকের যজ্ঞাদি ফলপ্রসূ কর্ম পরলোকে শুধুমাত্র পুনর্জন্মেরই হেতু, তাই এই পুনরাবৃত্ত অমঙ্গল থেকে আত্যন্তিক মুক্তি পুনর্জন্মের শৃঙ্খল-মোচনই প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অথচ এক্ষেত্রে যজ্ঞ সামান্য মাত্রায়ও সহায়ক হতে পারত না। ভারতীয় জীবনে এই যে আঁধির প্রকাশ ঘটেছিল, বস্তুত তা পৃথিবীর প্রত্যেকটি মহাদেশে ব্যাপ্ত ছিল। কেননা গ্রিস, ইরান, চীন ও মিশর, মেসোপোটামিয়ায় প্রায় এই সময়ে অনুরূপ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে আধ্যাত্মিক অস্থিরতা ও বহু দার্শনিকের আবির্ভাব হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে চীনে লাওৎসে এবং ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে কনফুসিয়াস আর গ্রিসে হেরাক্লিটাস, এ্যানাক্সাগোরাস, এম্পিডোক্লিস ও জেনোফানেস্-এর জন্ম হয়েছিল। অধিকাংশ গবেষকদের মতে জরথুস্ত্র আবির্ভূত হয়েছিলেন খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে। ভারতবর্ষে জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীর ও বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বুদ্ধদেব খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইহুদীদের তোরাহ্ আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দে সংকলিত হয়েছিল ; বিদেশী প্রভাব পারস্য থেকে ভারতে এসে পৌঁছেছিল, দারিয়ুস খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর শেষদিকে সিন্ধু জয় করেছিলেন—। গ্রিস, চীন ও মিশর বাণিজ্যসূত্রে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। উপনিষদ্ যুগের শেষ পর্বে, বিশেষত আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের ফলশ্রুতি হিসাবে, গ্রিসের সঙ্গে ভারতবর্ষের চিন্তা ও ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে বিনিময় শুরু হয়। পূরণ কশ্যপ, অজিত কেশকম্বল, কুকুদ কাত্যায়ন, নির্গ্রন্থ জ্ঞাতপুত্র, মস্করী গোশাল, রুদ্র রামপুত্র, সঞ্জয় বৈরাটিপুত্র প্রভৃতি নাম তৎকালীন ভারতবর্ষে বহুব্যাপ্ত আধ্যাত্মিক আলোড়নের ইঙ্গিত বহন করে, এদের মধ্যে বৈরাটিপুত্র সঞ্জয় ও মস্করী গোশাল ছিলেন বুদ্ধদেবের সমকালীন। নানাভাবে সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল ব'লে নতুন চিন্তাধারা ও জীবনের মূল্যবোধগুলির নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নূতন প্রবণতার সূত্রপাত হল। এ-সমস্ত প্রতিবাদী ধারার বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণ হ'ল যজ্ঞের চূড়ান্ত মূল্যের ও তাৎপর্যের প্রত্যাখ্যান ; জ্ঞানকাণ্ডের ভিত্তিমূলে নিহিত রয়েছে চিরাগত ধর্মীয় ঐতিহ্য প্রত্যাখ্যানের মনোভাব। একটি নতুন প্রতীকী ও নিগূঢ় রহস্যমূলক বিশ্লেষণ দিয়ে শুরু ক'রে তা শ্রীঘ্রই সম্পূর্ণভাবে যজ্ঞের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে ভিন্ন দিকে মুখ ফিরিয়েছিল।

এই নতুন আধ্যাত্মিক প্রবণতার উদ্ভূত হওয়ার পিছনে অন্যতম সহায়ক উপাদান ছিল প্রাগার্য বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংঘাত ও চূড়ান্ত সংশ্লেষণ। আর্যরা যখন প্রথম এসে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল ও পাঞ্জাবে বসতি স্থাপন করেছিল, সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের মধ্যে যারা দাস বা শূদ্ররূপে অধিকৃত হয় নি—তারা সম্ভবত দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে পলায়ন করেছিল। বৈদিক যুগের

অন্তিম পর্বের সূচনায় অধিকতর ভূমির প্রয়োজনে এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের বহুধাতু-সমৃদ্ধ জমিতে প্রবেশাধিকার লাভের তাগিদে অরণ্য অঞ্চল অগ্নিদগ্ধ করার নূতন প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হল। শতপথ ব্রাহ্মণের বিদেঘ মাধবের কাহিনীতে এবং মহাভারতের খাণ্ডব দহনের উপাখ্যানে আমরা তার প্রমাণ পাই। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ গবেষকদের অভিমত এই যে খ্রিস্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে মহাভারতের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। সুতরাং বৈদিক জনসাধারণের পূর্বমুখী সম্প্রসারণের সময়ে অর্থাৎ খুব প্রাচীন কালপর্যায়ে মহাভারত রচনার শুরু এবং খাণ্ডব উপাখ্যানও মূলত ঐতিহাসিক। পরবর্তী কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের যুগে ধাতু ও ধাতুশিল্পীরা ছিলেন প্রধান ভূমিকায়। তাৎপর্যপূর্ণভাবে মহাভারতের খাণ্ডব-উপাখ্যানে প্রদর্শিত হয়েছে যে, ধাতু গলানোয় বিশেষজ্ঞ ও নির্মাণবিদ্যায় দক্ষ অসুরবংশীয় স্থপতি ময়কে অন্বেষণ করার জন্য অরণ্য-দহন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।

উত্তর ভারতের অধিকাংশ স্থানে কৌম সমাজের চূড়ান্ত অবক্ষয় ঘটেছিল উপনিষদের যুগে। পিতৃ-উপাসনার ঐন্দ্রজালিক বন্ধন ভেঙে যাওয়ার মধ্যে তা প্রতিফলিত হয়েছে। নূতন বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনীতির জন্য এমন গতিশীল জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন ছিল, যারা পারিবারিক ও স্থানগত বন্ধনে আবদ্ধ নয় ; আর, এইজন্য কৌম জীবনের রক্তসম্পর্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রাচীন ধরনের সামাজিক বন্ধন ভেঙে মিশ্র-জনগোষ্ঠী দ্বারা গঠিত অধিকতর স্বাধীন প্রশাসনিক সংগঠন প্রবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। পিতৃ-উপাসনা ছিল সম্পূর্ণত কৌম জীবনের বৈশিষ্ট্য ; অন্যদিকে উপনিষদে এমন সমাজের চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে যেখানে জনসাধারণ কৌম-গোষ্ঠীর তুলনায় অনেক বেশি গতিশীল।

আর্যরা বিভিন্ন ধাতুর খনিতে সমৃদ্ধ পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ মগধ, অঙ্গ ও বঙ্গের দিকে এগোলেন, সম্ভবত পথিমধ্যে গঙ্গা-যমুনা বিধৌত দোয়াব ও ধাতুসমৃদ্ধ অঞ্চলের অধিবাসীরা আর্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাস্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল, এবং শান্তিপূর্ণভাবে আর্যধারায় মিশে গিয়েছিল অথবা সেসব অঞ্চল থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। আর্যদের যাত্রাপথের উভয়দিকে এবং বিশেষভাবে বিন্ধ্য অঞ্চলে ও আর্যায়ত্ত মধ্যদেশ অঞ্চলের সীমান্তবর্তী অরণ্যভূমিতে প্রাগার্যরা বসবাস করত। বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক মিশ্রণ, কৌম সমাজের ক্ষয়, উৎপাদন-পদ্ধতি ও উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারণ, মুদ্রাব্যবস্থার প্রবর্তন, ধাতুর ব্যবহার, বর্ষগণনাপঞ্জী ও লেখনপদ্ধতির প্রবর্তন ইত্যাদির ফলে সংস্কৃতিক্ষেত্রে যে সম্মিলন ও একীভবনের সূত্রপাত হয়েছিল—তার অনিবার্য প্রভাবে যজ্ঞধর্মের প্রাচীন রূপটি অপ্রচলিত হয়ে গেল, অর্থাৎ যুগের প্রয়োজনের অনুবর্তী আর রইল না।

যখন যজ্ঞগুলি এত অসংখ্য, দীর্ঘায়িত, জটিল ও ব্যয়বহুল হয়ে উঠল যে শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় ব্যক্তিই প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারত, তখন প্রতিবাদী মনোভাব ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠল ; জনসাধারণ যজ্ঞের যৌক্তিকতা ও ঈপ্সিত ফলদানে ব্যর্থতা দেখে সেগুলির প্রতিশ্রুত শক্তি সম্পর্কে সংশয় পোষণ করতে লাগল। অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক ও প্রতীকী ভাবে যজ্ঞানুষ্ঠানের পুনর্বিশ্লেষণ প্রকৃতপক্ষে দ্রুত ক্ষীয়মান ধর্মীয় বিশ্বাসের পুনরুদ্ধার করার শেষ মরিয়া প্রচেষ্টাকেই অভিব্যক্ত করছে। কিন্তু তখন ভিন্ন ধরনের ভাবাদর্শ উদ্ভূত হয়ে প্রচলিত চিন্তাধারাকে যে প্রত্যাহ্বান জানালো, যজ্ঞধর্ম যথাযথভাবে তার প্রত্যুত্তর দিতে অসমর্থ হ'ল ; যেমন যজ্ঞের সাহায্যে কর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা কঠিন। অবশ্য জন্মান্তরবাদ দুরূহতম সমস্যা সৃষ্টি করেছিল কারণ, পুনর্জন্ম অবিমিশ্র অমঙ্গল ব'লেই বিবেচিত হ'ত এবং তাই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হয়ে উঠল পুনর্জন্ম-পরম্পরার সমাপ্তি ঘটানো। কিন্তু কোনও যজ্ঞে এই আশ্বাস পাওয়া যায় নি।

ফলে, এই নূতন সমস্যা সমাধানের আশায় জনসাধারণ স্বভাবতই ভিন্নপথগামী হতে বাধ্য হ'ল। আর্যবৃত্তের বহির্ভূত জনসাধারণের মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কয়েকটি সম্ভাব্য বিকল্প পাওয়া গেল। এমনকি বহুপূর্বে ঋগ্বেদের যুগেও আমরা মুনি, যতি, অযজমান রাক্ষস, ধাতুশিল্পী প্রাচ্যবাসী, বালখিল্য, বৈখানস, সন্ন্যাসী ও ব্রাত্যদের উল্লেখ পেয়েছি, যাদের জীবনযাত্রা ও বিশ্বাস পরস্পর-ভিন্ন হলেও অন্তত একটি ক্ষেত্রে তাদের সমধর্মিতা ছিল : বৈদিক যজ্ঞ-ধর্মের প্রত্যাখ্যান ও বিকল্প মূল্যবোধ গ্রহণ। এসব জনগোষ্ঠীর বিচিত্র ভাবাদর্শের মধ্যে যে নতুন জীবনদর্শনের সম্ভাবনা ছিল, উপনিষদ্ যুগের শেষ পর্যায়ের পূর্বে তার প্রতি মানুষেব দৃষ্টি বিশেষ পড়েনি, অথচ এসব পরস্পর-ভিন্ন পরিব্রাজক তপস্বীগোষ্ঠীর দীর্ঘকাল-ব্যাপী নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তার ঐতিহ্য বৈদিক জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি বিদ্যমান ছিল। এদের মোটামুটিভাবে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়,—আদিম জনগোষ্ঠী, যারা আর্য আক্রমণের ফলে উদ্বাস্তু হয়েছিল এবং যারা সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার গণ্ডীর বহির্ভূত ছিল। এদের মধ্যে উত্তর ও মধ্য অঞ্চল এবং অঙ্গ ও মগধের মতো পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরা ব্রাত্য নামে পরিচিত ছিল। মূলত, এরা ছিল কৃষিজীবী ও পশুপালক জনগোষ্ঠী ; তবে এদের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক ধাতুশিল্প, কারুশিল্প ও বাণিজ্য নিরত ছিল। বৌদ্ধ বিবরণগুলিতে এরা সমৃদ্ধিশালী গোষ্ঠীরূপে চিত্রিত হয়েছে। সম্ভবত, ব্রাত্যস্টোম ছিল এমন একটি অনুষ্ঠান যার মাধ্যমে এরা আর্যসমাজে প্রবিষ্ট হতে পারত, কেননা সমৃদ্ধিশালী গোষ্ঠীর আত্মীকরণ আর্যদের পক্ষে সুবিধাজনক ও আকর্ষণীয় ছিল। অন্যদিকে এরাও যেসব উদীয়মান রাজ্যে বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনা আছে, এমন সব রাজ্যে জনসাধারণের সঙ্গে একাত্মীভূত হওয়ার প্রত্যাশায়

প্রলুব্ধ বোধ করেছিল—যেহেতু তাদের খনিজ দ্রব্য, কৃষিজাত উদ্বৃত্ত ও শিল্পজাত পণ্যগুলিকে লাভজনকভাবে হস্তান্তরের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয়, একটি গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন সন্ন্যাসী, যোগী, মুনি ও বৈখানসদের বিভিন্ন সম্প্রদায় যাঁরা নৈতিক জীবন যাপন করতেন এবং বিবিধ প্রকারের সাধন-পদ্ধতি ও সাধনার জন্য কৃচ্ছ্র-প্রক্রিয়া অবলম্বন করতেন। রক্ষণশীল বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নানারূপেই অভিব্যক্ত হয়েছিল। এদের অধিকাংশই অরণ্যে বাস করতেন এবং সেই সূত্রে যজ্ঞধর্ম সম্পর্কে বিতৃষ্ণ আর্য জিজ্ঞাসুদের সঙ্গেও এদের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এধরনের তাপস-গোষ্ঠীর প্রাথমিক উল্লেখ ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যকে পাওয়া গেছে। মানসিক আরাধনার যে পদ্ধতি মূলত ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের বৃত্ত-বহির্ভূত ছিল, উপনিষদের যুগে ক্রমশ তা আর্যদের ধর্মীয় ভাবনায় অনুপ্রবিষ্ট হ'ল।

তৃতীয়ত, ভ্রমমান দার্শনিকদের কিছু কিছু গোষ্ঠী গ্রিস দেশের 'সোফিস্ট'দের মতো ইতস্তত বিচরণ করতেন, কখনো একাকী কখনো বা শিষ্যবর্গকে নিয়ে এঁরা চলতেন। এঁদের প্রত্যেকেই নীতিশাস্ত্র, ধর্ম বা অধ্যাত্মবিদ্যা, কর্মবাদ, পুনর্জ্জন্মবাদ, প্রেততত্ত্ব ও মুক্তি সম্পর্কে কোনো না কোনো নতুন মতবাদ প্রচার করতেন। এ সমস্ত গোষ্ঠী প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ছিলেন প্রতিবাদী, কারণ এঁদের কেউই যজ্ঞধর্ম অনুসরণ করতেন না। এঁরা একত্রে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রাসঙ্গিকতার বিরুদ্ধে প্রত্যাহ্বান জানাতে সফল হয়েছিলেন। এই সমস্ত ব্যাপারটি ছিল গৌণ ও সমাজব্যবস্থাপকদের অগোচর ঘটনা, কেউ পূর্বনির্দিষ্ট সূত্র ধ'রে এটি ঘটায়নি।

এই নতুন সমস্যার বাতাবরণে তৎকালীন চিন্তাবিদ ও দার্শনিকরা বিভিন্নভাবে প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু, তাঁদের মধ্যে মাত্র তিনটি গোষ্ঠী সাফল্য অর্জন করেছিলেন। প্রথমত, জৈনধর্ম ; কয়েক শতাব্দী ধ'রে মোটামুটিভাবে ভারতবর্ষের নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চল এটি সীমাবদ্ধ ছিল। জৈনদের অধ্যাত্মবাদী চিন্তার সঙ্গে বৌদ্ধ ভাবনার কতকদূর পর্যন্ত সাদৃশ্য ছিল ; তবে শেষোক্তের তুলনায় ভারতবর্ষে তারা যে দীর্ঘতর জীবন পেয়েছিল, তার কারণ সাধারণ মঠ-বহির্ভূত ভক্তদের পক্ষে জৈনধর্ম একটি ব্যাপক আচরণবিধি নির্মাণ করতে পেরেছিল, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম সন্ন্যাস-জীবনের উপরই প্রধান গুরুত্ব আরোপ করেছিল। স্পষ্টত গণ-ধর্মান্তরের ফলে জৈনদের মতবাদ আরো ব্যাপক ও কতকটা সারগ্রাহী হ'ল, সাধারণ গৃহী ভক্তদের জন্য এখানে যথার্থ স্থান নির্দেশিত হ'ল। একই যুক্তি দিয়ে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের দীর্ঘ জীবন লাভ ও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ; তৃতীয় ও চতুর্থ আশ্রমে ভিন্নমতাবলম্বী ও প্রতিবাদী তপস্বী গোষ্ঠীদের একাত্মীভূত করার বিচক্ষণতা দেখিয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম আপন প্রভাবের পরিধি বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই সঙ্গে যে-গৃহস্থরা

জনসাধারণের বিপুল অংশ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের শক্তির মূল স্তম্ভরূপে পরিগণিত হয়েছিল, তাদের জন্যও সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য একটি সামাজিক বিন্যাস পাওয়া গেলো।

দ্বিতীয়ত, বৌদ্ধধর্ম সমগ্র ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তার করলেও কয়েক শতাব্দী পরে উপমহাদেশ থেকে প্রকৃতপক্ষে বিদায় নিয়েছিল। তৃতীয় ধারা অর্থাৎ উপনিষদীয় বৈদিক ধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্মকে সমকালীন আধ্যাত্মিক প্রয়োজননির্বাহের উপযোগী ক'রে তোলে এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মৌল উপাদানগুলিকে নিজ মতবাদের মধ্যে ক্রমশ আত্মসাৎ ক'রে নিয়ে নতুন আধ্যাত্মিক আলোড়নকে সবচেয়ে সার্থকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়েছিল। অর্থনৈতিক দিক থেকেও এই ধারা নিজের অবস্থানকে গ্রহণযোগ্য করতে পেরেছিল ; এজন্য বহু দীর্ঘ ও জটিল যজ্ঞে গোসম্পদের অপ্রয়োজনীয় অপচয় সম্পর্কে জনসাধারণকে নিরুৎসাহ করার সঙ্গে-সঙ্গে মুক্তিলাভের উচ্চতর লক্ষ্যের প্রতিও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। এই মুক্তি যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অর্জন করা সম্ভব নয়, আত্মার প্রকৃত স্বরূপ বিষয়ে জ্ঞানলাভের দ্বারাই সম্ভব—এই মত ধীরে-ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। অবশ্য, এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উপনিষদে অভিব্যক্ত আধ্যাত্মিক পরিশীলনের প্রবণতায় কোনভাবে বিপুল জনসাধারণের বিশ্বাস প্রতিফলিত হয় নি, তারা সম্ভবত তখনো পর্যন্ত একাগ্রভাবেই প্রাচীনতর বৈদিক ধর্ম অর্থাৎ যজ্ঞধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করত। এর অন্যতম কারণ হ'ল, একমাত্র এধরনের ধর্মে ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাসের যৌক্তিকতা সিদ্ধ হ'ত ; এই বিশ্বাস ব্রাহ্মণ্য-চিন্তার একটি আবশ্যিক উপাদান। এই ঐন্দ্রজালিক শক্তি অর্থাৎ প্রাচীনতর 'ব্রহ্ম' (অর্থাৎ অলৌকিক শক্তিযুক্ত বচন) এর প্রতি প্রশ্নসংকুল প্রত্যাহ্বান উত্থাপিত হওয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত বস্তুবাদের সঙ্গে সামান্যতম সম্পর্কযুক্ত সমস্ত কিছুই নিন্দিত ও প্রত্যাখ্যাত হল। ইন্দ্রজাল যেহেতু যজ্ঞানুষ্ঠানের মৌল ভিত্তি তাই পুরোহিত শ্রেণীর নিকট তা অপরিহার্য ; ফলে, তাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার প্রতি ন্যূনতম প্রশ্নের আশঙ্কাও সহ্য করা হয় নি। সুতরাং বিদ্বৎসমাজের মধ্যে নতুন অধ্যাত্মবাদী সাহিত্যের রচনা ও প্রচারের দিনগুলিতেও বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান ও প্রাগ্বৈদিক স্থানীয় উপাসনা-পদ্ধতি জনসাধারণের ধর্মরূপে প্রচলিত ছিল। কারণ, অন্তত আরো কয়েকটি শতাব্দী ধ'রে তা স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে সহায়ক হয়েছিল ; বিশেষত যে-জনসাধারণ ধর্মের নিকট আশ্রয় ও নিরাপত্তার আশ্বাস পেতে চায় তাদের জন্য এই স্থিতাবস্থা কার্যকরী হয়েছিল।

এই পরিস্থিতি একদিকে স্পষ্টত জনসাধারণের সংখ্যাগুরু অংশকে তুষ্ট করেছিল, অন্যদিকে অগ্রগামী চিন্তাবিদরা এই প্রশ্নের দ্বারা তাড়িত হচ্ছিলেন : কোথায় এবং কিভাবে মুক্তিপ্রদ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভবপর। আর, ঠিক এখানেই ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী আচার্য ও তপস্বীরা সমাধানের একটি পথ দেখালেন। যেহেতু তাঁদের মধ্যে অনেকেই

ছিল অরণ্যবাসী, তাই শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে অরণ্যে গমন ও বসবাস আবশ্যিক ব'লে বিবেচিত হল ; অথচ ব্রাহ্মণ্যজীবনের শৃঙ্খলাবোধ অনুযায়ী বেদাধ্যয়নের পরে তরুণ যুবকের পক্ষে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রত্যাবর্তনই ছিল বাধ্যতামূলক। অন্যদিকে, এই যুগের বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণযুক্ত আধ্যাত্মিক আন্দোলনে নতুন আধ্যাত্মিক সমস্যাবলীর সমাধানকল্পে অরণ্যে দীর্ঘকালব্যাপী অবস্থান ছিল আবশ্যিক। সুতরাং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পারস্পরিক বোঝাপড়ায় মধ্যপন্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হল : পঞ্চাশ বছর বয়সের পর বেদাধ্যয়নে ব্রহ্মঋণ, বহু যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা দেবঋণ শোধ করে, নিজ পরিবার গঠনের দ্বারা পিতৃঋণ এবং অতিথিসেবা ও অন্যান্য প্রাণীদের জন্যে অন্নদানে প্রাণিমাত্রেয় ঋণ পরিশোধ করার পরেই শুধু অরণ্যে গমন ক'রে বনবাসী জীবনযাপনের অনুমতি পাওয়া গেল। অরণ্যে ন্যূনতম যজ্ঞের আয়োজনই ছিল যথেষ্ট। একে বলা হল বানপ্রস্থ।

কিন্তু ভ্রমমাণ দার্শনিক শিক্ষকরা বহু জ্ঞানভাণ্ডারের একমাত্র অধিকারী ছিলেন এবং একটি নির্দিষ্ট স্থানে তাঁরা দীর্ঘকাল অবস্থানও করতেন না। ফলে, আরো আপোষের ব্যবস্থা আবিষ্কার করতে হ'ল—তখন জীবনের শেষ পর্যায়টি একাকী ভ্রমমাণ অবস্থায় অতিবাহিত করার নিয়ম নির্দেশিত হল। তপস্যা ও সন্ন্যাস-জীবনকে বিশেষ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মানে সমুন্নীত করার ফলে চতুর্থ আশ্রম 'যতি' বা 'সন্ন্যাস' নামে চিহ্নিত হয়েছিল। যতিদের জীবনযাপন যজ্ঞকেন্দ্রিক বৈদিক সমাজের একটি সম্ভাব্য বিকল্পরূপে ঋগ্বেদের সময় থেকেই বর্তমান ছিল—উপনিষদের যুগে রক্ষণশীল বৈদিক সংস্কৃতি তাকে যথাযথ স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হল।

সুসংগঠিত ধর্মপ্রতিষ্ঠানের অভাবে 'আশ্রম'-এর ভাবাদর্শ বহুলপ্রচলিত হয়ে একটি প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র অর্জন ক'রে নেয় ; চার বা পাঁচ শতাব্দী ধ'রে ব্রহ্মচারী, গৃহী ও বানপ্রস্থী—এই তিনটি স্তর সামাজিক অনুমোদন পেয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব শেষ দুটি শতাব্দীতে সন্ন্যাসী বা যতির বর্গীকরণ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতিলাভ করে।

ক্ষত্রিয়গণ যে এই যুগের নব্যচিন্তাধারার বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন—তা বিস্ময়কর নয়। সমাজের যে অংশ যজ্ঞের উপযোগিতা সম্পর্কে সর্বপ্রথম মোহমুক্ত হয়েছিল, স্বাভাবিকভাবে তারা হ'ল ক্ষত্রিয় শ্রেণীর অভিজাত সম্প্রদায় অর্থাৎ রাজন্য, কেননা এঁরাই ক্রমবর্ধমান বহুব্যয়যুক্ত জটিল ও দীর্ঘায়িত যজ্ঞানুষ্ঠানের আর্থিক দায় বহন করতেন। যোদ্ধা হিসাবে একমাত্র তাঁরাই অকালমৃত্যুর সম্মুখীন হতেন ব'লে মৃত্যু-পরবর্তী জীবন ও প্রেততত্ত্ব সম্পর্কে তাঁদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ খুব স্বাভাবিক।

কর্মবাদ ও দেহান্তর-গ্রহণের নবোদ্ভূত তত্ত্ব পুরাতন বা নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ খায়নি, এধরনের গ্রন্থিল সমস্যা সমাজের অন্য বর্গের তুলনায় ক্ষত্রিয়

শ্রেণীকেই অধিক বিড়ম্বিত করত। ইতোপূর্বে আমরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে অবদমিত দ্বন্দ্বের আভাস লক্ষ্য করেছি ; দুই শ্রেণীর মধ্যে আর্থনীতিক স্বার্থজনিত সংঘাতও ছিল। পরগাছার মতো পুরোহিত সম্প্রদায় যজ্ঞানুষ্ঠানের পরিবর্ধন, ব্যাপ্তি ও নিরবচ্ছিন্নতা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে প্রবলভাবে উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু অন্যদিকে আর্থিক দায়িত্বের বিপুল বোঝা ও যজ্ঞের অনিশ্চিত ফল এবং নব্যচিন্তাধারা-প্রসূত প্রত্যাহ্বানের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দানে সমগ্র যজ্ঞতন্ত্রের ব্যর্থতা পৃষ্ঠপোষক ক্ষত্রিয় প্রস্তুত হল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, এক অর্থে কর্মবাদ যজ্ঞানুষ্ঠান-ব্যবস্থাপক পুরোহিতদের শ্রেণীস্বার্থের পরিপন্থী ছিল, কারণ তা যজ্ঞবহির্ভূত জ্ঞানলব্ধ পুণ্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেছে।

নৈতিক আদর্শ অনুযায়ী পরিচালিত জীবনও স্বর্গলাভে সমর্থ—এই মতবাদ সমাজের অযজ্ঞপরায়ণ অংশের পক্ষে যথোপযুক্ত হলেও তা যাজক-শ্রেণীর মৌল অস্তিত্বকে বিপন্ন করেছিল। তাই, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্—এই উভয়বিধ গ্রন্থ বারেবারে দুটি বর্ণের পারস্পরিক নির্ভরতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে—তৎকালীন সমাজে যার প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক, অথচ প্রচলিত ধর্মচর্যা ও উপাসনাপদ্ধতি যার নিশ্চয়তা বিধান করতে পারেনি। ব্রাহ্মণদের স্বার্থ বিঘ্নিত করার অপরাধে ক্ষত্রিয়দের ধ্বংস সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন সতর্কীকরণের মধ্যে আমরা আরো একটি প্রমাণ পাই যে, এধরনের ঘটনা তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল না। শ্রেণী হিসাবে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের মধ্যে কেউ যে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র ছিল না এবং জীবন ও সমৃদ্ধির প্রয়োজনে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল ছিল—উপনিষদের বিবরণ থেকে এই তথ্য যেমন স্পষ্ট, তেমনি আমরা বুঝতে পারি যে, উভয়বর্ণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সংঘাতজনিত স্নায়বিক উদ্বেগ নিরসন করার পথ অন্বেষণ করারও প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজনের আত্যন্তিক তাড়নায় এ ধরনের বিশিষ্ট সমন্বয়ের ভিত্তিতে সমাধান আবিষ্কৃত হল, আশ্রমধর্মের প্রবর্তন তারই একটি উপায়।

ত্রিবিধ প্রধান যজ্ঞানুষ্ঠান, পশু, সোম ও ইষ্টির মধ্যে প্রথম দুটিতে পশুবলি প্রয়োজন। সমৃদ্ধির দিক দিয়ে পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বী নগররাষ্ট্রগুলির উত্থান এবং ততদিনে সামাজিক সম্মানের প্রতীকে পরিণত আড়ম্বরপূর্ণ যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলে গোধনের প্রবল অপচয় হচ্ছিল। সেসময় লোহার লাঙ্গলের সঙ্গে ভারবাহী পশু কৃষিকার্যের অপরিহার্য উপাদানে পরিণত হয়েছিল ব'লে এই অপচয়ে বৈশ্য সম্প্রদায় বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল। শুধু তাই নয়, বাণিজ্যমার্গে যাতায়াতকারী শকটগুলির জন্যও এসব পশু প্রয়োজনীয় ছিল। সুতরাং অতিপল্লবিত জটিল যজ্ঞগুলি বৈশ্য সম্প্রদায়ের স্বার্থকে কঠোরভাবে আঘাত করেছিল। তাই যজ্ঞবিরোধী বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম যে বণিক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সুদৃঢ় ভিত্তি ও আশ্রয় পেয়েছিল, তা মোটেই আকস্মিক নয়, কারণ এই যুগেই সমাজে বৈশ্যদের সমুত্থান সূচিত হয়েছিল।

উপনিষদে ক্ষত্রিয়শ্রেণী যদিও প্রধান সামাজিক বর্ণরূপে চিত্রিত হয়েছে, তবু এই যুগেই বাণিজ্যরত বৈশ্যশ্রেণী, প্রকৃতপক্ষে সমাজে তাঁদের অবস্থানকে মর্যাদাযুক্ত ক'রে তুলেছিলেন। ভারতবর্ষে সীমা-বহির্ভূত দেশগুলির সঙ্গে সামুদ্রিক বাণিজ্য খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে পুনঃস্থাপিত হয়েছিল এবং ব্যবসায়ীরা ক্রমশ অধিক সমৃদ্ধিশালী ও সমাজের অন্য বর্গের উপর কম নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিল। তাই উপনিষদের যুগ শুরু হয়েছিল শক্তিশালী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের পরস্পর-নির্ভরতা দিয়ে ; ক্রমশ চিন্তাধারার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানের ভার ক্ষত্রিয়বর্গের উপর বিন্যস্ত হল। এই যুগের শেষ পর্যায়ে আধ্যাত্মিক চিন্তার ক্ষেত্রে প্রাধান্য যদিও তখনো পর্যন্ত মূলত ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদেরই ছিল, তবু বৈশ্যশ্রেণীও নব্য চিন্তাধারার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন,—এবং এঁদেরই হাতে বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনীতি থেকে লব্ধ সম্পদ কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল। এঁরা ক্রমশ যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রতি বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। স্থিতিশীল যজ্ঞীয় ধর্মচর্যার যেহেতু আর্থনীতিক দিক থেকে বহুমূল্য গোধন ও সম্পদের অপচয় ঘটে, তাই তার পরিবর্তে ব্যয়ভারহীন ও নীতিনিষ্ঠ মুক্তিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠাই ক্রমে জনসাধারণের কাম্য হয়ে উঠল।

অন্যদিকে বর্ণভেদপ্রথা দ্রুত শিলীভূত ও বর্ণগত সঞ্চরণশীলতা নিরুদ্ধ হওয়ার ফলে শূদ্রশ্রেণী সমাজে নিজেদের অধিকারের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছিল। এই অধিকারগুলি সমাজের সুদিনেও তাদেব পক্ষে নিরতিশয় স্বল্প ছিল, কিন্তু এই যুগে তা আরো কমে গেল। তিনটি উচ্চতর বর্ণের প্রতি শূদ্রদের অধিকতর সেবাপরায়ণতা যে সমাজেব অধিকর্তাদের পক্ষে বেশি কাম্য হয়ে উঠেছে, তা সেসময়ে রচিত প্রাচীনতর ধর্মসূত্রগুলির সাক্ষ্য থেকে স্পষ্ট। শূদ্ররা যেহেতু সমাজের বিপুল অংশ, বর্ণনির্ভর সামাজিক অধিকার ও অনমনীয় বর্ণভেদপ্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত যজ্ঞধর্ম সম্পর্কে তাদের বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদ সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে বেড়েই গেল, কেননা বর্ণগত বিদ্বেষের ফলে তাদের সামাজিক অবস্থান প্রায় অমানবিক স্তরে নেমে গিয়েছিল। এই স্তরে বর্ণ এবং বর্ণগত অবস্থান, বর্ণগত মর্যাদাকে অল্প কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদের বিশেষভাবে প্রতিফলিত করেছে। বৈশ্যদের শ্রেণী-স্বার্থ যদিও অনেকাংশে বণিক ও কারুশিল্পীদের সঙ্ঘ দ্বারা রক্ষিত হয়েছিল, তবুও শূদ্রদের অবস্থান ছিল নিতান্ত হেয়, যেহেতু তারা সম্পূর্ণত প্রভুদের দয়ার উপর নির্ভরশীল ছিল। সুতরাং এটা একটুও বিস্ময়ের নয় যে বৈশ্যরা নূতন ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী ধর্মপ্রচারকদের চতুষ্পার্শ্বে ধীরে ধীরে সমবেত হয়ে বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম ও অন্যান্য তপস্বী গোষ্ঠীর প্রতি ক্রমেই আকৃষ্ট হয়েছিল।

তাই এই বহুধাব্যাপ্ত অসন্তোষকে নিয়ন্ত্রণ করা যজ্ঞমূলক ব্রাহ্মণ্যধর্মের পক্ষে ক্রমশ দুরূহতর হয়ে উঠল, তেমনি নব্য চিন্তাধারা দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্নগুলির সমাধান

এবং সমাজে অসন্তুষ্ট ও বিচ্ছিন্ন বিরাট অংশের সামঞ্জস্যবিধানও অসম্ভব বিবেচিত হল। ফলে, ধর্মীয় ভাবনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন অনিবার্য হয়ে উঠল। যখন এই প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হ'ল, বৈদিক ধর্মের দ্বিতীয় প্রধান পর্যায় অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ড তখনই আরম্ভ হ'ল।

ব্রাত্যষ্টোমের দ্বারা প্রাগার্য গৃহস্থদের বহু আর্যবৃত্তবহির্ভূত গোষ্ঠী আর্য সামাজিক সংগঠনে একাত্মীভূত হয়েছিল ; তেমনি বানপ্রস্থ পর্যায়ের দ্বারা অরণ্যবাসী তপস্বীরা এবং যতি বা সন্ন্যাস আশ্রমের মধ্যে দিয়ে ভ্রমমাণ ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় আর্যসমাজভুক্ত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম যেখানে গৃহস্থদের এবং জৈনধর্ম সন্ন্যাসীদের আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, সেখানে ক্যাথলিক ধর্মের মতো প্রাচীনতর ব্রাহ্মণ্যধর্ম কিন্তু তার অন্তহীন গতিশীল প্রক্রিয়ার দ্বারা আপন পরিধির পরিসর ক্রমান্বয়ে প্রসারিত করে সর্ববিধ প্রতিবাদী ধর্মীয় অভিজ্ঞতা ও আচরণবিধিকে আত্মসাৎ ক'রে নিয়েছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি অংশে (৮ : ১৫ : ১) প্রথম তিনটি আশ্রম অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; আবার ঐ উপনিষদেরই অন্য একটি অংশে (৫ : ১০ : ২, ৩) বিকল্প ধর্মচর্যারূপে অরণ্যে 'শ্রদ্ধা' ও 'তপঃ' নির্দেশিত হয়েছে, যার সাহায্যে যজ্ঞপরায়ণ গৃহস্থ উন্নততর আধ্যাত্মিক অবস্থানে উপনীত হতে পারেন। এই যুগে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের ক্রমোন্নতি ও সামাজিক প্রাধান্য অর্জন এবং সাহিত্যে অর্থাৎ সমাজে তাদের আদর্শায়িত আত্ম-প্রতিকৃতির প্রতিফলন লক্ষণীয়। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাণিজ্য, ভূমির ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার ও রাজনৈতিক-আর্থনীতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকায় ক্রমাগত বর্ধিত হচ্ছিল। বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম—এই দুটি শ্রমণ ধর্ম, যে দুটি সর্বাধিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী শ্রেণীর অর্থাৎ বণিক ও রাজন্যদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তার কারণ এদের আদর্শগত প্রয়োজনও ধর্মদুটি দ্বারা রক্ষিত হয়েছিল। এভাবে নৈতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে সামাজিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রসারিত অভিব্যক্তি এবং জন্মান্তরপ্রাপ্ত সত্ত্বাকে নৈতিক প্রতিরূপ ব'লে মনে হয়।

দেবসঙ্ঘ

ব্রাহ্মণসাহিত্যের দেবসঙ্ঘ উপনিষদে প্রকৃতপক্ষে একই থেকে গেছে, যদিও দেবতারা পূর্ব পরিচয়ের সারবস্তুর পরিবর্তে নিতান্ত নামটুকুর মধ্যেই পর্যবসিত। কেনোপণিষদ্ অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্রের মতো প্রধান বৈদিক দেবতাদের উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে উমা হৈমবতীর মতো পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত দেবীকে আমাদের কাছে উপস্থিত করেছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (১ : ১ : ১) মিত্র, বরুণ, অর্যমা, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও বায়ুর উল্লেখ পাই। ঐতরেয় উপনিষদের একটি সৃষ্টিপ্রক্রিয়া

সম্পর্কিত কাহিনীতে (১ : ২ : ১-৫) এই তথ্য বিবৃত হয়েছে যে, মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবৃত্ত হলে তবে দেবতারাও তাঁদের প্রাপ্য অংশ লাভ করেন। ঐ উপনিষদের অন্যত্র [৩ : ১ : ৩] প্রজ্ঞানকে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, প্রজাপতি ও মহাভূতসমূহের সঙ্গে একাত্ম করা হয়েছে। সুতরাং এই যুগের নব্য ভাবাদর্শ-সম্ভূত নূতন মূল্যবোধ অর্থাৎ প্রজ্ঞার গৌরব বর্ধিত করার জন্য দেবতাদের প্রাচীন মহিমা খর্ব করা হয়েছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ সংহিতা যুগের প্রাচীন ও প্রভাবের দিক থেকে গৌণ দেবতা রুদ্রকে সর্বোত্তম দেবতারূপে উপস্থাপিত করেছে। রুদ্র এখানে সরূপ ঈশ্বরের নামান্তর, কিন্তু বিশেষ লক্ষণীয়ভাবে তিনি 'মহর্ষি' ব'লে কথিত, যদিও পূর্বে তিনি পশু ও মানুষের প্রতি তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করতেন এবং মঙ্গলময় ও অমঙ্গলময়—এই দুই রূপে তাঁর প্রাচীনতর ভাবমূর্তি সংরক্ষিত। আবার পরম বিশ্বাতিগ সত্তারূপে তাঁর সমুন্নত অবস্থান এখানে ব্রহ্মার সমতুল্য হয়ে পড়েছে। কিছু কিছু অদ্বৈতবাদী প্রবণতা-সহ একেশ্বরবাদী ভাবনার ক্রমাভিব্যক্তি এই প্রক্রিয়ার মধ্যে স্পষ্ট ঃ তাই এখানে বলা হয়েছে যে শিবসম্পর্কিত জ্ঞান নির্বাণ ও পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি দান করে।

দেব-দানব সংঘর্ষের ব্রাহ্মণ্য দেবকাহিনীটি উপনিষদে পুনরাবির্ভূত হলেও এর তাৎপর্য এই পর্যায়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ; এই সংগ্রাম এখন বস্তুত আধ্যাত্মিক রূপক হয়ে উঠেছে। (যেমন ছান্দোগ্য ৮ : ৭-১২)। দেবতা ও দানব তাই আত্মজ্ঞান লাভের জন্য পরস্পরের প্রতিস্পর্ধী। এই প্রত্নকথার দেবতা ও দানবের মধ্যবর্তী পার্থক্য প্রকৃতপক্ষে বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যবর্তী পার্থক্যের সমতুল্য ; বস্তুবাদকে এখানে মূল্যহীন, সহজ ও অগভীর রূপে চিত্রিত করা হয়েছে, কারণ সম্ভবত সেই যুগে বস্তুবাদী দর্শন কতকটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল ব'লে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা অত্যাবশ্যক বিবেচিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, যে-ইন্দ্রকে পূর্বে ক[illegible]না জ্ঞানপিপাসুরূপে দেখা যায়নি—এখানে তাঁকে পরম জ্ঞানের অধ্যবসায়ী জিজ্ঞাসুরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে, সম্ভবত দেবতাদের মধ্যে প্রধান বলেই তিনি জ্ঞানকাণ্ডেও যোগ্য গ্রহীতা ব'লে বিবেচিত। আবার এই প্রত্নকথায় জনক বা প্রবহন জৈবলির মতো রাজবংশীয় ক্ষত্রিয় ঋষিদের প্রতীকী বিবরণও নিহিত থাকতে পারে, যাঁরা সে-যুগে নিশ্চিতভাবে বর্তমান ছিলেন—দেবতাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় ব'লে গণ্য ইন্দ্র সম্ভবত তাঁদের দৈব প্রতিরূপ। এদিক দিয়ে, যাজ্ঞবল্ক্য বা গৌতমের মতো ব্রাহ্মণ দার্শনিকদের দৈব প্রতিরূপ হলেন প্রজাপতি। তৃতীয়ত; একটি বঙ্কিম পথ দিয়ে নিদ্রা, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির স্তর-সম্পর্কিত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিকে দেহ ও আত্মার মধ্যবর্তী ব্যবধানের ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থান রূপে দেখানো হয়েছে—যা-থেকে ক্রমশ এদের পরমাত্মা সম্পর্কে সচেতনতা জেগে ওঠে। আত্মজ্ঞানলিপ্সু ব্যক্তিকে ভাবগত উপলব্ধির স্তরে পৌছানোর পূর্বে যে সমস্ত সোপান অতিক্রম করতে হয়—এই কাহিনীতে জ্ঞানই বিবৃত হয়েছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই দেবকাহিনী সামান্য পরিবর্তিতরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। লক্ষণীয় যে এতে আয়স্য অঙ্গিরস অর্থাৎ অথর্ববেদীয় এক পুরোহিত দেবতাদের সর্বোত্তম জ্ঞান শিক্ষা দান করেছেন। এখানে আদিত্যকে সুখ ও বসুকে বায়ুমণ্ডল এবং পৃথিবী, আকাশ, সূর্য, স্বর্গ, চন্দ্র, নক্ষত্র ও রুদ্রকে দশ ইন্দ্রিয়, এবং মন ও ইন্দ্রকে বজ্রের সঙ্গে একাত্ম করা হয়েছে। যজ্ঞবহির্ভূত নৈসর্গিক শক্তি ও উপাদানের সঙ্গে দেবতাদের সম্পর্ক রচনার মধ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের দ্রুত ক্ষীয়মাণ পরিমণ্ডলে প্রাচীন বিশ্বাসকে নূতন জীবনদানের প্রাণান্তিক প্রচেষ্টা প্রতিফলিত হয়েছে।

বহুদেববাদ থেকে একেশ্বরবাদ এবং তৎপরবর্তী স্তরে অদ্বৈতবাদ—এই ছিল তৎকালীন সমাজে ধর্মীয় চেতনার বিবর্তনের প্রক্রিয়া। এভাবে অসংখ্য ঋগ্বেদীয় দেবতা ক্রমশ বৈদিক যুগের অন্তিম পর্যায়ে উত্থিত পরমাত্মার ভাবমূর্তি অর্থাৎ প্রজাপতি, ব্রহ্মণস্পতি, ব্রহ্মা বা পুরুষের মধ্যে বিলীন হয়েছিলেন। পারস্পরিক বোঝাপড়ার বাতাবরণেই এটা সম্ভব হয়েছিল, কারণ তখনো তাঁরা অস্পষ্ট নবরূপধারী দেবতা রয়ে গেছেন, আহুতি ও প্রার্থনা তাঁদের উদ্দেশে তখনো নিবেদিত হচ্ছে। সম্ভবত প্রাগার্যদের কাছ থেকে একেশ্বরবাদী ধারণা গৃহীত হয়েছিল ; তবে, অন্তত বুদ্ধির স্তরে, তা প্রাচীনতর বহুদেববাদ থেকে স্পষ্টত পৃথক হয়ে পড়েছিল। অনুমান করা যেতে পারে, ক্রমবর্ধমান যজ্ঞানুষ্ঠান ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের শ্বাসরোধকারী নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়দের বিদ্রোহের ফলেই এই পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। অবশ্য কোনো একজন নির্দিষ্ট বিদ্রোহী ধর্মপ্রবক্তার উল্লেখ করা কঠিন, কেননা ভারতে নব্য চিন্তার বহু প্রবক্তা এই যুগে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে নানাবিধ বিদ্রোহী মতবাদ প্রচার করেছিলেন ; অন্তত, একটি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তাঁদের ঐক্য ছিল—যজ্ঞধর্মের প্রবল বিরোধিতা। অন্যান্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য হ'ল কল্যাণকর আচরণের নির্দেশে নিহিত আদর্শ, চূড়ান্ত সত্যের জন্য বৌদ্ধিক অন্বেষণ এবং কর্ম ও জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস। তবে নিঃসন্দেহে এই নব্য চিন্তাধারার স্বরূপকে বিবর্তন-ধারার পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপিত না-করে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের অভিব্যক্তি হিসাবে পর্যালোচনা করতে হবে। প্রাচীন দেবতাদের অস্তিত্ব তখনো রয়েছে কিন্তু ভক্তদের কাছে তাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি বহুলাংশে নিষ্প্রভ এবং প্রাচীনতর প্রত্নকথাগুলির প্রতি বিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়েছে।

যজ্ঞানুষ্ঠানের নবতর ব্যাখ্যা

এই ধারণা করা সম্পূর্ণ ভুল হবে যে, এই স্তরে যজ্ঞ অপ্রচলিত হয়ে পড়েছিল,—তা একেবারেই হয় নি। পূর্ববর্তী যুগে যেমন হচ্ছিল, এখনো প্রায় সমপরিমাণ এবং প্রায় তেমনই সাড়ম্বরে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল ; শুধু যজ্ঞ সম্পর্কে জনসাধারণের

প্রতিক্রিয়া ও দৃষ্টিভঙ্গি বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। অগ্নিচয়নের মতো কিছু কিছু যজ্ঞানুষ্ঠান এই পর্যায়ে পরোক্ষভাবে প্রশংশিত হচ্ছিল, কিন্তু স্পষ্টতই তাতে নূতন কালোপযোগী ও নূতন প্রয়োজনের আলোকে যজ্ঞানুষ্ঠানগুলি পুনর্বিশ্লেষণ করার প্রয়াস প্রতিফলিত হয়েছে। যজ্ঞসম্পর্কে উপনিষদের ঋষিদের দোলাচলবৃত্তি মুণ্ডক উপনিষদে (১ : ২) অভিব্যক্তি হয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন, অস্তিত্বের পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পুনর্জন্ম সম্পর্কে প্রাচীনতম উল্লেখে তাকে 'বারংবার জীবনধারণ' না-ব'লে 'অসংখ্যবার মৃত্যু' বলে বর্ণনা করা হয়েছে ; কারণ, মৃত্যুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রণা উদ্বেগের অভিজ্ঞতাই মানুষকে জীবনের গভীর তাৎপর্য অনুশীলনে অনুপ্রাণিত করেছে—আর, মানুষ তাকেই চূড়ান্ত সত্যরূপে গ্রহণ করেছে।

আমরা লক্ষ্য করি যে, অধিকাংশ উপনিষদ্ সংহিতা থেকে বিশেষ কোনো উদ্ধৃতি দেয় নি। এতে প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদ সূচিত হয়েছে ; কেননা, গবেষকরা ঐতিহ্যের নিরবচ্ছিন্নতা প্রমাণিত করার জন্য চেষ্টা করলেও বৈদিক ধর্মের দুটি প্রধান প্রবণতাকে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড রূপে চিহ্নিত করার মধ্যে এই বিচ্ছেদ অভিব্যক্ত হয়েছে—এই তথ্যই স্বীকৃত হয়েছে যে নব্য ধর্মচিন্তা ধীরে-ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে প্রাধান্য অর্জন করছে। এই যুগের ধর্ম হ'ল দেবকাহিনী, যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যাত্মবিদ্যা, ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া, লোকায়ত কুসংস্কার, ধর্মানুষ্ঠানে সচেতনভাবে আরোপিত রহস্য, ভাবী শুভাশুভ গণনার তত্ত্ব, ভবিষ্যদবাণী, ঝাড়ফুঁক, সর্বপ্রাণবাদী বিশ্বাস, জাদুপুরোহিতের কার্যকলাপ ও প্রেততত্ত্ব সম্পর্কে জল্পনা ইত্যাদি। কিছু নতুন মাত্রাও যুক্ত হয়েছে ঃ কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ ; জীবন মূলতই অমঙ্গলজনক এমন ধারণা, পুনর্জন্ম থেকে মুক্তিলাভের প্রত্যাশায় পরমাত্মা ও ব্রহ্মের স্বরূপ-বিষয়ক জ্ঞান অর্জন ইত্যাদি। ভিন্ন মাপের সৎকর্মের দ্বারা আনন্দময় লোকের বিভিন্ন স্তর জয় করার বিশ্বাসও ব্যক্ত হয়েছে। সপ্তলোক এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ নর, পিতৃ, গন্ধর্ব, কর্ম, অজন, প্রজাপতি ও ব্রহ্ম (বৃহদারণ্যক ৪ : ৩ : ৩৮)। পৃথিবীর সঙ্গে অন্যান্য উন্নততর লোকের দূরত্বের উপলব্ধি অনুযায়ী ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি বিষয়ে নূতন ভাবাদর্শগুলিও এ-সময় দেখা দিতে থাকে।

যদিও প্রত্নকথা ও যজ্ঞানুষ্ঠান—এই উভয়ের মৌলিক চরিত্র এ-সময় যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়েছিল তবু নব্য চিন্তাধারার উদ্ভবের যুগে যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রাসঙ্গিকতা কতকটা অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় যজ্ঞের পুনর্ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আমরা দেখেছি যে আরণ্যকে নূতন ভাবগত আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ; যজ্ঞের যথার্থ তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারলে তা যে কোনো নূতন সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ—এটা প্রমাণের জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা সেই আন্দোলনে প্রতিফলিত হয়েছিল। এস্তরে বলা হচ্ছে নিহিতার্থ অনুধাবনের জন্য আক্ষরিকভাবে যজ্ঞকে গ্রহণ না করে

গভীরতর অতীন্দ্রিয়, প্রতীকী ও অতিজাগতিক তাৎপর্যের মধ্যে অবগাহন আবশ্যক ; সেইসঙ্গে বস্তুজগতের সামগ্রী দিয়ে অনুষ্ঠিত নিছক পার্থিব ক্রিয়া হিসাবে যজ্ঞকে গ্রহণ না ক'রে, আধ্যাত্মিক ও আত্মিক উপকরণ দিয়ে প্রতীকীভাবে অনুষ্ঠিত অতিজাগতিক কর্ম হিসাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন—এ-ধরনের ভাবনা অভিব্যক্তি লাভ করে। তাই, তিনটি যজ্ঞাগ্নি দেহের ত্রিবিধ প্রানবায়ুর সঙ্গে উপমিত হয়েছে (প্রশ্ন ৪ : ৩, ৪) ; চতুর্বিধ আনুষ্ঠানিক ব্যাহৃতি আহ্বানকে অগ্নি, বায়ু, সূর্য ও চন্দ্রের সঙ্গে, তিন বেদকে ত্রিবিধ প্রাণবায়ুর সঙ্গে এবং ব্রহ্মাকে অন্নের সঙ্গে একীভূত করে দেখা হয়েছে (তৈত্তিরীয়, ১ : ৫ : ১)। তেমনি ছান্দোগ্য উপনিষদে বাক্ ও প্রাণ যথাক্রমে ঋক্ ও সামের সঙ্গে উপমিত হয়েছে (১ : ১ : ৫)। এ-ধরনের বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

অথর্ববেদের পুরোহিত ব্রহ্মা, যিনি বিলম্বে রক্ষণশীল যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবেশাধিকার লাভ করেছিলেন—এই পর্যায়ে তাঁর ভূমিকা অতীন্দ্রিয়ভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে নতুন আগ্রহের ফলে আনুষ্ঠানিক উপকরণগুলি বারবার বিভিন্ন অতিজাগতিক উপাদানের সঙ্গে উপমিত হয়েছে। তাই, ইহলোক অগ্নি এবং সূর্য তার ইন্ধন, রশ্মি ধূম, দিন শিখা, চন্দ্র অঙ্গার ও নক্ষত্র স্ফুলিঙ্গ রূপে বর্ণিত (ছান্দোগ্য, ৫ : ৪ : ১)। বৃহদারণ্যক উপনিষদে অশ্বমেধ যজ্ঞে বলিপ্রদত্ত অশ্বের বিভিন্ন অঙ্গকে অতিজাগতিক উপাদানের সঙ্গে একীভূত করে দেখা হয়েছে (১ : ১ : ১, ২)। এভাবে উপনিষদের যুগে প্রচলিত নিগূঢ় রহস্যবাদী প্রবণতার ফলে অণুবিশ্ব ও ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে বহুবিধ পরস্পর-সম্পৃক্ত বস্তু-শৃঙ্খলা নির্মিত হয়—মুখ্যত'তাদের প্রভাবে অসম্বদ্ধ ও বিশৃঙ্খল চিন্তাধারায় দ্রুত প্রসারণ, লক্ষ্যহীন ছদ্ম-আধ্যাত্মিক আলোক-দৃষ্টির উৎপত্তি এবং অনিয়ন্ত্রিত 'দিব্যদৃষ্টি'র আবাহন ঘটে। এর সাহিত্যিক প্রকাশ প্রায়ই অসন্তোষজনক এবং আমরা প্রকৃত দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির জন্য অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত অনুসন্ধান রূপেই এ-সব গ্রহণ করতে পারি। অন্বেষণের ঐকান্তিকতা ও আন্তরিকতার মধ্যে এগুলির সর্বাধিক মূল্য নিহিত ; এরূপ নিবিড় আন্তরিকতার মুহূর্তে কখনো কখনো চমৎকার কাব্যিক অভিব্যক্তি দেখা গেছে। যজ্ঞানুষ্ঠানের পুনর্বিশ্লেষণের এই স্তরে পরবর্তী দিক-পরিবর্তনের পূর্বাভাস সূচিত, যখন অধ্যাত্মবিদ্যা অবশিষ্ট প্রত্নকথার আবেষ্টনী থেকে মুক্ত হয়ে যথার্থভাবে প্রত্ন-দার্শনিক পর্যায়ে উন্নীত হয়।

এভাবে উপনিষদের যুগে জ্ঞান নতুন গৌরব অর্জন করে ; গূঢ় শক্তিমত্তা ও ফলোৎপাদক ক্ষমতার দিক দিয়ে ক্রমশ তা যজ্ঞানুষ্ঠানের পরিপূরক হয়ে ওঠে। এই পর্যায়ে জ্ঞান শুধু আধ্যাত্মিক ছিল না, আরো বহুবিধ জ্ঞানের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি পাঠ্যসূচীতে (৭ : ১ : ২) তার প্রমাণ রয়েছে :

চার বেদ, ইতিহাস, উপাখ্যান, পুরাণ, পিতৃপুরুষের কাহিনী, গণিত শাস্ত্র, শুভাশুভ গণনার বিদ্যা, অর্থনীতি, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, বেদান্ত, নিরুক্ত, ব্রহ্মবিদ্যা, জীববিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ও সর্পবিদ্যা। লক্ষণীয় যে, প্রাগুক্ত উপনিষদের অন্যত্র (৫ : ১ : ১-৫) জ্ঞানকে জয় বা প্রাপ্তির সঙ্গে একাত্ম করা হয়েছে। বৃহদারণ্যকে জ্ঞানকে মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে মহিমান্বিত করা হয়েছে (১ : ৪ : ১০)। শ্বেতাশ্বতরে বলা হয়েছে যে প্রাচীন জ্ঞান দেবশ্রেষ্ঠ শিব থেকে উৎসারিত হয়েছিল (৪ : ১৮)। বস্তুত এ-যুগে অভিব্যক্ত 'জ্ঞান'-এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ ক'রে আমরা বুঝতে পারি যে, জ্ঞান কেবল যজ্ঞের বিকল্প নয় অর্থাৎ তা শুধু নির্দিষ্ট কিছু প্রাপ্তির অঙ্গীকারই দেয় না, আরো কিছুর সন্ধান দেয়। সংহিতার যুগে জীবনের সারাৎসা এবং লক্ষ্য ছিল দীর্ঘ ও কল্যাণময় জীবনলাভ ; কিন্তু উপনিষদের যুগে এই জীবন ও তার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ অমঙ্গলজনক ও অবাঞ্ছনীয় বলে মনে করা হয়েছে। পুনর্জন্ম-সম্ভাবনা অতিক্রমের লক্ষ্য যখন গুরুত্ব লাভ করল, যজ্ঞ তখন তার উপযোগিতা সম্পূর্ণ হারাল এবং জ্ঞান-ই হয়ে উঠলো একমাত্র যুক্তিসিদ্ধ উপায়। কিন্তু জ্ঞানের লক্ষ্য আবার পরিবর্তিত হয় : বস্তুনিষ্ঠ জগতের জ্ঞান পর্যাপ্ত নয় ; শুধু আত্মার প্রকৃত পরিচয় সন্ধান ক'রে এবং জীবাত্মা যে পরমাত্মা থেকে ভিন্ন নয়—এই উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হয়ে পুনর্জন্মের অভিশাপ অতিক্রম করা সম্ভব।

অতীন্দ্রিয়বাদী ও অধ্যাত্মবাদী প্রবণতা

এই স্তরে অতীন্দ্রিয়বাদী উপাদান তাত্ত্বিক দিক দিয়ে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল—আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া ও পুনর্জন্ম-বন্ধন থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় রূপে জ্ঞানের উপর সচেতন নির্ভরতা এসেছিল। উপনিষদের যুগে মানুষের জীবনের সমগ্র দিগন্তকে পুনর্জন্মবাদ ও কর্মতত্ত্ব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত ক'রে দিয়েছিল ; এইসব নতুন ভাবাদর্শের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে গিয়ে মানুষ তখন প্রবল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিল—কেননা জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি, লক্ষ্য ও প্রাপ্তির উপায়সমূহের উপর এদের প্রচণ্ড প্রভাব তখন অনস্বীকার্য। ইন্দ্রজালের অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় উপাদানের ঐতিহ্য থেকে যজ্ঞধর্মে গৃহীত অতীন্দ্রিয়বাদী প্রবণতা ছিল সমাদৃত, ও নতুন বোধের সহায়ক ; যেমন, সামমন্ত্র রচনার সৃষ্টিশীল প্রেরণারূপে সোম নির্দেশিত হয়েছে (বৃহদারণ্যক, ১ : ৩ : ২৪)। এমন কি, আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিনিষ্ঠ দ্বান্দ্বিক বিতর্কেও চূড়ান্ত পর্যায়ে অতীন্দ্রিয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট (যেমন, তদেব ৩ : ২ : ১)। উত্তর লাভের চেয়ে প্রশ্ন উত্থাপনের তাৎপর্য অনেক বেশি ; মৃত্যুবোধের পর্যাপ্ত অভিব্যক্তির মধ্যে সেই যুগের বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণ প্রকট হয়ে উঠেছে (তদেব, ৪ : ৩ : ৬)। বহুস্থানে পরমাত্মার নিগূঢ় স্বভাব ও ক্রিয়াকলাপ অতীন্দ্রিয় ভাবনার পটভূমিকায় বর্ণিত হয়েছে, কারণ এই বিষয়

বুদ্ধিগম্য নয়, কেবল অতীন্দ্রিয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে প্রাণিধান করা যেতে পারে (যেমন, তদেব, ৪ : ৩ : ১৪ ; কঠ, ১ : ২ : ১২, মুণ্ডক ৩ : ২ : ৩ ; শ্বেতাশ্বেতর ৩ : ১৪, ১৯, ২০ ইত্যাদি)

আত্মা ব্রহ্মের দুর্জ্ঞেয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করার অন্যতম পরিচিত পদ্ধতি হ'ল সমস্ত মহাভূত, সূর্য, প্রজাপতি, বর্ষ, দিবা, রাত্রি, অন্ন ইত্যাদির সঙ্গে তার একাত্মতা ঘোষণা (প্রশ্ন, ১ : ৩-১২)। আবেকটি সাধারণ পদ্ধতি হ'ল তাকে নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ একাক্ষর 'ওম্'-এ (মুণ্ডক, ১ : ১ : ১ ; তৈত্তিরীয়, ১ : ৮) কিংবা তিনটি পবিত্র অক্ষর 'ভূ, ভুবঃ, স্বর্'-এর পরিণত করা (তৈত্তিরীয় ১ : ৬ : ২)। এভাবে যজ্ঞের বিভিন্ন উপকরণকে বা মন্ত্রের বিভিন্ন উপাদানকে নানাবিধ অতীন্দ্রিয় তাৎপর্যে মণ্ডিত করা হয়েছে। মৃত্যু সম্পর্কিত ভাবনাও অনুরূপ অতীন্দ্রিয় কল্পনাকে আশ্রয় করেছে। এভাবে অতীন্দ্রিয়বাদী ভাবনা যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রতীকী ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে উঠেছে ; এ ধরনের পুনর্বিশ্লেষণ উপনিষদের যথার্থ আধ্যাত্মিক মতবাদ নির্মাণের পূর্ববর্তী প্রয়োজনীয় স্তরটি গঠন করেছে। অতীন্দ্রিয়বাদী প্রবণতা ব্যতীত কোনো ধর্মতত্ত্ব বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্ভব নয় , কয়েক শতাব্দীর প্রত্নপৌরাণিক চিন্তাভাবনা ও যজ্ঞানুষ্ঠানের পরে বিমূর্ত ভাবনার অপেক্ষাকৃত অনিশ্চিত পরিমণ্ডলে আকস্মিক উল্লম্ফন প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব। তাই, অব্যবহিত পরবর্তী স্তরে অতীন্দ্রিয়বাদী প্রবণতার ভূমিকা পরিবর্তিত হয়ে যায় ; তখন প্রত্নকথাগুলিকে প্রতীকী অতিজাগতিক ও প্রত্ন-আধ্যাত্মিকভাবে ব্যাখ্যা ক'রে আনুষ্ঠানিক ধর্মকে উচ্চতর স্তরে দীর্ঘস্থায়ী গ্রহণীয়তা দিতে চেয়েছে। এই পর্যায়ের পরেই শুধু পরবর্তী দুঃসাহসী পদক্ষেপ সম্ভব, অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক ধর্মকে সম্পূর্ণ অ-পর্যাপ্ত, এবং ফলত, অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় পরিত্যাগ করে অপেক্ষাকৃত প্রত্নকথা-বর্জিত আধ্যাত্মিক চিন্তার স্তরে উপনীত হওয়া। ইন্দ্রজালে বিশ্বাস দুজ্ঞেয় রহস্যময় প্রবণতার সহগামী ও তার ভিত্তিভূমি ; ক্রমশ তা আধ্যাত্মিক পরিশীলনের ফলে দুর্বলতর হ'ল, যেহেতু তা বুদ্ধিবৃত্তিকে উপযুক্ত উপকরণরূপে গ্রহণ ক'রে ধীরে-ধীরে তারই উপর অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে উঠলো।

বাস্তবতার সম্বন্ধে উপনিষদের দৃষ্টিভঙ্গি কতকটা বিশ্লেষণী বুদ্ধি-প্রসূত ; বেশ কিছু প্রচলিত সাধারণ ভ্রান্তি এড়ানোর জন্য এই সত্যকে সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করতে হবে। এ-ধরনের ভুল ধারণাগুলির মধ্যে প্রধান হল শংকরাচার্যের উপনিষদ্-ভাষ্যকে অভ্রান্ত পদ্ধতি ব'লে মনে করা। এটা অনৈতিহাসিক এবং সম্পূর্ণ ভুল ; কারণ, উপনিষদ্ রচিত হওয়ার প্রায় পনেরো শ' বছর পরে শংকর জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এই অন্তবর্তী শতাব্দীগুলির মধ্যে উদ্ভূত পূর্ণাঙ্গ অধ্যাত্মবাদী চিন্তাধারা-প্রসূত দার্শনিক মতবাদ দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর নিজস্ব উদ্দেশ্যের উপযোগীরূপে ও আপন মতবাদের দৃষ্টান্ত হিসেবে উপনিষদ্গুলিকে তিনি ব্যবহার

করেছিলেন। উপনিষদ্‌গুলি যখন যেভাবে রচিত হোক না কেন, নিজেরা কোনো সুস্পষ্ট প্রণালীবদ্ধ দার্শনিক লক্ষ্যযুক্ত পদ্ধতি তৈরি করার চেষ্টা করে নি। এর একটা কারণ এই যে, অতীন্দ্রিয়বাদী প্রবণতার আতিশয্য তখনো এদের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে রয়েছিল ব'লে সম্পূর্ণ বিধিবদ্ধ অধ্যাত্মভাবনার স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করা সম্ভব ছিল না ; এ দৃষ্টিভঙ্গি শুধু আংশিকভাবেই গভীর চিন্তাপ্রসূত। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ঋষি উপনিষদের ভিন্ন ভিন্ন অংশ রচনা করেছিলেন ব'লে তাদের মধ্যে পরস্পর-ভিন্ন, এমনকি কখনো-কখনো পরস্পরবিরোধী উপলব্ধিও প্রতিফলিত হয়েছে। এই রচনাংশগুলি যে একত্র সন্নিবিষ্ট হতে পেরেছিল, তার পেছনে রয়েছে একটি নেতিবাচক ও একটি ইতিবাচক কারণ। নেতিবাচক কারণটি হ'ল, আনুষ্ঠানিক ধর্মচর্যা থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার মূল তাগিদ এবং ইতিবাচক কারণ হ'ল, তাদের অনুসন্ধানের প্রধান বিষয়বস্তু অর্থাৎ মানুষ, মন, বস্তু, আত্মা ও পরমাত্মার তাৎপর্য উপলব্ধি।

সংহিতার সর্বেশ্বরবাদ থেকে ব্রাহ্মণ যুগের অন্ত্যপর্বের প্রজাপতিকেন্দ্রিক একেশ্বরবাদের মধ্য দিয়ে উপনিষদের ব্রহ্ম-ভাবনার অদ্বৈতবাদে চরম পরিণতি লাভের বঙ্কিম পথটি দীর্ঘ ও গ্রন্থিল। এর মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের উত্থান-পতন ও সংঘর্ষের বিবিধ স্তর প্রতিফলিত হয়েছে। কেনোপনিষদের একটি বিখ্যাত উপাখ্যানে দেবতারা রহস্যময় বস্তুর আবির্ভাবকে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হওয়ার পরে উমা হৈমবতী জানালেন, ইনিই ব্রহ্ম। এখানে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ঋষির দিব্যদর্শনকে ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ রূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে, বুদ্ধিবৃত্তির প্রক্রিয়া হিসাবে করা হয় নি। কঠোপণিষদে আত্মাকে রথী, দেহকে রথ, ইন্দ্রিয়কে অশ্ব, বুদ্ধি সারথি এবং মনকে রথরশ্মিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে (১ : ৩ ৩-৪)। সাংখ্যতত্ত্বের পূর্বসূরী হিসেবে শ্বেতাশ্বেতর মহেশ্বরকে অতিজাগতিক মায়ার নিয়ন্তা ও শ্রেষ্ঠ প্রভুরূপে বর্ণনা করেছে ; প্রকৃতি হ'ল মায়া এবং মহেশ্বর থেকে উদ্ভূত সহায়ক শক্তিগুলি সমগ্র বিশ্বজগৎকে আবৃত করেছে (৫ : ৩)। পুরুষ ও প্রকৃতি সম্মিলিত হওয়ার পরে বিবর্তনময় সৃষ্টিপ্রক্রিয়া শুরু হয়। এই উপনিষদের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়ে একেশ্বরবাদী প্রবণতা আত্মপ্রকাশ করেছে ; ষষ্ঠে মহেশ্বর পরমাত্মা রূপে গৃহীত। তাছাড়া পরবর্তী বেদান্তদর্শনে প্রবল-প্রভাবে যে মায়াবাদ শ্বেতাশ্বেতরেই তার প্রথম দেখা মেলে।

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে আত্ম-ব্রহ্ম তত্ত্ব চূড়ান্ত ও সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত রূপ পরিগ্রহ করে। মানবিক সারাৎসার সম্পর্কে ভাববাদী বিশ্লেষণ অজর ও অমর আত্মা সম্পর্কিত ধারণার পর্যবসিত হয় (যেমন ছান্দোগ্য, ৬ : ১১ : ৩ ; ৮ : ১ : ৬ ইত্যাদি)। আত্মাকে দেহ থেকে পৃথক ক'রে দেখানোর প্রবনতার ভাববাদী

দর্শনের পূর্বাভাস সূচিত হয়েছে। পরবর্তী উপনিষদ্‌গুলিতে দেহ ও আত্মার পার্থক্য স্পষ্টতর হয়ে অবিসংবাদী ভাববাদী দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবু কিছু কিছু ক্ষেত্রে বস্তুবাদী চিন্তাধারার অবশেষও রয়ে গেছে (যেমন, ছান্দোগ্য, ১ : ২ : ২-৭ ; ৩ : ১৪ : ৩ ইত্যাদি)। দেহ ও আত্মার দ্বৈতবোধ এই উপনিষদে অভিব্যক্ত ঃ 'মৃত্যুগৃহীত এই শরীর মরণশীল হলেও এতেই অমর ও দেহহীন আত্মার অবস্থান' (তদেব, ৮ : ১২ : ১)। ফলে এই শরীরের প্রতি বিদ্বিষ্ট মনোভাবের সূত্রপাত হ'ল ; নানাবিধ পাপ ও অকল্যাণের অধিষ্ঠানরূপে দেহ বিভিন্ন উপনিষদে নিন্দিত হয়ে দেহবিচ্ছিন্ন নিরুপাধি নিরঞ্জন স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মার ধারণা বৃহদারণ্যকে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করল। যাজ্ঞবল্ক্যের তত্ত্ব দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে একটি যুগের সমাপ্তি ও পরবর্তী আবির্ভাব সূচনা করেছে—যে-যুগ প্রকৃতপক্ষে এখনো পর্যন্ত অব্যাহত। (তুলনীয় বৃহদারণ্যক, ১ : ৪ : ১ ; ১ : ৪ : ৮ ; ২ : ৩ ; ৩ : ৪ : ২)। নতুন দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্যবোধ দৃঢ় ও নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা লাভ করল।

এই অনুমান যুক্তিসঙ্গত যে, উপনিষদের প্রাগুক্ত প্রধান মতবাদে সমন্বিত হওয়ার পূর্বে দুটি স্বতন্ত্র দার্শনিক সন্ধানের ধারা প্রবাহিত ছিল। একদিকে, সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় আত্মা সম্পর্কে দীর্ঘায়িত অনুসন্ধান নিশ্চিতভাবে চলছিল, যেহেতু শরীরের ধ্বংস অনিবার্য এবং মরণশীল মানুষ সাগ্রহে জানতে চাইছিল, মানুষের কোনো উপাদান মৃত্যুকে অতিক্রম করে কিনা। দেহাতিরিক্ত আত্মার স্বপ্নমায়া ও বিভ্রম এবং সেই সঙ্গে জীবনের নেতিবাদ বা বিনাশ অর্থাৎ মৃত্যুকে স্বীকার করার প্রতি স্বাভাবিক অনীহা থেকেই অমর আত্মার অস্তিত্ব-সম্পর্কিত বিশ্বাস জন্ম নেয়। বস্তুবিশ্বের সঙ্গে মানুষের একমাত্র যোগসূত্র হ'ল আত্মা, কারণ বিভিন্ন ইন্দ্রিয় চিন্তা, অনুভব বা আকাঙ্ক্ষা করতে পারে না,—তাদের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আত্মাই বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সমর্থ। (বৃহদারণ্যক, ২ : ৪ : ১৪ ; ৩ : ৪ : ১-২)।

তত্ত্ব সন্ধানের ধারা শুরু হয়েছিল বস্তুবিশ্বের সারাৎসার এবং পরমাত্মার সঙ্গে তার যোগসূত্র অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে। এই দীর্ঘায়িত তত্ত্ব সন্ধানের ধারার শুধু কিছু তাৎপর্যপূর্ণ কিছু কিছু তাৎপর্যপূর্ণ অংশ আমাদের নিকট উপনীত হয়েছে, যা শেষ পর্যন্ত সার্বভৌম চিরন্তন আত্মারূপে অবিহিত যে ব্রহ্ম তার সম্পর্কে ধারণার চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছে। বস্তুত তত্ত্ব সন্ধানের এই দুটি ধারার চিহ্ন দুটি শব্দের ব্যুৎপত্তিতে নিহিত। কেননা একদিকে 'আত্মা' শব্দটি সম্ভবত প্রাণবায়ু থেকে নিষ্পন্ন (তুলনীয় জার্মান 'আত্মেন্', অর্থ) নিঃশ্বাস নেওয়া এবং অন্যদিকে 'ব্রহ্ম' শব্দের মধ্যে বিপুলতার ধারণাটি প্রচ্ছন্ন যেহেতু 'বৃহৎ' শব্দের সঙ্গে তার ব্যুৎপত্তিগত সম্পর্ক রয়েছে,—এতে বোঝা যাচ্ছে যে এ তত্ত্ব সন্ধানের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল বিশ্বজগৎ।

অনুসন্ধানের প্রথম ধারাটি প্রসঙ্গক্রমে দৈহিক জীবনের ধারণা অর্থাৎ প্রাণ সম্পর্কেও গবেষণা করেছে। বহু রচনাতে প্রাণ ও আত্মা—শব্দ দুটি সহগামী ও পরস্পর বিনিময়সহ তত্ত্ব। শরীরের প্রতিটি প্রধান ক্রিয়াশীল অংশের একটি ক'রে প্রাণ কল্পিত হয়েছে, সম্ভবত এই ধারণা থেকেই পরবর্তীকালে প্রাণ সম্পর্কিত অনেকত্ববাদী ধারণার সৃষ্টি হয়। তবে, সাধারণত উপনিষদে প্রাণ একক (তুলনীয় মুণ্ডক ৩ : ১ : ৪, তৈত্তিরীয় ২ : ২ : ৩)। বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি বিখ্যাত কাহিনীতে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের তুলনায় প্রাণের নিশ্চিত প্রাধান্য ও অপরিহার্যতা ব্যক্ত হয়েছে (১ : ৩ : ১১)। প্রাণের অতীন্দ্রিয়বাদী ও অধ্যাত্মবাদী ব্যাখ্যা বহুস্থানে যায়। আত্মানুসন্ধানের প্রক্রিয়ায় দেহ ও মনের প্রকৃতি, ক্রিয়াকলাপ, পরিধি, সীমা ইত্যাদি আলোচিত হওয়ার ফলে এর মধ্যে আমরা শরীরতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের কিছু আভাস পাই। মানুষের মধ্যে যে অবিনশ্বর উপাদান দৈহিক মৃত্যুর ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে গিয়ে নিদ্রা, স্বপ্ন ও স্বপ্নহীন সুষুপ্তির মৃত্যুতুল্য পর্যায়গুলি বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল (বৃহদারণ্যক, ২ : ১১ : ১৫-২০, মাণ্ডূক্য, ৩ : ৭)। পরবর্তী স্তরে উদ্ভূত হ'ল এই বিশ্বাস-লালিত সিদ্ধান্ত যে, শরীরে প্রাণবায়ু-সঞ্চরণকারী ও ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষকারয়িতা শক্তি মৃত্যুর পরেও বর্তমান থাকে। এই আত্মা জীবনদায়ী প্রাণবায়ুর প্রেরয়িতা, অন্তরতম এবং পুত্র, ধন ও অন্যান্য সমস্ত কিছু অপেক্ষা প্রিয়তর (বৃহদারণ্যক, ৩ : ৪ : ১ ; ৪ : ১৬, ১৭ ; ১ : ৪ : ৭)। জীবনীশক্তিকে যখন আত্মার সঙ্গে একাত্মীভূত করা হ'ল, আত্মানুসন্ধানের এই ধারা তখন তার সমাপ্তি-বিন্দুতে উপনীত হ'ল।

অনাত্মের রহস্যজনক জগতের জন্য অনুসন্ধানের অপর ধারাও ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হওয়ার পূর্বে দীর্ঘপথ পরিক্রমা করেছিল। আমরা দেখি যে, মধ্যপথে তা নিজেকে অতিজাগতিক উপাদানসমূহের সঙ্গে অস্থায়ীভাবে একাত্ম ক'রে নিয়েছিল। মহাবিশ্বের বিস্ময়কর বিশালতা—বিশেষত আকাশমণ্ডল ও মহাশূন্যের ব্যাপ্তি খুব সম্ভবত ব্রহ্মবিষয়ক ধারণার প্রথম বস্তুগত ভিত্তিভূমি নির্মাণ করেছিল। বারংবার ব্যবহৃত আলো উজ্জ্বলতা, পুত্র, স্বর্ণ (অর্থাৎ সূর্য) নির্মল মহাশূন্য (বিরজা) ধবলতা, অপ্রাপণীয় উচ্চতা সর্বব্যাপ্ত পরিসর যার পরে আর কিছু নেই—ইত্যাদি অনুষঙ্গ থেকে এই ব্রহ্ম ধারনার সমর্থন পাওয়া যায়। ব্রহ্মের এই সীমাহীনতা থাকে চূড়ান্তভাবে বোধাতীত ক'রে তুলেছে ; কোনও সংজ্ঞার্থের মধ্যে তাকে আবদ্ধ করা যায় না। ব্রহ্ম সমগ্র সৃষ্টির চূড়ান্ত আশ্রেয়, সীমাহীন মহাবিশ্বের বিমূর্ত প্রকাশ, মৃত্যু ও বিনাশের অতীত এবং তাই বিশুদ্ধ আনন্দস্বরূপ।

উপনিষদীয় চিন্তাধারা তার শীর্ষবিন্দুতে উপনীত হয়েছিল, যখন সসীম আত্মার মৌল স্বরূপ এবং এই বস্তুগত জগতের পশ্চাদবর্তী বাস্তবত অর্থাৎ ব্রহ্ম সম্পর্কিত

দুটি স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত এক ও অভিন্নরূপে উপলব্ধ ও ঘোষিত হ'ল। আমাদের বাহিরে ও ভিতরে একই বস্তু বিরাজমান ; এই দুয়ের মধ্যে যারা ভিন্নতা দর্শন করে, তাদের দৃষ্টি বিকৃত এবং সেই ক্লিষ্ট ও ভীতিসঙ্কুল দৃষ্টির কাছে বাস্তবতা খণ্ডিত ও বহু ব'লে প্রতিপন্ন হয়। একমাত্র একত্বের উপলব্ধি মুক্তি-বিধান করতে সমর্থ, যা বাক্ বা বুদ্ধি অনুধাবন করতে পারে না। আনন্দরূপে যখন তা উপলব্ধ হয়, কেবন তখনই ভয় ও উদ্বেগ থেকে নিশ্চিত মুক্তি পাওয়া সম্ভব। আত্মা ও ব্রহ্মের এই একত্ববোধের প্রক্রিয়া প্রাচীনতর উপনিষদ্গুলিতে শুরু হয়েছিল এবং এই প্রবণতা উপনিষদ্‌কে আরণ্যক থেকে পৃথক করেছে। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের মধ্যন্তরে ভারতবর্ষে ব্রহ্ম ও আত্মার এই আপাত-সরল সমীকরণের প্রবল প্রভাব অনুভূত হয়েছিল, কারণ তা একটি বিশাল ব্যাপ্তিযুক্ত সামাজিক সমস্যার ভাগবত অনুবন্ধ নির্মাণ করতে চেয়েছিল। এই সমস্যা ছিল গোষ্ঠীগত সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সমন্বয়ের সমস্যা। প্রাগ্বৈদিক, সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা ও বিভিন্ন অনার্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে বহুশতাব্দীব্যাপী সংঘর্ষ ও আর্যীকরণের যুগে যে জটিল ও বহুস্তর-বিন্যস্ত সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংশ্লেষণের প্রক্রিয়া চলছিল, তার অনিবার্য ফলশ্রুতিরূপে এমন একটি আধ্যাত্মিক প্রত্নকথার সৃষ্টি হল, যা বিচ্ছিন্নতা বা বিভাজনের পরিবর্তে সংশ্লেষণী ও সর্বাত্মকতার প্রবনতাকে অভিব্যক্ত করেছে।

আত্মা ও ব্রহ্মের একাত্মবোধের ধারণায় সমাজের সর্বস্তরের মানুষ পরমাত্মার সঙ্গে ঐক্যবোধের সম্ভাবনায় সমুন্নতি লাভ করল ; এতে শুধু অনার্য জনগোষ্ঠীর অহংবোধ যে তৃপ্ত হ'ল তা নয়, প্রাগার্য প্রতিবেশীকে শ্রদ্ধা এবং এমনকি, ঘনিষ্ঠতার বোধ গ্রহণ করতে শিখল। বিকাশোন্মুখ মিশ্র জনগোষ্ঠী পরস্পরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ ক'রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সমর্থনে তাত্ত্বিক যুক্তি পেয়ে গেল। অবশ্য এর অর্থ এই যে, এ সমস্তই কোনো পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটেছিল ; প্রকৃতপক্ষে সেযুগের আধ্যাত্মিক অভিভাবকরা একটি বিশাল ও বিকাশমান জনগোষ্ঠীর সামাজিক কল্যাণের জন্য উপযুক্ত তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছিল। 'বৃহৎ' শব্দনিষ্পন্ন 'ব্রহ্ম' স্বাভাবিকভাবেই ছিল একটি ব্যাপক ভাবাদর্শ,—কোনও ব্যক্তি যদি কাল্পনিকভাবেও নিজেকে তার মধ্যে স্থাপিত করতে পারে, সমগ্র মানবজাতির জন্য সে এর মধ্যে আধ্যাত্মিক আশ্রয় খুঁজে পায়। অন্যদিকে আত্মতত্ত্ব আংশিকভাবে মানুষের অন্তিম ভয় অর্থাৎ মৃত্যুর ফলে বিনাশের ভয়কে একটি নৈর্ব্যক্তিক স্তরে সমাধান করেছিল।

ব্যক্তির মৃত্যু হলেও মানবজাতির মৃত্যু হয় না ; যখন কোনো ব্যক্তি নিজের সীমাবদ্ধ মরণশীল অস্তিত্বকে ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে মানবজাতির অমর আত্মার পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করতে পারে, যা মৃত্যুহীন অসীম আত্মা —তখন সেই ব্যক্তি

তার ব্যক্তিগত দেহাবসানের পরেও জীবনের নিরবচ্ছিন্নতার আশ্বাস পেয়ে নিরাপদ বোধ করে। সুতরাং এ-দুটি ভাবাদর্শের সম্মিলনের ফলে অন্তত ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে বহু সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছিল। স্বভাবত, বিশেষভাবে বর্ণ-বিন্যস্ত ও শ্রেণী-বিভক্ত সমসাময়িক সমাজ তখনো মন্দভাগ্যদের নিপীড়ন করছিল, নানাবিধ যজ্ঞ তখনো অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, পুরোহিতরা পূর্ববৎ লোভী ছিল, যদিও জনসাধারণের একটি অংশ প্রচলিত ধর্ম সম্পর্কে ক্রমশ অধিকতর বিক্ষুব্ধ ও হতাশ হয়ে উঠেছিল, সমাজের বিপুল সংখ্যাগুরু অংশ তখনও পর্যন্ত অভ্যস্ত আনুষ্ঠানিক ধর্মের মাধ্যমে তাদের বিক্ষুব্ধ ধর্মীয় বিবেকের সমাধান সন্ধান করছিল। সেই মুহূর্তে সামাজিক স্তরে খুব সামান্য বস্তুগত অভিজ্ঞতা লাভ সম্ভব ছিল, তবে ব্রহ্মাত্ম-তত্ত্বের মধ্যে এমন একটি যুক্তিসিদ্ধ সূত্রের সন্ধান পাওয়া গেল, যা সামাজিক বাস্তবতাকে নতুন পথের সন্ধান দিয়ে বহু সম্ভাব্য শত্রুতা ও রক্তপাতের আশঙ্কাকে প্রতিহত করেছিল। বিশ্বজগতের মৌল স্বরূপ ও উৎপত্তি, তার বিভিন্ন উপাদান এবং মানবিক অস্তিত্ব সম্পর্কে উৎসাহ এই যুগের বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণ, তবে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের মতো এখানেও বিভিন্ন প্রত্নকথার মধ্যে কোনো সাযুজ্যবোধ নেই। মুণ্ডক উপনিষদের মতে অক্ষর থেকে সৃষ্টির উৎপত্তি হয়েছিল—একধরনের বিবর্তনের ক্রম-অনুযায়ী প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়সমূহ, আকাশ, বায়ু, আলো ও জল উদ্ভূত হয়েছিল। তৈত্তিরীয় উপনিষদে এই ক্রম সামান্য পরিবর্তিতভাবে আত্মা থেকে উদ্ভূত। বিভিন্ন প্রত্নকথায় দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন তত্ত্বগত বাস্তবতার মূল উৎসরূপে বিভিন্ন সারবস্তুকে নির্দেশিত করা হয়েছে। সে সময় বহু আঞ্চলিক রূপভেদ ও আধ্যাত্মিক বিবর্তনের বহুস্তরযুক্ত অভিব্যক্তি-সহ যেসব সৃষ্টিতত্ত্ব জনমানসে ভেসে বেড়াচ্ছিল, সেগুলিকে সংহত করার উদগ্র আকাঙ্ক্ষাই ঐ প্রবণতার কারণ। এভাবে একটি বিবর্তন-নির্ভর ভাবনির্মাণে পরস্পর বিপরীত সৃষ্টিতত্ত্বগুলিকে সন্নিবেশিত করে তাদের চূড়ান্ত রূপদানের চেষ্টা হয়েছে। (যেমন তৈত্তিরীয় ২ : ৬, ৭ ; ঐতরেয় ১ : ১ ১-৪, ১২ ; ছান্দোগ্য ৩ : ২১ : ২, ৪ : ১৭ : ১-৩ ; বৃহদারণ্যক ১ : ২ : ৫ ইত্যাদি) পরবর্তী উপনিষদ্‌গুলিতে সৃষ্টির আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। পরমাত্মার সৃষ্টি-আকাঙ্ক্ষা ও সৃষ্টির প্রয়োজনে তপস্যায় নিরত হওয়ার বৃত্তান্ত বহু প্রত্ন-কথায় পাওয়া যায়। সৃষ্টিশীল শক্তি, সৃষ্টি-প্রক্রিয়া ও সৃষ্টির পশ্চাদবর্তী সক্রিয় মহাশক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রত্নকথায় ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ রয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি কাহিনীতে মানবজীবনের একাকিত্বের অনুভূতি, সঙ্গিনীর আকাঙ্ক্ষা, নারীপুরুষের মিলন ও সন্তান উৎপাদনের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল ভাবনাকাব্যিক অভিব্যক্তি পেয়েছে। লক্ষণীয় যে, মরণশীল মানুষকে সেখানে মৃত্যুহীন দেবতার স্রষ্টারূপে বর্ণনা করা হয়েছে (১ : ৪ : ৬), যাতে উপনিষদীয় ভাবনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত আছে।

চূড়ান্ত জ্ঞানের জন্য আধ্যাত্মিক সন্ধানের অন্য মেরুতে রয়েছে প্রেততত্ত্ব ; সৃষ্টিতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে পরস্পরের পরিপূরক। সংহিতা সাহিত্যে এই বিষয়ে ভাবনার সূত্রপাত হলেও পরবর্তী অধ্যায়েই তা নিজস্ব চরিত্র অর্জন করে। এই তত্ত্ব সন্ধানের সূচনা-বিন্দুতে রয়েছে মানুষ ও মানুষের মরণোত্তর ভাগ্য। জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রধান শত্রু যে মৃত্যু, তার সম্পর্কে চেতনা অধিকাংশ আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার সূচনা-বিন্দু এবং সেই সঙ্গে সর্বপ্রধান সমস্যার কেন্দ্র। তবে, মৃত্যুকে জয় করা অর্থাৎ দৈহিক মৃত্যুর পরেও জীবনের নিরবচ্ছিন্নতা স্থাপনই একধরনের ভাবনার প্রকৃত উদ্দেশ্যে। তাই গ্রিক, ইহুদী ইরাণীয় এবং অন্যান্য দেশের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চিন্তাবিদগণ এ-বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তাবিষ্ট হয়েছিলেন। প্রত্যেক উপনিষদ্ পৃথকভাবে এই সমস্যা আলোচনা ক'রে নিজস্ব উপায়ে সমাধান উপনীত হতে চেয়েছে ; এইসব সমাধান আবার একটি বিন্দুতে পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছে ঃ তা হল ব্রহ্মের স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞানই পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি দেয়। ঈশ ও কঠোপনিষদে নিরানন্দময় অন্ধকারে আবৃত মৃত্যুলোকের বর্ণনা আমাদের চোখে পড়ে। বিভিন্ন উপনিষদে এই মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে ঃ দেহ বিনষ্ট হওয়ার পর মানুষের কী অবশিষ্ট থাকে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে আত্মা অবশিষ্ট থাকে (কঠ ২ : ২ : ৪)। এই উপনিষদে পুনর্জন্মতত্ত্ব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এধরনের প্রশ্ন ও মীমাংসা আমরা 'কেন' এবং প্রশ্নোপনিষদেও লক্ষ্য করি। প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিখ্যাত দেবযান ও পিতৃযান তত্ত্বের প্রাথমিক আভাস রয়েছে মুণ্ডকোপনিষদে (১ : ২ : ১১)। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই ধারণাকে আরও বিশদ করা হয়েছে। তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় ও শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে প্রেততত্ত্ব সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারণাকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়েছে। শেষোক্ত উপনিষদে বলা হয়েছে যে, মানুষের আপন কর্ম অনুযায়ী তারা আত্মা বিভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ ক'রে থাকে (৫ : ১১ : ১২)। স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এই পর্যায়ে কর্মবাদ পুনর্জন্মতত্ত্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, দেহান্তরবাদতত্ত্ব ক্রমশ একটি যুক্তিসিদ্ধ-ভাব-সংগঠনের মধ্যে বিন্যস্ত হচ্ছিল।

অন্য উপনিষদ্গুলির তুলনায় ছান্দোগ্য উপনিষদ্ প্রেততত্ত্ব সম্পর্কে অধিক আলোচনা ক'রে আমাদের কাছে অনেক বেশি তথ্য উপস্থাপিত করেছে। বলা হয়েছে যে, কোনও মানুষ তার প্রাক্তন জন্মে অর্জিত কর্মফল অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কুকুর, শূকর বা চণ্ডালরূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে (৫ : ১০ : ৭) ; এমনকি, স্বর্গ ও চিরস্থায়ী সুখের নিকেতন নয়, কর্মফলের শক্তি ক্ষীণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গ থেকে আত্মাকে নির্বাসিত হতে হয় (৮ : ১ : ৬)। মরণোত্তর আত্মার বিভিন্ন অবস্থান, ভিন্ন ভিন্ন লোক এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বর্ণনা ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে লক্ষ্য করা যায়।

নতুন উপাসনা পদ্ধতি ঃ প্রশ্ন ও সংশয়

প্রাজ্ঞ চিন্তাবিদরা যখন বিশ্বজগৎ ও ব্যক্তির স্বভাববৈশিষ্ট্য ও সারবস্তুর সন্ধান করছিলেন, সম্প্রসারণশীল জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় আচার ব্যবহার তখন আর কেবল যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বহু লোকপ্রিয় অবৈদিক ও প্রাগার্য উপাসনা পদ্ধতি ও পরমাত্মা সম্পর্কে ধারণা প্রচলিত আচার ব্যবহারের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছিল। এগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান ভাবাদর্শ হ'ল তপঃ—বহু উপনিষদের মধ্যে এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উল্লেখ ছড়িয়ে রয়েছে। সংহিতা ধর্ম যজ্ঞবিষয়ক সামূহিক অনুষ্ঠান পরিচালনার বিদ্যা সম্পর্কে অবহিত ছিল, কিন্তু এই পর্যায়ে তপঃ আত্মোপলব্ধির বহুজন-গ্রাহ্য পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে। তাই, মুণ্ডক উপনিষদ্ বলেছে যে, তপস্ক্রিয়ার দ্বারা ব্রহ্মকে লাভ করা যায় (১ : ১ : ৮)। যখন কৌম সমাজ এবং ঐন্দ্রজালিক ও অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক বিশ্ববীক্ষা বিলীন হওয়ার ফলে নিরাপত্তার অভাববোধ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ছিল, সম্ভবত সেই পরিবেশেই নতুন উপাসনা পদ্ধতি অর্থাৎ যোগসাধনচর্যার উদ্ভব ঘটেছিল। হয়ত বা এই ভাবাদর্শ প্রাগার্য প্রভাবের ফল।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় মূল্যবোধ যোগচর্যার মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছিল ; সম্ভবত সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার প্রাপ্ত প্রত্ন-পশুপতি মূর্তির মধ্যে তার প্রথম প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। সংহিতায় এই ভাবনার সঙ্গে তুলনীয় কিছু নেই, যদিও যতিদের সঙ্গে ইন্দ্রের শত্রুতাবিষয়ক উপাখ্যানে একটি ভিন্ন ধরনের ধর্মচর্যার নিদর্শন পাওয়া যায়। কিংবা 'মুনি' ব'লে পরিচিত ভিক্ষাজীবী ও মৌন ব্রতধারী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে আদিম মানুষের বিচিত্র ধর্মচর্যার ইঙ্গিত রয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে যোগসাধনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কঠোর বিধিসমূহের উল্লেখ রয়েছে, যেখানে ব্রহ্মচর্যকে উপবাস পালনের সঙ্গে একীভূত ক'রে দেখানো হয়েছে। সম্ভবত, এতে অবৈদিক ভাবাদর্শ দ্বারা বৈদিক ধর্মচিন্তা প্রভাবিত হওয়ার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে যোগসাধনার নানাবিধ অনুপুঙ্খ উল্লিখিত হয়েছে।

যোগ ছাড়াও ভক্তির প্রাথমিক পর্যায়ের নিদর্শন আমরা শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে লক্ষ্য করি, যেখানে মহেশ্বরের প্রশস্তির মধ্যে পরবর্তী পৌরাণিক যুগের সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পূর্বাভাস পাওয়া যায়। মুণ্ডক উপনিষদে গুরুবাদ, কর্মবাদ ও যজ্ঞধর্মের তাৎপর্যহীনতা আভাসিত হয়েছে। অর্বাচীনতর শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে এই ধারণাগুলি যেমন আরও বিস্তার লাভ করেছে, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ মানবজীবনের পরম লক্ষ্যরূপে সেখানে ঘোষিত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে প্রায় সবগুলি উপনিষদ্ এমন কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে চেয়েছে, যা তৎকালীন জনসাধারণের চিন্তাশীল অংশকে সংশয়-গ্রস্ত ক'রে তুলেছিল। আমরা সেযুগে অনুষ্ঠিত বহু আধ্যাত্মিক আলোচনা চক্রের ব্রহ্মোদ্যের বিবরণ এবং বহু আরণ্য শিক্ষা নিকেতনের নিদর্শন পাই, যেখানে কিছু কিছু মৌলিক সমস্যা নিয়ে আলোচনায় সমাধানের পথ সন্ধান করা হ'ত। এমনকি, যেখানে কোনও প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি, সেসব রচনাকেও কোনো মৌলিক সমস্যার প্রতি আলোকপাতের প্রয়াসরূপে গণ্য করা হ'ত, সমাধানগুলি বিশ্লেষণ ক'রে আমরা তার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন প্রশ্নগুলি সম্পর্কে ধারণা ক'রে নিতে পারি। কঠোপনিষদের বিখ্যাত নচিকেতা-উপাখ্যানে মানুষের মরণোত্তর অবস্থা সম্পর্কে যে সংশয় ব্যক্ত হয়েছে, তাতে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারতবর্ষে প্রেততত্ত্ব সংশ্লিষ্ট প্রাচীন সংশয়ই অভিব্যক্তি লাভ করেছে। সমগ্র প্রশ্নোউপনিষদ্ প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন জিজ্ঞাসুদের মনে ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক প্রশ্ন ও সমাধানের সমষ্টি। এ সবের মধ্যে অরণ্যের আশ্রমগুলিতে তৎকালীন বিদ্যাচর্চার পরিবেশ প্রতিফলিত হয়েছে। এই উপনিষদ্ থেকে এই তথ্য স্পষ্ট যে, সেসময় প্রধান তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা জীবনের উৎস, সারাৎসার, ক্রিয়া, পরিধি ও সমাপ্তি ছাড়াও জীবনের মূলাধার আত্মাকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছিল। তৈত্তিরীয় উপনিষদেও মরণোত্তর অবস্থা সম্পর্কে বেশ কিছু প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছে। আবার, প্রায় সমগ্র ছান্দোগ্য উপনিষদে দ্বান্দ্বিক আঙ্গিকে অধ্যাত্মবিদ্যা সম্পর্কিত বিশেষ জিজ্ঞাসা ছাড়াও কিছু কিছু ব্যবহারিক ও পার্থিব প্রশ্নও উত্থাপিত হয়েছে। আধ্যাত্মিক সমস্যা সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা মৌলিক সমাধান সম্ভবত বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাওয়া যায়, যেখানে উপনিষদের আদর্শবাদ তার শীর্ষবিন্দুতে উপনীত হয়েছে। এই উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর বিখ্যাত সংলাপ ছাড়াও অশ্বলের সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্যের কথোপকথন তৎকালনী তত্ত্ব জিজ্ঞাসার স্বরূপ আভাসিত হয়েছে। এই উপনিষদে মৃত্যু, অতিজাগতিক উপাদান ও আত্মার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। উদ্দালক ও যাজ্ঞবল্ক্যের কথোপকথন এবং গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্যের বিখ্যাত বিতর্ক তৎকালীন দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাবনার অসামান্য পরিচয় বহন করছে। মৃত্যু ও পুনর্জন্ম সম্পর্কিত তত্ত্বসমূহ গৃহীত হওয়ার পূর্বে যে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষিত হয়েছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ বৃহদারণ্যক উপনিষদে রয়েছে। প্রেততত্ত্ব বিষয়ক কিছু কিছু সংশয়ের সম্পূর্ণ নিরসন হয়নি। জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য এবং প্রবহন ও শ্বেতকেতুর সংলাপে আত্মতত্ত্ববিষয়ক সূক্ষ্ম ও বিশদ চিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে। বস্তুত বিভিন্ন উপনিষদে উত্থাপিত প্রশ্নগুলি বিশ্লেষণ ক'রে আমরা সেইযুগের প্রধান বৌদ্ধিক প্রক্রিয়ার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত হই ; মৃত্যু, মৃত্যুর পরে মানুষের ভাগ্য, বস্তুগত বিশ্বজগৎ ও মানুষের আপন আত্মার নিগূঢ় স্বভাব, মৃত্যুর পরে মানুষের কর্মের সঙ্গে তার ভাগ্যের সম্পর্ক এবং পুনর্জন্ম থেকে পরিত্রাণ ও চূড়ান্ত মুক্তিলাভের উপায়।

পুনর্জন্ম ও মুক্তি

ঋগ্বেদের মানুষের কাছে এই পৃথিবীর জীবন ছিল মধুর আশীর্বাদ, তাই একটি সমস্যামুক্ত সমৃদ্ধ জীবনকে মৃত্যুর পরেও সম্প্রসারিত ও দীর্ঘায়িত করাই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু উপনিষদে জীবন এমন অমঙ্গলে পরিণত যে, পার্থিব অস্তিত্বের পুনরাবৃত্তি এখন ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছে। ফলে, পুনর্জন্মকে অতিক্রম করাই ধর্মের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত—সম্ভবত এই মতবাদ প্রাগার্য তপস্বী সম্প্রদায়দের (যেমন—মুনি যতি ও শ্রমণ) মধ্যে উদ্ভূত হয়েছিল। তৎকালীন মানুষ জীবনের পুনরাবৃত্তি এবং মৃত্যুর পরে পুনরুদ্ভবের প্রক্রিয়া চন্দ্র, উদ্ভিদ ও জীবজগতের মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখেছিল ; কিন্তু মৃত্যুর পরে জীবনের উদ্ভব সম্পর্কে প্রবল বিশ্বাস থাকায় মানুষের কাছে তা অবিমিশ্র অভিশাপে পরিণত হয়েছিল। কঠোপনিষদে আছে ঃ 'মানুষ শস্যের মতো মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আবার শস্যের মতই পুনর্জন্ম গ্রহণ করে' (১ : ১ : ৬) প্রথম দিকে মৃত্যুর পুনরাবৃত্তি মানুষকে শঙ্কিত ক'রে তুলেছিল ; বিশেষভাবে পুনর্জন্মরূপ এই চূড়ান্ত অভিশাপটি নাস্তিক্যবাদীদের জন্য সংরক্ষিত ছিল, যারা বিশ্বাস করত যে, শুধুমাত্র এই পৃথিবীই বাস্তব এবং মৃত্যুর পরে আর কিছুই নেই। অর্থাৎ এটা ছিল সেই সময়, যখন প্রচলিত মতবাদ সম্পর্কে অবিশ্বাস খুব স্পষ্টভাবে মাথা তুলেছিল এবং তাই তাকে সর্বাধিক অকল্যাণপ্রদ যে পুনর্জন্ম তার দ্বারাই শাস্তি দিতে হ'ল। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না ক'রে যে ব্যক্তি মরে, পুনর্জন্ম তার নিশ্চিত ভবিতব্য এবং এরূপ ব্যক্তি মানুষ, ইতর প্রাণী কিংবা জড়পদার্থরূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে পারে (কঠ, ২ : ২ : ৭, ২ : ৩ : ৪) ; মুণ্ডক উপনিষদে কর্ম 'অদৃঢ় তরণী'রূপে বর্ণিত ; কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী ব্যক্তিদেব জন্যই পুনর্জন্ম সংরক্ষিত। পরবর্তী জন্মগুলিতে কোনো ব্যক্তির অবস্থান তার আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি ও কর্মের দ্বারা নির্ধারিত হয়। জীবজগতের জীবনের পুনর্নবায়ণ লক্ষ্য ক'রে যে তৎকালীন মানুষ এই ধরনের তত্ত্বে উপনীত হয়েছিল, তার ইঙ্গিত রয়েছে—আম, বট বা পিপুল গাছের উল্লেখে (মুণ্ডক ১ : ২ : ৯)।

তবুও পুনর্জন্ম লাভের এই সম্ভাবনাকে কখনো কাম্য মনে করা হয় নি, মানবজীবনে প্রধান আশঙ্কা রূপেই তা বিবেচিত হয়েছে, যে আশঙ্কা শুধু চূড়ান্ত মুক্তি অর্থাৎ মোক্ষ অর্জনের দ্বারা জয় করা সম্ভব। এই মুক্তির তিনটি স্তর রয়েছে ঃ পরীক্ষা নিরীক্ষার স্তরে তা হ'ল মৌলিক ঐক্যবোধের উপলব্ধি বা সকল বাস্তবতা যে-একে মিলিত হয়, সেই ব্রহ্ম এবং জীবাত্মার অন্তর্নিহিত সত্ত্বার একত্ব। এভাবে ব্যষ্টি মানুষের খণ্ডিত সত্ত্বার বোধ থেকে আসে মুক্তির সংকেত। পরলোক তত্ত্বের স্তরে উন্মোচিত অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা একটি দীর্ঘস্থায়ী ফল পাওয়া যায়—তা পুনর্জন্মের

শৃঙ্খল থেকে মানুষের মুক্তি। তৃতীয়ত, আধ্যাত্মিক স্তরে মুক্তি হ'ল অতীত কর্মের ও কর্মফলের বিলুপ্তিকর্মের ভয়াবহ ও অমোঘ কার্যকারণ-শৃঙ্খল থেকে মানুষের মুক্তি। তৃতীয়ত, আধ্যাত্মিক স্তরে মুক্তি হ'ল অতীত কর্মের ও কর্মফলের বিলুপ্তিকর্মের ভয়াবহ ও অমোঘ কার্যকারণ-শৃঙ্খল ও তার ফলাফলের উচ্ছেদসাধন। বিভিন্ন উপনিষদে বিশ্বে মৌলশক্তিকে বিশুদ্ধ, অমৃতস্বরূপ এবং জাগতিকতার স্পর্শরহিত ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। জ্ঞান ও বোধই বাস্তবতা সম্পর্কে মানুষকে প্রকৃত একত্ববোধের অন্তর্দৃষ্টি দিতে পারে—এই ভাবনা সর্বতোভাবে নতুন একটি ধর্মীয় মূল্যবোধের সূচনা করেছিল। কঠোপনিষদ্ মুক্তিলাভের প্রক্রিয়াকে বিশদভাবে বর্ণনা করেছে ; সেখানে বলা হয়েছে যে, আত্মা ইন্দ্রিয়াতীত আদি ও অন্তহীন, ও গভীর ও অনন্ত শান্তির আধার—আত্মাকে জানার পর মানুষ মৃত্যুর কবল থেকে নিস্তার পায় (১ : ৩ : ১৩ , ১৫ ; ২ : ১ : ১ ; ২ : ২ : ১৩)। কখনো বা এই আত্মাকে পুরুষরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, যাকে জানার ফলে মানুষ মুক্তি পায়, অমৃতত্ত্ব ও নিত্য আনন্দের লোকে উত্তীর্ণ হয়। প্রশ্নোপণিষদে যে 'প্রাণে'র উল্লেখ আছে, তাই আত্মতত্ত্বের প্রাথমিক স্তর। মুণ্ডক উপনিষদে বিশ্বজগতের সক্রিয় ও সৃষ্টিশীল শক্তিরূপে পুরুষকে ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম করে দেখা হয়েছে ; মুক্তির আনন্দময় অবস্থা এই উপনিষদে মনোজ্ঞ কাব্যিক পদ্ধতিতে অভিব্যক্ত হয়েছে। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদেও আমরা এই ভাবনার অনুবৃত্তি লক্ষ্য করি ; সেখানে শিব-বিষয়ক জ্ঞান মুক্তিপ্রদ ও বিশুদ্ধ চৈতন্যের অভিব্যক্তিরূপে বর্ণিত। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞান এবং আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্যবোধই যে মুক্তি তা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। সেখানে যজ্ঞের অতীন্দ্রিয় রূপক ব্যাখ্যাকে অনুষ্ঠান-কেন্দ্রিক বিশ্বাস ও অধ্যাত্মবিদ্যার মধ্যবর্তী অস্থায়ী সেতুরূপে যেমন ব্যবহার করা হয়েছে, তেমনি প্রাচীনতর প্রত্নকথাগুলির তাৎপর্য আমূল পরিবর্তিত হয়ে পড়েছে। সংহিতা যুগ থেকে উপনিষদের যুগে বিবর্তিত হওয়ার পথে ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরীণ গঠন এমন ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল যে দার্শনিক ভাবনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন সমস্যাসংকুল জটিলতা দেখা দিল, তাই বৃহদারণ্যক উপনিষদের বিশ্ববীক্ষায় ব্রহ্মবিদ জ্ঞানী নিজেকে ব্রহ্ম বলে উপলব্ধি করেন, পুনর্জন্মের হেতু সকল বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে মরণশীল মানুষ তখন অমরত্ব ও ব্রহ্মত্ব লাভ করে (৪ : ৪ : ৭)। বস্তু ও মন, দেহ ও আত্মার মধ্যে বিচ্ছেদের ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষে ভাববাদী দর্শনের প্রথম পদক্ষেপ। যদিও এটাই একমাত্র আধ্যাত্মিক পদ্ধতি নয়, তবুও একে আমরা তৎকালীন চিন্তাজগতে বিশিষ্ট একটি প্রবণতারূপে গ্রহণ করতে পারি। অধিকতর বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দর্শন-প্রস্থানের অস্তিত্ব থাকলেও (উপনিষদে উদ্দালকের ভূমিকা ও ভাবাদর্শে তার পরিচয়ও আছে) এদের অতি সামান্য নিদর্শন আমাদের হাতে পৌঁছতে পেরেছে।

শুধু যে মূল তত্ত্ব-সন্ধানের ক্ষেত্রে উপনিষদের যুগে সার্বিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল তাই নয় ; জীবন-সম্পর্কিত চূড়ান্ত দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রেও যে স্পষ্ট ও দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল তারই ফলে উপাসনা-পদ্ধতির ক্ষেত্রেও অভিনব দিক পরিবর্তন অভিব্যক্ত হয়েছে। সর্বাপেক্ষা মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল পার্থিব অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যা এই পর্যায়ে মানবজীবন অবিমিশ্র মন্দ ও দুঃখময়, ও পূর্ববর্তী জন্মের পাপের শাস্তিরূপে পরিগণিত হয়েছে। ইতোমধ্যে তৎকালীন সমাজে দুটি মতবাদ বিশেষভাবে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল ঃ জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদ যা পরবর্তী জন্মে মানুষের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই দুটি মতবাদ একত্রে পার্থিব অস্তিত্বের সামগ্রিক তাৎপর্যকেই আমূল পরিবর্তিত করেছিল ; উপনিষদে মানবজীবন একটি অনন্ত কার্যকারণ-শৃঙ্খলে পরিণত হয়েছিল, কারণ এই জন্মের প্রত্যেকটি কাজের সমপরিমাণ ও সমানুপাতিক ফল যে পরবর্তী জন্মে ভোগ করতে হয়—এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। ফলে, অস্তিত্বের দ্যোতনা অনন্ত হয়ে উঠল। উপনিষদ্ যুগ শুরু হওয়ার পূর্বে এবং পরেও বহু তত্ত্বজ্ঞানী আবির্ভূত হয়েছিলেন, যাঁরা কার্যকারণ নিয়মের অমোঘতা ঘোষণা ক'রে জন্ম-শৃঙ্খলের আপাত-অবিনাশী স্বরূপকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। মানুষের চূড়ান্ত ভাগ্য সম্পর্কে তিক্ত বিদ্রূপ, নৈরাশ্যবাদ ও সংশয়ী মনোভাব এই চিন্তাধারার অধিকাংশ প্রবক্তাদের মধ্যেই পবিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।

বস্তুত এযুগের প্রায় প্রত্যেকটি চিন্তাধারার ক্ষেত্রে বুদ্ধির বিপুল দ্বন্দ্বজনিত অভিঘাত দার্শনিক ভাবনার তত্ত্বের উদ্দেশ্যবাদী ও স্বরূপবাদী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নানা সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। তিনটি প্রধান দার্শনিক ধারা—জৈন, বৌদ্ধ ও উপনিষদীয়—এসব সমস্যার তিনটি ভিন্ন সমাধান তুলে ধরেছিল। উপনিষদের মধ্যে প্রচলিত যজ্ঞ-সমূহের পুনর্বিশ্লেষণ, অতীন্দ্রিয়বাদী ভাবনার উপাদান এবং সন্ন্যাসী সম্প্রদায়গুলিকে বিভিন্নভাবে আত্মসাৎ ক'রে নেবার প্রবণতার ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রধান শত্রুপক্ষের আক্রমণ বিশেষভাবে প্রতিহত হ'ল। সংহিতা ও ব্রাহ্মণের ধর্মের চরিত্র অনেকাংশে পরিবর্তিত ক'রে দিয়েছিল। পরিবর্তনের মধ্যেও যে নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষিত হ'ল, তারই ফলে প্রতিবাদী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়গুলির প্রভাব অনেকাংশে বিলুপ্ত হ'ল এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের নতুন রূপ ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করল। তবে, সাধারণভাবে জীবন নানাবিধ দুঃখ, হতাশা, ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু দ্বারা আকীর্ণ হওয়ায় অমঙ্গল রূপেই পরিগণিত এবং সেজন্য তার অবসান কাম্য ঃ এই বিশ্বাস সে যুগের সমস্ত দর্শন প্রস্থানের দ্বারা সাধারণভাবে গৃহীত হয়েছিল। তবে, বৌদ্ধধর্ম যেখানে সচেতন অস্তিত্বের মৌলিক বিনাশকে ঈপ্সিত মনে করেছে, জৈনধর্ম বিশ্বজগতের শীর্ষ-বিন্দুতে

উন্নীত হওয়ার জন্য কর্ম থেকে আত্মার স্বাধীন অবস্থানের তত্ত্ব প্রচার করেছে। অন্যদিকে উপনিষদ্‌গুলিতে অধিকতর ইতিবাচক লক্ষ্য স্থাপিত হয়েছে—পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার একাত্মতা, যার মৌল স্বরূপ হ'ল অস্তিত্ব চৈতন্য, ও আনন্দ। তৎকালীন সাধকের কাছে সার্বিক ধ্বংসের চেয়ে এই একাত্মবোধ অধিকতর আকর্ষণীয় তত্ত্বরূপে প্রতিভাত হয়েছে ; ব্রাহ্মণ্যধর্মের চূড়ান্ত বিজয় ও অন্যদুটি ধর্মচর্যা অপেক্ষা দীর্ঘতর পরমায়ু ও অধিক প্রাধান্য লাভের এটা একটা বড় কারণ। জীবনের পুনরাবৃত্তির শৃঙ্খল মোচন ক'রে চৈতন্যময় আনন্দময় সত্ত্বা অর্থাৎ বিশ্বজগতের অন্তরতম আত্মার সঙ্গে সম্মিলিত হওয়াই জীবনের লক্ষ্যরূপে এতে গৃহীত হয়েছে। ঈশ, কেন ও কঠ উপনিষদে নতুন ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে জীবনের নতুন লক্ষ্য বিশ্লেষিত হয়েছে (ঈশ ৭ ; কেন ৪ : ৬ ; কঠ ১ : ২৭ : ২৮ ; ১ : ২ : ২) কর্মকাণ্ড ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতিগুলি এই পর্যায়ে হীনতর ব'লে বিবেচিত, ত্যাগ ও মুক্তি উন্নতরূপে প্রশংসিত। পূর্ববর্তী পর্যায়ের ধর্মীয় বিশ্ববীক্ষা অনুযায়ী যজ্ঞ, ধন-ক্রিয়া, সর্ববিধ ঐহিক সুখ, দীর্ঘ জীবন ও স্বর্গ অর্জনের জন্য প্রযুক্ত হ'ত। উপনিষদের পর্যায়ে স্পষ্ট ঘোষিত হ'ল যে স্বরূপকে কখনো অস্থায়ী পার্থিব বস্তুদ্বারা অর্জন করা সম্ভব নয় (কঠ ১ : ২ : ২০)। সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ ক'রে ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম বোধ করাই প্রকৃত লক্ষ্যরূপে এখানে বিবেচিত হয়েছে। প্রশ্নোপণিষদের বিখ্যাত কাহিনীটিতে পিপ্পলাদ ঋষি জিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণদের তপঃ ব্রহ্মচর্য ও শ্রদ্ধা আচরণের উপদেশ দিয়েছিলেন (২ : ২)। প্রাথমিক স্তরে শ্রদ্ধার চরিত্রে যেন একটি ঐন্দ্রজালিক শুদ্ধতা নিহিত ছিল, কিন্তু ক্রমশ বিবর্তিত হয়ে উপনিষদে তা নৈতিক চরিত্র অর্জন করে। পিপ্পলাদের উপদেশ নতুন মূল্যবোধ এবং চরম আত্মোপলব্ধির উদ্দেশ্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিতবহ। লক্ষণীয় যে, পিপ্পলাদের উপদেশে যজ্ঞানুষ্ঠান উল্লিখিত হয়নি, অর্থাৎ কর্মকাণ্ড ইতোমধ্যে অনুপযোগী ব'লে প্রতিপন্ন হয়েছে এবং ধর্মীয় জীবনের লক্ষ্যও ভিন্ন হয়ে পড়েছে। তাই দেবতারা আর পূর্বের মতো প্রাচুর্য, সুখ ও দীর্ঘজীবনের তাবৎ পার্থিব আনন্দের বিধানকর্তা নন, তাঁরা এখন জীবন থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করেন। এই উপনিষদে আরো লক্ষ্য করা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞানও বহুস্তরে বিন্যস্ত, তাই উচ্চতর উপলব্ধির জন্য একনিষ্ঠ আলোচনা ও তত্ত্বোপলব্ধি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। সমাজে পুরোহিত অপেক্ষা জ্ঞানের উপদেষ্টা আচার্যের মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মুণ্ডক উপনিষদেও যজ্ঞকে ক্ষয়শীলরূপে বর্ণনা ক'রে বলা হয়েছে যে, তা কখনও অবিনাশী মুক্তির সন্ধান দিতে পারে না।

মুণ্ডক উপনিষদে শৌনক অঙ্গিরাকে যে প্রশ্ন করেছেন, তাতে দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন দিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত রয়েছে (১ : ২ : ১-৭)। জীবনের নতুন লক্ষ্য অনুযায়ী ব্রহ্মবিদ স্বয়ং ব্রহ্ম হয়ে ওঠেন—দুঃখ ও পাপের সীমা অতিক্রম ক'রে তিনি

আসক্তি ও অজ্ঞতার অদৃশ্য বন্ধন ছিন্ন ক'রে অমরত্ব লাভ করেন (৩ : ২ : ৯)। অনুরূপভাবে তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য ও শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে এই যুগের নূতন চিন্তাধারার চূড়ান্ত ভাবাদর্শ বিবৃত হয়েছে। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে যোগ-প্রনোদিত সংযমের মাধ্যমে ঈপ্সিত ব্রহ্ম-সান্নিধ্য লাভের চিন্তার ফলে মায়া-মোহ দূরীভূত হয়। এই উপনিষদে দৈব অনুগ্রহ-লাভের যে প্রভাব বর্ণিত হয়েছে (৩ : ২০), তা একটি নূতন ভাবধারার সূচনা করে।

পাপ সম্পর্কে উদ্বেগ এবং পাপমোচনের আকাঙ্ক্ষা এই যুগের একটি নূতন চরিত্র-লক্ষণ, কারণ, আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রাধান্যের সময় পাপ নিতান্ত অনুষ্ঠানগত ত্রুটি-বিচ্যুতির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। পাপ ও দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপর উপনিষদে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মবিদ পাপকে জয় করেন ; পাপ, ত্রিগুণ ও সংশয় থেকে মুক্ত হয়েই তিনি যথার্থ ব্রাহ্মণ হয়ে ওঠেন (৪ : ৪ : ২৩)। এই বক্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা পূর্বে ব্রাহ্মণত্ব শুধু জন্ম ও আচরণ দ্বারা নির্ধারিত হ'ত ; কিন্তু এই পর্যায়ে এই প্রথম ব্রহ্মণত্বের নির্ণায়করূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই ধারণা ধর্মশাস্ত্রের অন্তিম পর্যায় পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও ব্রহ্মবিদ ব্যক্তিকে বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে (১ : ৪ : ৮, ৪ : ৪ : ১২ ইত্যাদি)। ব্রহ্মবিদ বহু পার্থিব সুখ উপভোগের পর মৃত্যুর পরে ব্রহ্মে লীন হন।

এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হল বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৪ : ৪ : ২২ অংশটি। "ব্রাহ্মণেরা প্রাত্যহিক স্বাধ্যায়, যজ্ঞ, দান, তপঃ এবং নিষ্কামভাবে জীবনযাপনের দ্বারা, এই (ব্রহ্ম)কে লাভ করতে প্রয়াসী। এই (ব্রহ্ম)কে জেনে মানুষ মুনি হয়, সন্ন্যাসীরা এই পদপ্রাপ্তির আশায় গৃহত্যাগ করে। এই (সন্ন্যাস) এমন ছিল কারণ পূর্বকাল ব্রহ্মবিদরা বংশবিস্তার চাইতেন না, তাঁরা মনে করতেন 'আমরা যাঁরা আত্মা-কে একমাত্র লভ্যবস্তু জ্ঞান করি, বংশবিস্তারে আমাদের কী হবে?' পুত্র, ধন ও (ইহ এবং পরলোকে) উচ্চস্থানের লোভ পরিহার করে' তাঁরা সন্ন্যাস গ্রহণ করতেন।" এখানে একটি প্রবণতা লক্ষ্য করি (১) বেদনির্দিষ্ট জীবনধারাকে সন্ন্যাসজীবনের অন্তর্ভুক্ত করে ব্যাখ্যা (২) ব্রাহ্মণ্যধর্মকে যজ্ঞসীমার বাইরে এনে অবৈদিক ধর্মাচারকে স্বীকৃতি দেওয়া (৩) প্রাগ্বৈদিক ঋষিদের সম্পর্কে বিদ্বেষ পরিহার করে 'মুনি'র সংজ্ঞাকে বিস্তৃতিদান। আপাত-অসমঞ্জস জীবনধারাগুলিকে সামঞ্জস্যদান এই উপনিষদ্‌টির একটি উদ্দেশ্য, ধর্মাচরণের জীবনীশক্তির প্রাবল্য এতে ঘোষিত হয়। এবং এ প্রয়াস সার্থকও হয় : সাধারণ মানুষ, উৎসব সমারোহ প্রতি যাদের প্রবণতা, ক্রিয়াকাণ্ডে যাদের মন আশ্রিত তাদের কাছে যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানকে রূপকে পরিবেশন করে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। তাদের বলা হল যজ্ঞকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে,

তার বস্তুগত দিকটির আত্মস্থ করে, রূপকায়িত আধ্যাত্মিকতার উন্নীত করতে বলা হল। মুনিদেরও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত করার ফলে বিপক্ষের প্রত্যাহ্বানের শাণিত শক্তিকে ক্ষীণ করে দেওয়া হল। বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসকে 'আশ্রম'-বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করে ব্রাহ্মণ্যধর্মী জয়ী হল, তার পরমায়ু বৃদ্ধি হল। পুরাতনের সঙ্গে নূতনের সীমা নির্ণীত হল যাজ্ঞবল্ক্যের সেই বিখ্যাত উক্তিতে, "গার্গি, সেই অক্ষয়কে না জেনে যে পৃথিবী ত্যাগ করে যে কৃপার পাত্র, তাকে জেনে যে এই পৃথিবী থেকে প্রস্থান করে সে-ই ব্রাহ্মণ" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৩ : ৮ : ১০) ব্রাহ্মণের এই নূতন সংজ্ঞা ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে সমাজের সঞ্চিত শ্রদ্ধাকে নূতন এক তাৎপর্যে মণ্ডিত করে, চিন্তাজগতে নূতন এক দিকনির্দেশ সূচিত করে।

কাব্য

সমস্ত উপনিষদ্ সাহিত্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু জ্ঞানগর্ভ ও উপলব্ধি-ঋদ্ধ শ্লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এগুলি সম্ভবত বহু প্রাচীন লোকসাহিত্যের সিন্ধুতরঙ্গে আবর্তিত একটি অমূল্য কাব্যসঞ্চয়। সাধারণ গদ্যধর্মী সাহিত্যে সন্নিহিত এই গাথাগুলিই সহসা অসামান্য সৌন্দর্যের সন্ধান দেয়। এ ধরনের রচনার প্রথম সাক্ষাৎ আমরা ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে পেয়েছি, যা সাধারণভাবে গদ্যময় ও নিষ্প্রাণ রচনাকে আকস্মিকভাবে প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধু অন্তর্লীন উপলব্ধি-জনিত দীপ্তি ও সৌন্দর্যে উন্নততর অভিব্যক্তিতে রূপান্তরিত করেছে। এ ধরনের গাথা বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের মতো বৌদ্ধ, জৈন এবং অন্যান্য যতি-সাহিত্যকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। এই যুগের শেষ পর্যায়ে রচিত মহাভারতে এধরনের অসংখ্য নৈতিক ও উপলব্ধি-সমৃদ্ধ শ্লোকে প্রভূত সৌন্দর্য ও শক্তির পরিচয় নিহিত রয়েছে।

উপনিষদের মর্মবাণী যে এত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে, তার কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে উন্নততম চিন্তা ও উপলব্ধি কাব্যের মাধ্যমে উপস্থাপিত। উপমার বহুল ব্যবহারের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি যে, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে চিত্র-কল্পগুলি আহৃত হওয়ায় অত্যন্ত সার্থকভাবে তা জিজ্ঞাসুর মনকে আন্দোলিত করে। প্রকৃতপক্ষে চিত্রকল্পের এ-জাতীয় প্রয়োগ নব্য মতপ্রচারে অপরিহার্য। উপনিষদের ঋষিরা যে বক্তব্য তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, তা এত অভিনব এবং চিরাগত অভিজ্ঞতার তুলনায় এত স্বতন্ত্র ও দুর্জ্ঞেয় আধ্যাত্মিক উপলব্ধিমণ্ডিত যে কেবলমাত্র পরিচিত পৃথিবীর বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে তুলনা করেই অন্তর্নিহিত ভাবকে পরিস্ফুট করা সম্ভব ছিল (যেমন কঠ ২ : ১ : ১৪ ; মুণ্ডক ৩ : ২ : ৮ ; ছান্দোগ্য ৪ : ১৪ : ৩, বৃহদারণ্যক ১ : ৪ : ৭ ; শ্বেতাশ্বেতর ১ : ১৩ ইত্যাদি)।

বিশেষভাবে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে আহৃত উপমাগুলি গভীর সত্যের বাহন (ছান্দোগ্য ৬ : ৮ : ২, বৃহদারণ্যক ২ : ৫ : ১৫ ; ৪ : ৩ : ২১ ; ৪ : ৪ : ৩ : ৪ : ৭)। এই উপমাগুলির সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, আপাত-তুচ্ছ সর্বজন পরিচিত দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার উপকরণে সাহায্যে ঋষি কবি সম্পূর্ণ নতুন ও অপরিচিত আধ্যাত্মিক ভাবনাকে পরিস্ফুট ক'রে তুলেছেন। এদিক দিয়ে উপনিষদের চিত্রকল্প সংহিতা যুগের অলঙ্করণের তুলনায় স্বরূপত ভিন্ন। আবার, রূপক প্রয়োগের মাধ্যমে অভিজ্ঞতার গভীরতর বিস্তার ঘটানো হয়েছে ; উপনিষদের কবি চৈতন্যের গভীরতর স্তরে অবগাহন ক'রে দুটি পরস্পর ভিন্ন বস্তুর মধ্যবর্তী ব্যবধানকে যেন বিলুপ্ত ক'রে দিয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এধরনের অভিব্যক্তি চরিত্রগতভাবে অতীন্দ্রিয় প্রবণতাযুক্ত (যেমন মুণ্ডক ৩ : ২ : ১ ; তৈত্তিরীয় ২ : ৭ : ৮ : ১ ; ছান্দোগ্য ৩ : ১৫ : ১ ; বৃহদারণ্যক ২ : ৪ : ১০ ; প্রশ্ন ২ : ৯ ইত্যাদি)। তবে, উপনিষদের সর্বোত্তম কাব্যিক অভিব্যক্তি কোনও অলঙ্কার প্রয়োগের মাধ্যমে ঘটেনি, অভিজ্ঞতার অব্যবহিত প্রত্যক্ষ উপস্থাপনার দ্বারাই ঘটেছে। (যেমন—বৃহদারণ্যক ২ : ৫ : ১ ; ছান্দোগ্য ৩ : ১ : ১ ; ঈশ ১৬ ; তৈত্তিরীয় ২ : ৪, ৯ ; শ্বেতাশ্বেতর ৩ : ৯ ইত্যাদি)। বস্তুত, বিমূর্ত আধ্যাত্মিক ও নীরস বর্ণনাও অনুভূতির স্পর্শে নতুন কাব্যিক মাত্রা অর্জন করেছে। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে বিশ্বাত্মা রূপী পুরুষকে কখনো অনন্ত অশ্বত্থবৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে (২ : ৩ : ১) কখনো বা সীমাহীন আকাশের সঙ্গে একাত্ম ক'রে দেখানো হয়েছে। তেমনি উপনিষদের কবির কালচেতনা (শ্বেতাশ্বেতর ৬ : ১) কিংবা অপরিমেয় ব্রহ্মের বর্ণনা (বৃহদারণ্যক ৩ : ৭ : ৩) আমাদের মুগ্ধ ও চমৎকৃত করে। অনুরূপভাবে আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্যবোধ যেভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে, তা অসামান্য কাব্যিক গভীরতায় মণ্ডিত (তৈত্তিরীয় ১ : ১০)। এই উপনিষদেই কাব্যিক প্রকাশ ও অন্তর্গূঢ় সৌন্দর্যবোধ লালিত 'রসে'র এর কবিত্বপূর্ণ উল্লেখ রয়েছে (২ : ৭)।

এটা সত্য যে, ঋগ্বেদ-সংহিতাতেও উন্নত কাব্যের বিদ্যুৎ-চমক ছিল ; অনুরূপ উন্নত কাব্যিক অভিব্যক্তি বেশকিছু অথর্ববেদীয় মন্ত্রেও রয়েছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ ও শক্তিশালী কাব্যিক অন্তর্দৃষ্টি এবং সজীব সরল ও দৃপ্ত অলঙ্করণের সাহায্যে উপনিষদের কাব্যগুণ পূর্ববর্তী যুগের সমস্ত সাহিত্যকে অতিক্রম করেছে। গভীরতা, ব্যাপ্তি ও অভিজ্ঞতার উজ্জ্বল প্রকাশের দ্বারা এবং সামান্যমাত্র কলাকৃতির সাহায্যে উপনিষদ্ পাঠকচিত্তকে অভিভূত করে। যে অসামান্য প্রত্যক্ষভাষা ও রচনাশৈলীর মধ্য দিয়ে উপনিষদে উপলব্ধির চমৎকৃতি অভিব্যক্ত হয়েছে, তা সংস্কৃত-ভাষা পূর্বে বা পরে আর কখনো পায়নি।

ঋগ্বেদের শেষ অংশ এবং অথর্ববেদ—এই উভয়েই রচনা কালের দিক দিয়ে প্রাচীনতর উপনিষদ্‌গুলির সমকালীন, ফলে কাব্যাংশে তাদের মধ্যেও একধরনের প্রত্যক্ষতা, শক্তি, ঋজুতা ও সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। মহাভারতের শ্রেষ্ঠ কাব্যাংশ বাদ দিলে এরা নিত্যগুণে ভাস্কর এবং সর্বপ্রথম ভারতীয় সাহিত্যে রচনাশৈলীর ঋজু ও বিদ্যুৎতুল্য উজ্জ্বলতার প্রবর্তক। বস্তুত, এই রচনাশৈলী নূতন এক অভিজ্ঞতার ফল, কারণ উপনিষদের ঋষিরা জীবনের মৌলিক তাৎপর্য সন্ধানের জন্য সমকালীন জীবনের গভীরে অবগাহন করেছিলেন। এই প্রক্রিয়ায় সঙ্গে যথেষ্ট উদ্বেগ জড়িত ছিল, কেননা লোকপ্রিয় বিশ্বাস ও চিন্তাধারাকে এ জন্য তাঁদের প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছিল। কবিরা আত্মানুসন্ধানের আত্যন্তিক প্রয়োজনে এবং নূতন আলো ও উপলব্ধির অব্যবহিত প্রকাশের জন্য নূতন বাগ্‌ভঙ্গী নির্মাণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, যেহেতু প্রাচীনতর ভাষা তাদের অভিনব আত্মিক উপলব্ধি প্রকাশের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। অভিজ্ঞতার তীব্রতার ফলে তাঁরা নূতন বাক্‌কৌশল ও সজীব চিত্রকল্প প্রণয়নে মনোনিবেশ ক'রে সম্পূর্ণ নূতন ধরনের এক কাব্য সৃষ্টি করলেন। উপনিষদের কাব্যকলায় নিহিত শক্তি ও সজীবতা যে আমাদের আন্দোলিত করে, তার উৎস হ'ল বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে উদ্ভূত যুগন্ধর নব্য চিন্তাধারার অপরিমেয় গভীরতা, আন্তরিকতা ও জীবনের তাৎপর্য অন্বেষণের তীব্র যন্ত্রণা।

অষ্টম অধ্যায়

বেদাঙ্গসূত্র

উপনিষদ্‌গুলি যেমন নিছক আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে বিচ্ছেদের যুগ সূচনা করে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যের সঙ্গে নিশ্চিত পার্থক্য এবং পরবর্তী নূতন দার্শনিক সন্ধানের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল, তেমনি উপনিষদের উত্তরসূরী বেদাঙ্গগুলিও পূর্ববর্তী যুগের সমগ্র ধর্মীয় সাহিত্যের সঙ্গে অপর একটি বিপুল বিচ্ছেদ সূচনা করেছিল। উপনিষদগুলির মত এই ছেদ সার্বভৌম নয় কেননা অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। তবে বেদাঙ্গ—বা বিশিষ্ট আঙ্গিকের জন্য 'সূত্র'রূপে অভিহিত- -সাহিত্যধারার ক্ষেত্রে এই ছেদ অনেক বেশি মৌলিক, কারণ সূত্র-সাহিত্য অপৌরুষের নয়, মানুষের রচিত সাহিত্য-রূপেই এগুলি স্পষ্ট স্বীকৃতি পেয়েছে। বেদাধ্যয়নে সহায়ক রচনারূপে বেদাঙ্গের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ষড়বিংশ ব্রাহ্মণে।

প্রধান বেদাঙ্গগুলি মোট ছয় ধরনের ঃ ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত, শিক্ষা, জ্যোতিষ ও কল্প। কল্পসূত্রগুলি আবার চারভাগে বিন্যস্ত—শ্রৌত, গৃহ্য, ধর্ম ও শুল্ব। বেদাঙ্গকে অবশ্য কার্যকরীভাবে আমরা দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করতে পারি ঃ—(ক) ধর্মসংক্রান্ত—এর মধ্যে শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্মসূত্রকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং (খ) পার্থিব-এর মধ্যে রয়েছে শুল্বসূত্র, শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ ও নিরুক্ত। এছাড়াও আমরা কয়েকটি সহায়ক রচনাধারার উল্লেখ করতে পারি—প্রায়শ্চিত্ত, পরিশিষ্ট, শ্রাদ্ধকল্প ইত্যাদি।

রচনাকাল

সূত্রগুলির আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে গবেষকরা এই সাহিত্যের অধিকাংশ রচনাকে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম থেকে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের মধ্যে রচিত বলে নির্দেশ করে থাকেন। সূত্র রচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ গোষ্ঠীর নামের সঙ্গে 'অয়ন' এই অন্ত্য প্রত্যয়টি যুক্ত রয়েছে—যেমন আশ্বলায়ন, বৌধায়ন ইত্যাদি। বিখ্যাত ভারততাত্ত্বিক হেবার মনে করেন, এটা থেকে আমরা প্রতিষ্ঠিত রচয়িতা গোষ্ঠীগুলির সময় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করতে পারি। খ্রিস্টপূর্ব যুগের শেষ দুটি শতাব্দী এবং খ্রিস্টীয় প্রথম দুটি শতাব্দীকে বিদেশী প্রভাব আত্মীকরণের এবং এদের সঙ্গে আদিম

জনগোষ্ঠীর ধর্মমতের সমন্বয় ও সংশ্লেষনের মাধ্যমে নূতন ধর্মীয় আন্দোলন সৃষ্টি করার পক্ষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়রূপে চিহ্নিত করা যায়।

তাই সূত্র-রচনার যুগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যে বুদ্ধপরবর্তী যুগে সূত্রধারার সাহিত্য রচিত হয়েছিল, যজ্ঞনিষ্ঠ ধর্ম তখন কঠোর প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন। রূঢ় আঘাতের ফলে বৈদিক ধর্মের প্রাচীন রূপ আর কখনও প্রাক্তন গৌরব অধিষ্ঠিত হতে পারেনি। এই যুগটি ছিল বহু বৈদেশিক আক্রমণেরও কাল ; খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে আলেকজান্ডারের আক্রমণের পর থেকে উত্তর ভারত একাদিক্রমে শক, কুষাণ, হূন ও অন্যান্য গোষ্ঠীদ্বারা বহুবার আক্রান্ত হয়েছিল। এইযুগে উত্তর ভারতে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সাম্রাজ্য অর্থাৎ মৌর্য বংশের অভ্যুত্থান ঘটে। প্রকৃতপক্ষে এসময়েই আমরা প্রাগৈতিহাসিক স্তর অতিক্রম করে মৌর্য সম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক পর্যায়ে প্রবেশ করেছি। এটা ঘটেছিল প্রধান উপনিষদ্‌গুলি রচিত হওয়ার শেষ পর্যায়ে প্রবেশ করেছি। এটা ঘটেছিল প্রধান উপনিষদ্‌গুলি রচিত হওয়ার শেষ পর্যায়ে যখন বেদাঙ্গযুগের প্রাচীনতর পর্যায়েরও সূত্রপাত ; এই যুগে ভারতবর্ষ গ্রিস, রোম, মধ্যপ্রাচ্য, চীন ও দূরপ্রাচ্যের সঙ্গে সমৃদ্ধিপূর্ণ বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করেছিল এবং ফলে দূরবর্তী দেশগুলি থেকে বাণিজ্যিক সামগ্রীর সঙ্গে সঙ্গে নূতন ও অপরিচিত ভাবাদর্শ, আচার ব্যবহার, অনুষ্ঠান ও বিশ্বাস, দেশের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছিল। পাটলিপুত্র ও কৌশাম্বীর মত সমৃদ্ধিশালী নগরীর উত্থান সাধারণ আর্থিক প্রাচুর্যের প্রমাণ বহন করে, অন্ততপক্ষে বণিকশ্রেণী এবং শাসকগোষ্ঠী অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও পুরোহিতদের সমৃদ্ধি যে বিশেষ মাত্রা অর্জন করেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। প্রাচীন বৌদ্ধ রচনাসমূহে এই অভ্রান্ত তথ্য প্রকাশিত হয়েছে যে সেযুগে দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত এবং বাণিজ্যিক আদানপ্রদানের ফলে লাভের প্রভাবে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির উদ্ভব হয়েছিল। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম এবং অন্যান্য প্রতিবাদী গোষ্ঠীর উত্থানের ফলে যজ্ঞনিষ্ঠ ধর্মের ভিত্তিমূল চূড়ান্তভাবে শিথিল হওয়ার পূর্বে পুরোহিতশ্রেণী যজ্ঞপরায়ণে গোষ্ঠীর মধ্যে জাগতিক উন্নতির শিখরে আরোহন করেছিলেন।

শিল্পকলা সেসময় এমনভাবে বিকাশলাভ করে যা পূর্বে দেখা যায়নি : ভাস্কর্যে গান্ধার ও মথুরা রীতি (লক্ষণীয় যে এই দুটি অঞ্চল তৎকালীন বাণিজ্যপথের দুই প্রান্তে অবস্থিত) এবং স্থাপত্যে সাঁচি ও ভারহুত রীতির উত্থান এযুগেই ঘটেছিল। প্রচুর সংখ্যক শিলালিপি ও মুদ্রার প্রচলন হওয়াতে শিল্প-প্রচেষ্টার বহু নিদর্শন আমরা পেয়েছি। এযুগের সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যকর্মের সাক্ষ্য থেকে এই তথ্য পরিস্ফুট হয়েছে যে গণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও চিকিৎসাবিদ্যা সেসময় গভীরভাবে অনুশীলিত হত। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এইযুগে যেমন বহু বৌদ্ধ ও জৈন

ধর্মমত বিধিবদ্ধ হয়েছিল, তেমনি ভারতবর্ষে, দুই শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য মহাভারত এবং রামায়ণ এ-যুগেই রচিত হয়। তাছাড়া ভাসের নাটকগুলি এবং অশ্বঘোষের রচনাবলীও এযুগে প্রণীত হয়ে সাহিত্যের রচনাশৈলী ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে প্রধান দিকপরিবর্তনের সূচনা করে—এদের মধ্যে আমরা পরিণত ধ্রূপদী শৈলীর সাহিত্য-সৃষ্টির নিদর্শন দেখতে পাই। 'ললিতবিস্তর' এবং কিছু পরবর্তীকালের 'বুদ্ধরচিত', এ গ্রন্থদুটি একটি নূতন সাহিত্য-ধারার সূত্রপাত করে—লোকত্রাতা দেবতার জীবন-কাহিনী পরবর্তী যুগে একটি নূতন ধর্মীয় সাহিত্যের শ্রেণী পরিচয় আমাদের নিকট পরিস্ফুট করে তোলে। এই শ্রেণীর বিশেষ অভিব্যক্তি দেখা যায় পুরাণ সাহিত্যে—যেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনও নির্দিষ্ট ধর্মচর্যা বা সম্প্রদায়ের বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে কোনও অবতার বা দেবতার জীবন ও কীর্তি কাহিনী চিত্রিত হয়েছে।

এইযুগের ব্রাহ্মণ্যধর্মে আমরা লোকায়ত ধর্মের সঙ্গে অনেক বেশিমাত্রায় ও অধিকতর মৌলিক ক্ষেত্রে সমঝোতার একটি প্রক্রিয়া লক্ষ করি। দীর্ঘকাল থেকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের উপর চাপ অব্যাহত ছিল। এমনকি আর্যরা যখন তাদের অপরিশীলিত ও প্রাথমিক যজ্ঞগুলি নিয়ে এদেশে এসেছিল, তখন বিবিধ প্রচলিত উপাসনা-পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ধীরে-ধীরে গ্রহণ করতে হয়েছিল। তাই ঋগ্বেদেও আমরা ইন্দ্র কর্তৃক শালাবৃকদের কাছে যতিদের সমর্পণ করাব বৃত্তান্ত, মুনিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং মৃত বৈখানসদের পুনরুজ্জীবনের কাহিনী পাই। বিভিন্ন তপস্বী সম্প্রদায়রূপে এইসব গোষ্ঠী পরবর্তী যুগে আত্মপ্রকাশ করে এবং ফলে দেশীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীধর্মের দ্বারা আর্য উপাসনা পদ্ধতি সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও সংঘর্ষময় হয়ে ওঠে কেননা সেসময় এধরনের বহু ধর্মগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দের বিপুলসংখ্যক অনুগামী ছিল। এরা যজ্ঞধর্মের মৌলিক আদর্শগুলিকে এমনভাবে প্রত্যাহ্বান জানিয়েছিল যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সত্যিই যুগান্তরে উপনীত হয়ে সার্বিক বিলুপ্তির আশঙ্কার মুখোমুখী হল। পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে আরণ্যকগুলি আধ্যাত্মিক ও অধ্যাত্মবাদী প্রতীকায়নের সাহায্যে যজ্ঞানুষ্ঠানগুলির পুনর্বিশ্লেষণ করে, ব্রাহ্মণ্যধর্মের আয়ুষ্কালকে দীর্ঘতর করতে চেয়েছিল। এতে যে নূতন পথ উন্মুক্ত হল, সেদিকে অগ্রসর হয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম আরও কিছুকাল বেঁচে থাকল বটে—কিন্তু এরই মধ্যে যজ্ঞের মৃত্যুনির্দেশ উত্থান ও প্রাচীনতর পুরাণসাহিত্যের উদ্ভবের মধ্যবর্তী সময়টা ছিল অচলাবস্থা, অবক্ষয় ও ক্রমাবলুপ্তির যুগ। অবশ্য যজ্ঞ তখনও অনুষ্ঠিত হচ্ছিল কেননা রাজারা ও রাজন্যরা তখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করার মত সমৃদ্ধিশালী ছিল ; যদিও অনষ্ঠান ততদিনে তার জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

এই শতাব্দীগুলিতে যজ্ঞ আরও কৃত্রিম, যান্ত্রিক হয়ে উঠেছিল, এবং উত্তর ভারতের সর্বত্র উদ্ভূত অসংখ্য নগররাষ্ট্রের রাজসভাগুলিতে বিত্তশালী পৃষ্ঠপোষকের সামাজিক মর্যাদার প্রতীকে পরিণত হয়েছিল। সাধারণ মানুষ দূর থেকে যজ্ঞের জাঁকজমক দেখে কৌতূহল বোধ করত কিন্তু সংশয়, অবিশ্বাস এবং ব্যয়বহুল যজ্ঞ-সম্পাদনে নিজেদের অক্ষমতা-হেতু ক্রমশ এই ধর্মপ্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিরাসক্ত দর্শক ও সমালোচকে পরিণত হয়েছিল। এই জনসাধারণ যেমন সক্রিয়ভাবে যজ্ঞানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করত না তেমনি সেযুগে প্রচলিত বিমূর্ত অধ্যাত্মবাদী আলোচনা সম্পর্কেও কোনও প্রকৃত আগ্রহ বা অনুশীলনের ক্ষমতাও তাদের ছিল না। ফলে তারা লঘু ঐতিহ্যের অন্তর্গত লোকায়ত ধর্মের সেই উপাদানগুলির প্রতিই ক্রমশ অধিকতর আকৃষ্ট হচ্ছিল যা তাদেরকে কিছু কিছু আত্মিক আশ্রয়ের সন্ধান দিয়ে পার্থিব সমৃদ্ধির প্রত্যাশা এবং মৃত্যুর পর স্বর্গের আশ্বাস দিতে পারত। এটা নিশ্চয়ই অলস অনুমান নয় যে, যখন দেহান্তরবাদ সাধারণভাবে গৃহীত হওয়ায় এর মূল তত্ত্বগুলি জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল—সাধারণ মানুষ তখন একে অবিমিশ্র অকল্যাণ বলে মনে করেনি। মানুষের অন্তর্গূঢ় জীবনমুখী প্রত্যয় স্বভাবত বারংবার জীবনলাভের প্রত্যাশায় উৎসুক বোধ করবেই, এজীবনে যে-সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয়নি, পরবর্তী সুযোগে তা আরও পরিপূর্ণভাবে ভোগ করার জন্য মানুষ পুনর্জীবনলাভের আশাই আঁকড়ে ধরেছিল। লোকায়ত ধর্ম সাধারণ মানুষের কাছে তারই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তাই সমাজে তখন যে সংশ্লেষণী প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হল, ক্রমশ পরবর্তী কয়েকটি শতাব্দীতে পরিপূর্ণতা লাভ করে তা পৌরাণিক হিন্দুধর্মে পর্যবসিত হল৭ অবশ্য এই পর্যায়ে তা নিতান্ত অস্পষ্ট ছিল : যজ্ঞধর্মের পুরোনো কাঠামো রক্ষিত হয়েছিল কেননা কালোত্তীর্ণ ও পরিচিত কাঠামো হিসাবে সমাজ তাকে উত্তরাধিকাররূপে পেয়েছে যদিও এরমধ্যে নূতন ভাববস্তু সর্বদাই সংযোজিত হচ্ছিল।

মহাকাব্যগুলিতে এই সামাজিক পরিস্থিতি অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে যে রাজারা তাদের রাজনৈতিক জীবনের সমস্যা-সঙ্কুল সন্ধিক্ষণে কিছু কিছু যজ্ঞ তখনও অনুষ্ঠান করে চলেছেন। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী পাবার আশায় পুত্রেষ্টি, স্বজনহত্যার পাপমোচনের জন্য অশ্বমেধ বা যুদ্ধজয়ের জন্য নূতন ধরনের যজ্ঞ (নিকুম্ভিলা) অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। কিন্তু তখনকার সমাজে এর মধ্যেই পূজার প্রচলন হয়ে গেছে, তাছাড়া তীর্থযাত্রা, বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার, দেবতাদের লীলা, ব্রতপালন, প্রতিমা-প্রতিষ্ঠা, মন্দির-নির্মাণ ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। পরিত্রাতা দেবতা এবং তাঁদের পূজা প্রায়ই বিবৃত হয়েছে। স্পষ্টত সমাজ ইতোমধ্যে বিশেষ এক মিশ্র ধর্মচিন্তার পথে অগ্রসর হয়ে গেছে ; বৈদিক মন্ত্র অবৈদিক অনুষ্ঠানগুলিতে ব্যবহৃত হচ্ছে যাতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে একধরনের আপাত-

ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে। তবে ধর্মের বিষয়বস্তু ইতোমধ্যে সম্পূর্ণভাবে যজ্ঞের সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়ে পড়েছে।

এই যুগেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম তার শেষ সংকটের সম্মুখীন হয় ; যজ্ঞানুষ্ঠানের সম্পূর্ণ অবলুপ্তির আশঙ্কার মুখোমুখি এসে এবং অন্যদিকে নব্য হিন্দুধর্মের আসন্ন উত্থানের পূর্বাভাস সূচনা করে তা অতীত ঐতিহ্যের বিনাশ সম্ভাবনার সম্মুখীন হল। ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি প্রথম পর্যায়ের প্রত্যাহ্বানের উত্তর যেমন উপনিষদ্ সাহিত্যে পাওয়া গিয়েছিল, তেমনি তার শেষ পর্যায়ের সংকটের সমাধান পাওয়া গেল বেদাঙ্গগুলিতে। এমন এক সময় এরা বৈদিক সাহিত্যকে সংরক্ষণ করতে চেয়েছিল যখন তা দ্রুত প্রকৃত অনুষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, বেদাঙ্গ পর্যায়ে বহু ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ের অনুশীলনের সূত্রপাত হয়, তাই ব্যাকরণ জ্যামিতি ও ছন্দ যজ্ঞের প্রয়োজনে উদ্ভূত হলেও অতি শীঘ্রই এগুলি আপন অধিকারে স্বতন্ত্র বিষয়রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ও ক্রমাগত অনুশীলনের দ্বারা উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

আঙ্গিক ও ভাষা

সংহিতা-সাহিত্যের অধিকাংশই পদ্যে ও ব্রাহ্মণ গদ্যে রচিত ; আবার আরণ্যক ও উপনিষদ্ সাহিত্যে গদ্য ও পদ্য উভয়ই ব্যবহৃত হয়েছে। তবে সমগ্র সূত্র-সাহিত্য একটি বিচিত্র ধরনের জটিল, সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ ভাষায় রচিত হয়েছিল। সূত্রের গদ্য সম্পূর্ণত স্বরন্যাস থেকে মুক্ত হলেও এর ব্যাকরণগত কাঠামো ব্রাহ্মণ সাহিত্যের অনুরূপ ; অবশ্য প্রাচীনতর সূত্রগুলিতে বাক্‌সংযমের প্রবণতা অনেক বেশি। এতে এই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে ছয় বা সাতশ বছরের মধ্যে মৌখিক গদ্যে কোনও মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। সাধারণভাবে এ ভাষা উপনিষদ্ ও তৎপরবর্তী যুগের বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত বহন করে। শব্দভাণ্ডারে মহাকাব্যিক যুগের লক্ষণ পরিস্ফুট হলেও এর বিপুল অংশ ধ্রুপদী সংস্কৃত ভাষায় তখনই অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাকরণ প্রাক্‌পাণিনীয়। সূত্রসাহিত্য মহাভারত সম্পর্কে অবহিত ছিল। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র 'ভারত' ও 'মহাভারতে'র উল্লেখ করায় মনে হয়, মহাকাব্য রচনার তিনটি মুখ্য দুটির স্তরের সঙ্গেই তা পরিচিত ছিল।

শব্দসংক্ষেপের জন্য লেখকের অতিরিক্ত উদ্বেগ ছিল বলে ক্রিয়া, সর্বনাম, সম্পূরক শব্দ এবং সমস্ত ধরনের বর্জনীয় ক্রিয়াবিশেষণ ও বিশেষণ পরিত্যক্ত হয়েছিল। ফলে যে কর্কশ, সংক্ষিপ্ত ও সাংকেতিক ভাষার সৃষ্টি হল, অনেকসময়েই উপযুক্ত ভাষ্য ব্যতীত তার অর্থবোধ প্রায় অসম্ভব। প্রাথমিকভাবে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া

সম্পর্কিত নির্দেশ শিক্ষকরা মৌখিকভাবে দিতেন। বস্তুত, সূত্রসাহিত্যের অধিকাংশ রচনা এমন একটি যুগে উদ্ভূত হয়েছিল যখন লেখন-প্রণালী আবিষ্কৃত হলেও ধর্মীয় সাহিত্যের প্রয়োজনে তা তখনো ব্যবহৃত হত না। এবং এই সাহিত্য যে-তিনটি উচ্চতর বর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তাঁরা মনে করতেন যে এধরনের সাহিত্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় নিগূঢ় রহস্যময় চরিত্র লেখন-পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে বিপন্ন হবে। সুতরাং নূতন যুগের সাহিত্যও স্মৃতিতে ধারণ করার জন্য প্রস্তুত করা হল। কিন্তু বিষয়বস্তু স্বভাবত শুষ্ক ও বন্ধ্যা হওয়ার ফলে স্মৃতিশক্তির উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ল। তাই বাধ্য হয়েই ভাষাকে সমস্তকিছু পরিহারযোগ্য উপাদান বর্জন করে কেবলমাত্র সেই অংশটুকু রক্ষা করতে হল যা বিবক্ষিত বস্তুর সঙ্গে সাধারণভাবে পরিচিত জনগোষ্ঠীর কাছে অর্থবহ হয়ে উঠবে। এটা যথার্থ যে গদ্যে রচিত ব্রাহ্মণগুলিও স্মৃতিতে ধারণ করা হত ; কিন্তু তখন যজ্ঞ অনেক বেশি জীবন্ত ছিল বলে তা সজীবমন ও শক্তিশালী স্মৃতিকে আকর্ষণ করতে সমর্থ ছিল। তাছাড়া সাহিত্যগত ভাবেও ব্রাহ্মণগুলি পরিপূর্ণতর ভাষায় রচিত বলে সহজে স্মরণযোগ্য রচনা ছিল। অন্যদিকে সূত্র-সাহিত্যে দেবকাহিনীর কোনও স্থান ছিল না যা ব্রাহ্মণ-সাহিত্যকে বহু ক্ষেত্রে সজীবতা দান করেছে ; এমনকি এতে কোনও আলঙ্কারিক সৌষ্ঠব বা কাব্যগুণও নেই। উপরন্তু এই শুষ্ক ও নির্জীব সাহিত্য মনুষ্যরচিত বলে স্বীকৃত, তাই পূর্ববর্তী যুগের সাহিত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা থেকেও তা পুরোপুরি বঞ্চিত ছিল। সূত্রসাহিত্য মৌখিকভাবে সম্প্রচারিত হত বলে অধ্যায়ের সমাপ্তি স্পষ্ট করার জন্য একটি বিশেষ রীতি অবলম্বিত হত ঃ শেষ সূত্রটি ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদে প্রাপ্ত দৃষ্টান্ত অনুযায়ী অধ্যায় বা বিভাগের শেষে একবার পুনরাবৃত্ত হত, এতেই একটি পরিচ্ছেদ বা অধ্যায়ের অবসান সূচিত হত।

শিক্ষা

আমরা বেদাঙ্গের অধিকতর বিধিবদ্ধ দিকগুলি প্রথমে আলোচনা করছি। এই পর্যায়ে রয়েছে শিক্ষা (ধ্বনিতত্ত্ব), ব্যাকরণ, নিরুক্ত (ব্যুৎপত্তি শাস্ত্র) এবং ছন্দ। এদের মধ্যে শিক্ষা আমাদের প্রথম আলোচ্য বিষয়, কারণ সর্বাধিক সংখ্যক রচনা শিক্ষা সম্পর্কে প্রণীত হয়েছে।

শিক্ষাবিষয়ক রচনাগুলিতে আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষে ধ্বনিতত্ত্ব অনুশীলন সম্পর্কে পরিচয় পাই। ধ্বনি উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত উচ্চারণপদ্ধতি, বাক্‌যন্ত্র ও আস্য-প্রয়াস সম্পর্কে শিক্ষা-গ্রন্থগুলি আমাদের অবহিত করে ঃ সংক্ষেপে বলা যায়, বেদমন্ত্র উচ্চারণ প্রশিক্ষণের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত কিছুই এই গ্রন্থের পরিধিভুক্ত। শিক্ষা প্রায় অবিচ্ছেদ্যভাবে প্রাতিশাখ্য শ্রেণীর গ্রন্থসমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর

নামকরণেই এই ইঙ্গিত নিহিত যে প্রতিবৈদিক শাখায় পরিশীলিত শিক্ষাগ্রন্থই হল প্রাতিশাখ্য। অবশ্য বিধিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিক্ষা বেদাঙ্গের অন্যতম হলেও প্রাতিশাখ্যগুলি এই বৃত্ত-বহির্ভূত ; তবে এদের একটিকে অপরটির সাহায্যে ছাড়া আলোচনা করা অসম্ভব।

বহু শিক্ষাগ্রন্থের নাম আমাদের কাছে পৌঁছলেও এসমস্ত রচনাগুলি এখন আর পাওয়া যায় না। সমস্ত শাখার চলিত সাধারণ শিক্ষাগ্রন্থগুলি হল 'পাণিনীয়', 'সর্বসম্মত' ও 'সিদ্ধান্ত'। মন্ত্রের বিভিন্ন অংশ গানের প্রণালী, সংহিতা পাঠকে পরিশীলিত করে সুর-সমন্বিত করার পদ্ধতি, উচ্চারণ পদ্ধতি এবং গান ও বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের সহযোগী অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি এইসব গ্রন্থের প্রধান বিষয়বস্তু। 'শিক্ষা সংগ্রহ' গ্রন্থটি তুলনামূলকভাবে নবীনতর ও বহু বিষয়-সমৃদ্ধ রচনা। এধরনের গ্রন্থগুলি মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত 'পাণিনীয় শিক্ষা' যথার্থ উচ্চারণ, সন্ধিবিচ্ছেদ ও সংহিতা পাঠে পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রধান বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করেছে। এই গ্রন্থে ব্যাস, নারদ, শৌনক প্রভৃতি বিশেষজ্ঞরা উল্লিখিত হয়েছেন। পাণিনির উল্লেখ থেকে প্রমাণিত হয় যে প্রচলিত গ্রন্থটি স্বয়ং পাণিনির দ্বারা রচিত নয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে শিক্ষাকে অক্ষর, স্বর, সম্বোধনের স্বর-দৈর্ঘ্য, শ্বাসাঘাত, মন্ত্রোচ্চারণ, ও সন্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সবগুলি শিক্ষাগ্রন্থেই এই বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া পাণিনীয়-শিক্ষার মত প্রধান শিক্ষাগুলি বিষয়বস্তুর গভীরে অবগাহন করে পদের উৎস এবং উচ্চারণের মৌখিক কলাকৌশল আলোচনা করেছে কেননা প্রাতিশাখ্যগুলি যেখানে ধ্বনির শ্রবণগত দিক সম্পর্কে উৎসাহী, শিক্ষা যেখানে ধ্বনি উচ্চারণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর্য-প্রযত্ন সম্পর্কে আলোচনা করেছে। প্রাচীনতর বৈদিক সাহিত্যে স্বরন্যাস উচ্চারণের তীব্রতা অনুযায়ী নির্ধারিত হত কিন্তু কালক্রমে অবৈদিক উচ্চারণ রীতির সঙ্গে নিরন্তর পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে তা ধীরে ধীরে ও নিশ্চিতভাবে শ্বাসাঘাতমূলক স্বরন্যাসে বিবর্তিত হয়। কৃষ্ণ-যজুর্বেদের সময় থেকে এটা বিধিতে পরিণত হয়ে উপনিষদের কাল পর্যন্ত প্রচলিত থাকে।

এছাড়া আমরা অন্য যেসব শিক্ষাগ্রন্থের কথা শুনি, তাদের মধ্যে কেশব, মাধ্যন্দিনীয়, লোমশ ও অমোঘনন্দিনী শুক্ল-যজুর্বেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এদের মধ্যে অমোঘনন্দিনী প্রধানত উচ্চারণবিধি সম্পর্কিত সাতান্নটি শ্লোকে গ্রথিত সংক্ষিপ্ত একটি রচনা ; মাধ্যন্দিনীয়তে রয়েছে সাতাশটি এবং কেশবে মাত্র নয়টি শ্লোক। গার্গ্যাচার্য রচিত লোমশী গ্রন্থটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর রচনা ; এতে চারটি খণ্ড ও চল্লিশটি শ্লোক রয়েছে।

ভারদ্বাজ, চারায়ণীয়, আরণ্য ও ব্যাসশিক্ষা তৈত্তিরীয় সংহিতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। একশ তেত্রিশটি শ্লোকে রচিত ভারদ্বাজ গ্রন্থটি একটি ব্যবহারিক নির্দেশিকা যা

প্রতিশব্দগুলির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে ও যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে শেখায়। তৈত্তিরীয় সংহিতা পাঠের বিশুদ্ধতা রক্ষাই এর লক্ষ্য। দশটি অধ্যায় ও তিনশ পঁয়ত্রিশটি শ্লোক-সংবলিত চারায়ণীয় একটি দীর্ঘতর রচনা ; এর বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে। সন্ধি, সমাস, আবৃত্তির নিয়ম, স্বরন্যাস, যতি, বিভিন্ন পদের দৈর্ঘ্য, ছন্দ ইত্যাদি। বিষয় পরিধির ক্ষেত্রে 'আরণ্য ক্ষুদ্রতম, কেননা এই গ্রন্থ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের স্বরন্যাসেই সীমাবদ্ধ। এর দাবি হল যে অন্য ন'টি শিক্ষাগ্রন্থ থেকে এ-গ্রন্থ তার বিষয়বস্তু আহরণ করেছে। ব্যাসশিক্ষা সম্ভবত প্রাচীনতম এবং তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য নামক গ্রন্থের উপর নির্ভরশীল। এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটি অন্য বহু শিক্ষার তুলনায় বিষয়বস্তুর দিক থেকে ব্যাপকতর।

অথর্ববেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাণ্ডুকী শিক্ষা ষোলটি অধ্যায় ও একশ চুরাশিটি শ্লোকে গ্রথিত দীর্ঘ রচনা ; বশিষ্ট-শিক্ষা নামক অতি ক্ষুদ্র রচনাটিতে শুধুমাত্র অক্ষরের দ্বিত্ব বা 'আবৃত্তি' আলোচিত হয়েছে। গদ্যে রচিত আপিশলী শিক্ষায় বর্ণমালার বিভিন্ন অক্ষরের শ্রেণীবিভাগ ও যথার্থ উচ্চারণ ও ধ্বনির উৎপত্তি আলোচিত হয়েছে।

সামবেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারদীয় শিক্ষার দুটি প্রপাঠকের প্রতিটিই আটটি অধ্যায় বিভক্ত। এতে মোট দু'শ চল্লিশটি শ্লোক ও কিছু গদ্য-স্তবক রয়েছে ; সামবেদের পাঠকে সুরের নিয়ম অনুযায়ী বিন্যস্ত করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। সামবেদের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যাসশিক্ষা দীর্ঘতম শিক্ষাগ্রন্থ, এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রচনাগুলির অন্যতম। সামবেদের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও এটি তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যকে এত বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছে যে প্রকৃতপক্ষে শেষোক্ত গ্রন্থের একটি ভিন্ন ধরনের পদ্য-সংস্করণ হয়ে পড়েছে। এই গ্রন্থে আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে প্রায়োগিক পরিভাষা, স্বরন্যাসের বিধি, দ্বিত্ব-বিধি ইত্যাদি।

অন্যান্য রচনার উল্লেখ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে শিক্ষাশ্রেণীভুক্ত সমস্ত গ্রন্থ শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে পৌঁছায়নি। এমন প্রায় চৌদ্দটি নাম পাওয়া যায় যা এখন আমাদের নিকট লুপ্ত। পাণিনি তাঁর রচনাকে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্ এবং কয়েকটি প্রাচীনতর শ্রৌতসূত্রের প্রায়োগিক দিকের সাহায্যে প্রণয়ন করেছিলেন। সোমশর্মা রচিত 'যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষা'র বিষয়-পরিধি পাণিনীয়ের অনুরূপ ; তবে এটা বহু পরবর্তীকালের রচনা—অন্তত খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ববর্তী তো নয়-ই অর্থাৎ যখন গুপ্ত সাম্রাজ্যের যুগে নূতনভাবে যজ্ঞধর্মের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা হয়েছিল তখনকার। এর চেয়েও পরবর্তী রচনা হল 'কাত্যায়ন-শিক্ষা' যদিও কোনো কোনো বিখ্যাত গবেষকের মতে এটি যাজ্ঞবল্ক্য শ্রৌতসূত্র অপেক্ষা প্রাচীনতর যেহেতু প্রথমোক্ত রচনা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি শেষোক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায়। তবে আমাদের মনে হয়, উভয় গ্রন্থই সম্ভবত কোনো বিলুপ্ত প্রাচীনতর রচনা থেকে বিষয়বস্তু আহরণ

করে থাকবে। অনুমান করা যায়, কাত্যায়ন-শিক্ষা খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল। এর শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্য—উভয়ক্ষেত্রে বিষয়সূচী প্রায় এক ; তবে প্রথমোক্ত রচনা উচ্চারণ-প্রয়াসের প্রকৃতি সম্পর্কে অধিক মনোযোগী এবং দ্বিতীয়োক্ত রচনায় উচ্চারিত ধ্বনির শাব্দিক চরিত্র আলোচিত। এই দুই শ্রেণীর রচনার প্রকৃত পার্থক্য একটি বিধিতে আভাসিত হয়েছে ঃ যখন শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্য পরস্পরবিরোধী অভিমতদেয় তখন প্রাতিশাখ্যই প্রামাণ্য বলে গণ্য হবে ; কেননা বৈদিক ধর্ম ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় ফলে বাচনভঙ্গীতে যে বৈচিত্র্য ও উচ্চারণ-বিধিতে যে পরস্পর-বিরোধিতা দেখা দেয়, তার ফলে বহু ভাষাভাষী জনসাধারণের কাছে সর্বজনগ্রাহ্য নির্দিষ্ট বিধি প্রণয়ন করা কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তাই প্রত্যেক অঞ্চল কোনো নির্দিষ্ট শাখার প্রচলিত প্রয়োগ বিধির দ্বারা পরিচালিত হত। কীল্‌হর্ন মনে করেন যে অপেক্ষাকৃত নবীনতর শিক্ষাগুলি বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে প্রাতিশাখ্যের তুলনায় পূর্ণতর ও রচনা-বিন্যাসের ক্ষেত্রে উন্নততর। তবে প্রথম সম্ভবত একটিমাত্র শিক্ষা প্রচলিত ছিল এবং পাণিনির বৈদিক ধ্বনিতত্ত্ব-বিষয়ক প্রাচীনতম রচনাটি ছিল এই শিক্ষা, যা দীর্ঘকাল ধরে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে রূপান্তরিত হয়। লক্ষণীয় যে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে 'শিক্ষা' শব্দটি একবচনে প্রযুক্ত হয়েছে ; (৭ : ২ : ১) ; এতে মনে হয় যে এটা শ্রেণীনাম ও সম্ভবত বিভিন্ন শাখায় প্রচলিত বেশ কিছু রচনার সাধারণ নাম। আমাদের কাছে যেসব শিক্ষাগ্রন্থ পৌঁছতে পেরেছে, সেগুলিকে বেদাঙ্গসূত্রের প্রাচীনতম পর্যায়ের কাছাকাছি স্থাপন করতে হবে ; কিন্তু 'প্রাতিশাখ্যগুলি অন্ততপক্ষে চার বা তিন শতাব্দী পরে রচিত—নবীনতম প্রাতিশাখ্যগুলি সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল।

প্রচলিত প্রাতিশাখ্যগুলি হল শৌনকের ঋক্-প্রাতিশাখ্য, যজুর্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য, শুক্ল যজুর্বেদের অন্তর্গত কাত্যায়ন-রচিত 'বাজসনেয়' প্রাতিশাখ্য, অথর্ববেদের অন্তর্গত শৌনক রচিত অথর্ব-প্রাতিশাখ্য বা চতুরধ্যায়িকা, এবং সামবেদের অন্তর্গত সাম-প্রাতিশাখ্য (পুষ্প বা পঞ্চবিধ সূত্রের মত সংক্ষিপ্ত রচনাগুলিও এর সঙ্গে সংযোজিত)। বহু প্রাতিশাখ্য প্রাচীনতর এবং অঞ্চল ও শাখাভেদে ভিন্ন ভিন্ন ; এদের মধ্যে থেকেই বিমূর্তায়ন ও সাধারণীকরণের প্রবণতার ফলস্বরূপ শিক্ষাগ্রন্থগুলি উদ্ভূত হয়। উবট ভাষ্যে আমরা এর প্রমাণ পাই যেখানে তিনি বলেছেন যে এই বিশেষ বেদাঙ্গটি (অর্থাৎ প্রাতিশাখ্য) সমস্ত বেদের শিক্ষা ছন্দ ও ব্যাকরণগুলিতে সাধারণভাবে প্রাপ্ত সূত্রগুলির সংকলন ; তাছাড়া কোনও নির্দিষ্ট শাখার প্রয়োগরীতি অনুযায়ী সাধারণ নিয়মগুলি এতে পরিশীলিত হয়েছে বলেই এধরনের রচনাকে প্রাতিশাখ্য বলা হয়। খুব তাৎপর্যপূর্ণভাবে ঋক্ প্রাতিশাখ্য নিজেকে বেদাঙ্গরূপে বর্ণনা করেছে (১৬ : ৬৯) ; যদিও পরিচিত তালিকাগুলি

শিক্ষাকেই অন্তর্ভুক্ত করেছে কারণ সম্ভবত প্রাতিশাখ্য থেকে শিক্ষা গঠিত হওয়ার পরই সেই তালিকা সংকলিত হয়েছিল। উবট প্রাতিশাখ্য তালিকায় শিক্ষাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং শেষোক্ত রচনাগুলিকে তিনি 'পার্ষদ' বা বিদ্বজ্জনমণ্ডলীরূপে অভিহিত করেছেন। শৌনকের ঋক্-প্রাতিশাখ্য শাকল শাখার অন্তর্গত, এর আঠারটি 'পটল' দুটি প্রধান ভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথমভাগে রয়েছে বর্ণমালাসম্পর্কিত একটি অধ্যায় যাকে ধ্বনিগত উৎস অনুযায়ী কয়েকটি সমরূপযুক্ত ভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে (১ম পটল) ; এছাড়া রয়েছে চোদ্দ রকম সন্ধি ও সন্ধি-প্রতিষেধ (২য়) এবং বিভিন্ন ধরনের আলোচনা-সংবলিত আরো চারটি অধ্যায়। দ্বিতীয় ভাগে যে বারোটি পটল (অধ্যায়) রয়েছে, তার মধ্যে দীর্ঘায়িত স্বরবর্ণ (৭ম), প্লুতস্বরের বৈচিত্র্য (৮ম ও ৯ম), স্মৃতিতে ধারণ করার জন্য ক্রম-পদ্ধতি (১০ম ও ১১শ), ত্রুটিপূর্ণ উচ্চারণ (১৪শ), ছাত্রদের শিক্ষাদান করার উপায় (১৫শ) ও ছন্দ (১৬শ) ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে।

তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য গ্রন্থে প্রকৃতপক্ষে একই বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে ; এছাড়া বিভিন্ন প্রায়োগিক পরিভাষাও আলোচিত হয়েছে।

কাত্যায়নের শুক্ল-যজুর্বেদ-প্রাতিশাখ্য গ্রন্থে আটটি অধ্যায় ও 'সাতশ' সাতাশটি সূত্র রয়েছে। এতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে ঃ সামবেদীয় ভাষার বিশুদ্ধ উচ্চারণ, শিক্ষকদের দ্বারা নির্দেশিত আবৃত্তির বিচিত্র প্রাচ্যরীতি, শুক্ল যজুর্বেদের পদ ও ক্রমপাঠ, সন্ধিবিধি, স্বরন্যাস, আবৃত্তির জন্য কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন, বিভিন্ন জটিল পাঠে প্রতিটি শব্দ পুনরাবৃত্তির পদ্ধতি ইত্যাদি।

আমরা শুক্ল যজুর্বেদের পনেরোটি ভিন্ন শাখার কথা শুনি, এদের সবগুলি একটিমাত্র সাধারণ প্রাতিশাখ্য ছিল। ঋক্‌প্রাতিশাখ্যে ছন্দ আলোচিত হলেও শুক্ল যজুর্বেদ-প্রাতিশাখ্যে তা হয় নি—সম্ভবত এর কারণ এই যে, প্রাতিশাখ্যরচয়িতা কাত্যায়ন তাঁর 'সর্বানুক্রমণী' গ্রন্থে বিষয়টি আলোচনা করেছেন। বিশেষভাবে শুক্ল যজুর্বেদের সঙ্গে সম্পর্কিত ধ্বনিতত্ত্ব এই গ্রন্থে আলোচিত হলেও বহু আপাত-অপ্রাসঙ্গিক বিষয় এতে সন্নিবেশিত হয়েছে ; যেমন—স্মৃতি-নিবদ্ধ করার প্রয়োজন বা বেদাধ্যয়নের নির্দেশ বা সাঙ্গীতিক প্রণালী বা কিছু কিছু প্রাচীন আচার্য ও তাঁদের অনুসরণকারীদের বিচিত্র আবৃত্তিরীতি। শুক্লযজুর্বেদ প্রাতিশাখ্য অনুযায়ী বর্ণমালায় ৬৫টি বর্ণ রয়েছে—কেননা উচ্চারণের বিভিন্ন সূক্ষ্ম তারতম্যও এতে স্বীকৃত ; এছাড়া আছে ফলশ্রুতি অংশ, যেখানে আলোচ্য গ্রন্থপাঠ-লব্ধ পুণ্যসমূহ বিবৃত হয়েছে।

সর্বাধিক-সংখ্যক প্রতিশাখ্য সামবেদের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ; এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরিচিত হল সাম-প্রাতিশাখ্য, 'পঞ্চবিধ' বা 'পুষ্পসূত্র' ও ঋক্‌তন্ত্র। ঋক্‌তন্ত্র গ্রন্থটি

মূলত ব্যাকরণের প্রকৃতিযুক্ত ; অন্যান্য রচনাগুলিতে সামবেদের আবৃত্তি ও গানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের বিশেষ পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন শাখা ও অঞ্চলভেদে গায়নরীতি প্রচুর পরিমাণে পরিবর্তিত হতে পারে ; এই রচনাসমূহে পরিবর্তন-সম্পর্কিত নিয়মাবলী দেওয়া হয়েছে। তাই সামবেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রাতিশাখ্যের এত সংখ্যাধিক্য।

সামবেদের প্রাতিশাখ্যগুলি সম্ভবত অথর্ববেদীয় প্রাতিশাখ্য অপেক্ষাও প্রাচীনতর ; শেষোক্ত রচনাগুলিতে প্রকৃতপক্ষে সূত্রসাহিত্যের উন্মেষপর্বের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে অথর্ববেদের তিনটি প্রাতিশাখ্যের মধ্যে মাত্র একটি, অথর্ব প্রাতিশাখ্য নামে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। অন্য একটি, কৌণক ও সায়ণ শাখার রচনা 'চতুরধ্যায়' নামে পরিচিত ; পৈপ্পলাদ শাখার তৃতীয় প্রাতিশাখ্যটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। চতুরধ্যায় ও অথর্ব প্রাতিশাখ্যের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। এর বিষয়বস্তু অন্যান্য প্রাতিশাখ্যগুলির প্রায় অনুরূপ। কিন্তু যেহেতু অন্যান্য পরিচিত সংহিতাগুলির তুলনায় অথর্ববেদের ভাষায় অনেক বেশি ভাষা-তাত্ত্বিক বৈচিত্র্য রয়েছে, তাই এই প্রাতিশাখ্যের অতিরিক্ত গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠে। কারণ তা এমন একটি দুর্জ্ঞেয় ভাষার উপর আলোকসম্পাত করেছে যার মধ্যে একই সঙ্গে ঋক্‌বেদ ও যজুর্বেদ সংহিতা প্রাচীনতর ও নবীনতর—এই উভয়বিধ নিদর্শনই সংরক্ষিত আছে। এর অন্য বৈশিষ্ট্য হল লেখনপ্রণালীর প্রতি গুরুত্ব আরোপের প্রবণতা ; এই অসামান্য বৈশিষ্ট্যের জন্য একে স্পষ্টত সেই সময়ের রচনা বলে চিহ্নিত করা চলে যখন বৈদিক সাহিত্য লিখিত রূপ পরিগ্রহ করছিল। পাণিনি ও পতঞ্জলির আবির্ভাবের মধ্যবর্তী সময়ে—সম্ভবত শেষোক্ত জনেরই বেশি কাছাকাছি—এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটেছিল। 'চতুরধ্যায়'-প্রচলিত অথর্ববেদ পাঠকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছে যদিও কখনো কখনো স্পষ্টতই তা ত্রুটিপূর্ণ। লক্ষণীয় যে, প্রাতিশাখ্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন কিছু রয়েছে সাধারণত যাকে ব্যাকরণের অন্তর্ভুক্ত করা হয় ; এদের বিষয়বস্তু প্রায়ই পরস্পরের বৃত্তে অনুপ্রবেশ করে। কিন্তু প্রাতিশাখ্যগুলি কখনো ব্যাকরণ বলে' অভিহিত হয় না, কারণ ভাষার ব্যাকরণ শিক্ষাদান এগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়, বিভিন্ন বৈদিক শাখার নির্ভুল প্রকরণ বিবৃত করাই এদের লক্ষ্য। অবশ্য এদের মধ্যে স্পষ্টভাবে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত ব্যাকরণের অস্তিত্ব ও পরিশীলন সূচিত হয় ; এই সঙ্গে দুটি স্পষ্টত ভিন্ন ধারায় এদের বর্গীকরণের পূর্বাভাসও পাওয়া যায়। প্রাতিশাখ্যগুলিতে ভাষা অধিক তরলায়িত ; উচ্চারণ, স্বরভঙ্গি, সন্ধি ও স্বরন্যাসের অসংখ্য আঞ্চলিক বিকল্প রূপ প্রকাশিত হয়েছে। পৃথক বিষয়-রূপে ব্যাকরণের উদ্ভবের ফলে এগুলি আরো কঠোরভাবে বিধিবদ্ধ হয়েছিল।

পদপাঠের প্রণেতা শাকল্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে যাস্ক বা শৌনক অপেক্ষা প্রাচীনতর। পদপাঠ ছাড়াও সংহিতাকে স্মৃতিতে ধারণ করার জন্য অন্যান্য পদ্ধতিও

প্রচলিত ছিল ; যেমন—জটা, মালা, রথ, ধ্বজ, ঘন, রেখা, শিখা ও দণ্ড। সংহিতাপাঠের যথাযথ পৌর্বাপর্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বিভিন্ন পারস্পর্যে সংহিতার শব্দসমূহ প্রাগুক্ত স্মৃতিসহায়ক পদ্ধতি অনুযায়ী বিন্যস্ত করা হত।

ব্যাকরণ

অধ্যয়নের বিষয়রূপে ব্যাকরণ নিশ্চিতই দীর্ঘকাল ধরে বহু গবেষক দ্বারা অনুশীলিত হচ্ছিল—প্রাচীন বিশেষজ্ঞদের অভিমত বিভিন্ন বেদাঙ্গে বহুবার উল্লিখিত হওয়ার মধ্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তবু একমাত্র পাণিনির বৈদিক ব্যাকরণটিই আমাদের নিকট এসে পৌঁছেছে, তাও আবার ধ্রূপদী ব্যাকরণ-বিষয়ক রচনার বৈদিক ব্যাকরণ-সংক্রান্ত বিষয় একটিমাত্র অধ্যায়েই নিহিত। এখানে পাণিনি ধ্রূপদী সংস্কৃত ভাষার অপ্রচলিত স্বরন্যাস এবং প্রাচীনতর ভাষার বিচিত্র ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে প্রণীত এই রচনায় ভাষা-আলোচনার ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি লক্ষ্য করা যায়, কেননা বৈদিক ভাষা ততদিনে সম্পূর্ণ অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে ; দৈনন্দিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা এবং সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীদের উপভাষা ও ধ্রূপদী প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বৈদিক ভাষার বিকল্প হয়ে উঠেছিল।

পাণিনির দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি অতুলনীয় এবং সম্পূর্ণত বৈজ্ঞানিক। বৈদিক অধ্যায়টি সংক্ষিপ্ত ; ধ্রূপদী ভাষার অধ্যায়ে প্রযুক্ত পারিভাষিক শব্দ এখানেও ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া ধ্রূপদী ভাষা সম্পর্কে সচেতনতার আভাস এই সংক্ষিপ্ত অধ্যায়টিতে পরিস্ফুট। আরো পরবর্তীকালে পতঞ্জলি বৈদিক ভাষাকে 'ছন্দঃ' এবং কথ্য ভাষাকে 'লৌকিক' বা 'ভাষা' নামে অভিহিত করেছেন। পাণিনির মৌলিক অবদান সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা সহজ নয় কারণ তাঁর পূর্বসূরীদের রচনার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতির ফলে (এঁদের মধ্যে অনেকের নাম পাণিনি তাঁর ব্যাকরণে উল্লেখ করেছেন) আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না ব্যাকরণের কী কী ধারণা তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জন করেছিলেন আর কোন অংশ তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবন। তবে মনে হয় প্রত্যয় ও বিভক্তির মতো পারিভাষিক শব্দ এবং বর্ণমালা-সংক্রান্ত প্রাথমিক নিয়মাবলী যেমন শিবসূত্র, গণ ইত্যাদি সম্ভবত পাণিনির নিজস্ব অবদান। পাণিনি স্পষ্টতা, সংক্ষিপ্ততা ও দ্ব্যর্থবিহীনতার পক্ষপাতী ; তাঁর সমগ্র ব্যাকরণ-প্রকরণে এই পূর্বানুমান আভাসিত যে সাহিত্য শ্রুতি-সঞ্চরণের উপর নির্ভরশীল যদিও ততদিনে লিখন-প্রক্রিয়া প্রবর্তিত হয়ে গেছে। চূড়ান্ত সংক্ষিপ্ততার আদর্শরূপে তাঁর ব্যাকরণ সেই সূত্র-শৈলীর চমৎকার নিদর্শন যেখানে একটি বাহুল্য অক্ষরও বর্জিত হয়ে থাকে। যে যুগে সংস্কৃত আর কথ্য ভাষা ছিল না, সেই সময়েই পাণিনি ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন, তাই তিনি প্রচলিত

শব্দভাণ্ডারকে ব্যাপকভাবে অনুশীলন করেছিলেন , এতে অনুমান করা যায় যে ইতোমধ্যে সংস্কৃত মৃত ভাষা হয়ে পড়েছিল। বিখ্যাত গবেষক টি. বারো দেখিয়েছেন যে পাণিনির প্রচেষ্টায় সংস্কৃত ভাষা তৎকালে প্রচলিত রূপে চূড়ান্ত স্থিতিশীলতা অর্জন করেছিল। অন্যভাবে বলা যায়, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর এই বৈয়াকরণের আবির্ভাব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ; কেননা তাঁর রচনা প্রাচীন ভারতীয় আর্য ও মধ্যভারতীয় আর্য-ভাষার মধ্যে জলবিভাজন রেখারূপে বর্তমান। তৎকালীন ভাষাতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষাটি ছিল জটিল, যেহেতু তখন বৈদিক, প্রত্ন-ধ্রুপদী সংস্কৃত ও কথ্য উপভাষাগুলি পরস্পরের সঙ্গে সহাবস্থান করছিল। কিন্তু মধ্যভারতীয় আর্যভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও দুই সহস্রাব্দের বেশি কাল ধরে সংস্কৃত ও কথ্য উপভাষাগুলি পরস্পরের সঙ্গে সহস্রাব্দের বেশি কাল ধরে সংস্কৃত ভাষা বিদ্বদ্বত্তার একমাত্র মাধ্যম হয়ে রইল ; পাণিনির ব্যাকরণ দ্বারা কঠোরভাবে তা নিয়ন্ত্রিত হত। তাই ভারতীয় বিদ্বৎসমাজে পাণিনির সম্মানিত প্রতিষ্ঠা অবিসম্বাদিত।

শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্য, ব্যাকরণ ও নিরুক্ত স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে যে বৈদিক ভাষা কালক্রমে অপরিচিত ও বিরল হয়ে পড়েছিল। বস্তুত খ্রিস্টপূর্ব অষ্ট শতাব্দীতে বৈদিক ভাষা যেহেতু বিশেষ সহায়ক ব্যতীত দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছিল, তার সঙ্গে তাই কতকটা অনিবার্যভাবেই একটি পবিত্রতার ধারণা যুক্ত হয়ে পড়ল। শুধুমাত্র বৃত্তিধারী পুরোহিত ও শিক্ষকদের কাছেই ঐ ভাষা বোধগম্য ছিল। এই বিশেষ ভাষাগত পরিপ্রেক্ষিতে— পবিত্রীভূত বৈদিক' সাহিত্যের ভাষা থেকে যখন কথ্যভাষার কিছু কিছু অনুপুঙ্খ স্পষ্টভাবে পৃথক হয়ে পড়েছিল তখন শিক্ষা, ব্যাকরণ প্রভৃতির উত্থান ঘটায় এদের চরিত্রবৈশিষ্ট্যে ঐ পরিপ্রেক্ষা ধরা পড়েছিল। শিক্ষাগ্রন্থগুলিতে এমন অনেক কিছু পাওয়া যায় যা ইতোপূর্বে প্রাতিশাখ্যগুলিতে বিবৃত হয়েছিল কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত রচনাগুলিতে যেহেতু এমন অনেক নিয়ম ছিল যাদের সঙ্গে বেদমন্ত্র আবৃত্তিকারীদের কোনো সম্পর্ক ছিল না—বেদমন্ত্র বিশুদ্ধভাবে আবৃত্তি করার জন্য উপযুক্ত বিধিসম্বলিত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ প্রণয়ন তাই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। ঐসব বিধিকে একই সঙ্গে বোধগম্য ও সহজে স্মরণযোগ্য আঙ্গিকে সন্নিবেশিত করার জন্যই 'শিক্ষা'গুলি রচিত হল ; যখন বেদমন্ত্রের আবৃত্তি এত কৃত্রিম হয়ে পড়ল যে অপেক্ষাকৃত সরল প্রাতিশাখ্যের নিয়মের সাহায্যে তাদের যথাযথ ব্যাখ্যাদান আর সম্ভব হল না—সে সময়ে এ-ধরনের গ্রন্থ প্রণয়ন আরো প্রয়োজনীয় হয়ে উঠলো। তাছাড়া প্রতিবেশী ভাষা অর্থাৎ অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাবে পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা আরো বেশি রূপান্তরিত হলো। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের কাছাকাছি মধ্য-ভারতীয় আর্য ভাষা উদ্ভূত হয়েছিল এবং পরবর্তী শতাব্দী থেকে বৌদ্ধ সাহিত্য ক্রমশ অধিক মাত্রায় পালি ভাষায় রচিত হতে থাকে। এমন

কি, ঋগ্বেদেও প্রাকৃত ভাষার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় ; খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে অথর্ববেদ চতুর্থ বেদরূপে স্বীকৃতিলাভের পরে ধর্মগ্রন্থের শব্দভাণ্ডারে বহু লোকায়ত ও আঞ্চলিক ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান প্রবিষ্ট হতে থাকে।

গ্রিক, শক, কুষাণ, হূন প্রভৃতি বৈদেশিক জাতির আক্রমণের পরে উচ্চারণ ও স্বরভঙ্গির ক্ষেত্রে সংশয় যেমন বহুগুণ বর্ধিত হলো, তেমনি স্বরন্যাসের চরিত্রও আমূল পালটে গেল। পরস্পরের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত জনসাধারণের পাশাপাশি বসতি করে নিজেদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করল। এই পরিস্থিতির সুদূরপ্রসারী পরিণতি দেখা গেল প্রাচীন ভারতীয় আর্যের বৈদিক ভাষা যা ব্রাহ্মণ শ্রেণীর সীমাবদ্ধ অধিকারে পর্যবসিত হল। এঁরা বিভিন্ন কৌম ও গোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দূতের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন (যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট কৌমের প্রতি তাঁরা আনুগত্য প্রকাশ করতেন না)। প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক আর্যভাষায় ব্রাহ্মণরা তাঁদের ধর্মানুষ্ঠান পরিচালনা করলেও এটা ছিল সেই সময় (৫০০-২০০ খ্রিস্টপূর্ব) যখন বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তার ফলে বৈদিক ধর্ম ও তদনুগামী ভাষার মহিমা ক্রমশ খর্ব হয়ে পড়েছিল। এই ভাষাগত সংশয়দীর্ণ জটিলতার পরিবেশে পুরোহিত সম্প্রদায়কে তাঁদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সংরক্ষণের দুরূহ দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল। কিন্তু কঠোর ধর্মচর্যা ও প্রয়োজনীয় ভাষাগত প্রশিক্ষণের প্রতি সাধারণ মানুষের ক্রমবর্ধমান অনীহার ফলে ভাষার ক্ষেত্রে সমস্যা নিশ্চিতই প্রবল সংকট সৃষ্টি করেছিল। পবিত্র বৈদিক সাহিত্যের নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষার ক্ষেত্রে সংকট-সম্ভাবনায় শঙ্কিত হয়ে পুরোহিতরা সংরক্ষিত ঐতিহ্যকে বিধিবদ্ধ করার জন্য যত্নবান হয়ে উঠেছিলেন ; আঞ্চলিক রূপভেদকে তাঁরা স্বাভাবিক ও কখনো কখনো অনুমোদনযোগ্য বিকল্প হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন।

প্রাচীন বিশেষজ্ঞদের নামোল্লেখ (যাঁদের রচনা আমাদের কাছে পৌঁছয় নি) প্রমাণিত করে যে বৈদিক সাহিত্যের অন্তিম পর্যায়ের সময় থেকে কথ্যভাষা ক্রমাগত প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে দূরে সরে যাওয়ায় শেষোক্ত ভাষা অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে ; যে-সমস্ত বিশেষজ্ঞের তত্ত্ব উপযুক্ত নমনীয়তা ও ব্যাপকতার জন্যে নিজেদের চিন্তাধারায় বিভিন্ন ভাষাগত রূপান্তরকে যথাযথ স্থান দিতে পেরেছে—শুধুমাত্র সেইসব গ্রন্থই নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। দ্ব্যর্থবিহীন স্পষ্টতার প্রয়োজনে সৃষ্ট সামঞ্জস্যবিধানের প্রবণতা বিভিন্ন প্রাতিশাখ্যে বিশেষজ্ঞের অভিমত দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত। তাই যদিও আমরা প্রতি বেদের অনেক শাখা, এমনকি অনেক প্রাতিশাখ্যের কথাও শুনি, প্রতি বেদের জন্য একটিমাত্র প্রাতিশাখ্যই আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। সংক্ষেপে বলা যায়—বৈদিক আবৃত্তি নিয়ন্ত্রণকারী ভাষাবিষয়ক নিয়মাবলী সূত্রে পরিণত হওয়া অনিবার্য ; তাই এ ধরনের নূতন অর্ধ-লোকায়ত পদ্ধতির উদ্ভব ও বেদাঙ্গরূপে তাদের স্বীকৃতিলাভ সম্ভব হল।

নিরুক্ত

যাস্কের নিরুক্তই শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে পৃথিবীর প্রথমতম গ্রন্থ। পণ্ডিতগণ এর রচনাকাল সম্পর্কে একমত হয়ে খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ থেকে ৫০০ অব্দের মধ্যে এর সময় নির্দেশ করেছেন যদিও খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের কাছাকাছি একে সংস্থাপিত করাই অধিক সম্ভব বলে মনে হয়। নিরুক্ত তিনটি কাণ্ড ও পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। নৈঘণ্টুক কাণ্ডরূপে পরিচিত প্রথম তিনটি অধ্যায়ে প্রতিশব্দ ; নৈগম কাণ্ড বা ঐকপদিকরূপে অভিহিত চতুর্থ অধ্যায়ে সমার্থক শব্দ ; এবং দৈবত কাণ্ড-রূপে পরিচিত পঞ্চম অধ্যায়ে বৈদিক দেবতাদের নামের ব্যুৎপত্তি আলোচিত হয়েছে। ঐকপদিকে আলোচিত শব্দসমূহের অধিকাংশ ঋগ্বেদের চূড়ান্ত পর্যায়ের রচনা থেকে সংগৃহীত। নৈঘণ্টুকের তিনটি অধ্যায়ের প্রথমটিতে বায়ু, জল, পৃথিবী ইত্যাদির মতো ভৌত উপাদান ; দ্বিতীয়ে মানুষ, তার দেহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আবেগ ইত্যাদি এবং তৃতীয় মূলত দেবতা ও তৎসংসৃষ্ট কিছু বিমূর্ত ধারণাসমূহ আলোচিত হয়েছে। নিরুক্তের দুটি অর্ধে মোট বারোটি পরিচ্ছেদ আছে ; প্রথম ছ'টি পরিচ্ছেদে নিঘণ্টুর প্রথম দুটি কাণ্ড এবং শেষের ছ'টি পরিচ্ছেদে দৈবত কাণ্ড ব্যাখাত হয়েছে। প্রতি অর্ধে মৌলিক বিধি ও আলোচ্য বিষয়ের পরিধি সম্পর্কে সাধারণ ভূমিকা রয়েছে ; সম্ভবত তাতে রচনার দুটি স্তরের মধ্যবর্তী ব্যবধান আভাসিত।

ব্যাকরণ ব্যুৎপত্তির কাঠামোও আঙ্গিকগত দিক সম্পর্কে নিরুক্ত অবহিত, অন্যদিকে শব্দের অর্থান্তর-সংক্রমণের তত্ত্বও বিশ্লেষণ করেছে। বহুলাংশে কাল্পনিক এবং অবাস্তব হলেও ব্যুৎপত্তি ব্রাহ্মণ সাহিত্যে এবং নিতান্ত প্রাথমিক রূপে ঋগ্বেদেও পাওয়া যায়। যাস্ক তাঁর গ্রন্থে অন্তত ষোলজন পূর্বসূরী শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞদের অভিমত উল্লেখ করেছেন। এতে মনে হয়, যাস্কের কয়েক শতাব্দী পূর্বেও সম্ভবত ব্যুৎপত্তি শাস্ত্র অনুশীলিত হত। আমরা দেখেছি যে ছদ্মযুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তিতে শব্দের অর্থসংক্রমণগত উৎস নির্ধারণের প্রথম অনুমাননির্ভর প্রচেষ্টার নিদর্শন পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে। যাস্ক তাঁর পূর্বসূরী হিসাবে সংহিতা (সবগুলি শাখায় বিন্যস্ত রূপে), ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্ ও প্রাতিশাখ্যগুলিকে পেয়েছিলেন। এসব রচনা থেকে তিনি উপাদান আহরণ করেছিলেন এবং এগুলির উপর ভিত্তি করেই নিজস্ব বক্তব্য গঠন করেছিলেন। সেযুগে বেদাধ্যয়ন যে পরিশীলিত স্তরে উপনীত হয়েছিল, তা বেদ বিষয়ক চিন্তার বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে যাস্কের উল্লেখ থেকে প্রমাণিত হয় যথা যাজ্ঞিক, বৈয়াকরণ, নৈদান, ঐতিহাসিক ও নিরুক্ত। বৈদিক মন্ত্রগুলিকে যিনি অর্থহীন বলে মনে করতেন, সেই কৌৎসের অভিমত সম্পর্কে নিরুক্তের আলোচনা (১ : ১৫) কিংবা ঐতিহাসিক পক্ষের অস্তিত্ব (৩ : ১২) থেকে প্রমাণিত হয় যে বস্তুবাদী ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি ইতোমধ্যেই গড়ে উঠেছিল।

নিরুক্ত গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে একটি বিলুপ্ত শব্দের তালিকার উপর ভাষ্য ; একটি পৃথক শব্দ-তালিকা রূপে যদি কখনো তার অস্তিত্ব থেকে থাকে, ভাষ্যকৃত শব্দগুলি থেকে এখন তার পুনর্নির্মাণ করা যেতে পারে। এই তালিকাকে 'নিঘণ্টু' বলা হত ; তাই প্রথম অধ্যায় সম্পর্কে নৈঘণ্টুক নামটি প্রযুক্ত হয়। মনে হয় যে নিঘণ্টু বলতে মূলত প্রতিশব্দ-বিষয়ক গ্রন্থই বোঝাত ; পরবর্তীকালে অভিধার বৃত্তকে প্রসারিত সমার্থক শব্দ ও দেবনামকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার ফলে প্রবলভাবে সীমাবদ্ধ হয়েও যাস্ক নিরুক্তে ব্যুৎপত্তি অনুশীলনের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর অবদানের স্বাক্ষর রেখেছেন ; তিনি দৃঢ়ভাবে এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে শব্দসমূহের নির্বাচন সম্ভব, তবে এই অভিমতের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি উদ্ভট ব্যুৎপত্তির সন্ধান দিয়েছেন। বহুক্ষেত্রে কোনো মূল ধাতু থেকেই ব্যুৎপত্তি সন্ধানের প্রবণতার ফলে তিনি ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন ; অনুরূপভাবে একটি দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ব্যুৎপত্তি অনুশীলন প্রক্রিয়ার অভাবের ফলে শব্দের বহুমুখী নির্বাচন দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এইসব ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও যাস্ক একটি বিস্ময়কর সতর্ক ও যুক্তিনিষ্ঠ মনের পরিচয় দিতে পেরেছেন ; এ ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের মূল্য মূলগত নির্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে বহুগুণ বর্ধিত হয়েছে যেহেতু তিনি বিরোধী পক্ষের সম্পূর্ণ প্রতিবাদী অভিমতকেও স্বীকৃতি দিতে ইতস্তত করেন নি। যাস্ক বিশ্বাস করেন যেন ব্যুৎপত্তি কখনোই অর্থ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয় ; কারণ নিছক ব্যাকরণের নিয়ম কোনো শব্দের উৎস নির্ণয়ে সফল না হলেও শব্দার্থ পরিবর্তনগত অনুষঙ্গকে অবলম্বন করে আমরা সেই শব্দের সম্ভাব্য উৎসস্থলে উপনীত হতে পারি। তাই যাস্ক সর্বদা ব্যুৎপত্তি নির্ণয় প্রক্রিয়াকে শব্দার্থ-পরিবর্তন তত্ত্ব ও শাব্দিক প্রসঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন।

যাস্ক চার ধরনের পদকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন—নাম (বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্বনাম, আখ্যাত (ক্রিয়া), উপসর্গ ও নিপাত (অব্যয়) ; এ আলোচনায় তিনি আশ্চর্য স্পষ্টতা ও বিজ্ঞানসম্মত ঋজুতার পরিচয় দিয়েছেন। কখনো কখনো যেন সে-সমস্ত ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়মের পূর্বাভাস পাওয়া যায়, পাণিনি তাঁর ব্যাকরণে পরবর্তীকালে যেগুলি ব্যবহার করেছিলেন ; কখনো বা কোনো ব্যুৎপত্তিতে বহু সম্ভাব্য ধাতুর সম্পর্ক নির্ণয় করে তিনি তার বিষয়বস্তুতে আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় রেখেছেন। তাত্ত্বিকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে তিনি বহু ভাষাতাত্ত্বিক প্রবণতাকে উপভাষার প্রভাব ও আঞ্চলিক চরিত্র বৈশিষ্ট্য এবং তৎপ্রসূত ভাষাগত সংমিশ্রণের আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। যেসব ক্ষেত্রে তিনি সমন্বয় সাধনে ব্যর্থ হয়েছেন, সেখানেও আমাদের বহু ভাষাতাত্ত্বিক প্রবণতাকে উপভাষার প্রভাব ও আঞ্চলিক চরিত্র বৈশিষ্ট্য এবং তৎপ্রসূত

ভাষাগত সংমিশ্রণের আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। যেসব ক্ষেত্রে তিনি সমন্বয় সাধনে ব্যর্থ হয়েছেন, সেখানেও আমাদের বিবেচনার জন্য বহু তাৎপর্যপূর্ণ সূত্র রেখে গেছেন। যাস্ক স্পষ্টতই বহু বৈয়াকরণ ও ব্যুৎপত্তিবিদের দীর্ঘায়ত ঐতিহ্যের পরিণত পর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন ; কিন্তু তাঁর নিজস্ব অবদান এত অসামান্য ছিল যে তা পূর্বসূরীদের কীর্তিকে সম্পূর্ণ ম্লান করে দিয়েছিল। নিরুক্তের ভাষার মধ্যে বৈদিক ভাষার বিবর্তনের নিদর্শন স্পষ্ট ; তাই যাস্ক বহু বৈদিক শব্দকে ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে পরবর্তী ও অধিকতর প্রচলিত রূপের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন।

ব্যুৎপত্তি শাস্ত্রের অন্যতম প্রাচীনতর বিশেষজ্ঞ শাকটায়ন মনে করতেন যে সমস্ত বিশেষণকে ধাতু থেকে নিষ্পন্ন করা সম্ভব। কিন্তু ব্যুৎপত্তিবিদরূপে যাস্ক অ[illegible] ভারসাম্য-বোধের পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু এ ধরনের চরম অভিমতকে সমর্থন করেন নি। তাছাড়া কৌৎসের বক্তব্যকেও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতেও যে কৌৎস বৈদিক মন্ত্রসমূহককে অর্থহীন বলে ঘোষণা করে মৌলিক প্রতিবাদী চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছিলেন—তা আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে।

জ্যোতিষ

বৈদিক যুগে রচিত জ্যোতিষ-সংক্রান্ত কোনো গ্রন্থ আমাদের কাছে এসে পৌঁছয় নি ; এ-সম্পর্কে যজুর্বেদ একমাত্র উৎস হিসাবে গণ্য। অবশ্য লগধপ্রণীত জ্যোতিষ বেদাঙ্গ বা বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ নামে একটি গ্রন্থ পাওয়া যায় ; এর প্রচলিত দুটি পাঠই পদ্যে বিন্যস্ত। ঋগ্বেদীয় পাঠে ছত্রিশটি এবং যজুর্বেদীয় পাঠে তেতাল্লিশটি শ্লোক পাওয়া যায়। উভয় পাঠেই নিম্নোক্ত বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে : উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের সময়ে সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থান, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার সঠিক সময়, সাতাশটি চান্দ্র আবর্তনের স্থিতি এবং এ-সব গণনার নিয়মাবলী। অবশ্য জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে এই আগ্রহ তখনো পর্যন্ত বিশুদ্ধ বিদ্যাচর্চার প্রয়াস হয়ে ওঠে নি ; যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযোগী যথার্থ সময় নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে যজুর্বেদ ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যে নক্ষত্রের অবস্থানের উল্লেখ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এগুলির মধ্যে দিয়ে জ্যোতির্বিদ্যার ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছিল যা কয়েক শতাব্দী পরে সমৃদ্ধতর অভিব্যক্তি অর্জন করেছিল। এছাড়া কৃষকদের পক্ষে বিশেষ সহায়ক নক্ষত্রের অবস্থান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার পক্ষে এ শাস্ত্র অত্যন্ত সহায়ক হয়ে উঠেছিল।

প্রাচীন সংস্কৃতিগুলিতে জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতি বিশেষ তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে ; চীন, ব্যাবিলন ও মিশরে বর্ষপঞ্জী যাজকশ্রেণীর প্রয়োজনীয় উপকরণে পরিণত হয়েছিল কেননা এর সাহায্যে সেসব দেশের মানুষ যজ্ঞানুষ্ঠানের পক্ষে সঠিক সময়

নির্দেশ করতে পারত। কৃষকসমাজ একে সাদরে গ্রহণ করেছিল কারণ এর সাহায্যে বৃষ্টিপাত সম্পর্কে যথার্থ ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হল ; এতে যাজকশ্রেণীর পুঁথিপত্রের গৌরব আরো বর্ধিত হল এবং আপাত-দুর্বোধ্য কলাশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের অনুশীলনের যথার্থতাও প্রমাণিত হলো।

বিবিধ সূত্র

প্রধান বেদাঙ্গ গ্রন্থগুলি রচিত হওয়ার পরেও বহুসংখ্যক সহায়ক গ্রন্থ প্রণীত হয়েছিল ; এদের প্রধান বিষয়বস্তু হল প্রকৃত যজ্ঞানুষ্ঠান থেকে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ এবং প্রাচীনতর রচনাগুলিতে আলোচিত বিষয়। যথা ঃ—বৌধায়ন, গৌতম ও হিরণ্যকেশী প্রণীত পিতৃমেধসূত্রগুলি, শৌনক, পৈপ্পলাদ, কাত্যায়ন ও মানব শ্রাদ্ধকল্পগুলি, আশ্বালায়ন ও বৌধায়ন প্রণীত পরিশিষ্টসমূহ, গোভিলের 'কর্মপ্রদীপ', গোভিলপুত্রের 'গৃহ্যাসংগ্রহ' ; 'অথর্বপরিশিষ্ট'। শৌনকের 'বৃহদ্দেবতা' দেবতা ও প্রত্নকথাসমূহের সংক্ষিপ্তসার এবং তাঁর 'ঋগ্বিধা' একটি মিশ্রবিষয়যুক্ত অর্বাচীন রচনা। এরূপ সম্পূরক গ্রন্থ প্রণয়নের ঐতিহ্য নিরবচ্ছিন্নভাবেই চলছিল ; ফলে আমরা বেশ কিছু অনুক্রমণী পেয়েছি—যেখানে ঋষি, ছন্দ ও দেবতার নাম এবং গ্রন্থবিভাগের বিস্তৃত বিবরণের শ্রেণীবদ্ধ সূচীপত্র রয়েছে। শৌনক ছটি ঋগ্বেদীয় অনুক্রমণীর রচয়িতা এবং কাত্যায়ন বিখ্যাত 'সর্বানুক্রমণী'র প্রণেতা। এই গ্রন্থসমূহ বৈদিক ঐতিহ্যের সমাপ্তি সূচিত করছে ; এর পরবর্তীকালে যা কিছু রচিত হল, তা মূলত এই ঐতিহ্য থেকে স্বতন্ত্র—পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতির উপযোগী, রূপান্তরসাধনের প্রয়োজনে সেসব গ্রন্থ প্রচুর পরিমাণ অবৈদিক উপাদান আত্মসাৎ করেছিল।

ছন্দোবদ্ধ রচনা যে চার বা পাঁচ শতাব্দী ধরে ক্রমোন্নতি লাভ করেছিল, বৈদিক ছন্দশাস্ত্রও সেসময় ক্রমশ জটিল হয়ে উঠল। এ-বিষয়ে দুটি রচনা পাওয়া যায় 'নিদানসূত্র' ও 'পিঙ্গলছন্দঃসূত্র'। নিদানসূত্রের প্রথম দশটি প্রপাঠক সামবেদের সঙ্গে সম্পর্কিত যেহেতু এখানে উক্থ, স্তোম, গান প্রভৃতি সামবেদীয় বিষয়ই মুখ্যত বিবৃত হয়েছে ; কারো কারো মতে এই অংশ পতঞ্জলির রচনা। এর ভাষা কৌতূহলজনক কারণ এতে নিহিত ব্যাকরণের চরিত্র কতকটা অদ্ভুত। 'বৃহদ্দেবতা' গ্রন্থে সেসমস্ত শ্লোক 'নিদানসূত্র' থেকে উদ্ধৃত বলে বর্ণিত হয়েছে—সেসব কিন্তু নিদানসূত্রে পাওয়া যায় নি। এই গ্রন্থে বিবৃত সমস্ত ছন্দই বৈদিক। কিন্তু পিঙ্গলছন্দঃসূত্র অর্বাচীন রচনা ; এর দুটি পাঠভেদ ঋগ্বেদ ও সামবেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বৈদিক ছন্দের পাশাপাশি কিছু কিছু বেদোত্তর অর্থাৎ ধ্রুপদী ছন্দও এতে আলোচিত হওয়ায় গ্রন্থের অর্বাচীনত্বতার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ; পিঙ্গলকেই এর রচয়িতা বলে বলা হয়।

কল্পসূত্র

সূত্রসাহিত্যের ছ'টি শ্রেণীর মধ্যে কল্পসূত্রগুলি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কল্পসূত্রগুলি আবার চারভাগে বিন্যস্ত ঃ শ্রৌত, গৃহ্য, ধর্ম ও শুল্ব। এদের মধ্যে বেদের সঙ্গে সবচেয়ে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত হল শ্রৌত সূত্র—প্রধান, বিশেষত সামূহিকভাবে পালনীয়, যজ্ঞানুষ্ঠানগুলির বিভিন্ন অনুপুঙ্খ এতে বিবৃত হয়েছে। শ্রৌতসূত্রে আলোচিত অনুষ্ঠানগুলি মুখ্যত তিনটি ভাগে বিন্যস্ত করা যায় ঃ (ক) নিত্য অর্থাৎ আবশ্যিক অনুষ্ঠান—প্রাত্যহিক ও সাময়িক ; যেমন ঃ অগ্নিহোত্র ও দর্শপূর্ণমাস। আর্য পুরুষকে সমগ্র জীবনব্যাপী এই অনুষ্ঠানগুলি পালন করতে হত। (খ) নৈমিত্তিক অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ সময়ে পালনীয় অনুষ্ঠান যেমন রাজসূয়, বাজপেয় এবং (গ) কাম্য অর্থাৎ পুত্র, গোধন, বৃষ্টিপাত, বিজয়লাভ প্রভৃতি বিশেষ আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য অনুষ্ঠান। যজ্ঞের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক থাকায় মনে হয় যে শ্রৌতসূত্রগুলি বিভিন্ন পুরোহিত পরিবারেই উদ্ভূত হয়েছিল এবং সম্ভবত এগুলি প্রাচীনতম সূত্র-সাহিত্যের নিদর্শন। প্রতি বেদে, এমন কি তার প্রতি শাখায় যজ্ঞসম্পাদক পুরোহিতদের নিজস্ব শ্রৌত-সূত্র ছিল। ঋগ্বেদের দুটি শ্রৌতসূত্র ছিল ঃ আশ্বলায়ন ও শাঙ্খায়ন। অধিকাংশ শ্রৌতসূত্রের অধ্যায়গুলি 'প্রশ্ন' নামে অভিহিত ; তাই অনুমান করা যায় যে, এই গ্রন্থগুলি যজ্ঞের যথার্থ পালন-বিধি সংক্রান্ত শিক্ষানবীশ পুরোহিতের প্রশ্ন ও শিক্ষকের উত্তর প্রত্যুত্তর প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। অবশ্য এই দ্বান্দ্বিক আঙ্গিক প্রচলিত পাঠে এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না কেননা সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ পরিত্যক্ত হয়ে গেছে ; তবে উৎসগত বিচারে প্রাগুক্ত আঙ্গিক ও অব্যবহিত পূর্ববর্তী উপনিষদ্ সাহিত্যের সঙ্গে শ্রৌতসূত্রের নিবিড় সাদৃশ্য রয়েছে।

আশ্বালায়ন শ্রৌতসূত্রে বারোটি অধ্যায় আছে। বৌধায়ন শ্রৌতসূত্রে নামকরণ শিক্ষকের নামে হয়েছিল, কিন্তু আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের ক্ষেত্রে ছাত্রের নামই রয়েছে। অর্থাৎ দ্বিতীয় গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা যদিও শৌনক, তিনি তাঁর শিষ্য আশ্বলায়নের নামে রচনাটিকে পরিচিত হতে অনুমতি দিয়েদিলেন, হয়ত আশ্বলায়ন কিছু পরিমার্জন করেছিলেন। অশ্বমেধ, প্রবর্গ্য ও রাজসূয় ব্যতীত প্রায় সমস্ত প্রাচীনতর ও প্রধান যজ্ঞানুষ্ঠান এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে ; তাছাড়া এতে হোতা, মৈত্রাবরণ, অচ্ছাবাক ও গ্রাবস্তুতের মতো ঋগ্বেদীয় পুরোহিত, এবং অথর্ববেদীয় পুরোহিত ব্রহ্মা ও যজমানের কর্মপদ্ধতি সংক্রান্ত নিয়মাবলী বিবৃত হয়েছে। অন্যান্য অর্বাচীন শ্রৌতসূত্রের মতো আশ্বালায়নে মন্ত্রবিশ্লেষণের সাধারণ নিয়মাবলী সংক্রান্ত পৃথক 'পরিভাষা' অধ্যায় নেই ; এ ধরনের নিয়ম গ্রন্থের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে এবং প্রসঙ্গ অনুযায়ী এদের আবির্ভাব ঘটেছে। নিয়মগুলি জটিল, তাই রচনাও দুরূহ।

শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র আশ্বলায়ন অপেক্ষা প্রাচীনতর এবং ঋগ্বেদের বাষ্কল শাখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু আশ্বলায়ন শাকল ও বাষ্কল—এই উভয় শাখার সঙ্গে সম্পর্কিত ; শঙ্খ পরিবারভুক্ত সুযজ্ঞ আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতা। সতেরোটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্রে সবগুলি নিবিদ্ বিবৃত হয়েছে (৮ : ১৬-২৩)। শেষ দুটি অধ্যায়ে আলোচিত মহাব্রত অনুষ্ঠানটি পরবর্তীকালে সংযোজিত ; একই শাখার আরণ্যকে বিন্যস্ত অনুরূপ অধ্যায়টির নিবিড় অনুসরণ এখানে স্পষ্ট। শাঙ্খায়নের অবশ্য একটি পৃথক পরিভাষা অধ্যায় আছে। আশ্বলায়নের তুলনায় এই গ্রন্থে অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক যজ্ঞ আলোচিত হলেও এর তালিকায় কয়েকটি অনুষ্ঠান যুক্ত হয়েছে—যা থেকে আমরা প্রাচীন যজ্ঞের কিছু কিছু নূতন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হই। পুরুষমেধ সম্পর্কে এই গ্রন্থে একটি সম্পূর্ণ ও বিবিধ—অনুপুঙ্খযুক্ত অংশ রয়েছে ; তবে স্পষ্ট বোঝা যায়, বহু পূর্বেই অনুষ্ঠানটি অপ্রচলিত হয়ে পড়েছিল। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে ব্রাহ্মণসাহিত্যের সঙ্গে এর প্রবল সাদৃশ্য স্পষ্ট, এতেও গ্রন্থটির অধিকতর প্রাচীনতা প্রমাণিত হয়।

তৈত্তিরীয় সংহিতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু শ্রৌতসূত্রে সন্ধান পাওয়া যায় ; পুরোহিতের কার্যকলাপের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত বিধিগ্রন্থের পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক। কারণ, বিশেষভাবে, বিভিন্ন অঞ্চলে উদ্ভূত বিভিন্ন শাখার আনুষ্ঠানিক কর্মপদ্ধতি পরস্পর ভিন্ন হতে বাধ্য। তৈত্তিরীয় শাখার শ্রৌতসূত্রগুলির সময়ানুক্রমিক তালিকা এভাবে দেওয়া যায় : বৌধায়ন ও বাধূল ; তারপর ভরদ্বাজ, আপস্তম্ব, সত্যাষাঢ় হিরণ্যকেশী এবং শেষে বৈখানস।

আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র ত্রিশটি প্রশ্ন বা অধ্যায়ে বিন্যস্ত একটি প্রাচীন গ্রন্থ। এতে প্রায় সমস্ত প্রধান যজ্ঞানুষ্ঠান আলোচিত হয়েছে ; এগুলির মধ্যে সৌত্রামণী, বাজপেয়, রাজসূয়, অশ্বমেধ ও সর্বমেধের মতো নবীনতর অনুষ্ঠানও আছে। পিতৃপুরুষের তালিকা-সহ একটি পৃথক পরিভাষা অংশ, মন্ত্রসংগ্রহ এবং হোতৃশ্রেণীর পুরোহিতের কর্মপদ্ধতি এখানে বিবৃত হয়েছে। এই গ্রন্থটি নিকক শ্রৌতসূত্র থেকে অনেকাংশে পৃথক, অন্য শ্রৌতসূত্রগুলির তুলনায় এটি পূর্ণতর এবং প্রকৃতপক্ষে একটি সম্পূর্ণ কল্পসূত্র ; কারণ এর একটি করে গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র ও শুল্বসূত্র আছে। তৈত্তিরীয় শাখার ভরদ্বাজ শ্রৌতসূত্রের সঙ্গে আলোচ্য আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রের প্রভূত সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। এটা আরো কৌতূহলপ্রদ, কারণ অন্য সহযোগী রচনা থেকে ঋণ গ্রহণে এর কুণ্ঠা নেই।

ত্রিশটি প্রশ্নে বিন্যস্ত বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র সম্ভবত প্রাচীনতম ; বাধূল সম্ভবত একই যুগ কিংবা সামান্য পরবর্তীকালের রচনা। বৌধায়নে আলোচিত বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে প্রধান যজ্ঞগুলি, এবং প্রবর্গ্য ও অশ্বমেধ এবং কয়েকটি অপরিচিত

বিষয়। স্পষ্টতই এটি এমন যুগে রচিত যখন শ্রৌতবিষয়ক মুখ্য রচনাংশেই এমন সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছিল যা পরবর্তী পর্যায়ে পৃথক সহায়ক রচনাসমূহে স্থান পেয়েছিল। তাই এতে কর্মান্ত অনুষ্ঠান, প্রায়শ্চিত্ত ও প্রবর-তালিকা সম্বলিত বিভিন্ন অংশ এবং শুল্বসূত্রের উপযোগী একটি অংশ পাওয়া যায়। রচনা বিশ্লেষণ করে এই তথ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে প্রচলিত গ্রন্থটি একাধিক লেখকের রচনা ; বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির রচনারীতির নিদর্শন রয়েছে। এই প্রাচীন গ্রন্থে অনেক প্রাচীনতর বিশেষজ্ঞদের অভিমত উদ্ধৃত হওয়ায় প্রমাণিত হয় যে শ্রৌতসূত্রগুলি রচনার পশ্চাতে সুদীর্ঘ একটি ইতিহাস রয়েছে। তৈত্তিরীয় সংহিতার উল্লেখ থাকায় মনে হয় সূত্র রচিত হওয়ার পূর্বেই এই সংহিতা তার প্রচলিত রূপ পরিগ্রহ করেছিল। অবশ্য কাঠক সংহিতার সঙ্গেই এই সূত্রের সম্পর্ক সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। লিপিগত সাক্ষ্য থেকে মনে হয় বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র দক্ষিণাঞ্চলে উদ্ভূত হয়েছিল। সম্ভবত দক্ষিণাঞ্চলের পাণ্ডুলিপি রাণায়নীয় ও উত্তরাঞ্চলের পাণ্ডুলিপি কৌথুম শাখার পাঠ আমাদের কাছে পৌঁছেছে।

তৈত্তিরীয় শাখার দীর্ঘতম শ্রৌতসূত্র হল সত্যাষাঢ় হিরণ্যকেশী রচিত গ্রন্থ। উনচল্লিশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত বহু সূত্র উভয়ের মধ্যে সাধারণ। বিষয়বস্তুর তালিকাটি দীর্ঘ এবং একটি পৃথক পরিভাষা অংশ এর প্রথম অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। অর্বাচীনতর যজ্ঞসমূহের মধ্যে প্রবর্গ্য, বাজপেয়, রাজসূয়, সৌত্রামণী, অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, সর্বমেধ, মহাব্রত ও গবাময়ন এতে আলোচিত হয়েছে। সৌত্রামণীর দুটি রূপভেদের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই—চরক ও কৌকিলী। 'সব' যজ্ঞের নিয়মাবলী এতে বিবৃত ; তাছাড়া ভরদ্বাজ প্রণীত পিতৃমেধের বিশেষ রূপভেদও এতে রয়েছে। গৃহ্য, শুল্ব ও ধর্ম সূত্রের অন্তর্ভুক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে আলোচ্য গ্রন্থটি ব্যা•ক সূত্র ঐতিহ্যের অন্তর্গত।

পনেরোটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত বাধুল শ্রৌতসূত্র সূত্রসাহিত্যের প্রাচীনতম পর্যায়ের অন্যতম, সম্ভবত তা বৌধায়নের সমকালীন। অধ্যাপক কাশীকারের মতে গ্রন্থটি হয়তো তৈত্তিরীয় সংহিতার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল না, এর সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্যযুক্ত অন্য কোনো পাঠভেদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। পরিভাষা বিষয়ক কোনো পৃথক অধ্যায় এতে নেই ; তবে প্রধান যজ্ঞগুলির বিবরণ ছাড়াও এতে 'ব্রাহ্মণ' নামক কয়েকটি অংশও রয়েছে (তুলনীয় পশুবন্ধ বা অগ্নিচয়ন ব্রাহ্মণ)—এতে একই সঙ্গে রচনাটির প্রাচীনত্ব এবং ব্রাহ্মণসাহিত্যের সঙ্গে কালগত সান্নিধ্য প্রমাণিত হচ্ছে। তাই একে আমরা সূত্রব্রাহ্মণের যুগলবদ্ধ রূপ হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। এই গ্রন্থে বাধুলের নাম স্পষ্টভাবে উল্লিখিত ; পণ্ডিতরা মনে করেন যে এটা প্রকৃতপক্ষে গোষ্ঠীনাম—যা যাস্ক ও ভৃগুদের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে বদ্ধ ছিল। এই শ্রৌতসূত্রের লেখক আপস্তম্বের প্রায় অর্ধশতাব্দী

পূর্বে আবির্ভূত হয়ে অগ্নিবেশ্যকে শিক্ষা দান করেছিলেন—অগ্নিবেশ্যের গৃহ্যসূত্র আমাদের নিকট এসে পৌঁছেছে। বাধুল শ্রৌতসূত্রের প্রাচীনতা নানাভাবে প্রমাণ করা যায় ; যেমন ঃ রচনার মিশ্র সূত্র-ব্রাহ্মণ চরিত্র, বহু গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্তি, মন্ত্রের ব্যাপক সংগ্রহ এবং কোনো কিছুকে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ না-করার মনোভাব—ঐতিহ্যগত নির্দেশগুলিকে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ না করে এটি প্রতিটি অনুষ্ঠানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছে।

বৈখানস্ শ্রৌতসূত্র 'ঔখীয়সূত্র' নামেও পরিচিত ; একুশটি প্রশ্নে বিন্যস্ত এই রচনাটি তৈত্তিরীয় শাখার অপর প্রধান সূত্র। কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে গৃহ্যসূত্র শ্রৌতসূত্রকে অনুসরণ করেছে ; ঐ গৃহ্যসূত্রে এগারটি প্রশ্ন রয়েছে। একটি পরিভাষা অধ্যায় ছাড়াও তাতে বহু প্রধান যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রয়েছে ; তবে অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, সর্বমেধ বা রাজসূয়ের মতো অর্বাচীন যজ্ঞসমূহ আলোচিত হয় নি। সোমযাগগুলির উপর প্রধান গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। ইষ্টি ও সোমের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক দুটি অংশে এতে রয়েছে সেগুলিই এর শেষ দুটি অধ্যায়। তৈত্তিরীয় শাখার মধ্যে বৈখানস্ শ্রৌতসূত্র যে অর্বাচীনতম রচনা, তা এর সুস্পষ্ট সাম্প্রদায়িক চরিত্র থেকেই প্রমাণিত। এটা স্পষ্টত বৈষ্ণব ধারার গ্রন্থ ; এতে নারায়ণের স্তুতি এবং নির্দিষ্ট রীতি অনুযায়ী ভস্ম দিয়ে ললাট চিহ্নিত করার বিশেষ বৈষ্ণবীয় আচারের বিবরণ আছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই ভস্ম গার্হপত্য অগ্নি থেকে আহরণ করতে হত। সম্প্রদায়কেন্দ্রিক পৌরাণিক বিশ্বাস যে ইতিমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়েছে, তা নিম্নোক্ত প্রতিশ্রুতিতে স্পষ্ট ঃ 'এই ভস্ম-চিহ্ন যে ব্যবহার করে, সে পুণ্য অর্জন করে' শেষ পর্যন্ত পরমাত্মার সঙ্গে সম্মিলিত হয়'। মনে হয়, একদা এই শাখার জন্য একটি পৃথক ব্রাহ্মণ ছিল ; কিন্তু পরে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। বৈখানস্ নিজস্ব মন্ত্রসংহিতার অস্তিত্বকে অনুমান করে নিয়েছে, তবে তার সমগ্র রূপটি শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে নি। এর ভাষা ব্রাহ্মণসাহিত্যে প্রযুক্ত গদ্যের প্রত্যক্ষ উত্তরসূরী—তাই বহু দুর্বোধ্য ও ত্রুটিপূর্ণ রীতির অস্তিত্ব তার বৈশিষ্ট্য সূচিত করছে।

পনেরোটি প্রশ্নে বিন্যস্ত সংক্ষিপ্ত ভারদ্বাজ শ্রৌতসূত্র মাত্র দশটি যজ্ঞ আলোচনা করেছে। জ্যোতিষ্টোম ছাড়া অন্য কোনো সোমযাগ এতে আলোচিত হয় নি ; তবে এতে অধ্বর্যু শ্রেণীর পুরোহিতদের ভূমিকা সম্পর্কে একটি এবং পূর্বানুমিত প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে আরেকটি অংশ রয়েছে। সম্ভবত মূল গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ রূপটি আমাদের কাছে পৌঁছয় নি কারণ পরবর্তী সাহিত্যে আরো কিছু যজ্ঞ সম্পর্কে ভারদ্বাজ শ্রৌতসূত্রের এমন সব বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে যা প্রচলিত পাঠে পাওয়া যায় না। এরকম একটি যজ্ঞ হল অশ্বমেধ। কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে এই রচনার সঙ্গে বৌধায়ন শ্রৌতসূত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

কাঠক শ্রৌতসূত্রের পাঠটি নামমাত্রে পর্যবসিত ; কারণ এর সামান্য কিছু অংশই মাত্র আমাদের কাছে পৌঁছেছে—রচনার বিপুল অংশই এখনও বিলুপ্ত। এরকম একটি প্রচলিত অংশে আমরা পিণ্ডপিতৃযজ্ঞের যে নির্দেশাবলী পাই—তাতে শ্রৌতসূত্রে আলোচিত হওয়ার যৌক্তিকতা সংশয়াতীত নয়, কেননা গৃহ্যসূত্রেই এগুলি অধিক মানানসই।

মৈত্রায়ণী শাখায় দুটি শ্রৌতসূত্র রয়েছে ঃ মানব ও বারাহ। মানব শ্রৌতসূত্র নানাভাবে পরিচিত ঃ 'মানব মৈত্রায়ণীয়' বা শুধু 'মৈত্রায়ণীয়'। এর একুশটি অধ্যায়ে বহু প্রধান যজ্ঞ আলোচিত হয়েছে ; কিছু কিছু অংশে বিচিত্র বিষয়বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে রয়েছে সুস্পষ্ট সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যযুক্ত কিছু কিছু বৈষ্ণব অনুষ্ঠান এবং 'গোনামিক' ও 'অনুগ্রাহিক'। এছাড়া এতে আছে পিতৃপুরুষের একটি তালিকা, একটি পরিশিষ্ট, শ্রাদ্ধবিষয়ক একটি অংশ এবং একটি সংশ্লিষ্ট শুল্বসূত্র।

বারাহ শ্রৌতসূত্র নামক অর্বাচীন রচনাটি তেরটি অধ্যায়ে ও তিনটি পৃথক অংশে বিন্যস্ত। কয়েকটি প্রধান যজ্ঞের সঙ্গে (এদের মধ্যে সোমযাগের বিবিধ রূপভেদই প্রধান) মহাব্রত এবং 'উৎসর্গিণাম্ অয়ন' ও 'একাদশিনী' মতো অপ্রচলিত অপ্রধান অনুষ্ঠানও এতে আলোচিত হয়েছে। মানব শ্রৌতসূত্রের সঙ্গে এর নিবিড় সাদৃশ্য লক্ষণীয় ; একমাত্র পার্থক্য এই যে, বারাহে পরিভাষা অংশ অনুপস্থিত। এর শব্দভাণ্ডারে কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায় ; এতে এমন কিছু শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে যা অন্য কোনো সূত্র গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

বাজসনেয়ী শাখার কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন—এই উভয় পাঠে একটিমাত্র শ্রৌতসূত্র রয়েছে ; কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র ; এর সঙ্গে তৎসংশ্লিষ্ট গৃহ্যসূত্রের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় যদিও সেই গৃহ্যসূত্রের নামকরণে কাত্যায়ন অনুপস্থিত। এই শাখায় গৃহ্যসূত্রকে পারস্কর গৃহ্যসূত্র বলা হয়। পারস্কর সম্ভবত কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রেরও রচয়িতা কারণ এই সূত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাত্যায়ন এবং সর্বানুক্রমণীয় রচয়িতা অভিন্ন নন। এতে পরিভাষা সম্পর্কে একটি পৃথক অধ্যায়, বিভিন্ন গোষ্ঠীর পিতৃপুরুষের একটি তালিকা এবং কৌকিলী, সৌত্রামণী, পিতৃমেধ ও দাক্ষায়ণ যজ্ঞের মতো কিছু কিছু স্বল্প প্রচলিত অনুষ্ঠানের বিবরণ আছে। বাজসনেয়ী সংহিতা ও শতপথ ব্রাহ্মণের সঙ্গে এর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ; যদিও এমন কিছু অনুষ্ঠান এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যা সংহিতায় পাওয়া যায় না, তবু সূত্রটি প্রাগুক্ত সংহিতাকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছে।

সামবেদের পাঁচটি শ্রৌতসূত্র আমাদের কাছে পৌঁছেছে ঃ ল্যাটায়ন, দ্রাহ্যায়ণ, জৈমিনীয়, আর্ষেয়কল্প ও নিদানসূত্র। ল্যাটায়ন ও দ্রাহ্যায়ণ—এই দুটিকেই কৌথুম ও রাণায়নীদের দশটি শ্রৌতসূত্রের তালিকার মধ্যে পাওয়া যায়। এই দুটি গ্রন্থ নিশ্চিতই

প্রাচীনতর, যেহেতু নিজেদের শাখায় এগুলি প্রথম সূত্র। লাট্যায়ন দশটি প্রপাঠকে বিন্যস্ত—প্রতিটি প্রপাঠক আবার বারোটি করে কণ্ডিকায় বিভক্ত। সামবেদীয় রচনারূপে এতে প্রধানত উদগাতা শ্রেণীর পুরোহিত ও তাঁর সহায়কদের দায়িত্ব এবং সোমযাগে ব্রহ্মা শ্রেণীর পুরোহিতদের কর্মপদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। এতে কয়েকটি অনুষ্ঠান বিবৃত হলেও এই সব যজ্ঞে গীত মন্ত্রসমূহই প্রধান বিবক্ষিত বস্তু। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের প্রচুর উদ্ধৃতি এই সূত্রে রয়েছে। বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী পরিস্থিতিতে বহু প্রাচীন বিশেষজ্ঞদের নাম উল্লিখিত হওয়ার ফলে এই গ্রন্থের পশ্চাদবর্তী দীর্ঘ ঐতিহ্য সম্পর্কে আমরা অবহিত হই।

দ্রাহ্যায়ণ শ্রৌতসূত্রের রূপটি স্পষ্ট নয় ; কারণ এর বত্রিশটি পটলের মধ্যে মাত্র পনেরোটি এখনো পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। প্রতি পটল আবার চার খণ্ডে বিন্যস্ত। মোট সাতটি যজ্ঞ এতে বিবৃত হয়েছে—মূলত এগুলি হল সোমযাগের রূপভেদ। ল্যাটায়ন ও দ্রাহ্যায়ণ একই বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃতি দিয়েছে বলে এবং ভাষারীতির ক্ষেত্রে পারস্পরিক নিবিড় সাদৃশ্যযুক্ত হওয়াতে এদের একটি অভিন্ন গ্রন্থের সামান্য ভেদযুক্ত দুটি শাখা হিসাবে গণ্য করা হয়। অবশ্য, এদের মধ্যে লাট্যায়ন সংবদ্ধতর এবং দ্রাহ্যায়ণে প্রাপ্ত অনুষ্ঠানতত্ত্ব অংশ প্রথমোক্ত গ্রন্থে বর্জিত হয়েছে বলে বিশুদ্ধতর পাঠ এতে সংরক্ষিত।

জৈমিনীয় শ্রৌতসূত্র একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ ; এতে মাত্র বিশটি খণ্ড আছে। অগ্নিচয়ন অনুষ্ঠানে গীত সামমন্ত্রগুলি বিবৃত হওয়ার পরেই রয়েছে প্রবর্গ্য অনুষ্ঠান বিষয়ক একটি পৃথক অংশ। মন্ত্র-গানের ক্রম বর্ণনার ক্ষেত্রে জৈমিনীয় বৌধায়নকে অনুসরণ করেছে।

চৌদ্দটি প্রপাঠকে বিন্যস্ত 'আর্ষেয়কল্পে' 'মশক কল্পসূত্র' নামেও পরিচিত ; আবার, শেষ তিনটি প্রপাঠক নিয়ে গড়ে উঠেছে ক্ষুদ্রসূত্র। এই গ্রন্থের রচয়িতা মশক এবং তা নিশ্চিতই লাট্যায়ন ও দ্রাহ্যায়ণ অপেক্ষা প্রাচীনতর, যেহেতু এই দুটি গ্রন্থের নিকট আর্ষেয়কল্প পরিচিত ছিল। এতে যে আটটি যজ্ঞ আলোচিত হয়েছে মূলত সেসব সোমযোগেরই রূপভেদ ; এই যজ্ঞগুলিতে গীত সামমন্ত্রের তালিকা ছাড়াও প্রায়শ্চিত্তবিষয়ে একটি অংশও পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণকে নিবিড়ভাবে অনুসরণ করেছে ; অবশ্য দ্বিতীয়োক্ত রচনায় যেসব অনুষ্ঠান বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে, সেসব এতে বর্জিত হয়ে গেছে। যে গ্রামগেয়, আরণ্যগেয়, উহ, উহ্যগানগুলি আর্ষেয়কল্পে প্রদত্ত সামমন্ত্রের ক্রমকে অনুসরণ করেছে বলে মনে হয়—তাদের মধ্যে অন্তরঙ্গ যোগসূত্র রয়েছে। এই গ্রন্থ মোটামুটিভাবে সুসংবদ্ধ, পুনরাবৃত্তির প্রবণতা থেকেও মুক্ত। 'ক্ষুদ্রসূত্রে'র নামকরণের সম্ভাব্য কারণ হলো রচনার সংক্ষিপ্ততা ; এতে মাত্র তিনটি অধ্যায় আছে। পরবর্তীকালের সামবেদীয় সহায়ক রচনাগুলিতে

এটি এই বর্ণনাত্মক নামেই পরিচিত ছিল। 'উপগ্রন্থসূত্র' নামক কাত্যায়ণরচিত ক্ষুদ্রসূত্রেব অংশবিশেষে 'প্রতিহার' নামক সামমন্ত্রের বিশেষ একটি শ্রেণী ব্যাখ্যাত হয়েছে। ভাষাগত বিচারে একে আর্ষেয়কল্প অপেক্ষা প্রাচীনতর বলে মনে হয়।

দশটি প্রপাঠকে বিন্যস্ত 'নিদানসূত্র' প্রকৃতপক্ষে আর্ষেয়কল্প গ্রন্থের পাঠান্তর ; সামবেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণসমূহ এর প্রত্যক্ষ পূর্বসুরী। গৌতম তাঁর 'পিতৃমেধসূত্র' গ্রন্থে আলোচ্য রচনার যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তাতে নিদানসূত্রের রচয়িতারূপে পতঞ্জলির নাম উল্লেখিত হয়েছে। রাণায়নীয় বা কৌথুম শাখার পাঠভেদের সঙ্গে এর কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই বলে কেউ কেউ মনে করেছেন, এটি 'ভাল্লবেয়' শাখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বহু ঐতিহাসিক ও সাহিত্যবিষয়ক তথ্য জোগান দিয়েছে বলে রচনাটি কৌতূহলজনক। এর প্রথম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হল বৈদিক ছন্দ। দুটি প্রপাঠকে বিন্যস্ত 'কল্পনুপদসূত্র' নামক পরিশিষ্টকে ক্ষুদ্রসূত্রের বিভিন্ন অংশ-সম্পর্কিত ভাষ্য বলে মনে হয়। নিদানসূত্রের নবীনতা ভাষাতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকেই স্পষ্ট ; তবে প্রচলিত পাণ্ডুলি।পি ।বকৃতিমুক্ত নয়।

'বৈতান' ও 'কৌশিক'—অথর্ববেদের এই দুটি সূত্রে একটি অসাধারণ ক্রম পরিলক্ষিত হয় ; কেননা গৃহসূত্রের বৈশিষ্ট্যযুক্ত কৌশিক সূত্র বৈতানের পূর্ববর্তী। বিভিন্ন লেখকের রচনা হলেও এদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক লক্ষণীয়। বৈতানসূত্রের রচয়িতা কৌশিকের উপর নির্ভরশীল এবং বেশ কিছু উদ্ধৃতিও চয়ন করেছেন ; শাস্ত্র-অংশে আশ্বলায়নের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। রচনাটি যদিও শৌনক শাখার অন্তর্গত, তবু এটি পৈপ্পলাদের সঙ্গে সম্পর্কিত। বৈতানসূত্রে আটটি অধ্যায় ও তেতাল্লিশটি কণ্ডিকা রয়েছে ; রচনার প্রথম শব্দ অনুযায়ী এর এরূপ নামকরণ হয়েছে। পরিভাষা অধ্যায় দিয়ে গ্রন্থের সূত্রপাত ; এছাড়া এতে প্রধান যজ্ঞসমূহ, বিশেষত সোমযাগগুলি এবং রাজসূয়, বাজপেয়, সৌত্রামণী, অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, সর্বমেধ ও গবাময়ন আলোচিত হয়েছে। রাজাদের উপযোগী বিশেষ অনুষ্ঠানগুলির উপর প্রচুর গুরুত্ব আরোপিত হতে দেখা যায় ; কারণ আমরা জানি, অথর্ববেদের পুরোহিত মূলত রাজপুরোহিত। গ্রন্থটি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন ; অথর্ববেদের স্বীকৃতিলাভের পরে, তবে সম্ভবত গোপথ ব্রাহ্মণের উদ্ভবের পূর্বে, এটি রচিত হয়েছিল।

শৌনক শাখার অন্তর্গত কৌশিকসূত্রে প্রা।ংশ বিকল্প অনুষ্ঠানই বিবৃত হয়েছে ; এই গ্রন্থটি অবশ্য যথার্থ শ্রৌতসূত্র-পদবাচ্য নয়। এতে বহু গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানও আলোচিত হয়েছে ; যেমন, জন্ম ও মৃত্যুসংক্রান্ত এবং ঐন্দ্রজালিক ও ডাকিনীবিদ্যা বিষয়ক অনুষ্ঠান। একে অবশ্য একজনমাত্র লেখকের রচনারূপেও গ্রহণ করা যায় না ;

আলোচিত বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করে আমরা এই স্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, এটি পরস্পরবিচ্ছিন্ন রচনাংশের একটি সংগ্রহ। গোপথ ছাড়াও অন্য একটি ব্রাহ্মণ সম্পর্কে এগ্রন্থ অবহিত ছিল, অবশ্য সেই ব্রাহ্মণটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

বৈতান বা কৌশিক—কোথাও প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কিত কোনো অংশ নেই ; কারণ, সম্ভবত, প্রায়শ্চিত্তসংক্রান্ত নিয়মাবলী 'অথর্ব-প্রায়শ্চিত্তানি' নামক ছ'টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত একটি পৃথক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে তাকে বৈতানের আটটি অধ্যায়ের সঙ্গে সংযুক্ত করে মোট চোদ্দটি অধ্যায়ে সম্প্রসারিত করা হল যাতে সমসংখ্যক অধ্যায়ে বিন্যস্ত কৌশিকসূত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় ; আনুষ্ঠানিক শিথিলতার উপর অথর্ববেদীয় শ্রৌতসূত্রের গুরুত্ব আরোপ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কারণ আনুষ্ঠানিক বিচ্যুতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তমূলক অনুষ্ঠানের বিধান-দানই ব্রহ্মাশ্রেণীর পুরোহিতের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব। চৈনিক ধর্মানুষ্ঠানবিষয়ক পুঁথি 'লি খী'র মতো শ্রৌতসূত্রগুলিও যথাযথ নির্দেশ-সহ প্রকৃত অনুষ্ঠানের বিবরণ, অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট সময়, কার্যপরিচালকদের নির্বাচন করার নিয়ম, সংখ্যাবিষয়ক বিধি এবং যজ্ঞ আয়োজনের পদ্ধতি, অবস্থান ও উদ্দেশ্যসংক্রান্ত নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করেছে।

সহায়ক সূত্র

অধিকাংশ শ্রৌতসূত্র প্রণীত হওয়ার পরে পরিশিষ্ট হিসাবে কয়েকটি সহায়ক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে কয়েকটি অনুষ্ঠান সংক্রান্ত এবং কয়েকটি যজ্ঞতত্ত্ববিষয়ক। পাঁচটি প্রপাঠকে বিন্যস্ত 'ঋক্‌তন্ত্র' প্রকৃতপক্ষে একটি প্রাতিশাখ্য জাতীয় রচনা, যাতে মন্ত্রসমূহের পদে প্রয়োগকালীন পরিবর্তন সম্পর্কিত নির্দেশ বিবৃত হয়েছে। বৌধায়ন, ভারদ্বাজ ও গৌতম পৃথকভাবে কয়েকটি পিতৃমেধ সূত্র রচনা করেছিলেন ; এদের মধ্যে মৃত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে পালনীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াসমূহ বিবৃত হয়েছে। এই বিষয়বস্তু যেহেতু শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্রের পক্ষে সমভাবে প্রয়োজ্য, এই উভয়বিধ সূত্র সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত রচনার সন্ধান এগুলিতে পাওয়া যায়। শাঙ্খায়ত ও মানব-শাখার পিতৃমেধ-সূত্রগুলি তৎসংশ্লিষ্ট শ্রৌত সূত্রগুলির অন্তর্গত, আবার কৌষীতক, আশ্বালায়ন, বৈখানস্ ও অগ্নিবেশ্য রচিত গ্রন্থগুলি এইসব শাখা সংশ্লিষ্ট গৃহ্য সূত্রগুলির অন্তর্ভুক্ত। আপস্তম্ব এবং এমনকি, বৈখানস্ ও আশ্বালায়ন নিজেদের পিতৃমেধ-সূত্রগুলিতে শ্রৌত ও গৃহ্য সূত্রের মধ্যে সমানভাবে স্থাপন করেছেন।

একটি নির্দিষ্টশ্রেণীর রচনা 'পরিশিষ্ট'রূপে অভিহিত ; যে সমস্ত বিষয়বস্তু প্রচলিত শ্রৌতসূত্রগুলিতে অপর্যাপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে কিংবা একটুও উল্লিখিত

হয়নি সেসবই এখানে বিবৃত হয়েছে। আশ্বলায়ন, কাত্যায়ন ও বারাহ-শাখার পরিশিষ্টসমূহ এই প্রবনতার ফলেই রচিত। অন্যদিকে মানবশাখার রচনায় পুরোহিতদের দক্ষিণার কথাটি আলোচিত হয়েছে। বৌধায়ন ও আপস্তম্ব রচিত 'হৌত্রসূত্র' গ্রন্থে হোতা শ্রেণীর পুরোহিতদের দায়িত্ব বর্ণিত হয়েছে।

সামগানের বিধিসংক্রান্ত গৌণ সূত্রগুলি প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া যায়। এদের মধ্যে প্রধান হলো 'পুষ্প সূত্র' বা 'ফুল্ল সূত্র'। দশটি প্রপাঠকে বিন্যস্ত গ্রন্থটিতে গ্রাম ও অরণ্যগেয় গানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামমন্ত্রগুলিকে অন্য মন্ত্রসমূহের উপযোগী করে পুনর্বিন্যাসের নিয়মাবলী এবং অন্যান্য অনুরূপ প্রয়োগিক বিধি বিবৃত হয়েছে। এই নিয়মগুলি বিধিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত। পুষ্পসূত্র এতে সম্পূর্ণ, যথাযথ ও সুশৃঙ্খল যে এতে উত্তরগানের অস্তিত্ব আভাসিত হয়েছে। এই রচনার পরিশিষ্ট সামমন্ত্ররূপে পরিচিত। এর তেরোটি প্রপাঠককে পুষ্পসূত্রে অনুল্লিখিত দুটি বিষয়, অর্থাৎ উহগান ও উহ্যগান আলোচিত হয়েছে।

দুটি প্রপাঠকে বিন্যস্ত 'পঞ্চবিধ সূত্রে' বর্ণিত হয়েছে কিভাবে সামমন্ত্র পাঁচটি অপরিহার্য উপাদানে বিভক্ত হয়—প্রস্তাব, উদ্গীথ, উপদ্রব, প্রতিহার ও নিধন। প্রতিহার-সূত্রও প্রস্তাবসূত্র প্রস্তোতা ও উদ্গাতার দ্বারা সোমমন্ত্রের নির্দিষ্ট অংশ গানের পদ্ধতি বিবৃত করেছে। তিনটি পটলে বিন্যস্ত 'গায়ত্র বিধান' সূত্র গায়ত্র গানের বিধি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের মন্ত্রকে পুনর্বিন্যস্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। তিনটি খণ্ড ও তেতাল্লিশটি শ্লোকে বিন্যস্ত 'স্তোভানুসংহার' গ্রন্থে সামমন্ত্রের সঙ্গে স্তোত্রকে যুক্ত করার নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। তিনটি খণ্ডিকার বিভক্ত 'মাত্রালক্ষণ সূত্র' নামক সংক্ষিপ্ত রচনায় মন্ত্রের অক্ষরসমূহের দৈর্ঘ্য আলোচিত হয়েছে ; সহায়ক শ্রৌতসূত্র অপেক্ষা একে প্রাতিশাখ্য রূপে গ্রহণ করাই সমীচীন।

শ্রৌতসূত্রগুলি বৈদিক যজ্ঞচর্যার চূড়ান্ত পর্বের রচনা ; এই পর্যায় প্রকৃতপক্ষে যজুর্বেদ ও ব্রাহ্মণের সঙ্গে শুরু হয়েছিল—প্রসারণশীল যজ্ঞতত্ত্ব তখন জীবন্ত শক্তিরূপে বিদ্যমান ছিল। ভৌগোলিক সীমার প্রসারণ, ক্রমবর্ধমান সংমিশ্রণ, নির্দিষ্ট কিছু পরিবার ও বিভিন্ন অঞ্চলে আনুষ্ঠানিক প্রয়োগবিধির বৈচিত্র্যের ফলে এইসব ক্রমাগত, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে অদৃশ্যভাবে, পরিবর্তিত হল। যজ্ঞানুষ্ঠানগুলিকে সাংকেতিক ভাষায় লিপিবদ্ধ করা এবং এদের ব্যাখ্যাগম্য ও যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলা ছাড়াও ব্রাহ্মণসাহিত্যের অর্থবাদ অংশের সঙ্গে সম্পর্কিত করার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। সূত্রসাহিত্যের প্রতি শাখা (যজ্ঞতত্ত্ব, জ্যামিতি, জ্যোতিষ বা নিরুক্ত-নির্বিশেষে)—গৃহ্য ও ধর্মসূত্রের সম্ভাব্য ব্যতিক্রম ছাড়া—ব্রাহ্মণ সাহিত্য থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। এই পর্যায়ের অন্য সীমায় যজ্ঞানুষ্ঠান যখন দ্রুত শক্তি হারিয়ে নিঃশেষিত-প্রায় হয়ে উঠেছিল, ক্ষীয়মান ধর্মচর্যাকে সংরক্ষিত করার নূতন ধরনের প্রয়োজন

অনুভূত হল—গড়ে উঠল সূত্রসাহিত্য। কোনো কোনো সূত্রের প্রাথমিক রূপ সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে নির্মিত হয়েছিল ; কিন্তু সেই স্তরে তা ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের অভিন্ন অংশ হিসাবে গণ্য হত। সূত্র ও ব্রাহ্মণের ভাষাগত নিবিড় সাদৃশ্যের কারণকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। আমাদের মনে হয়, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে সর্বাধিক সূত্রসাহিত্য রচিত হয়েছিল।

শ্রৌতসূত্রগুলিতে আমরা এমন একটি সমাজের ছবি দেখতে পাই যেখানে যজ্ঞানুষ্ঠানের সমস্ত রকম জটিলতাসহ সম্পূর্ণ বিকশিত হয়েছিল এবং বেশ কিছু শতাব্দী ধরে বিভিন্ন শাখার অস্তিত্ব জাগরুক ছিল।

গৃহ্যসূত্র

শ্রৌতসূত্রগুলিতে যেখানে প্রধান সামূহিক যজ্ঞসমূহ বিবৃত হয়েছে, গৃহ্যসূত্রগুলিতে সেখানে গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানবিষয়ের নিয়মাবলী আলোচিত হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে পারিবারিক অনুষ্ঠানসমূহ—সন্তানসম্ভাবনা থেকে মৃত্যুর বহু পরবর্তী পারলৌকিক ক্রিয়া পর্যন্ত সেসব বিস্তৃত। এগুলি তাদের লক্ষ্য, বিষয়পরিধি ও ক্রমিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে শ্রৌত অনুষ্ঠান অপেক্ষা ভিন্ন। শ্রৌত অনুষ্ঠানগুলি যেখানে মূলত সমগ্র গোষ্ঠীর সামূহিক কল্যাণ কামনা করে, গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানসমূহ সেক্ষেত্রে বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে, কেননা এগুলি সর্বতোভাবে পরিবার-কেন্দ্রিক। গৃহ্যসূত্রগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এদের মধ্যে 'পাকযজ্ঞ' নামে অভিহিত প্রায় চল্লিশটি অনুষ্ঠানের নিয়মাবলী বিবৃত হয়েছে। এদের আবার তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ (ক) হুত অর্থাৎ যখন অগ্নিতে আহুতি অর্পণ করা হয় ; যেমন বিবাহে বা গর্ভবতী রমণীর সীমন্তোন্নয়ন অনুষ্ঠানে হয়ে থাকে। (খ) অহুত অর্থাৎ যেখানে আহুতি আদান-প্রদান হয় ; যেমন উপনয়নে ও স্নাতকদের জন্য দীক্ষান্ত অনুষ্ঠানে। (গ) প্রহুত অর্থাৎ যেখানে বিশেষ ধরনের আহুতি অর্পণ করা হয় ; যেমন জন্মপরবর্তী অনুষ্ঠানে। প্রধান অনুষ্ঠানগুলির সঙ্গে বহু গৌণ সহায়ক আচারও রয়েছে ; যেমন, গর্ভাবস্থার অনুষ্ঠানগুলি—এদের মধ্যে আছে গর্ভাধান, পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন।

জন্মের পরে নবজাত শিশুর কল্যাণের জন্য জাতকর্ম অনুষ্ঠিত হয়। তারপর একে-একে পালিত হয় আদিত্যদর্শন, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চৌল বা চূড়াকরণ, গোদান ও উপনয়ন অনুষ্ঠান। উপনয়নের পরে বেদাধ্যয়ন বা স্বাধ্যায়ের সূচনা হয় ; এই সঙ্গে থাকে অনধ্যায় ও শেষে সমাবর্তন। তারপ স্নাতক গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে গ্রার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে পাণিগ্রহণ, অগ্নিপরিগ্রহণ, অশ্মারোহন, সপ্তপদী ও লাজহোম। বিবাহিত গৃহস্থকে প্রতিদিন আবশ্যিক নিত্যকর্ম ও বিভিন্ন সাময়িক যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করতে হয়।

এইসব প্রধান অনুষ্ঠান ছাড়াও দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সমস্ত সম্ভাব্য ক্ষেত্রের জন্য নানাধরনের অনুষ্ঠান রয়েছে ; যেমন—গৃহনির্মাণ, বীজবপন, শস্য আহরণ, সর্প ও বিষাপ্ত কীট বিতাড়ন, অতিথিকে খাদ্য ও আশ্রয়দান, আরোগ্যলাভ, দারিদ্র্য নিবারণ, বিভিন্ন উদ্যোগে সফলতা, অমঙ্গলসূচক লক্ষণ, এমনকি অশুভ স্বপ্নের জন্য উপযুক্ত প্রতিবিধান। মানুষের সমগ্র জীবন প্রায় সম্পূর্ণভাবে অনুষ্ঠান দ্বারা আবৃত ছিল ; আদিম মানুষের মানসিকতায় ধর্মীয় ও লোকায়িত জীবনধারার মধ্যে কোনও স্পষ্ট ভেদরেখা ছিল না। এই মানসিকতায় পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ অসংখ্য অমঙ্গল শক্তির দ্বারা আকীর্ণ ছিল ; এদের মধ্যে রয়েছে জীবনের সুখকর ভোগ থেকে বঞ্চিত মৃতমানুষের আত্মা—এরা জীবিত মানুষ সম্পর্কে অসূয়াপরায়ণ হয়ে সর্বদা ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করে এমন বিশ্বাস ছিল। জীবনকে যেহেতু নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক শক্তি থেকে রক্ষা করতে হবে, তাই প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যযুক্ত পরিস্থিতির জন্য কোনো অনুষ্ঠান নির্দেশিত হয়েছিল, যার সাহায্যে এইসব অমঙ্গলপ্রদ শক্তিকে শান্ত, সন্তুষ্ট, বিতাড়িত বা সংগ্রামে প্রতিহত করা যায়। তাই শ্রৌতসূত্রগুলির তুলনায় গৃহ্যসূত্রসমূহ অনেক বেশি স্পষ্টভাবে ঐন্দ্রজালিক। এটা সত্য যে সূত্র-সাহিত্য রচিত হওয়ার সময় ভারতীয়রা আদিম অবস্থা থেকে বহুদূর সরে এসেছিলেন ; কিন্তু সূত্রগুলি বহু সহস্র বৎসরের পুরাতন বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠানগুলিকে বিধিবদ্ধ করেছে মাত্র। জীবনের প্রতি প্রাগ্-বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অতিপ্রাকৃতিক স্তরে মানুষকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে সংগ্রাম করতে প্ররোচিত করেছে।

রচনা পরিচয়

ঋগ্বেদের সাতটি গৃহ্যসূত্র বিলুপ্ত হয়ে গেছে ; পরবর্তী সাহিত্যে উল্লিখিত হওয়ার আমরা এদের নাম জানতে পেরেছি : শৌনক, শাকল্য, ঐতরেয়, বহ্বৃচ, ভারবীয়, পারাশর ও পৈঙ্গি। ঋগ্বেদের দুটিমাত্র গৃহ্যসূত্র—শাঙ্খায়ন ও অশ্বলায়ন আমাদের কাছে পৌঁছেছে। শুক্লযজুর্বেদের গৃহ্যসূত্রগুলির মধ্যেও দুটি এখন পাওয়া যায় : বাজসনেয় ও পারস্কর ('কার্যীয়' নামেও পরিচিত—কাত্যায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত) ; 'বাজবাপ' বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে কৃষ্ণযজুর্বেদের ন'টি গৃহ্যসূত্রের সবগুলি আমরা পেয়েছি। এদের মধ্যে ছ'টি তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত : বৌধায়ন, ভারদ্বাজ, আপস্তম্ব, হিরণ্যকেশী সত্যাষাঢ়, বৈখানস্ ও অগ্নিবেশ। অবশিষ্ট তিনটি মৈত্রায়ণ শাখার অন্তর্গত : মানব, কাঠক (বা লৌগাক্ষি) ও বারাহ। সামবেদের সঙ্গে চারটি গৃহ্যসূত্র সংশ্লিষ্ট : গোভিল, জৈমিনীয়, খাদির (দ্রাহ্যায়ণ নামেও পরিচিত) এবং কৌথুম। শেষোক্ত গ্রন্থের সামান্য কিছু অংশমাত্র পাওয়া যায় ; এই গুলি বিশ্লেষণ করে মনে হয়, একে যথার্থ গৃহ্যসূত্র অপেক্ষা 'পদ্ধতি'র প্রকৃতিযুক্ত সহায়ক শ্রেণীর

রচনা বলাই সঙ্গত। অথর্ববেদের কৌশিক সূত্র মিশ্রশ্রেণীর রচনা—শ্রৌতসূত্র পর্যায়ে আমরা ইতিমধ্যে এর আলোচনা করেছি।

রচনাকাল

রচনাকাল অনুযায়ী প্রধান গৃহ্যসূত্রগুলিকে তিনটি ভাগে বিন্যস্ত করা যায়। প্রথম ভাগে রয়েছে ঃ আশ্বালায়ন, গোভিল, বৌধায়ন, মানব ও কৌথুম। দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে ঃ ভারদ্বাজ, আপস্তম্ব, শাঙ্খায়ন, কাঠক ও পারস্কর। তৃতীয় বা শেষ স্তরে রয়েছে ঃ সত্যাষাঢ় হিরণ্যকেশী, জৈমিনীয়, খাদির ও দ্রাহ্যায়ণ। এইসব সূত্রের যথাযথ রচনাকাল নির্ণয় প্রায় অসম্ভব ; বিষয়বস্তু অর্থাৎ গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানসমূহ কোনো বিস্মৃত যুগের ধূসর অতীতে উদ্ভূত হয়েছিল। এইসব অনুষ্ঠান পালনের বিধিসমূহ সাংকেতিক সূত্রে চূড়ান্তভাবে গ্রথিত হওয়ার পূর্বে অসংখ্য প্রজন্মের মধ্য দিয়ে পরিশীলিত হয়েছিল। আমাদের মনে হয়, সূত্রগুলি খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ থেকে খ্রিস্টীয় ২০০ অব্দের মধ্যে সংগৃহীত ও বিধিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত হয়েছিল।

বিষয়বস্তু

কয়েকটি প্রধান গৃহ্যসূত্র পরীক্ষা করে আমরা এদের বিষয়বস্তু প্রকৃতি ও বিশেষ চরিত্রলক্ষণ সম্পর্কে অবহিত হতে পারি। ভি . এম. আপ্‌টে গৃহ্য অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত মন্ত্রসমূহকে পাঁচটি ভাগে বিন্যস্ত করেছেন ঃ (ক) ধর্মানুষ্ঠানসংশ্লিষ্ট ঃ এ-ধরনের মন্ত্রই সূত্রসাহিত্যে সর্বাধিক পাওয়া যায়—যার অধিকাংশ বিবাহ ও পারলৌকিক ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হত। (খ) দেব-আহ্বানসূচক ঃ এখানে অনুষ্ঠানের আয়োজকের প্রতি আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছে। (গ) দেবকাহিনীবিষয়ক ঃ এখানে প্রার্থনা অপেক্ষা কোনো দেবতা ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রত্নকথা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। (ঘ) আহুতিসংক্রান্ত ঃ এখানে অনুষ্ঠান অপেক্ষাও আহুতির উপর তৎসম্পর্কিত মন্ত্রের প্রভাব বেশি। (ঙ) আকস্মিক ঃ এ-ধরনের মন্ত্রের ক্ষেত্রে কিছু বিক্ষিপ্ত শব্দ বা বাক্যাংশ ছাড়া অনুষ্ঠানের সঙ্গে কোনো প্রত্যক্ষ যোগসূত্র থাকে না।

এই বিশ্লেষণ থেকে গৃহ্যসূত্রগুলিতে অভিব্যক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা সম্পর্কে আমরা অবহিত হই ঃ ক্রমশ মন্ত্রসমূহ তাদের যথার্থ বৈদিক পরিমণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এর দুটি কারণ বলা যেতে পারে ঃ (ক) একটি নতুন যৌগিক প্রত্ন-পৌরাণিক ধর্মের উদ্ভবের ফলে বৈদিক যজ্ঞধর্মের ক্রমিক অবনতি এবং (খ) প্রাচীনতর ঐতিহ্যের সঙ্গে কাল্পনিকভাবে হলেও সূক্ষ্ম একটি যোগসূত্র রক্ষা করার জন্য প্রাচীন মন্ত্রসমূহের উচ্চারণ মনস্তাত্ত্বিক কারণে প্রয়োজনীয় বিবেচিত হওয়া। বর্তমান ভারতীয়

সমাজে সম্পূর্ণত পৌরাণিক গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান পালিত হওয়ার মধ্যে এই প্রবণতা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। তাই আয়োজিত অনুষ্ঠানের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত মুখ্যত বৈদিক মন্ত্রই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আশ্বালায়ন চারটি অংশে বিভক্ত ; প্রথম অংশে গার্হপত্য অগ্নি প্রজ্বলনের বিধি এবং আর্যজীবনে গর্ভাধান থেকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত অনুষ্ঠানসমূহ আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে নির্দিষ্ট সময়নির্ভর অনুষ্ঠান ঃ যেমন, প্রধানত বর্ষাকালীন সর্পের বিরুদ্ধে আয়োজিত শ্রাবণ-যাগ এবং পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে শীতকালে করণীয় অষ্টকা ও অন্বাষ্টক্য-যুক্ত আশ্বযুজ। তাছাড়া রথারোহন ও তিনটি উচ্চতর বর্ণের গৃহনির্মাণের উপযোগী অনুষ্ঠানসমূহ এই অংশে বিবৃত হয়েছে। তৃতীয় অংশে রয়েছে বিবিধ বিষয়বস্তু ; এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ গৃহস্থদের পঞ্চবিধ অনুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন, লোকায়ত ধর্মবোধের উপাদান, ঋষিদের তালিকা, কাম্যেষ্টি, অশুভ-লক্ষণ ও তজ্জনিত প্রায়শ্চিত্ত, ছাত্রাবস্থা ও স্নাতকের আচারবিধি ইত্যাদি। বিশেষত এখানে রচনাটির অর্বাচীনতার লক্ষণ পরিস্ফুট। শেষ অংশে রয়েছে রোগ, মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংক্রান্ত নানাবিধ আলোচনা, সপ্তবিধ শ্রাদ্ধ এবং প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির জন্য রুদ্রের প্রতি নিবেদিত বিশেষ অনুষ্ঠান।

ত্রিশটি কণ্ডিকায় বিন্যস্ত আশ্বলায়ন-গৃহ্যপরিশিষ্ট মহাকাব্যিক ছন্দে গ্রথিত পবরর্তীকালের সম্পূরক রচনা। এর ব্যাকরণ, ছন্দ ও পদান্বয়রীতি ত্রুটিপূর্ণ ; ছন্দোগত বিচ্যুতি-পূরণের জন্য অব্যয় বারেবারে প্রযুক্ত হয়েছে। গৃহ্য অনুষ্ঠানগুলিতে ব্যবহৃত ঋগ্বেদীয় মন্ত্রগুলিকে ব্যাখ্যা করা ও প্রয়োগপদ্ধতির ভাষ্য রচনা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

ঋগ্বেদের অপর গৃহ্যসূত্র, অর্থাৎ শাঙ্খায়ন, বাষ্কল শাখার অনুগামীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। লেখকের নাম হিসাবে সুযজ্ঞ শাঙ্খায়ন উল্লিখিত হয়েছেন ; তবে গ্রন্থকর্তারূপে নিম্নোক্তদের নামও পাওয়া যায় ঃ কৌষীতকি, মহাকৌষীতকি, ঐতরেয়, মহৈতরেয়, আশ্বলায়ন ও কহোল। প্রথম অধ্যায় অষ্টকা, শ্রাবণী, আগ্রহায়ণী, চৈত্রী, আশ্বযুজী ও নির্দিষ্ট সময়ে আয়োজিত শ্রাদ্ধসমূহ—এই সপ্তবিধ পাকযজ্ঞ বিবৃত হয়েছে। প্রধান বর্ণনীয় বিষয় হলো শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানের পদ্ধতি ও আমন্ত্রণযোগ্য অতিথি। ক্রমশ বিবাহ অনুষ্ঠান, গর্ভাবস্থা, জন্মসংক্রান্ত অনুষ্ঠান, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ ইত্যাদিও আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপনয়ন, বেদাধ্যয়ন ও বিদ্যার্থীদের আচরণ-বিধি বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে গৃহনির্মাণ পদ্ধতি, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি। চতুর্থ অধ্যায়ে উপাকরণ, অনধ্যায় ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। তারপর গুরুর প্রতি কৃত অন্যায় ও তজ্জনিত প্রায়শ্চিত্ত বর্ণনা-প্রসঙ্গে ঋষিদের বিভিন্ন বর্গে বিভক্ত করা হয়েছে।

এই তালিকায় ব্যাসের চারজন শিষ্য উল্লিখিত হওয়ায় মনে হয়, আলোচ্য গৃহ্যসূত্র মহাভারতের চূড়ান্ত রচনাপর্বের সমকালীন। পুরুষ ঋষিদের সঙ্গে গার্গী বাচক্নবী, বড়বা আতিথেয়ী ও সুলভা মৈত্রেয়ীর মতো ঋষিকাও এতে উল্লিখিত হয়েছেন। তাছাড়া দেবগৃহে প্রদক্ষিণের বিধি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, তখন মন্দির ও দেবপ্রতিমা প্রদক্ষিণ করার নিয়ম প্রচলিত ছিল। শ্রাবণ আহুতিতে বিভিন্ন লোকের সর্পের উল্লেখ লক্ষণীয়। পরিশেষে রয়েছে বিভিন্ন ঋতুর অনুষ্ঠান ও রুদ্রহোম।

পঞ্চম অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে বৈশ্বদেব, প্রায়শ্চিত্ত এবং কূপ, দীঘি ও উদ্যান শুদ্ধীকরণের অনুষ্ঠান এবং পরিশেষে অশুভ লক্ষণ, ব্যাধি ও বিবিধ প্রয়োজনীয় আচারসহ প্রায়শ্চিত্তমূলক অনুষ্ঠানের বিবরণ। শেষ অধ্যায়ে স্বাধ্যায় বা বেদাধ্যয়নের বিষয়বস্তুরূপে আরণ্যক হোমের নির্দেশাবলী এবং সেই সঙ্গে কর্মবিরতির তালিকা ও বেদমন্ত্র আবৃত্তির পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে।

বিভিন্ন গৃহ্যসূত্রে বিষয়সূচী খুব সামান্যই পরিবর্তিত হয় ; শুধুমাত্র গুরুত্বআরোপের ক্ষেত্রে এদের পারস্পরিক ভিন্নতা নিরূপিত হতে পারে। শুক্লযজুর্বেদের পারস্কর গৃহ্যসূত্র প্রকৃতপক্ষে কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রের পরিশিষ্ট ; তাই তা 'কাতীয়' নামেও পরিচিত। এর তিনটি অংশ কয়েকটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অংশের সূচনায় রয়েছে গার্হপত্য অগ্নি প্রজ্বলনের প্রস্তুতি, ও অতিথি-আপ্যায়নের পদ্ধতি। লক্ষণীয়, বলা হয়েছে অতিথির উপযুক্ত খাদ্য হল গোমাংস। তারপর পাকযজ্ঞ ও বিবাহসংক্রান্ত বিভিন্ন অনুপুঙ্খ বর্ণিত হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের প্রাধান্য তর্কাতীত ; সপ্তপদী অনুষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোথাও—প্রত্নকথা বা অনুষ্ঠানের গঠনের পিছনে প্রধান প্রেরণাদায়ী ভূমিকা যে লোকায়ত লঘু ঐতিহ্যের অনুষ্ঠানবিধির ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জন্মবিষয়ক অনুষ্ঠানের বহু অবৈদিক জনপ্রিয় দেবতাকে আহ্বান করা হত, যাদের নাম এইখানেই প্রথমবার শোনা গেলো। ষণ্ড, মর্ক, উলূখলের মতো ব্রাহ্মণ্য উপদেবতা ছাড়াও এদের রয়েছে মলিম্লুচ, দ্রোণাশ, চ্যবন, আলিখৎ, অনিমিষ, কিংবদন্ত উপশ্রুতি, হর্যক্ষ, কুম্ভী, শত্রু-হস্তমুখ ও সর্ষপারুণ। লঘু ঐতিহ্যের বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের বিস্তর ইঙ্গিত মেলে এই নামগুলিতে।

দ্বিতীয় অংশে রয়েছে শিশুদের জন্য অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণ ভোজনের বিধি, উপনয়ন, বেদাধ্যয়ন, অনধ্যায়, প্রায়শ্চিত্ত, হলকর্ষণ, বিভিন্ন ঋতুর উপযুক্ত যজ্ঞ ইত্যাদি। তৃতীয় অংশে প্রাগুক্ত যজ্ঞসমূহের বিবরণ ছাড়াও রয়েছে শ্রাদ্ধ, গৃহনির্মাণ, শিরঃপীড়ার উপশম, ভৃত্যের পলায়ন রোধের জন্য ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান, রুদ্রের প্রতি রক্তের আহুতিপূর্ণ অনুষ্ঠান—এই সম্পূর্ণ অভিনব আচরণে সম্ভবত প্রত্ন-তান্ত্রিক ধর্মের উপাদান অভিব্যক্ত হয়েছে। তারপর বিভিন্ন ধরনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধ, পশুযাগ প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। দেবতার পক্ষে অনুকূল পবিত্র স্থানের ধারণা বৈদিক যুগের

প্রথম পর্যায়ে দেখা যায় নি ; এখানে তার প্রকাশ ঘটায় একে আমরা প্রত্ন-পৌরাণিক যুগের লক্ষণ রূপে গ্রহণ করতে পারি, যখন বিভিন্ন পবিত্র বন, বৃক্ষ, নদী ইত্যাদির কল্পনা ক্রমশ লোকপ্রিয় হয়ে ওঠে ; তাছাড়া মন্দির ও প্রতিমার ধারণা এ সময়ে দেখা দেয়। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিচারালায়, বশীকরণ ; পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে রথ বা হস্তী আরোহন ও বিভিন্ন দেবতার আহ্বান এবং ষোড়শ অধ্যায়ে জনৈক বৈদিক বিদ্যার্থীর মর্মস্পর্শী প্রার্থনা ব্যক্ত হয়েছে।

পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত ঋগ্বিধান গ্রন্থটি অর্বাচীনতর সূত্র-জাতীয় রচনা। এর একমাত্র বিষয়বস্তু হল ইন্দ্রজাল এবং প্রধান উদ্দেশ্য, ঋগ্বেদীয় মন্ত্রের ঐন্দ্রজালিক প্রয়োগবিধির নির্ধারণ। মহাকাব্যিক অনুষ্টুপ ছন্দে গ্রন্থের অধিকাংশই রচিত। যদিও লেখকরূপে শৌনকের নাম উল্লেখ করা যায়, তবুও এই গ্রন্থে দীর্ঘ বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত রচয়িতাদের প্রচেষ্টার নিদর্শনও রয়েছে। ঋগ্বেদের সঙ্গে এর যোগাযোগ ক্ষীণ ও কৃত্রিম, কেননা কোনো প্রকৃত আন্তরিক প্রয়োজন বা প্রাসঙ্গিকতা ছাড়াই বিচ্ছিন্নভাবে উদ্ধৃত মন্ত্রসমূহ প্রেতনিবারণ, অশুভলক্ষণ-দূরীকরণ, অভিচার ও অন্যান্য ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়েছে—মূল লক্ষ্য বা প্রয়োগের সঙ্গে যেগুলির পার্থক্য মৌলিক। এদিক দিয়ে সামবিধানের সঙ্গে এর নিবিড় সাদৃশ্য রয়েছে ; কেননা তা ব্রাহ্মণরূপে অভিহিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি ব্রাহ্মণ শ্রেণীর রচনা নয়। তেমনি কৌশিকসূত্র বা ঋগ্বিধানকেও প্রকৃত গৃহ্যসূত্র বলা যায় না, এরা নিরবয়ব প্রত্নপৌরাণিক ধর্মীয় সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। ঋগ্বিধানের শেষ অংশে রয়েছে ফলশ্রুতি বা রচনা-মাহাত্ম্য—যা পরবর্তী ধর্মীয় সাহিত্য, বিশেষত মহাকাব্য ও পুরাণের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এতে যে সমাজ চিত্রিত হয়েছে তা ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের নিয়ন্ত্রণে—যাঁরা শুধুমাত্র যজ্ঞানুষ্ঠানই করতেন না, কল্যাণ ও অকল্যাণপ্রদ ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানেও নিরত থাকতেন। তাঁরা নানাবিধ প্রেত ও লোকদেবতাকে আহ্বান জানাতেন ; পদ্মফুল, চন্দন, তৈল, লবণ, বিল্বপত্র ও শালগ্রাম শিলার সাহায্যে পূজা করতেন। ভক্তি, মন্দির, প্রতিমা, কৃচ্ছ্রসাধন, যোগ, জপ, উদ্ভিজ্জ আহুতি দিয়ে পূজা, রক্ষাকবচ, ন্যাস, প্রতিমূর্তির ঐন্দ্রজালিক অঙ্গচ্ছেদ, আতিশয্যের প্রবণতা—এ সমস্তই বেদোত্তর হিন্দু ঐতিহ্য-সম্পৃক্ত সাহিত্যের চরিত্রলক্ষণ। আহূত দেবতাদের অধিকাংশই পৌরাণিক, তান্ত্রিক ও বৈষ্ণবীয় ধারার অন্তর্গত ঃ এমন কি, এসমস্ত সম্প্রদায়ে প্রচলিত পূজাপদ্ধতিও প্রাধান্য পেয়েছে। জাতিভেদপ্রথা দুর্লঙ্ঘ্য সামাজিক প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে ; এ-পর্যায়ে পুরোহিতদের দক্ষিণার বৈচিত্র্য ও পরিমাণ বহুগুণ বর্ধিত যেহেতু ইতোমধ্যে তাদের সামাজিক মর্যাদা প্রকৃতপক্ষে অনতিক্রম্য হয়ে উঠেছিল।

ঋগ্বিধানের বিলম্বিত আত্মপ্রকাশ শুধুমাত্র বহু পৌরাণিক বিষয়বস্তু, অর্চনাপদ্ধতি ও অর্চিত বস্তুর অন্তর্ভুক্তির মধ্যেই প্রমাণিত নয়—মূল বৈদিক সমাজ থেকে এর

প্রচুর দূরত্বের মধ্যেও এই তথ্য অভিব্যক্ত। অধ্যাত্মভাবনায় নিষ্ণাত ঋগ্বেদের 'অস্যবামীয়' সূক্তকে এখানে পাপমোচনের জন্য আবৃত্তি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; তেমনি বন্ধনদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শুনঃশেপ উপাখ্যান আবৃত্তি করার যান্ত্রিক নির্দেশ লক্ষ্য করা যায়। রতি, প্রদ্যুম্ন, কেশব, মাধব, গোবিন্দ, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ ও দামোদরের মতো দেবতারা শুধু পৌরাণিক দেবতার অস্তিত্বই প্রমাণ করে না, বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের সুদীর্ঘ ইতিহাসের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুতরাং আলোচ্য গ্রন্থকে বৈদিক ও পৌরাণিক ঐতিহ্যের অন্তর্বর্তী তাৎপর্যপূর্ণ যোগসূত্ররূপে যথাযথভাবে গ্রহণ করা সমীচীন। আরো কয়েকটি অর্বাচীন গৃহ্যসূত্রের সঙ্গে এই গ্রন্থটি আমাদের নিকট নিশ্চিতভাবে যুগসন্ধিক্ষণের লক্ষণসমন্বিত প্রত্নপৌরাণিক ও প্রাক্-হিন্দুযুগের ধর্মীয় কাঠামোটি তুলে ধরে—আপন অবৈদিক কাঠামো আবৃত করার জন্যই যাকে বৈদিক পরিচ্ছেদের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, উন্নতিশালী যে বণিক সম্প্রদায় তৎকালীন অর্থনীতি ও ফলত কিছু কিছু প্রশাসনিক ক্ষমতাও নিয়ন্ত্রণ করত, তারা সে-যুগের প্রধান ধর্মীয় প্রবণতাগুলিরও নিয়ামক হয়ে উঠেছিল। এই বণিক সম্প্রদায় যে অরক্ষণশীল অথবা অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের সঙ্গে বিশেষ ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করেছিল—তা তাদের ক্রমোন্নতির ইতিহাস থেকেই স্পষ্ট ; এছাড়া কিছু কিছু লোকদেবতার প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিল।

তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত অগ্নিবেশ্য গৃহ্যসূত্র বাধুল শাখার উপবিভাগের সঙ্গে সম্পর্কিত। রচনাটি তিনটি প্রশ্নে বিন্যস্ত হয়েছে। এদের মধ্যে পুংসবন থেকে সন্ন্যাস পর্যন্ত সবগুলি গৃহ্য অনুষ্ঠান বিবৃত হয়েছে। শেষ প্রশ্নে রয়েছে বিবিধ বিষয়বস্তু : শ্রাদ্ধ এবং গর্ভবতী ও সংসার-পরিত্যাগীর জন্য অনুষ্ঠান ছাড়াও 'নারায়ণ-বলি'র মতো পিতৃপুরুষের উদ্দেশে আয়োজিত অনুষ্ঠান ও 'শকল-হোমে'র মতো গৌণ আচারও এতে রয়েছে। আবার এই গ্রন্থে বিবৃত কয়েকটি অনুষ্ঠান অন্য কোথাও পাওয়া যায় না : 'স্থাগরালঙ্কার' নামক বিচিত্র অনুষ্ঠানে আটটি বস্তু ব্যবহৃত হত—মালাবার অঞ্চলে এটি সাধারণত 'অষ্টমাঙ্গল্য' নামে পরিচিত এবং বঙ্গদেশে অনুষ্ঠিত একটি আচারের সঙ্গে এর সাদৃশ্য বেশ স্পষ্ট। অনেকটা তান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত দেবতারাধন অংশে 'যন্ত্র' উল্লিখিত হলেও প্রতিমার কোনো উল্লেখ নেই—সম্ভবত তা পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছিল। বোধায়ন, কুশহারীত, পুষ্করসাদি ও কৌষীতকি—এই চারজন শিক্ষকের নামও উল্লিখিত হয়েছে।

অগ্নিবেশ্য গৃহ্যসূত্রকে অর্বাচীন রচনা বলে মনে হয় ; বৌধায়ন শাখার সঙ্গে এর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে—সম্ভবত তা এর বিকল্প পাঠান্তর। মহাকাব্যিক অনুষ্টুপ ছন্দে দীর্ঘ স্তবকগুলি রচিত হওয়ার মধ্যে এর নবীনতা স্পষ্ট ; তবে এই শ্লোকগুলি

পরবর্তীকালের সংযোজনও হতে পারে। এমন কি, প্রাচীন সূত্র আঙ্গিকে রচিত অংশ অপেক্ষা এর গদ্যাংশ অনেক বেশি সম্পূর্ণতর। যদিও রচনার মধ্যে বেশ কিছু অপাণিনীয় শব্দ ব্যবহার রয়েছে, তবু এর ভাষাকে খুব একটা প্রাচীন বলা যায় না।

কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্র দুটি প্রশ্নে বিন্যস্ত—প্রতি প্রশ্ন আটটি পটলে বিভক্ত। প্রথম প্রশ্নে বিবৃত উপনয়ন উৎসবে আমরা 'শাক' ও 'জম্ভ' নামে দুটি নূতন গ্রহের কথা জানতে পারি। ঐন্দ্রজালিক আচার সম্পর্কিত একটি দীর্ঘ অংশের পরে বিবাহ অনুষ্ঠান আলোচিত হয়েছে। এছাড়া রয়েছে দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ আকস্মিক দুর্ঘটনা ও অবস্থা সম্পর্কে আচার ও ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান। গুরুগৃহ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মাতাপিতার প্রতি বিদ্যার্থীর কর্তব্য ও বিবাহের পর গার্হস্থ্য আশ্রমের সূচনা এবং তদপযোগী প্রার্থনা বর্ণিত হয়েছে। প্রার্থিত বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের মধ্যে সেযুগের আর্থসামাজিক পরিস্থিতির নিদর্শণ পাওয়া যায়। এছাড়া প্রথম প্রশ্নে রয়েছে যজ্ঞাগ্নির প্রজ্জ্বলন ও গৃহনির্মাণ। দ্বিতীয় প্রশ্নের সূচনা হয়েছে জন্মপূর্ববর্তী অনুষ্ঠান দিয়ে ; তারপর জন্মকালীন অনুষ্ঠান, নামকরণ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। শিশুর একটি গোপন নামের ব্যবস্থায় আদিম মানুষের মানসিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত রহস্য ও ঐন্দ্রজালিক চেতনা অভিব্যক্ত। কৈশোরকালীন অনুষ্ঠানগুলির পরে আচারগত বিচ্যুতি ও তজ্জনিত প্রায়শ্চিত্ত বর্ণিত হয়েছে। বিবিধ সারমেয়-দানবের মধ্যে যে 'দূলা' নামটি পাওয়া যায়, তা ছ'জন কৃত্তিকার অন্যতমা এই নামেরই অধিকারিণী। তৎপরবর্তী অনুষ্ঠান 'শূলগব'-এ বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে চন্দন উল্লিখিত হওয়ায় দাক্ষিণ্যাত্যের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক আভাসিত হয়েছে, যেহেতু কেবলমাত্র সেই অঞ্চলেই চন্দনবৃক্ষ দেখা যায়। রুদ্রের পানীয়রূপে সুরা ইত্যাদি নির্দেশিত হওয়ায় আমাদের মনে হয় এর অন্তরালে রয়েছে কোনও আদিম লৌকিক দেবতা বা অশুভ আত্মার উপস্থিতির প্রভাব। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের একটি বিচিত্র প্রার্থনায় যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে শিথিলতার ইঙ্গিত রয়েছে। অষ্টকা অনুষ্ঠানে পিতৃপুরুষের প্রতি গোমাংস নিবেদিত হয়েছে। একে একে শ্রাবণ অনুষ্ঠান, স্নাতক অনুষ্ঠান, প্রাচীন শিক্ষকদের তালিকা এবং জ্বর, ক্রোধ, ধর্ম প্রভৃতি বিশুদ্ধ বিমূর্ত বস্তুর সঙ্গে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন, বাজশ্রব, বিষ্ণু, রুদ্র, স্কন্দ ও কাশীশ্বর প্রভৃতি বশিষ্ঠ ও পরাশর দ্বারা উল্লিখিত হয়েছেন। অধ্যয়নের বিষয়সমূহের মধ্যে ইতিহাস ও পুরাণ উল্লিখিত হওয়ায় আলোচ্য গ্রন্থ যে পরবর্তীকালে রচিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। পদপাঠের রচয়িতারূপে আত্রেয়, ভাষ্যকাররূপে কৌণ্ডিণ্য ও সত্যাষাঢ় হিরণ্যকেশীর উল্লেখ এবং অরণ্যবাসী মুনি, শিক্ষক ও যতিদের বর্ণনা এবং একপত্নীক ব্যক্তিদের প্রশংসা থেকে তৎকালীন সমাজের পরিস্থিতি সম্পর্কে কতকটা ধারণা করে নেওয়া হয়েছে।

খাদির গৃহ্যসূত্র দ্রাহ্যায়ণ নামেও পরিচিত ; এর পাঁচটি পঞ্চিক প্রত্যেকটি কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত। এতে কয়েকটি নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে যেমন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের যথাযথ সময় ও ক্রিয়াপদ্ধতি, গৃহের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান এবং সমৃদ্ধিকামী ব্যক্তির আচরণীয় ক্রিয়া। হোতা ও ব্রহ্মাশ্রেণীর পুরোহিতদের ক্রিয়াকর্মকে সংযুক্ত করার জন্য প্রদত্ত একটি নির্দেশ আমরা সেই যুগের অভিব্যক্তি দেখি যখন একজন মাত্র পুরোহিত যজ্ঞ সমাধা করতেন। যজ্ঞ সম্পর্কিত কিছু কিছু নির্দেশ থেকে বিলাসী সমাজের চিত্র পাওয়া যায়।

সামবেদের গোভিল গৃহ্যসূত্র কৌথুম শাখার মন্ত্র-ব্রাহ্মণের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। চারটি প্রপাঠকে বিন্যস্ত এই গ্রন্থটি কয়েকটি কণ্ডিকায় বিভক্ত ; তবে এই বিভাগ নিতান্ত কৃত্রিম। যদি প্রতি ভাগকে একটি দিনের পাঠরূপে গ্রহণ করা যায়, শুধুমাত্র তা হলেই এর অর্থবোধ হতে পারে। প্রধানত সূত্রশৈলীর গদ্যে রচিত এই গ্রন্থে অল্প কয়েকটি শ্লোকও পাওয়া যায়। স্নান, শ্রাদ্ধ ও সান্ধ্য অর্চনা সম্পর্কিত আরো পাঁচটি গ্রন্থের রচয়িতা রূপে গোভিলের নাম উল্লিখিত হয়ে থাকে। গোভিল গৃহ্যসূত্রে বিষয়বস্তুর অনুরূপ ; শুধু সামমন্ত্র গায়ক ছাত্রের উপর অধিকতর গুরুত্ব এখানে আরোপিত হয়েছে। পক্ষিমাংস ভক্ষণ তার পক্ষে নিষিদ্ধ হওয়ায় মনে হয়, এটি সহানুভূতিনিষ্ঠ ইন্দ্রজালের প্রতি বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত—সুরশিক্ষার্থীর পক্ষে সুরস্রষ্টা জীবের প্রতি নিষ্ঠুরতাকে নিরস্ত করার অভিপ্রায়েই এ নির্দেশ পরিকল্পিত। গোভিলপুত্র রচিত গৃহ্য-সংগ্রহ প্রকৃতপক্ষে গোভিল গৃহ্যসূত্রের পরিশিষ্ট এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের প্রয়োজন নির্বাহ করার জন্য তা পরিকল্পিত। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গার্হপত্য অগ্নি যে ছত্রিশটি ভিন্ন ভিন্ন নাম পরিগ্রহ করে, তার বিবরণ দিয়ে এই গ্রন্থের সূত্রপাত ; এই অগ্নিতে আহুতিদানের তাৎপর্য. মহত্ত্ব ও তার যথার্থ পদ্ধতি এবং উপযুক্ত ইন্ধন প্রয়োগের উপর এখানে গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। প্রধানত যে সমস্ত বিষয় এই রচনায় আলোচিত, তার মধ্যে রয়েছে—আনুষ্ঠানিক আসনভঙ্গি, যজ্ঞবিষয়ক দেবতার পবিত্রতা, কুশ-ব্যবহারের উপযুক্ত ক্ষেত্র, আনুষ্ঠানিক স্নান, সুরার ব্যবহার, বালিকাদের বিবাহের উপযুক্ত বয়স, উপনয়ন, আহুতি প্রদান, শ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মণ-ভোজন আনুষ্ঠানিক অশুচিতা ও তার প্রতিবিধান, স্বকীয় বৈদিক শাখার প্রতি আনুগত্য এবং তদভাবে অনৌচিত্য ইত্যাদি।

লৌগাক্ষি গৃহ্যসূত্র (কাঠক, চরক ও চারায়ণীয় নামেও পরিচিত) কৃষ্ণ যর্জুবেদের কাঠক শাখার অন্তর্গত এবং মহাকাব্যিক শৈলীতে এর শ্লোক সমূহ রচিত হওয়ায় মনে হয় এটি পরবর্তী কালের গ্রন্থ। বিষয়বস্তুর বিন্যাসে কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনার ছাপ নেই। মানব ও বারাহ গৃহ্যসূত্রের সঙ্গে এই গ্রন্থের প্রচুর সাদৃশ্য রয়েছে। সাধারণত অন্যান্য গৃহ্যসূত্রে যে সমস্ত বিষয়-বস্তু পরিলক্ষিত হয়, লৌগাক্ষি গৃহ্যসূত্রেও সেসব

পাওয়া যায়। তবে নববধূর শুদ্ধীকরণ ও বধূবরণ অনুষ্ঠানের উপর এতে কিছু গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে ; এছাড়া দেবপূজায় প্রযুক্ত পবিত্র সঙ্গীতও কিছু গুরুত্ব পেয়েছে। যোগ্য ছাত্রদের তালিকায় ধনদাতা অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় স্পষ্টত এই তথ্য আভাসিত হচ্ছে যে ইতোমধ্যে শিক্ষাজগতেও কিছু পরিমাণে বাণিজ্যিক মনোভাব সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। বৈদিক বিদ্যার পক্ষে উপযুক্ত অন্যবিধ ব্যক্তিরূপে শিক্ষকের জন্য কায়িক পরিশ্রমে নিরত কর্মকৃৎ নির্দেশিত হয়েছে। বালিকাদের বিবাহের উপযুক্ত বয়স ছিল দশ বা বারো ; কুমারীদের জন্য দুটি বিশেষ উৎসব ছিল 'রাকা' ও 'হোলকা'। গার্হস্থ্য অঙ্গল মোচনের জন্য পরিকল্পিত বিভিন্ন সাময়িক অনুষ্ঠান, রাক্ষস, মূষিক ও কপোতের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হত। পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ নামক পিতৃপুরুষের উদ্দেশে নিবেদিত অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত অন্ন দিয়ে ব্রাহ্মণদের ভোজন করাতে হত। এই শেষোক্ত অনুষ্ঠানটি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকলেও এইরূপ ব্রাহ্মণদের সমাজে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা হয়, কারণ সম্ভবত এরা প্রাচীনতর কালেও সামাজিকভাবে হেয় ছিলেন। যেসব অমঙ্গলপ্রদ অপশক্তিকে বিতাড়নের চেষ্টা করা হয়, তাদের মধ্যে অধিকাংশ নাম অন্যান্য গৃহ্যসূত্রে পাওয়া গেলেও চুপনী—এই নূতন নামও পাওয়া যায়। ছয়জন কৃত্তিকার অন্যতমা চুপুনিকা নামটির উৎস এখনও পর্যন্ত অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত বৌধায়ন গৃহ্যসূত্র চারটি প্রশ্নে বিন্যস্ত ; এদের মধ্যে প্রথমটির বিবাহক্রিয়া দিয়ে শুরু এবং গর্ভাবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানগুলির চূড়ান্ত রূপটি দিয়ে সমাপ্তি। দ্বিতীয় প্রশ্নের শুরুতে রয়েছে জন্মকালীন অনুষ্ঠান এবং ক্রমে ক্রমে এতে বাল্যবস্থা বেদাধ্যয়ন ও গার্হস্থ্যসংক্রান্ত অনুষ্ঠানগুলি আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় প্রশ্নে বিবৃত হয়েছে বিবিধ আনুষ্ঠানিক বিচ্যুতি ও প্রায়শ্চিত্ত, সর্প ও অন্যান্য উপদেবতার শান্তিবিধান এবং কল্যাণ-বিধানের জন্য কিছু কিছু অনুষ্ঠান। শেষ অধ্যায়ে বিবিধ আকস্মিক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত নিয়মাবলী কথিত হয়েছে যাদের মধ্যে রয়েছে ভাবী অমঙ্গলসূচক লক্ষণ এবং তৎপ্রসূত অমঙ্গল নিবারণের উপযোগী অনুষ্ঠান সমূহ। রচনার প্রধান অংশের পরে যে পরিভাষা অংশটি রয়েছে তাতে আনুষ্ঠানিক স্নান, শুভদিন ও গৃহস্থের পক্ষে অবশ্য পালনীয় পঞ্চবিধ অনুষ্ঠানের নিয়মাবলী বিবৃত হয়েছে। এর পরবর্তী অংশটি গৃহ্যশেষ রূপে অভিহিত ; যে-সমস্ত বিষয় পূর্বসূরীদের রচনায় যথাযথভাবে আলোচিত হয় নি, এতে সে-সব স্থান পেয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে বিষ্ণু, রুদ্র, দুর্গা, রবি, জ্যেষ্ঠ, বিনায়ক, ঈশান প্রভৃতি দেবতার প্রতিমায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠার এবং নারায়ণের প্রতি অর্ঘ্য নিবেদনের নিয়মাবলী—এই অংশে আমরা পৌরাণিক যুগের প্রাথমিক পর্বে প্রবেশ করেছি। পিতৃমেধ ও পিতৃমেধ-শেষ সম্পর্কে বৌধায়ন রচিত আরো দুটি সম্পূরক রচনার সন্ধানও পাওয়া যায়। তেইশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্রের বিষয়বস্তুর সঙ্গে এর পার্থক্য খুব সামান্য—তবে গার্হপত্য

অগ্নিপ্রজ্বালন এবং নববধূর সঙ্গে সম্পর্কিত অনুষ্ঠান-সমূহের উপর এতে অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। অপর স্ত্রী গ্রহণ করা থেকে স্বামীকে নিবৃত্ত করার জন্য এবং স্বামীর মন আকৃষ্ট করার জন্য পত্নী কর্তৃক পালনীয় অনুষ্ঠানও এখানে রয়েছে। বিবাহ মণ্ডপে উপস্থিত হওয়ার পর বরকে একটি গোদান করে তবে তাকে অভ্যর্থনা জানানো হত। বধূ ও বরের মধ্যে শুভ ও অশুভসূচক লক্ষণ নির্ণয়ের চেষ্টায় লোকায়ত বিশ্বাসের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রায় সমস্ত অনুষ্ঠানে ইন্দ্রজালের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অষ্টকা শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে গোমাংস অর্পিত হওয়ায় মনে হয় গোমাংস ভক্ষণ সম্পর্কে সামাজিক নিষেধ তখনও পর্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল না। তুলনামূলকভাবে নূতন দেবতারূপে ঈশানকে কেন্দ্র করে পৃথক চর্যাবিধি যে গড়ে উঠেছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্পূরক রচনা অর্থাৎ গৃহ্যাশেষে আমরা একটি বিশেষ ধরনের চেষ্টায় সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি লক্ষ্য করি যেখানে গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানের সীমাকে নূতন যুগের ধর্মবোধে প্রসারিত করে ক্রমোন্নতিশীল পৌরাণিক পূজা-পদ্ধতিকে আত্মস্থ করার প্রক্রিয়া দেখা যায়। এই গৃহ্যাশেষ ছাড়াও আমরা একটি আপস্তম্ব গৃহ্যপরিশিষ্টের সন্ধান পাই যা আপস্তম্ব শাখার গৃহ্য অনুষ্ঠান-বিষয়ক রচনার পদ্যে গ্রথিত ও পরবর্তীকালে প্রণীত পরিশিষ্ট। বধূসম্প্রদানের সময় বধূ ও বরের মাতামহ ও পিতামহের নাম আমরা উল্লিখিত হতে দেখি কিন্তু তাদের মাতামহী ও পিতামহীর নাম উল্লিখিত হয় না—এটি পূর্ণবিকশিত পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থারই নিদর্শন। ইতোমধ্যে গ্রহগুলি দেবতায় পরিণত হয়ে পূজা পেতে শুরু করেছে। গ্রহগুলি প্রতিমারূপে পূজিত হত ; প্রত্যেক প্রতিমার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিমাপ ছিল এবং গোষ্ঠীগত অবস্থানে তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ভূমিকাও ছিল সুপরিমিত। রাজা ও ব্রাহ্মণের উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে, তাঁরা উপাসকদের যথোপযুক্ত প্রতিদান দিয়ে থাকেন এবং অবজ্ঞাকারীদের বিনাশ করেন। কূপ ও পুষ্করিণী খননের মত পূর্তকর্ম সম্পর্কে যে সমস্ত নিয়ম বিবৃত হয়েছে—তার মধ্যে রয়েছে ব্রাহ্মণদের বিপুল দক্ষিণা ও ভোজ্যদ্রব্য অর্পণের নির্দেশ। এছাড়া এতে স্বাধ্যায় সম্পর্কিত যেসব নির্দেশ রয়েছে, তা থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে ইতিমধ্যে উপনিষদের জনপ্রিয়তা বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মানব গৃহ্যসূত্র কৃষ্ণযজুর্বেদের মৈত্রায়ণীয় শাখার অন্তর্গত। এর দুটি খণ্ড আবার পঁয়তাল্লিশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। ছাত্রাবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানগুলি এখানে সানুপুঙ্খ আলোচিত হয়েছে এবং এই অনুষ্ঠানগুলি দিয়ে গ্রন্থ সূচনা হওয়ার পর গার্হস্থ্য জীবনের সূচনা যে বিবাহ অনুষ্ঠান তার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। শেষ অংশে বিভিন্ন ঋতুকালীন যজ্ঞ এবং দৈবদুর্বিপাকের সঙ্গে সম্পর্কিত অনুষ্ঠান বিবৃত হয়েছে। আরো কয়েকটি গৃহ্যসূত্রের মতো মানব গৃহ্যসূত্রেও সেই বিদ্যার্থীদের সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত অংশ

রয়েছে যারা উপনিষদ্ অধ্যয়নের পক্ষে অধিকারী। ছাত্রাবস্থায় কৃত পাপ সম্পর্কিত আলোচনায় বলা হয়েছে যে-কোনো মহাপাতকের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হল যুদ্ধে মৃত্যুবরণ। বিবাহের পাঁচটি উদ্দেশ্য কল্পিত হয়েছে ; সম্পদ, সৌন্দর্য, জ্ঞান, বুদ্ধি ও সাহচর্য। যদি সবগুলি একসঙ্গে না পাওয়া যায়, তবে পূর্বোক্ত ক্রম অনুযায়ী প্রথম তিনটি বর্জন করা যেতে পারে। অতিথিকে আপ্যায়নে গোমাংস নিবেদন করা ছিল বাধ্যতামূলক ; তবে গৃহস্থের কর্তব্যও ছিল অতিথিদের সঙ্গে আরো চারজন ব্রাহ্মণকে মাংস-ভোজনে আমন্ত্রণ করা। কর্ম সঙ্ঘ অনুষ্ঠানে সীতা ও রেবতী নামে দুজন নূতন দেবতা উল্লিখিত হয়েছেন। 'বিনায়ক কল্প' ও 'ষষ্ঠীকল্পে'র মতো নূতন অনুষ্ঠান এই গ্রন্থে প্রথম পাওয়া যায়।

তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত ভরদ্বাজ গৃহ্যসূত্র তিনটি প্রশ্ন ও সাতাশিটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। গৃহ্যসূত্রের সমস্ত প্রচলিত বিষয়বস্তু এতে আলোচিত হয়েছে ; এতে রয়েছে বিবাহ, গৃহস্থের পালনীয় অনুষ্ঠান-সমূহ, বিশেষ জরুরি কিছু আচার, প্রায়শ্চিত্ত এবং মৃত্যু, অন্ত্যেষ্টি ও প্রেতক্রিয়ামূলক অনুষ্ঠান। এই গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে যে বুদ্ধিমতী নারীকে বিবাহ করা উচিত এবং এই সঙ্গে উপযুক্ত পত্নী নির্বাচনের জন্য কিছু কিছু শুভ লক্ষণের তালিকাও রয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলা হয়েছে যে সমস্ত শুভ লক্ষণ বর্তমান থাকলেও নিজস্ব মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী বধূ নির্বাচন করা উচিত, যে স্বামীর হৃদয় এবং চক্ষু, এই দুই এর পক্ষেই প্রীতিকর হবে। তৎকালীন পরিস্থিতির পক্ষে এরূপ উদারতাপূর্ণ মনোভঙ্গীর প্রকাশ সত্যিই বিস্ময়কর। এই ভরদ্বাজ গৃহ্যসূত্রটি প্রাচীনতর ও দীর্ঘতর গৃহ্যসূত্রগুলির অন্যতম।

মৈত্রায়ণীয় শাখার অন্তর্গত বারাহ গৃহ্যসূত্র চরক উপশাখায় বিন্যস্ত এবং সম্ভবত তা খ্রিস্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল। এই গ্রন্থটি সতেরোটি খণ্ডে বিভক্ত, এদের মধ্যে প্রথমটি প্রকৃতপক্ষে মৈত্রায়ণীয় সূত্রের পরিশিষ্ট। বাকি অংশসমূহে গৃহ্যসূত্রের প্রচলিত বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে ; যেমন নবজাত শিশুর জন্য অনুষ্ঠান, দীক্ষা, বেদাধ্যয়ন ও অনধ্যায়-এর নিয়মাবলী বিবাহ, গর্ভবতী নারীর উপযোগী অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

বৈখানস-সূত্র অর্বাচীনতম সূত্রসাহিত্যের নিদর্শন। সাতটি প্রশ্নে বিন্যস্ত বৈখানস্ গৃহ্যসূত্র আবার কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত। এই গ্রন্থে যথাক্রমে আনুষ্ঠানিক স্নান, এবং চতুরাশ্রমের জন্য মুখ-প্রক্ষালন, অগ্নিবিষয়ক অনুষ্ঠান, পিতৃপুরুষের উদ্দেশে অনুষ্ঠান, স্নাতক, বিদ্যার্থী ও গৃহস্থদের জন্য অনুষ্ঠান বিবৃত হয়েছে। বহু অনুষ্ঠানে অপরিচিত দেবতা বা প্রেতাত্মাকে আহ্বান জানানো হত। বাসভবন শুদ্ধীকরণের জন্য অনুষ্ঠানের পরে প্রচলিত গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানগুলি অর্থাৎ গর্ভাধান থেকে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত ব্যাপ্ত সমস্ত আচার আলোচিত হয়েছে। শ্রাদ্ধ এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াসমূহ এই রচনায় বিশেষ গুরুত্ব

পেয়েছে। তারপর আকস্মিক দুর্ঘটনা ও অশুভ লক্ষণ নিরাকরণের উপযোগী প্রায়শ্চিত্ত বর্ণিত হয়েছে ; আনুষ্ঠানিক অশৌচ অবস্থা সম্পর্কেও আলোচনা এতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থটি সম্ভবত খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে রচিত হয়েছিল। বইটির অষ্টম ক্ষেত্রে দশম প্রশ্নের নাম বৈখানস্ ধর্মসূত্র।

অথর্ববেদের শৌনক শাখার অন্তর্গত 'কৌশিক সূত্র' বা 'সংহিতা বিধি' একমাত্র অথর্ববেদীয় গৃহ্যসূত্ররূপে পরিচিত। এর নামকরণের মধ্যে 'গৃহ্য' শব্দটি উল্লিখিত হয় নি, একে শুধুই সূত্র বলে অভিহিত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে 'বৈতানসূত্র' নামের মধ্যে শ্রৌত কথাটি অনুল্লিখিত থাকলেও বিষয়গুলির দিক থেকে শ্রৌতসূত্ররূপে তা গৃহীত হওয়ার পক্ষে কোনও বাধা নেই। কৌশিকসূত্র বিশুদ্ধ গৃহ্যসূত্র বা বিশুদ্ধ শ্রৌতসূত্র নয়—এই উভয়ের সংমিশ্রণ। অথর্ববেদ সংহিতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত এই গ্রন্থটি অথর্ববেদীয় মন্ত্রের যজ্ঞীয় বিনিয়োগ নির্দেশ করতে চেয়েছে এবং বহুবার একই মন্ত্রের জন্য একাধিক অনুষ্ঠানের বিধান দিয়েছে। যেমন বিবাহ ও তৎসম্পর্কিত স্ত্রী-আচার, জন্মকালীন অনুষ্ঠান ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। যদিও এটি শৌনক শাখার অন্তর্গত তথাপি সূত্র সাহিত্যের অর্বাচীনতম গ্রন্থগুলির অন্যতমরূপে এটি কখনো কখনো অন্য তিনটি অথর্ববেদীয় শাখায় অর্থাৎ জলদ, জাজল ও ব্রহ্মদেব, শাখায় প্রচলিত আচার পদ্ধতির উল্লেখ করেছে। একদিক দিয়ে কৌশিকসূত্রকে আমরা অথর্ববেদ সংহিতার অনুষ্ঠানমূলক ভাষ্যরূপে গ্রহণ করতে পারি। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের রচনা হলেও এর বিষয়বস্তু অথর্ববেদের প্রাচীনতম অংশেরই সমকালীন।

গৃহ্যসূত্রের উৎস

একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিক দিয়ে গৃহ্যসূত্রগুলি ব্রাহ্মণ সাহিত্য ও অথর্ববেদ থেকে প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভব হয়েছে। আর শ্রৌতসূত্রগুলি উদ্ভূত হয়েছে শুধু ব্রাহ্মণ সাহিত্য থেকে। অথর্ববেদ সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা দেখেছি যে তা অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও আদর্শগত বাতাবরণ সৃষ্ট হয়েছিল ; একদিকে ছিল তিনটি বেদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও প্রয়োগবিধি-জনিত একমুখী সংস্কৃতি এবং অন্যদিকে অথর্ববেদ— যা কিছু মৌলিক উপায়ে ত্রয়ীর তুলনায় শুধুমাত্র ভিন্ন ছিল না, সম্পূর্ণ বিরোধিতাও করেছিল। পরবর্তীকালে অথর্ববেদের স্বীকৃতিলাভের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল এই ধারায় প্রচলিত গৃহ্য অনুষ্ঠানসমূহের প্রবল উপস্থিতি। সামূহিক শ্রৌত অনুষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্র করে সামাজিক জীবন সম্পূর্ণত গড়ে উঠেছিল ; জনসাধারণ তাদের পারিবারিক, গার্হস্থ্য ও ব্যক্তিগত জীবনযাপনে বহুবিধ বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হত—ব্রাহ্মণ সাহিত্য

বা শ্রৌতসূত্রগুলি দিয়ে যাদের পুরোপুরি সমাধান করা যেত না। এইসব ক্ষেত্রে জরুরি প্রয়োজনসমূহ ছিল নিতান্ত বাস্তব ও পৌনঃপুনিক ; এইগুলি অবস্থার উন্নতি সাধন, শান্তিবিধান, প্রেতবিতাড়ন ও আশীর্বাদ প্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত আনুষ্ঠানিক প্রতিবিধান অনিবার্য করে তুলেছিল। অথর্ববেদ তার ব্যবস্থা করেছিল ; সুদূর অতীত কাল থেকে বৈদিক ধর্মের পশ্চাৎপটে অথর্ববেদীয় পুরোহিতেরা সক্রিয় ছিলেন এবং জনসাধারণের বিপদে পড়ে তাদের শরণাপন্ন হতেন। তারপর ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট সময়ে ক্রমোন্নতিশীল ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রধানরা প্রতিবেশী রাজাদের আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত হওয়ার জন্য ঐন্দ্রজালিক প্রতিরক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। প্রাচীনতর ধর্মে এধরনের সুরক্ষার ব্যবস্থা খুব কমই ছিল ; তাই অথর্ববেদীয় পুরোহিত যখন উদ্যোগী হলেন, তাঁকে রাজপুরোহিতরূপে নিয়োগ করা হল এবং কালক্রমে তাঁর গোষ্ঠী ও মতবাদ বিলম্বিত স্বীকৃতি লাভ করল। এই স্বীকৃতি প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত অনিচ্ছা সত্ত্বেই দেওয়া হয়েছিল ; কিন্তু রাজপুরোহিত রূপে অথর্ববেদীয় পুরোহিত যেহেতু একটি ক্ষমতাসম্পন্ন অবস্থান থেকে দরকষাকষি করতে সমর্থ ছিলেন তাই তিনি আপন অধিকার অর্জন করে নিলেন। তার জয়ের স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে ঃ সমগ্র যজ্ঞদক্ষিণার অর্ধেক অংশ একা ব্রহ্মার প্রাপ্য, বাকি অর্ধেক হোতা, উদ্গাতা ও অধ্বর্যুর। অন্যভাবে বলা যায়, অন্য তিনজন পুরোহিত একত্রে যা লাভ করতেন, ব্রহ্মাশ্রেণীর পুরোহিত একাই তা পেয়ে যেতেন। অথর্ববেদীয় পুরোহিতের ক্ষমতার অপর বাস্তব উৎস নিহিত ছিল গার্হস্থ্য ক্ষেত্রে তাঁর বিপুল নিয়ন্ত্রণের মধ্যে—সেখানে তাঁর মতবাদ ও ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকলাপ অবিসংবাদী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। সমগ্র সূত্রসাহিত্য যেহেতু পরবর্তীকালে রচিত, গৃহ্যসূত্রগুলিতে শুধুমাত্র অথর্ববেদের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির জয় প্রতিফলিত হয় নি , অন্যান্য বেদের শাখাগুলিতেও তার অন্তর্ভুক্তি প্রমাণিত হয়েছে। অথর্ববেদের পরিগ্রহণের পশ্চাতে রয়েছে লোকায়ত ধর্মের স্বীকৃতি অর্থাৎ নিজস্ব দেবতা, আচার অনুষ্ঠান, প্রত্নকথা ও বিশ্বাসসহ লঘু ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্তি। তাই এখানে আমরা বহু-সংখ্যক অপরিচিত অর্ধদেবতা, উপদেবতা, দানব ও পিশাচ প্রভৃতির সম্মুখীন হই, কেননা লোকায়ত ধর্ম মূলত এদের সঙ্গে সম্পর্কিত। এসময়ে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের উল্লেখ আমরা লক্ষ্য করি—হস্তরেখা-বিচার, সর্ববিধ ভবিষ্যৎ-কথন, জ্যোতির্বিদ্যা অর্থাৎ অন্তরিক্ষ-সংশ্লিষ্ট বস্তুসমূহ থেকে আহৃত শুভাশুভ গণনা, স্বপ্নবিশ্লেষণ করে আসন্ন ঘটনার পূর্বাভাস নির্ণয়, বস্ত্রে মূষিকদংশনের ফলে উদ্ভূত চিহ্ন ব্যাখ্যা করে ভবিষ্যদবাণী অগ্নির উদ্দেশে যজ্ঞ, বহুবিধ দেবতার প্রতি অর্পিত অর্ঘ্য, শুভাশুভ স্থান নিরূপণ, প্রেত-সঞ্চালন, সর্প-নিয়ন্ত্রণ বিদ্যা, প্রেতাবিষ্ট বালিকার মাধ্যমে দেবতাদের পরামর্শ গ্রহণ, পরমদেবতার উপাসনা, ব্রতপালন ও মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা সন্তান-উৎপাদনের শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস ইত্যাদি।

এই পর্যায়ে জনপ্রিয় ধর্মের মধ্যে বৃহৎ ও লঘু ঐতিহ্যের যে বিচিত্র সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়, তার সম্ভাব্য কারণ এই যে, দুটি ধারার মধ্যে পরস্পর অভিমুখীনতা সর্বদা অব্যাহত ছিল। তাই দীর্ঘ-নিকায়ের মহাসময়সুত্তন্ত অংশে পৃথিবী ও বিশাল পর্বতসমূহের আত্মা, দিকসমূহের চারজন অধিপতি, গন্ধর্ব, নাগ, গরুড়, দানব এবং ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও সনৎকুমার উল্লিখিত। 'বেদাঙ্গ'গুলিতে বিদেহী আত্মার উপাসনা অধিকতর প্রকট ; কারণ আদিম মানুষের মানসিকতায় বিশ্বজগৎ বৈরিতাকামী মন্দ আত্মার পরিপূর্ণ যারা নিয়ত মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য ও সুখ আক্রমণ এবং ধ্বংস করতে উদ্যত। তাই বহুদূর পর্যন্ত গৃহ্য অনুষ্ঠানগুলি আপাত-দৃষ্টিতে নেতিবাচক, মুখ্যত অমঙ্গল দূর করাই এগুলির উদ্দেশ্য।

শ্রৌত ও গৃহ্য অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে বিপুল অংশ এক সাধারণ বৃত্তের অন্তর্গত ; যেমন অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস, পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ এবং কিছু কিছু চাতুর্মাস্য অনুষ্ঠান উভয়বিধ গ্রন্থেই আলোচিত হয়েছে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি মাত্র কল্পসূত্রই প্রচলিত ছিল ; পরবর্তীকালে অনুষ্ঠানসমূহ বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী রচনাকে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছিল। তিনটি যজ্ঞাগ্নির প্রয়োগদ্বারাও নির্ধারিত হত—কোন বিষয় কোন শাখার অন্তর্ভুক্ত হবে ; শ্রৌত যাগে যেহেতু এই তিনটি অগ্নিরই প্রয়োজন ছিল, তাই এই তিনটির যে কোনো একটি অগ্নিদ্বারা অনুষ্ঠিত যে কোনো যজ্ঞ প্রাচীনতম শ্রৌতসূত্র গুলিতে আলোচিত হয়েছিল এবং ফলত প্রত্যেকটি গৃহ্য অনুষ্ঠান তার অন্তর্ভুক্ত হল। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে এমন কিছু বিষয় সন্নিবিষ্ট হয়েছে যা গৃহ্যসূত্রগুলির পক্ষে উপযোগী ; স্পষ্টত এর কারণ এই যে, সে সময় কোনো পৃথক সূত্র সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল না—গৃহ্যসূত্রের তো কোনো প্রশ্নই উঠে না। উপনয়ন, গার্হপত্য অগ্নির প্রতিষ্ঠা, বিবাহ, মৃত্যু ও মরণোত্তর শ্রাদ্ধাদি এসবই মূলত গৃহ্যানুষ্ঠান—এগুলি ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতেও আলোচিত হয়েছে। যখন পৃথক শ্রেণীর রচনারূপে সূত্রগুলিতে আলোচিত হয়েছে। যখন পৃথক শ্রেণীর রচনারূপে সূত্রগুলি রচিত হতে লাগল, তখনো যে মিশ্র বিষয়বস্তু-নির্ভর একটি সূত্র ছিল—তা আপাস্তম্ব সূত্র থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। এই গ্রন্থের প্রথম চৌদ্দটি অধ্যায়ে শ্রৌতসূত্রটি গঠিত ; তারপর যথাক্রমে পরিভাষা ও গৃহ্যসূত্রের মন্ত্রপাঠ অংশ পাওয়া যায় ; শেষ দুটি অধ্যায়ে ধর্ম ও শুল্ব সূত্রগুলি গঠিত হয়েছে। এর থেকে আমরা কল্পসূত্র সাহিত্যের স্পষ্ট ঐতিহাসিক স্তর সম্পর্কে অবহিত হই ; এর প্রাথমিক স্তরে প্রতি শাখা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিল।

সামূহিক বৈদিক যজ্ঞে তিনটি অগ্নি প্রয়োজনীয় ছিল—আহবনীয়, দক্ষিণা ও গার্হপত্য—মোটামুটিভাবে এগুলি দেবতা, পিতৃপুরুষ ও মানুষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এদের মধ্যে শুধুমাত্র গার্হপত্য অগ্নি গৃহ্য অনুষ্ঠানগুলিতে ব্যবহৃত হয়। শতপথ ব্রাহ্মণের

একটি দেবকাহিনীতে ইড়া বা শ্রৌত যাগের যজ্ঞীয় হব্যের উৎস বর্ণিত হয়েছে। এটা যেহেতু মনু কর্তৃক নিবেদিত প্রথম পাকযজ্ঞে উদ্ভূত হয়েছিল, তাই কোনো পাকযজ্ঞে ইড়া নেই। প্রকৃতপক্ষে এই অনুপস্থিতি সামূহিক ও গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানগুলির প্রধান প্রতীকী পার্থক্যকে সূচিত করছে। এদিক দিয়ে এই শেষোক্ত অনুষ্ঠানগুলি প্রাচীনতর ও অধিকতর সর্বজনীন—সম্ভবত ইড়া আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে কোনও সময়ে এর উদ্ভব হয়েছিল।

ধর্ম

গৃহ্যসূত্রগুলি ভারতবর্ষের ধর্মীয় ইতিহাসের একটি অত্যন্ত কৌতূহলজনক ও তাৎপর্যপূর্ণ স্তরের প্রতিনিধিত্ব করছে। এই সাহিত্য বৌদ্ধযুগের পরবর্তী এমন একটি সময়ে রচিত যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ভিত্তি কঠোরতম আঘাতে পতনোন্মুখ। অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম তাকে একদিক দিয়ে উন্মেষশীল দর্শন প্রস্থানগুলির সঙ্গে একটি আপোসে উপনীত হতে বাধ্য করেছিল—উপনিষদ্‌গুলিতে তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্যদিকে দিয়ে অবৈদিক অনুষ্ঠান, বিশ্বাস, প্রত্নকথা, আচারবিধি প্রভৃতির অস্তিত্বকে স্বীকার করতে তা বাধ্য হয়েছিল এবং অব্যাহত ও ব্যাপক আর্যীকরণের মাধ্যমে এই স্বীকৃতি একটি বিশেষ চরিত্র অর্জন করল। এই প্রক্রিয়া বহুমন্ত্রের অসংগতির মধ্যে আভাসিত হয় যাদের সঙ্গে আলোচ্য অনুষ্ঠানের কোনো সম্ভাব্য সম্পর্ক নেই। এই ধর্মমতের মধ্যে প্রতিমা, মন্দির, পবিত্র অরণ্য, ব্রতকথা এবং অন্যান্য পৌরাণিক উপাদান অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল ; এইসব পৌরাণিক উপাদানকে আর্যরূপ দান করার একটি অন্তিম প্রচেষ্টার দ্বারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আয়ুষ্কাল প্রসারিত করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। বৈদিক ও অবৈদিক গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান সংমিশ্রিত হয়ে একটি চরিত্রের গার্হস্থ্য ধর্ম উদ্ভূত হয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছিল ; গৃহ্যসূত্রগুলি এই আচার পদ্ধতিকে বিধিবদ্ধ করে তাদের সম্ভ্রম ও নিষ্ঠার গুণে অন্বিত করতে চেয়েছিল।

সমাজ

গৃহ্যসূত্রে প্রতিফলিত সমাজচিত্র থেকে কৃষি-নির্ভর অর্থনীতি, সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্ক ও পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষিক্ষেত্রের শ্রমিক গ্রামীণ কারুশিল্পী ও গৃহভৃত্যরূপে যে শূদ্ররা কর্মে নিরত থাকত তাদের প্রায়ই নারী ও হীনতর জন্তুর সঙ্গে একত্র উল্লেখ করা হয়েছে ; শূদ্রকে অপরিচ্ছন্ন ও সামাজিকভাবে হেয় বলে বিবেচনা করা হত। শূদ্রের জন্য কোনও গৃহ্য অনুষ্ঠান নির্দেশিত হয় নি। এর একটি কারণ সম্ভবত এই যে, যেহেতু আদিম

অধিবাসীদের বিপুল অংশ—বিশেষত যারা আর্যদের দ্বারা পরাজিত বা সামাজিকভাবে অধিকৃত হয়েছিল—তারা তাদের নিজস্ব সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি অব্যাহত রেখেছিল এবং যেহেতু আর্যরা এই বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীকে আর্য সংস্কৃতির বৃত্তে একাত্মীভূত করে নিতে চাননি তাই তাঁরা এই জনগোষ্ঠীকে তাদের অভ্যস্ত রীতিতে জীবন-নির্বাহ করতে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো বাধা দেননি যতক্ষণ পর্যন্ত এরা অল্পমূল্যে নিজেদের শ্রমশক্তি যোগান দিয়ে গেছে। আর্যদের জীবনদৃষ্টিতে ধর্মান্তরীকরণের প্রাধান্য কখনও ছিল না। শূদ্র দাসগণ যে প্রায়ই পালিয়ে যেতে চাইত, তা বিশেষভাবে তাদের সম্পর্কে প্রযোজ্য ঘৃণা ও অমানবিক শাস্তিবিধান থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে। বস্তুত প্রাচীনতর সাহিত্যের নিদর্শন থেকেও শূদ্রের সামাজিক হীনতার প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে শূদ্র কোনও দেবতার আশ্রয় ছাড়াই জন্মগ্রহণ করে (৬ : ১ : ১১) এবং জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে অপরের পাদ-প্রক্ষালন করেই শূদ্র জীবনধারণ করে। (১ : ৬৮, ৬৯)।

সমাজে নারীর অবস্থান মূলত এই তথ্য দ্বারা নির্ধারিত হত যে তাদের অনেকেই অনার্য পরিবার-সম্ভূত হওয়ায় যজ্ঞানুষ্ঠানে তাদের অংশগ্রহণের কোনো অধিকার ছিল না। যে কয়েকটি ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়, সেসব ক্ষেত্রেও মন্ত্রপাঠের অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত ছিল। অবশ্য গোভিল গৃহ্যসূত্রে বলা হয়েছে যে নারী সন্ধ্যায় গৃহে বৈশ্বদেববলি অর্পণ করতে পারে, অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানের একটি নিয়ম অনুযায়ী পত্নী প্রভাতে ও সন্ধ্যায় আহুতি অর্পণ করতে পারে যেহেতু, গোভিল গৃহ্যসূত্র অনুযায়ী 'পত্নী হল গৃহ এবং অগ্নিগৃহ্য' (১ : ৩ : ১৬) সেক্ষেত্রেও সে মন্ত্রোচ্চারণে অধিকারিণী ছিল না। স্বামীর ইচ্ছাই স্ত্রীকে যে নিয়ন্ত্রণ করত, তা বিবাহের মন্ত্র থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায় (পারস্কর গৃহ্যসূত্র ১ : ৮ : ১১)। স্ত্রীর প্রাথমিক কর্তব্য ছিল স্বামীর প্রীতি-বিধান এবং সন্তান—বিশেষত পুত্র সন্তানের জন্ম দেওয়া। সমাজের নিম্নতম স্তরে বহু দাসীর উপস্থিতি ছিল—প্রকৃতপক্ষে যারা বারাঙ্গনা অপেক্ষাও হীন অবস্থায় জীবনযাপন করত।

গৃহ্যসূত্রগুলি বিশ্লেষণ করে আমরা যে কৌতূহলজনক তথ্য সম্পর্কে অবহিত হই, তা হল ঃ বিদ্যার্থীর দীক্ষাগ্রহণ (উপনয়ন) এবং বিবাহের অনুষ্ঠান ও মন্ত্রের মধ্যে প্রশ্নাতীত সাদৃশ্য—যা দুটি অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অনুপুঙ্খের মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। এর কারণ হয়ত এই যে, উভয় সম্পর্কই সামাজিক উৎপাদন ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত আনুষ্ঠানিক চুক্তিরূপে গণ্য হত। কেননা বিবাহ হল সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠেয় কর্ম, যে সন্তানপরম্পরা কায়িকভাবে আর্য জনগোষ্ঠীর ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখে ; আবার, বেদাধ্যয়নে দীক্ষিত হয়ে আর্য পুরুষ স্বজাতির

আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক পরম্পরা অব্যাহত রাখে। যে যুগে অক্ষরজ্ঞান আবিষ্কৃত হয় নি, তখন, জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় রক্ষার পক্ষে এই প্রক্রিয়া ছিল আবশ্যিক ; তাই দীক্ষানুষ্ঠান অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ ও বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত ছিল— যা কোনো একটি নির্দিষ্ট প্রজন্মের গণ্ডীকে অতিক্রম করে।

তখনকার পারিবারিক ব্যবস্থার একক ছিল প্রধানত যৌথ পরিবার ; যদিও কিছু কিছু ইঙ্গিত থেকে মনে হয়, একই গৃহে বিভিন্ন শাখার জন্য পৃথক পাকশালা ও পাকের ব্যবস্থা ছিল। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের উপর বিপুল গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল। পরলোকগত আত্মা ভোগের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন ও অপূর্ণ আকাঙ্খা দ্বারা পীড়িত হয়ে জীবিত মানুষের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত হবে—তাই তাদের যথাযথভাবে শান্ত করা প্রয়োজন ; বস্তুত এইখানেই শ্রাদ্ধের গভীর তাৎপর্য রয়েছে। পুরোহিতদের পক্ষেও এটি ছিল অত্যন্ত লাভজনক অনুষ্ঠানগুলির অন্যতম। দ্রুত প্রসারণশীল দেবসঙ্ঘে এই পর্যায়ে কয়েকজন সম্পূর্ণ নূতন দেবতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। অমঙ্গলপ্রদ ও শুভসূচক আত্মার সংখ্যা ও ক্রিয়া যেহেতু ক্রমশ বর্ধিত হল, তাদের শান্ত, নিয়ন্ত্রিত ও বরদানের পক্ষে অনুকূল করে তোলার জন্য যথাযথ অনুষ্ঠানেরর প্রয়োজনও বহুগুণ বর্ধিত হল। জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান জ্ঞান ও সমুদ্রযাত্রায় তার উপযোগিতা অনুভূত হওয়ার গ্রহপূজার নূতন প্রবণতা দেখা গেল। ব্রহ্মাশ্রেণীর পুরোহিতের আসনে কুশ-নির্মিত প্রতীকী পুত্তলিকা স্থাপন করে যজমান নিজেই অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে পারতেন ; এতে মনে হয় যে গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানগুলিতে পুরোহিত নিয়োগ অপরিহার্য ছিল না।

গৃহ্যসূত্রগুলির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল গর্ভধারণের পূর্ব পর্যন্ত স্বতন্ত্র সামাজিক এককরূপে নারীর জন্য কোনও পৃথক অনুষ্ঠানের বিধান ছিল না ; পুত্র সন্তানের সম্ভাব্য জননীরূপে নারীর কতকটা গুরুত্ব ছিল। অন্যান্য সমস্ত গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানে নারী কেবলমাত্র স্বামীর সহায়করূপে সক্রিয় থাকত কিন্তু কখনো মন্ত্র উচ্চারণ করত না। শূদ্রের মতই নারী কোনো আনুষ্ঠানিক পরিচিতির অধিকারী ছিল না। অবশ্য শূদ্রদের সামাজিক পরিচিতিও ছিল না ; গৃহ্য ও ধর্মসূত্রগুলিতে শূদ্রকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়েছে যদিও কৃষিক্ষেত্রে ও ক্ষুদ্র শিল্পে শূদ্রগণ প্রধানত শ্রমশক্তির যোগান দিত। শূদ্র ভৃত্যের ত্রুটি লক্ষ্য করলে প্রভু তার ইচ্ছামত নিষ্ঠুরভাবে শাস্তি দিতে পারত ; গৃহ্যসূত্র সাহিত্যের বিপুল অংশে এধরনের শাস্তিকে অনুমোদন করা হয়েছে। ভৃত্য বা দাস সম্পূর্ণরূপে প্রভুর দয়ার অধীন ছিল ; তাকে রক্ষা করার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। "কোনো শূদ্র বা পতিত ব্যক্তি বা কুকুর খাদ্য স্পর্শ করলে তা অনুষ্ঠানের পক্ষে অশুদ্ধ বিবেচিত হত"। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রের এই তালিকাটি (১ : ৫ : ১৬, ২১, ২২, ৩০) কোনো ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। শূদ্র ও নারী—

এই উভয়কে সম্পত্তিরূপে বিবেচনা করা হত, এমনকি এরা ছিল সামাজিক মর্যাদারও নিদর্শন ; এদের সর্বদা কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখতে হত। অত্যন্ত বিরল কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া গৃহ্যসূত্রে জনসাধারণের বিপুল অংশের জীবনের চিত্র এমনই নৈরাশ্যজনক ; ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু ব্যতিক্রম বস্তুত নিয়মকেই প্রমাণিত করে।

সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের অভ্যুত্থান ছিল আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। তবে আমরা যেন এই তথ্য বিস্মৃত না হই যে,—সমাজে ব্রাহ্মণের তর্কাতীত প্রাধান্য, কর থেকে অব্যাহতি বা অন্যান্য বর্ণের জন্য আইনের মাধ্যমে বিহিত বিভিন্ন ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কর্কশ সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকে ব্রাহ্মণের অব্যাহতি, বিভিন্ন প্রকার দানগ্রহণে তাদের স্বাভাবিক যোগ্যতা, সামাজিক প্রতিপত্তির সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্করহিত ভাবে কেবলমাত্র জন্ম পরিচয়ের উপরই নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু এই সমস্তই ছিল সমাজের পরবর্তী স্তরের পরিচায়ক। খ্রিস্টপূর্ব তিনশ থেকে খ্রিস্টীয় একশ অব্দের মধ্যে কোনো শিলালিপিতে কোনো ব্রাহ্মণ বা সুনির্দিষ্ট ব্রাহ্মণ্য অনুষ্ঠান বা মন্দিরের উল্লেখ নেই। ব্রাহ্মণের প্রতি প্রথম ভূমিদান লিপি খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হয়েছিল এবং এধরনের ভূমিদান পরবর্তী দুই শতাব্দীর মধ্যে প্রকৃতই অসংখ্যবার লিপিবদ্ধ হয়েছিল—এই যুগেই গৃহ্যসূত্রের অন্তিম পর্যায়টি আত্মপ্রকাশ করে। যাইহোক, বৈদেশিক আক্রমণকারীদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে কঠোর বর্ণবিভক্ত সমাজের ভিত্তিভূমি প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল। তাই সম্ভবত সূত্রসাহিত্যে সমাজপতিদের প্রাচীন সমাজ সংগঠন অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াসই শুধুমাত্র অভিব্যক্ত হয় নি, শূদ্র এবং সমাজের অন্যান্য নিপীড়িত অংশের প্রতিরোধের লক্ষণও প্রতিফলিত হয়েছে—এরা সম্ভবত ক্রমেই অস্পষ্টভাবে হলেও এই উপলব্ধিতে উপনীত হচ্ছিল সে সমাজের উৎপাদক শক্তিরূপে তাদের মৌলিক অবদান রয়েছে।

গৃহ্যসূত্রে প্রযুক্ত মন্ত্রসমূহ সংহিতা থেকে কখনো প্রত্যক্ষভাবে ঋণ হিসাবে গৃহীত হয়েছে আবার কখনো বা অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষভাবে রচিত হয়েছে। এই দুই ধরনের মন্ত্র বিশ্লেষণ করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে এরা শুধু দুটি ঐতিহ্যের প্রতিনিধিমাত্র নয়, সূত্র সাহিত্যের দুটি সুস্পষ্ট স্তরেরও নিদর্শনও বহন করছে। বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য রচিত এবং সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যের অন্তর্গত নয় এমন মন্ত্র নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের জন্য সম্পূর্ণভাবে উপযোগী ও প্রয়োজনীয় হলেও যেসব মন্ত্র সংহিতা ও ব্রাহ্মণ থেকে গৃহীত হয়েছে—তাদের অধিকাংশই কৃত্রিমভাবে নির্বাচিত এবং তাদের উপযোগিতাও নেই বললেই চলে। এটা থেকে সম্ভবত এই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে গৃহ্য অনুষ্ঠানগুলি একটি বিশেষ পর্যায়ে শ্রৌত অনুষ্ঠান অর্থাৎ সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যের সঙ্গে অসম্পৃক্তভাবে বিরাজিত ছিল। যজ্ঞধর্ম যখন বৌদ্ধধর্মদ্বারা প্রবলভাবে আক্রান্ত হল, তখনই গৃহ্য অনুষ্ঠানগুলিকে প্রামাণ্য ও সম্মানিত করে

তোলার একটি প্রবণতা সৃষ্টি হল—অথর্ববেদের স্বীকৃতিলাভের সঙ্গে এর সম্পর্ক খুবই নিবিড় ; রক্ষণশীল বৃহৎ ঐতিহ্যে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে নিবেদিত অনুষ্ঠানসমূহ, অর্ধদেবতা এবং বিভিন্ন ধরনের যক্ষ, অপ্সরা, পিশাচ, দানব ও রাক্ষস প্রভৃতির উদ্ভব ও স্বীকৃতিলাভের ফলে কতকটা যান্ত্রিকভাবেই গৃহ্য অনুষ্ঠানগুলিতে সংহিতা ও ব্রাহ্মণের মন্ত্রগুলি গৃহীত হল। সেই সঙ্গে বৈদিকযুগের অন্তিম পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটল—যার সূচনা হয়েছিল ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল ও ব্রাহ্মণ সাহিত্য রচনার মধ্যে দিয়ে। বিবাহ অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত অধিকাংশ ইন্দ্রজালতুল্য মন্ত্র যে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল থেকে গৃহীত হয়েছে, তাতেও এ অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায়। বৈদিক মন্ত্রের সাহায্যে গৃহ্য অনুষ্ঠানগুলিকে পরিশীলিত করার প্রক্রিয়াই শুধু এই পর্যায়ে হয় নি, স্পষ্টত প্রাচীনতর ভাসমান লোকায়ত উপাদানের স্বীকৃতিদানও তখন ঘটেছিল। লোকবিশ্বাস ও আচারের যেসব উল্লেখ সূর্যাসূক্তে পাওয়া যায় এবং গন্ধর্বচর্যার সঙ্গে তার যে সম্পর্ক আভাসিত তা সুস্পষ্টভাবে লঘু ঐতিহ্যেরই অন্তর্গত। এই পর্যায়েই তা রক্ষণশীল শাস্ত্রে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছিল।

ধর্মসূত্র

ধর্মসূত্রের মধ্যে দিয়ে আমরা একটি নূতন যুগে প্রবেশ করি কারণ যদিও প্রত্যক্ষভাবে তা বেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আনুষ্ঠানিক সাহিত্যের অংশ, তথাপি যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। প্রথম তিনটি বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের জীবনের চতুরাশ্রমকে (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও যতি) কেন্দ্র করে সামাজিক জীবনধারার পরিচয় ধর্মসূত্রগুলিতে পাওয়া যায়। সামাজিক সামঞ্জস্য রচনা যদিও এদের প্রধান লক্ষ্য, তবু উপনিষদের পরে এই সমাজে বর্ণভেদ প্রথা ধীরে ধীরে কঠোরতর হয়ে উঠেছিল। বর্ণগুলির মধ্যে চলিষ্ণুতা ক্রমেই অতীতের বস্তু হয়ে পড়ছিল। পূর্ববর্তী যুগগুলিতে অসবর্ণ বিবাহের ফলে যেসমস্ত অসংখ্য নূতন মিশ্রবর্ণের উৎপত্তি হয়েছিল, তাদের জন্য সমাজে উপযুক্ত স্থান ও যথাযথ কর্তব্য, অধিকার ও অপরিহার্য দায়িত্ব নির্দেশ করা আবশ্যিক হয়ে পড়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যবর্তী কালে ভারতীয় সামাজিক জীবন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার পক্ষে ধর্মসূত্রগুলি আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল। এই যুগে জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যে বিপুল পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল, তার নিম্নোক্ত নিদর্শনগুলি উল্লেখ করা যায় : লৌহনির্মিত অস্ত্র এবং কৃষি ও শিল্প সম্পর্কিত যন্ত্র ও উপকরণের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার, বাণিজ্য, নগররাষ্ট্রের উদ্ভব। বণিকদের হাতে বিপুল সম্পদের কেন্দ্রীভবন, প্রাথমিক উৎপাদকদের ক্রমাগত

দারিদ্র্যবৃদ্ধি, উৎপাদক ও উৎপন্ন দ্রব্যের ভোক্তার মধ্যে সুস্পষ্ট বিচ্ছেদ, শ্রেণীভেদ, কারুশিল্প ও কুটিরশিল্প-নির্ভর অর্থনীতিতে শূদ্রের বিপুল শোষণ এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং অংশত রাজনৈতিক শক্তি সেইসব ব্যক্তিদের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়া, খনি ও খনিজদ্রব্য যাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং সশস্ত্র রক্ষীরূপে যারা বাণিজ্য শকটের অনুগমণ করত। অর্থাৎ সমাজের নূতন প্রভু ছিল নবোদ্গত বণিকশ্রেণী ও অভিজাতবর্গ, অর্থাৎ বিত্তবাণ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্প্রদায়। তিনটি আর্যবর্ণের পুরুষরা যেহেতু শক্তিশালী পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় স্বভাবত বিপুল ক্ষমতার অধিকারী ছিল তাই শূদ্র ও নারী ক্রমশ অধিকতর নিষ্পেষণের সম্মুখীন হল।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে কয়েক শতাব্দীব্যাপী মিশ্রণ এবং সমস্ত প্রকার সম্ভাব্য পারস্পরিক বিনিময় ও সংযোগের মাধ্যমে বহু উপবর্ণের উত্থানের ফলে এমন একটা সময় উপস্থিত হল যখন বর্ণপ্রথা-শাসিত সমাজের সীমারেখা কতকটা স্পষ্ট হয়ে উঠল ; ফলে সমস্ত নবোদ্ভূত বর্ণের সামাজিক অবস্থান ও কর্তব্য নির্দেশ করা সম্ভব হল। অনুরূপভাবে, গৃহস্থদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য অর্থাৎ নিয়মিত যজ্ঞ সম্পাদনের উপর বৈদিক সাহিত্যের অতি স্পষ্ট গুরুত্ব আরোপ এবং সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বা ভ্রমমাণ যোগীদের প্রভাবে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী প্রক্রিয়ার মধ্যে সুদীর্ঘ দ্বন্দ্বমুখর সংগ্রামের পরে শেষপর্যন্ত আপোসের একটি পথ আবিষ্কৃত হল—অরণ্যে অবসর জীবনযাপন এবং ভ্রমমাণ সন্ন্যাসীর জীবনকে মানুষের জীবনের শেষ দুটি স্তররূপে স্বীকৃতি দেওয়া হল। এই পর্যায়ে উপনীত হওয়ার পর কতকটা সামাজিক সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, যার ফলে কোনোপ্রকার প্রধান প্রতিবন্ধক ছাড়াই সামাজিক জীবনের প্রবাহ অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে। তবে এটা স্বীকার করা প্রয়োজন যে বিদ্রোহ বা আপোসবিরোধী মনোভাবের বিশেষ কোনো প্রমাণ যেহেতু আমাদের হাতে নেই, তাই আমরা এটাও ধরে নিতে পারি না যে এই সুদীর্ঘ পর্যায়ে নিরবচ্ছিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। বস্তুত এই যুগে বহু বৈদিশিক আক্রমণ, সামাজিক সংগঠনে অনেক নূতন উপাদানের আত্মীকরণ, বহু সামাজিক ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক সংঘর্ষ, পরস্পর-বিধ্বংসী ও পররাজ্য অধিকারের জন্য নগর ও রাষ্ট্র-মধ্যবর্তী যুদ্ধ ইত্যাদি আমরা লক্ষ্য করেছি ; সুতরাং, বলাই বাহুল্য, যে এই যুগে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন ছিল সংঘাতে আকীর্ণ।

এ ধরনের সামাজিক দ্বন্দ্বকে ন্যূনতম পর্যায়ে হ্রাস করে আনাই ছিল ধর্ম সূত্রগুলির দায়িত্ব। এই পর্যায়েই কর্ম ও জন্মান্তরবাদের তত্ত্ব বিশেষ অভিব্যক্তি লাভ করল—এই দুটি অতুলনীয় মতস্পদ সমস্ত প্রকার সামাজিক অসাম্যের চমৎকার ব্যাখ্যা

দান করে সমাজে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছিল। এই যুগের ধর্ম ও দর্শন মৌল ভাবাদর্শগত ভিত্তি স্থাপন করার ফলে ধর্মসূত্রের রচয়িতারা উপযুক্ত নিয়ম প্রণয়ন করে সামাজিক বিধি ব্যবস্থাকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা দিতে চাইলেন এবং সেই সঙ্গে বিভেদকামী শক্তিগুলিকে অধার্মিক ও অসামাজিক আখ্যা দিয়ে চূর্ণ করে দিতে চাইলেন। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে অনুষ্ঠানগুলির সংখ্যাবৃদ্ধি এবং নূতন অর্চনাপদ্ধতি ও নূতন দেবতাদের প্রবর্তন রাজনৈতিক অস্থিরতার সঙ্গে একই সূত্রে গ্রথিত—যা সেযুগের বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণ। নিঃসন্দেহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সার্বভৌম নগররাষ্ট্রের শাসকরা জনসাধারণের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ফিরিয়ে বিভ্রান্ত করার কৌশলরূপে পুরোহিত ও অনুষ্ঠানগুলিকে ব্যবহার করতেন।

ধর্মসূত্রের বিধিসমূহের প্রকৃত ক্ষেত্র হল বিভিন্ন বর্ণ ও আশ্রমগুলি ; তবে বাস্তবে এদের ক্ষেত্র আরো বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। ধর্মসূত্রগুলিতে শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্রসমূহের প্রাগাবস্থান আভাসিত এবং প্রকৃতপক্ষে সেগুলি এদের সম্পূরক। ধর্মসূত্রে ব্যাখ্যা 'ধর্ম' কি, এই প্রশ্নের উত্তরে জৈমিনি তাঁর মীমাংসা সূত্রে বলেছেন : 'ধর্ম মানুষকে যথার্থ শ্রেয় আচরণে প্রণোদিত করে', এবং এই শ্রেয় আচরণের তৎকালীন ভিত্তি ছিল বর্ণাশ্রম।

রচনা

প্রধান ধর্মসূত্রগুলির রচয়িতা আপস্তম্ব, আশ্বলায়ন, গৌতম, বৌধায়ন, বশিষ্ঠ, বৈখানস্, দ্রাহ্যায়ণ, কাত্যায়ন, অগস্ত্য, শাকল্য, সত্যাষাঢ় হিরণ্যকেশী ও সবর্ণীয়। এদের মধ্যে শুধু প্রথম ছয়জনের রচনা অধিকতর পরিচিত ; এছাড়াও বিষ্ণুস্মৃতি নামে একটি রচনার সন্ধান পাওয়া যায়—সম্ভবত বিষ্ণু নামে কোনও ব্যক্তি এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন।

রচনাকাল

অধিকাংশ ধর্মসূত্র খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়েছিল যদিও এর উচ্চতর ও নিম্নতর সীমা আমরা আরও কিছুদূর প্রসারিত করতে পারি। এই কালসীমা ভারতবর্ষের ইতিহাসে চূড়ান্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ পরবর্তী দুই সহস্র বৎসর ধরে যে সব চিন্তা ও ধারণা ভারতীয় ধর্ম ও সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে সেগুলির উদ্ভব এইযুগেই।

আঙ্গিক ও ভাষা

ধর্মসূত্র সাহিত্য প্রধানত গদ্যে রচিত হলেও কোনো কোনো গ্রন্থে কয়েকটি শ্লোকও বিক্ষিপ্তভাবে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ভাষা ধ্রুপদী সংস্কৃতের সমীপবর্তী ; যদিও কিছু কিছু অধ্রুপদী বৈশিষ্ট্য তখনও পর্যন্ত রয়ে গেছে, তবু সামগ্রিকভাবে ভাষা বৈদিক অপেক্ষা ধ্রুপদী সংস্কৃতের অধিক নিকটবর্তী। সূত্রে ভাষা হল সংস্কৃত—যা প্রাচীন বৈদিক ভাষা বা ছান্দস ভাষা থেকে বহু দূরবর্তী হয়ে পড়েছে। গ্রন্থগুলি বিভিন্ন প্রশ্নে বিভক্ত, প্রশ্নগুলি প্রায়ই 'অধ্যায়ে' বিন্যস্ত এবং অধ্যায়ও কখনো কখনো 'খণ্ডে' বিভক্ত। অবশ্য কোনো ধরনের সম্পাদনা প্রক্রিয়ার নিদর্শন খুব সামান্যই পাওয়া যায়, কেননা বিভিন্ন অধ্যায় ও উপবিভাগগুলি সাধারণত নির্বিচারে বিভক্ত করা হয়েছে, কোনো অন্তর্নিহিত আদর্শ অনুযায়ী হয় নি। সাধারণত ধর্মসূত্র একই গ্রন্থকার রচিত গৃহ্যসূত্রের ধারাবাহিক রচনা ; এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল 'বৈখানস্ ধর্ম প্রশ্ন' যা বৈখানস্ রচিত গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্রের যথেচ্ছ সংমিশ্রণ। বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে ধর্মসূত্রের যোগসূত্র নিরতিশয় ক্ষীণ—শুধুমাত্র কয়েকটি আকস্মিক বৈদিক উদ্ধৃতির মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ।

বিষয়বস্তু

সামবেদের গৌতম ধর্মসূত্র (ধর্মশাস্ত্র নামেও পরিচিত) সম্ভবত প্রাচীনতম রচনা ; তা আঠাশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ছত্রিশতম অধ্যায়টি সামবিধান থেকে হুবহু উদ্ধৃত হয়েছে ; প্রায়শ্চিত্ত ও শুদ্ধীকরণ সংক্রান্ত যেসব বিবরণ রচনায় উল্লিখিত, তাদের মধ্যে ন'টি বিখ্যাত সামমন্ত্র স্থান পেয়েছে—এ-সমস্ত সামবেদের সঙ্গে গৌতম ধর্মসূত্রের যোগসূত্রটি প্রতিষ্ঠিত করে। যবন শব্দের উল্লেখ থেকে মনে হয়, এই গ্রন্থের উচ্চতম সীমা খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর কাছাকাছি।

দীক্ষানুষ্ঠান দিয়ে রচনার শুরু এবং ক্রমে ক্রমে প্রায়শ্চিত্ত ও শুদ্ধীকরণ অনুষ্ঠান এবং ব্রহ্মচর্য এতে আলোচিত হয়েছে। এর অব্যবহিত পরে যথাক্রমে সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থী ও গৃহস্থের জীবন সম্পর্কিত নিয়মাবলী বিবৃত হয়েছে। এই চতুরাশ্রমের পরে চতুর্বর্ণের উপযুক্ত অভিবাদন বিধি, বিভিন্ন অবস্থান এবং আপতিক অবস্থার জন্য উদ্ভাবিত বিশেষ নিয়মাবলী স্থান পেয়েছে। অষ্টম অধ্যায় রাজা ও বেদবিদ ব্রাহ্মণকে পৃথিবীর নৈতিক শৃঙ্খলার নিয়ন্তারূপে অভিহিত করে ব্রাহ্মণের বিশেষ অধিকারগুলি বিবৃত করেছে। পরবর্তী অধ্যায়ে কতকটা আকস্মিকভাবে স্নাতকদের কর্তব্য ও অধিকার আলোচনা করে চতুর্বর্ণের যথাযোগ্য বিধিসম্মত বৃত্তির তালিকা দিয়েছে।

দশম অধ্যায়ে রাজার কর্তব্য, দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন এবং সাক্ষ্যদান সংক্রান্ত আইন লিপিবদ্ধ হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলির বিষয়বস্তু হল আনুষ্ঠানিক অশুচিতা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংশ্লিষ্ট অর্ঘ্য, বেদাধ্যয়ন এবং খাদ্যাখাদ্য বিচার। নারীর দায়িত্ব ও অধিকার সংক্রান্ত একটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ের পরে নয়টি সম্পূর্ণ অধ্যায়ে বিবিধ অপরাধের জন্য (আনুষ্ঠানিক, সামাজিক ও পারিবারিক) তপস্যার কথা আলোচিত হয়েছে। শেষ অধ্যায়ে রয়েছে উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত বিধিগুলি।

কালানুক্রমিক বিচারে মনে হয়, বৌধায়ন ধর্মসূত্রের স্থান ঠিক এর পরেই। গৌতমের মত এটিও দাক্ষিণাত্যে উদ্ভূত হয়েছিল। আলোচ্য রচনাটি যে শুধু গৌতম ধর্মসূত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিল, তাই নয় ; প্রকৃতপক্ষে এর তৃতীয় অধ্যায়টি শেষোক্ত গ্রন্থের উনিশতম অধ্যায় থেকে প্রচুর ঋণ গ্রহণ করেছে। বৌধায়নের প্রথম দুটি অধ্যায়ে রয়েছে বিস্তর পুনরাবৃত্তি। মোটামুটিভাবে এই গ্রন্থ বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে গৌতমের অনুরূপ ; বস্তুত উল্লিখিত বিষয়সমূহ সমস্ত ধর্মসূত্রের পক্ষেই সাধারণ, তবে আলোচ্য গ্রন্থে বিষয়বস্তু ও বিন্যাস-পদ্ধতিতে শৃঙ্খলা অপেক্ষাকৃত কম। তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত হলেও বৌধায়ন অন্যান্য অনেক শাখার মধ্যেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং একে বহু ধর্মসূত্রের প্রধান আকর গ্রন্থরূপে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তৃতীয় প্রশ্নের ষষ্ঠ অধ্যায়ের সঙ্গে বিষ্ণুস্মৃতির আটচল্লিশতম অধ্যায়ের নিবিড় সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বৌধায়ন অশব্য কল্পসূত্রের চতুর্বিত্র রচনায় বিন্যস্ত সম্পূর্ণ সূত্র-সাহিত্যের নিদর্শন রেখে যায় নি ; বৌধায়ন রচিত বিভিন্ন অংশ যে আঙ্গিকে উপস্থিত হয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে মূল রচনার বিপুল অংশ লুপ্ত হয়ে গেছে এবং প্রচলিত সূত্রগুলিও অপটুভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। অনেক বিক্ষিপ্ত অংশই স্পষ্টত পরবর্তীকালে রচিত হয়েছিল। গ্রন্থের প্রায় সমস্তই অংশই গদ্যে রচিত, শুধু চতুর্থ প্রশ্ন মূলত পদ্যে গ্রথিত ; এতে পরবর্তীকালের প্রত্নপৌরাণিক দেবতা এবং এমনকি, তান্ত্রিক উপাসনা পদ্ধতিও আলোচিত হয়েছে।

বৌধায়নের বিষয়বস্তু অন্যান্য ধর্মসূত্রগুলির অনুরূপ—প্রথম তিন বর্ণের উপযোগী চতুরাশ্রম আলোচিত হয়েছে। খাদ্য সম্বন্ধে বিধিনিষেধ, একত্রভোজন বিষয়ে নিয়ম, শ্রাদ্ধ, তপস্যার বিবিধ পদ্ধতি, আইন ও বিচারপদ্ধতি, জীবনের তৃতীয় ও চতুর্থ আশ্রমে কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ ও উপযুক্ত আচারবিধি ইত্যাদির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। সামাজিক মূল্যবোধের বৃত্তে বহু যতি-সম্প্রদায় ও তাদের আচরিত জীবনযাপন পদ্ধতিকে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় কেননা এ সম্প্রদায় ক্রমশই প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করায় এদের আর অবহেলা করা সম্ভব ছিল না। রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সামাজিক ও রাজনৈতিক অপরাধ ও

তৎসংশ্লিষ্ট শাস্তির সংখ্যা ক্রমাগত বর্ধিত হচ্ছিল ; পাপ, অপরাধ ও শাস্তি-বিষয়ক বিপুল কলেবর আলোচনার মধ্যে তা প্রতিফলিত হয়েছে। ভারতবর্ষে কখনো কোনো সুবিন্যস্ত কেন্দ্রীয় ধর্মশাসকমণ্ডলী ছিল না ; তাই কেন্দ্রীয় যাজকমণ্ডলীর স্বাভাবিক কর্তব্য রাজনৈতিক শাসকদের উপর অর্পিত হয়েছিল ; এঁরা নৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক অপরাধের জন্য শাস্তি বিধান করতেন। একাজে শাসকের পরামর্শদাতারূপে পুরোহিত ও অমাত্যরা সক্রিয় ছিলেন ; তাদের ব্রাহ্মণ পরিচয়ের ফলে তারা রাষ্ট্রের ধর্মযাজক ও রাজনৈতিক বাহুরূপে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। পরিবার, সম্পত্তি, রাষ্ট্র ও ধর্ম, তাদের অধিকার ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণের সীমা—এই জটিল প্রায়োগিক পদ্ধতির দ্বারা কেন্দ্রীভূত করে তুলেছিল—সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়ে রাজা তাঁর ব্রাহ্মণ উপদেষ্টাদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিভিন্ন কার্য পরিচালনা করতেন।

ত্রিশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত বশিষ্ঠ ধর্মসূত্রের বিষয়বস্তু অন্যান্য গ্রন্থগুলির অনুরূপ। সম্ভবত এর একমাত্র মৌলিক উপাদান হল সেই অংশটি যেখানে চতুর্বর্ণের উৎপত্তি ও নারীর স্বাভাবিক অপবিত্রতা বর্ণিত হয়েছে। জঘন্য পাপের শাস্তিরূপে সমাজ থেকে বহিষ্কার এবং উপযুক্ত তপস্যার পর পুনর্গ্রহণের অনুমতির উল্লেখ থেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে গনগোষ্ঠীর সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। এর দীর্ঘতম অংশের বিষয়বস্তু হল তপস্যা। এখানে ব্রাহ্মণদের অগ্নিতুল্য সম্মানের অধিকারী বলা হয়েছে এবং তাদের প্রাপ্য দক্ষিণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর প্রকৃতি থেকে রচনার অর্বাচীনতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

দুটি প্রশ্নে বিন্যস্ত আপস্তম্ব ধর্মসূত্র এই শ্রেণীর অন্যতম প্রধান রচনা এবং বৌধায়নের পরেই তার স্থান। বক্তব্যের মৌলিক ভাবনার বিচারে তা ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের অধিক নিকটবর্তী। এই গ্রন্থের প্রথম সূত্রেই যুগোপযোগী আইন ও সামাজিকভাবে অনুমোদিত প্রথার সঙ্কলনরূপে সমগ্র রচনার পরিধিকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে ; ধার্মিক ব্যক্তির আচরণ এবং বেদকে এ-ব্যাপারে দুটি প্রামাণ্যরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

প্রথম তিনটি বর্ণের আচরণ আলোচ্য গ্রন্থের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় ; তাই এই তিন বর্ণের সেবাকে শূদ্রের একমাত্র কর্তব্যরূপে এখানে নির্দেশ করা হয়েছে। ধর্মসূত্রগুলির মধ্যে এটি এ প্রাচীনতর রচনার অন্যতম, তার প্রমাণ পাওয়া যায় মিশ্র উপবর্ণ সম্পর্কিত নিয়মাবলীর অনুপস্থিতি এবং গোমাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে অকুণ্ঠ অনুমোদন ও তেজারতি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিয়মাবলী থেকে। ব্রাহ্মণ্য সমাজের

রীতিনীতি ও আচার আচরণকে সমর্থন জানানো ও বিধিবদ্ধ করাই যেন এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। একাদিক্রমে জীবনের চতুরাশ্রম এতে আলোচিত ; এর সূত্রপাত ব্রহ্মচর্য পর্যায়ে করণীয় ও অকরণীয় বিষয়গুলির বর্ণনায়—তপস্যা সংক্রান্ত নিয়মাবলী থেকে স্খলিত হলে তা নরকবাসের কারণরূপে নির্দেশিত হয়েছে। আচার্যের প্রতি ব্যক্তিগত সেবা ও অতিরিক্ত আনুগত্য প্রকাশের মধ্যে তন্ত্র প্রভৃতি প্রতিবাদী ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে গুরুর ভূমিকার গুরুত্ব আভাসিত। এই গ্রন্থে প্রতিফলিত সমাজে বর্ণভেদ সম্পর্কিত নিয়মাবলী স্পষ্টত কঠোরভাবে পালিত হত ; বিভিন্ন বর্ণের আচরণ সম্পর্কিত নির্দেশের অসংখ্য অনুপুঙ্খ থেকে আমরা এই সম্পর্কে অবহিত হই। খুবই বিস্ময়করভাবে নিষিদ্ধ খাদ্যের তালিকায় গোমাংস ও কুক্কুট মাংস অন্তর্ভুক্তি হয় নি। যেসব জনগোষ্ঠীর কাছে খাদ্যগ্রহণে বাধা ছিল, তাদের বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা থেকে একত্র আহার ও সামাজিকভাবে জাতিচ্যুত ব্যক্তিদের সম্পর্কে প্রচলিত নিয়মাবলী সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা পাই ; এই তালিকার মধ্যে রয়েছে লোকশিল্পী ও কারিগর, [illegible] অর্থের বিনিময়ে আতিথ্যদানকারী ব্যক্তি, চিকিৎসা, কুসীদজীবী, নপুংসক, রাজভৃত্য, উন্মাদ, রুগ্‌ণ, পাপী ও ব্রাহ্মণ্য-বিধি-বহির্ভূতভাবে তপস্যার নিরত ব্যক্তি।

জীবনের চারটি স্বীকৃত লক্ষ্য, অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ সম্বন্ধে এখানে প্রচুর আলোচনা রয়েছে। আপাত-নীরস বিষয়বস্তুর মধ্যে কখনো কখনো বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক চিন্তাসমৃদ্ধ শ্লোক সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সাধারণত প্রতি আচরণবিধি সম্পর্কেই অতিরিক্ত সূক্ষ্ম অনুপুঙ্খ পাওয়া যায়। হত্যার পাপ-ক্ষালন সম্পর্কিত নির্দেশাবলী থেকে আমরা সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস বিষয়ে বেশ ভাল একটি ধারণা পাই ; যেমন, বলা হয়েছে, ক্ষত্রিয়হত্যার প্রায়শ্চিত্ত একসহস্র গোদান, বৈশ্য-হত্যার জন্য একশত এবং শূদ্র বা নারী হত্যার জন্য দশটি গরু ও একটি ষাঁড় দান করতে হবে। ব্রাহ্মণ হত্যা মহাপাপ বলে গণ্য হত ; এর যথাযথ প্রায়শ্চিত্ত ছিল অরণ্যে দ্বাদশবর্ষব্যাপী কঠোর তপস্যা কিংবা অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন। বিবিধ শ্রেণীর পাখি, নীচ প্রাণী ও নারী এবং শূদ্রহত্যার একই প্রায়শ্চিত্ত নির্দেশ করা হত। আপাতদৃষ্টিতে প্রত্যেক জঘন্য পাপের জন্যই প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হয়েছিল। কখনো কখনো আমরা মানবতাবাদেরও আশ্চর্য আভাস পাই। কিছু কিছু প্রায়শ্চিত্তের পদ্ধতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদের নিদর্শনও পাওয়া যায়। চতুর্বর্ণের উপযুক্ত কর্ম এবং আপতিক অবস্থা সম্পর্কিত নিয়মাবলীর পরেই দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। আট প্রকার বৈধ বিবাহ-প্রক্রিয়ার মধ্যে কেবলমাত্র প্রথম তিনটিকে প্রশংসা করা হয়েছে ; গন্ধর্ব বিবাহ

থেকে শুরু করে অন্যান্য বিবাহ-রীতিকে তুলনামূলকভাবে হীনতর ভাবা হয়েছে। তাছাড়া যৌতুক অপেক্ষা কন্যা-শুল্ককে অধিক গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করা হত। বিভিন্ন বর্ণের পত্নীর পুত্রদের ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ে বর্গীকরণ করা হত—পিতা ও জন্মদাতার প্রতি তাদের দায়িত্বও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। পত্নীকে স্বামীর সম্পদের যৌথ অধিকারিণী বলে ভাবা হত ; অবশ্য তা দান বা বিক্রয়ে তার অধিকার ছিল না, ধর্মীয় কর্ম, পুণ্য ও সম্পদ ভোগের ব্যাপারে পত্নী তার স্বামীর সমান অংশ-ভাগিনী হতেন এমন কথাও কোথাও কোথাও আছে। ক্রমশ শ্রাদ্ধ অধিকতর তাৎপর্য অর্জন করেছে ; বহু অংশে প্রচুর অনুপুঙ্খসহ শ্রাদ্ধ বিষয়ে নানাবিধ নিয়ম লিপিবদ্ধ হয়েছে। মাংস—বিশেষত গরু ও মোষের মাংস—পিতৃপুরুষের পক্ষে অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ বলে বিবেচিত হত। মাছ এবং গণ্ডার সমেত অন্যান্য জন্তুর মাংস অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পক্ষে উপযুক্ত খাদ্যার্ঘ্য রূপে তালিকাভুক্ত হয়েছে।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বৈরাগ্য ; এই বিশেষ পর্যায়ে জীবনযাপন প্রণালী সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নিয়ম প্রণীত হয়েছিল। এই সমস্ত নিয়মের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম ও অন্যান্য সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত ; তবে বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা অধিক কঠোরতা এদের মধ্যে নির্দেশিত হয়েছে। এই যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সন্ন্যাসমূলক ধর্মের প্রবণতার মধ্যে প্রবল বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। প্রতি ধারার গুণাবলী যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছে ; তবে শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্যধর্মের ওপরেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কেননা সন্ন্যাসধর্মকে শুধুমাত্র অত্যন্ত বৃদ্ধ ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অবশ্য অহিংসাকে জীবনের মূল চালিকাশক্তিরূপে প্রশংসা করায় যজ্ঞধর্মের গুরুত্ব অনেকটা যেন হ্রাস পেয়েছে। রাজপ্রাসাদ, এর স্থাপত্য, রাজকীয় অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে একটি অংশ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে ; এতে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন এবং ব্রাহ্মণের প্রতি রাজকীয় দান আলোচিত হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, ব্রাহ্মণেরা করদান থেকেও অব্যাহতি পেতেন ; অবশ্য সেই সঙ্গে প্রতিবন্ধী, নারী, শিশু এবং সন্ন্যাসীদেরও কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হত—অবশ্য এই শেষোক্তদের সম্পত্তিতেই অধিকার ছিল না, যা ব্রাহ্মণের ছিল। একটি মানবিক বিধি অনুযায়ী ধর্ষিতা নারীকে রাজা ভরণপোষণ দিতেন ; অপরাধী পুরুষকে হত্যা করে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার বিধান দেওয়া হয়েছিল। কৃষিক্ষেত্রে অবহেলার ফলে শস্যহানি ঘটলে সেজন্যও শাস্তির ব্যবস্থা ছিল।

তিনটি অধ্যায় বিন্যস্ত বৈখানস্ ধর্মসূত্র সম্ভবত খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে রচিত। শ্রৌতসূত্র ও ধর্মসূত্রগুলি একই গ্রন্থে ক্রমান্বয়ে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল ; এই দুটি অংশকে একত্রে 'বৈখানস্ প্রশ্ন' রূপে অভিহিত করা হয়। রচনাটির

নাম তাকে একটি বিশিষ্ট সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত করেছে ; বস্তুত এই রচনা জীবনের চতুর্থ পর্যায়কে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে বিভিন্ন যতি-সম্প্রদায়ের রীতিনীতিকে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছে। এই গ্রন্থকে চারটি প্রধান ভাগে বিন্যস্ত করা যায়, যার প্রতিটি অংশে তপস্যার একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতির আলোচনা করা হয়েছে। তবে গ্রন্থটির নামকরণে যে বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত রয়েছে, তার সঙ্গে প্রকৃত সংজ্ঞার ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। তা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরিধির মধ্যে সন্ন্যাসমূলক ধর্মাচারকে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা এবং সে চেষ্টার সাফল্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই রচনা সেই তাৎপর্যপূর্ণ যুগের অন্তর্গত, যখন মোক্ষদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অনানুষ্ঠানিক উপাসনা-পদ্ধতির প্রতি উপনিষদের বিশেষ সুবিধাদানের প্রবণতা বাস্তবায়িত হয়ে উঠেছিল। নীতিগতভাবে মৌলিক আপোসের প্রবণতা যখন গৃহীত হল, বিভিন্ন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে ধর্মীয় পরিমণ্ডলে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার জটিল ও দুরূহ কর্তব্য সম্পাদনের ভার সমাজের উপর এসে পড়ল ; ততদিনে ঐসব সম্প্রদায়ের নাম অতিপরিচিত কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে, ফলে শেষ দুটি আশ্রমে এদের স্থান নির্দেশ করা হল।

বৈখানস্ ধর্মসূত্র অরণ্যে অবসর-গ্রহণের পর্যায়কে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছে : পত্নীসহ ও একাকী বানপ্রস্থ গ্রহণ। এদের মধ্যে প্রথম ক্ষেত্রে পাঁচটি ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একত্রিশটি উপরিভাগ রয়েছে। চতুর্থ আশ্রমের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম সক্রিয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বানপ্রস্থের সারমর্ম ও বিশদ বিবরণ রয়েছে ; তাছাড়া এতে বিস্তৃতভাবে আচরণবিধি ও কর্তব্যে শিথিলতার জন্য প্রায়শ্চিত্ত বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায় গৃহস্থের কর্তব্য দিয়ে শুরু হলেও পুনরায় জীবনের শেষ দুটি অধ্যায় আলোচিত হয়েছে। কেশব, নারায়ণ ও দেবেশের মত নবাগত প্রত্ন-পৌরাণিক দেবতারা সর্বশক্তিমানরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। নিরামিষ ভোজনের প্রশংসা ও মিশ্রবর্ণ সম্পর্কিত আলোচনা থাকার ফলে এই গ্রন্থের তুলনামূলক অর্বাচীনতা স্পষ্ট। উপযুক্ত আচরণের নিয়মগুলিও এতে ভিন্ন, কারণ এই পর্যায়ে তা বর্ণভেদ ও সামাজিক অবস্থান দিয়েই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, মানবিক ভাবনা তত গুরুত্ব পায় নি।

বিষ্ণুস্মৃতি ধর্ম-সূত্ররূপে পরিচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে বহু অর্বাচীন কালের ও অপেক্ষাকৃত অপ্রমাণ্য গ্রন্থ। এতে পাপ ও শাস্তির উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং অপরাধীদের জন্য নির্দিষ্ট নরকের সংখ্যাও এতে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

শুল্বসূত্র

শুল্বসূত্র নামে পরিচিত সূত্র সাহিত্যের একটি ক্ষুদ্র অংশে যজ্ঞবেদী ও যজ্ঞগৃহের মত যজ্ঞীয় স্থাপত্যের জ্যামিতিক ভিত্তি আলোচিত হয়েছে। শুল্ব শব্দটির অর্থ প্রমাণসূত্র

(বা মাপবার ফিতে)। শুল্বসূত্রের নিদর্শনরূপে খুব বেশি সংখ্যক রচনা আমাদের কাছে পৌঁছয় নি। আমরা মোট সাতটি শুল্বসূত্রের সন্ধান পেয়েছি : বৌধায়ন, কাত্যায়ন, আপস্তম্ব, সত্যাষাঢ়, মানব, বারাহ ও মৈত্রায়ণী। এই গ্রন্থসমূহের বিষয়বস্তু যেহেতু পরিমাপ এবং তৎসংশ্লিষ্ট জ্যামিতি ও গণিত তাই এদের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই। বেদী ও যজ্ঞগৃহের একই ধরনের জ্যামিতিক পরিমাপের জন্য সবগুলি গ্রন্থ একই ধরনের প্রয়োগিক পরিভাষা ব্যবহার করেছে।

সংক্ষেপে কাত্যায়ন ও আপস্তম্ব রচিত দুটি শুল্বসূত্রের আলোচনা করা যায় , অবশিষ্ট রচনাগুলির মধ্যে·বোধায়নের গ্রন্থটি সেই শাখার শ্রৌতসূত্রেরই অনুপূরক গ্রন্থ, শুল্বসূত্রটি প্রকৃতপক্ষে পূর্বোক্ত গ্রন্থের শেষ বা ত্রিশতম প্রশ্নেই পাওয়া যায়। বরাহ ও মানব নামমাত্র ভিন্ন কেননা এদের রচনায় কিছুমাত্র প্রভেদ নেই। এই দুটি রচনাই তিনটি অংশে বিভক্ত ; 'মানবশুল্ব' নামে পরিচিত প্রথম অংশটি পদ্যে রচিত ও চারটি অংশে বিন্যস্ত। 'উত্তরাষ্টক' নামে পরিচিত দ্বিতীয় অংশটি পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত এবং মূলত গদ্যে রচিত—শুধু শেষ খণ্ড পদ্যে রচিত। 'বৈষ্ণব' নামে পরিচিত তৃতীয় অংশে মূলত পদ্যে রচিত ও সাতটি খণ্ডে বিন্যস্ত। এই গ্রন্থগুলিতে পদ্যের প্রাধান্য রচনার অর্বাচীনতার ইঙ্গিত বহন করছে, বিশেষত যখন আমরা স্মরণ করি যে প্রাচীনতর গদ্য রচনাগুলির ভাষ্যকাররা নিজেদের ভাষ্যের সমাপ্তিতে বেশ কিছুসংখ্যক শ্লোক ব্যবহার করেছেন। আশ্বলায়ন ও শুল্বসূত্র মৈত্রায়ণী শাখার অন্তর্গত এবং সত্যাষাঢ় ও আপস্তম্ব শুল্বসূত্র সম্পূর্ণভাবে পরস্পরের অনুরূপ। রচনাগুলি কয়েকটি 'পটল' ও 'খণ্ডে' বিন্যস্ত।

কাত্যায়ন শুল্বসূত্র ছ'টি অধ্যায়ে বিভক্ত একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। এর সূচনায় রয়েছে বৃত্ত সম্পর্কিত প্রয়োগিক নির্দেশ এবং সেই সঙ্গে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দিক নির্ণয়ের পদ্ধতি। বৃত্ত, আয়তক্ষেত্র ও অর্ধবৃত্ত—এই তিনটি ভিন্ন আকৃতিতে তিনটি ভিন্ন অগ্নির জন্য যজ্ঞগৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে বিবিধ জ্যামিতিক অনুপুঙ্খ আলোচিত হয়েছে। পূর্বোক্ত যজ্ঞগৃহগুলির যথাযথ অবস্থান ও পারস্পরিক দূরত্ব পরিমাপ করাই এই গ্রন্থের প্রকৃত বিষয়বস্তু। এর অব্যবহিত পরে বিভিন্ন যজ্ঞ সংশ্লিষ্ট উপকরণ রাখার নির্দেশাবলী বিবৃত হয়েছে।

বিভিন্ন খণ্ডে বিন্যস্ত মোট ছ'টি পটলে গ্রথিত আপস্তম্ব শুল্বসূত্রেরও একই লক্ষ্য। অর্থাৎ যজ্ঞগৃহ ও বেদী নির্মাণ। গ্রন্থের সূচনায় রয়েছে যজ্ঞগৃহ পরিমাপের প্রমাণসূত্রের বর্ণনা এবং পরে কুড়িটি বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে একটি বর্গক্ষেত্রের মধ্যে বৃত্তাকৃতি বস্তু স্থাপনের স্থাপত্য-বিষয়ক সমস্যার জ্যামিতিক সমাধান। অন্তিম অংশগুলিতে সোম, দর্শপূর্ণমাস, সৌত্রামণী, অশ্বমেধ, নিরূঢ়-পশুবন্ধ

প্রভৃতি প্রধান যাগগুলির জন্য প্রয়োজনীয় যজ্ঞবেদী নির্মাণ পদ্ধতি। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত এগারোটি প্রায়োগিক পরিভাষা থেকে কৃষিকার্য ও স্থাপত্য সংশ্লিষ্ট ব্যবহারিক জ্যামিতিবিষয়ক উন্নততর জ্ঞানের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা অবহিত হই। এছাড়া এই গ্রন্থে গণিত ও বীজগণিত সম্পর্কিত জ্ঞানের পরিচয়ও রয়েছে।

প্রত্যাশিতভাবেই শুল্বসূত্রগুলির বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণ হল গণিত শাস্ত্রের উপযোগী যথার্থতা ; তবুও রচনাশৈলীতে ব্যাকরণ গ্রন্থের তুলনায় ঐগুলি কম রহস্যময় ও সংক্ষিপ্ত। কারণ সম্ভবত স্থাপত্য ও যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য প্রায়োগিক নির্দেশ অধিকতর স্পষ্টতা ও প্রাঞ্জলতা দাবি করে এবং এদের কখনো অতিরিক্ত মাত্রার সংক্ষেপিত বা সঙ্কুচিত করে আনা সম্ভব নয়। কাত্যায়ন শুল্বসূত্রের সমাপ্তিতে ভাষ্যকাররা প্রয়োগিক পরিভাষা ও অনুপুঙ্খ সম্পর্কে বেশ কিছুসংখ্যক শ্লোক সংযোজিত করেছেন। এর সম্ভাব্য কারণ এই যে প্রকৃত যজ্ঞানুষ্ঠান বন্ধ বা ধ্বংসোন্মুখ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এইসব পরিভাষা সম্পর্কিত জ্ঞান ক্রমশ ক্ষীণ ও অস্পষ্ট হয়ে পড়ছিল। শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্মসূত্রগুলির সঙ্গে চীনদেশের বিখ্যাত গ্রন্থ 'লি-খি'র প্রবল সাদৃশ্য রয়েছে। এই গ্রন্থেও রণ-নৈতিক, প্রশাসনিক, আনুষ্ঠানিক, সামাজিক ও পারিবারিক আচরণ সম্পর্কে নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ হয়েছে। তবে 'লি-খি'র মত সূত্র সাহিত্য কোনো প্রকৃত অনুষ্ঠানের যথার্থ ইতিহাস প্রণয়ন করে নি, যেহেতু ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ সাহিত্য তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছিল।

কল্পসূত্রে প্রতিফলিত জীবন ও সমাজ

শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্মসূত্রগুলি সম্মিলিতভাবে অন্তত সাত শতাব্দী-ব্যাপ্ত ভারতীয় সমাজের বিপুল চিত্র আমাদের কাছে তুলে ধরেছে—এর মধ্যে ভারতবর্ষের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তের সমাজ ব্যবস্থা প্রতিফলিত হয়েছে। এই বিশাল কালপরিধি-ব্যাপী ও বৃহৎ-ভূখণ্ড-ব্যাপী জীবনধারার পক্ষে সমানভাবে প্রযোজ্য সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেমন কঠিন, অনৈতিহাসিক তেমনি অবৈজ্ঞানিকও। তবে আমরা নিরাপদে একথা বলতে পারি, যে সমাজে ক্ষমতা, প্রভুত্ব ও সামাজিক সম্মান সমাজের নিম্নবর্গীয় জনসাধারণ থেকে অপ্রতিহতভাবে প্রত্যাহার করে সমাজের উচ্চবর্গীয় জনগোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত করা হচ্ছিল—সেই সমাজে সম্পূর্ণত পরস্পরবিচ্ছিন্ন অস্তিত্বরূপে শ্রেণী ও বর্ণসমূহের স্থবিরত্ব প্রাপ্তির দৃঢ় প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। অবশ্য অর্থনৈতিক উপাদান উৎপাদন-সম্পর্কিত প্রয়োগিক কুশলতা ও উৎপাদন সম্পর্কসমূহ এই পর্যায়ে সংঘটিত অধিকাংশ পরিবর্তনের জন্য দায়ী। তবে প্রাথমিক গতি ও সুস্পষ্ট লক্ষ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর আদর্শগত ভিত্তি নিজস্ব পথে ততক্ষণই

অগ্রসর হয় যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো সম্পূর্ণরূপে বিরোধী প্রক্রিয়া এই গতিকে রুদ্ধ, ব্যাহত, বা রূপান্তরিত না করে করে। কল্পসূত্রের পর্যায়ে পৌরাণিক সমাজের উদ্ভবের পক্ষে প্রয়োজনীয় সুদৃঢ় ভিত্তি ক্রমে নির্মিত হয়েছিল ; এই যুগের প্রবণতা শুধুমাত্র পরবর্তী যুগের পূর্বাভাসই দেয় নি, কিছুদূর পর্যন্ত নূতন ধারার সূচনাও করেছিল।

পরিণতির আলোকে বিচার করা বলা যায়, এই যুগে বিভিন্ন বর্ণ ও উপবর্ণের কঠোরভাবে নির্দিষ্ট রূপ সূত্রবদ্ধ হয়েছিল ; সমাজে প্রত্যেকের সুনির্দিষ্ট অমোঘ ও অপরিবর্তনীয় অবস্থান ও উপযুক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য বিবৃত হয়েছিল। যদিও বর্ণের তালিকায় অসবর্ণ বিবাহের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তবু এধরনের অসবর্ণ-বিবাহজাত সন্তানদের নামকরণে কিছু কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলের ইঙ্গিত রয়েছে। মোট একচল্লিশটি বর্ণনামের পরিচয় পাওয়া যায়। এদের মধ্যে যেমন নিম্নোক্ত বৃত্তিমূলক নাম রয়েছে— কর্মকার, ধীবর, মাহিষ্য, মণিকার, নাবিক, রজক, রথকার, সূচিক, শূলিক, সূত, উদ্বন্ধক, বেণুক প্রভৃতি—তেমনি নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত নামও পাওয়া যায়, যেমন মাগধ, বৈদেহক প্রভৃতি।

জীবনের তৃতীয় পর্যায়ে অরণ্যে বানপ্রস্থ-গ্রহণকারী ব্যক্তির জন্য ত্রিশটি ভিন্ন ধরনের জীবনযাপন প্রণালী রয়েছে ঃ ধ্যানের জন্য গৃহীত আসনের বৈচিত্র্য অনুযায়ী দশপ্রকার এবং খাদ্যাভ্যাস অনুযায়ী আরো কুড়িটি পদ্ধতি। খাদ্য-পরিহারজনিত কৃচ্ছ্রসাধনও চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছিল, তাই কেউ কেউ শুধু ধূম, কেউ বা শুধু ফেনা পান করে জীবন নির্বাহ করতেন। স্পষ্টত সমাজ তখন সেইসব সমাজ-বহির্ভূত গোষ্ঠীর সঙ্গে আপোসের চেষ্টা করছিল যাঁরা বহু শতাব্দী ধরে কঠোর তপস্যায় নিরত ছিলেন ; সিন্ধু উপত্যকার জনসাধারণের প্রাগ্‌বৈদিক আগম-ধর্মে এধরনের কঠোর সাধনা প্রচলিত ছিল, আমাদের এই বিশ্বাস যদি ঠিক হয়, তাহলে এই সাধনধারার আয়ুষ্কাল ছিল প্রায় এক হাজার বছর। ব্রাহ্মণধর্মের বৃত্তে এদের অন্তর্ভুক্ত করার একটি পথ ছিল জীবনের শেষ দুটি আশ্রমে ধ্যান ও আত্মোপলব্ধির প্রামাণ্য পদ্ধতিরূপে তাদের স্বীকৃতিদান। অনুরূপভাবে বহু শতাব্দী ধরে চতুর্বর্ণের অন্তর্গত জনসাধারণ মোটামুটি ইচ্ছামত অসবর্ণ বিবাহ করছিল ; প্রাচীনতর বৈদিক যুগের চতুর্বর্ণকেই শুধু সমাজ যদি স্বীকৃতি দিত তাহলে সমাজের একটি বিপুল অংশ বৃত্ত-বহির্ভূত হয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল। তাই এইযুগে বহু প্রতিবাদী ধর্মীয় গোষ্ঠীর দ্বারা রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও তৎসংশ্লিষ্ট বর্ণগত ভেদ ও নিষেধ যখন প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হল তখন নবোদ্ভূত উপবর্ণগুলিকে সামাজিক গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠল। আগামী বহু শতাব্দীর জন্য ধর্মসূত্রগুলি সামাজিক সংহতি সাধনের এই কর্তব্য সফলভাবে সমাধা করেছিল।

সামাজিক মূল্যবোধ কিভাবে বিবর্তিত ও পরিবর্তিত হয়েছিল তা আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখেছি ; তবে সবচেয়ে লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা গেল শূদ্র ও নারীর ক্ষেত্রে, কেননা এই উভয়েই সামাজিক মানদণ্ডে নিম্নস্তরে অবনমিত হয়েছিল। শূদ্রদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য তাদের অবনমনকে আরো প্রকট করে তুলেছিল, এরা খেতমজুর, ধাতুশিল্পী, কুম্ভকার ও গৃহভৃত্যরূপে কাজ করত ঃ এদের সামাজিক অধিকার ছিল খুবই নগণ্য ; জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় বৃত্তিই মাত্র এরা পেত এবং নিপীড়ন থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল সামান্যই। শূদ্রের একমাত্র ধর্ম ছিল উচ্চতর তিন বর্ণের সেবা। তার জন্য কোনো অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট ছিল না এবং আনুষ্ঠানিক ও ধর্মগতভাবে শূদ্র আর্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে অপরের দয়ার উপর নির্ভরশীল হয়েই বাস করত। এমনকি সাক্ষাতের পর শূদ্রের প্রতি কোনো ধরনের অভিবাদনের বিধান নেই। বণিক ও ব্যবসায়ীদের লালসার স্বাভাবিক পরিণতিরূপে নির্বিচারে শোষণ বর্তমান ছিল এবং কর্মবিমুখ ভৃত্য বা দাসের জন্য নিষ্ঠুর ব্যবস্থার মধ্যে গৃহভৃত্য এবং দাস-শ্রেণীর সামাজিক অবস্থান সুস্পষ্ট। এটা খুবই বিস্ময়ের যে, শূদ্রেরা উচ্চতর বর্ণগুলির জন্য রান্না করতে পারত কিন্তু প্রকাশ্যে তা উল্লেখ করতে পারত না কিংবা অন্নগ্রহণের জন্য তাদের আহ্বানও করতে পারত না।

পাণিনি জানিয়েছেন যে গৃহভৃত্য, দ্বাররক্ষী, বারিবাহক প্রভৃতি অন্নবস্ত্রর বিনিময়েই নিযুক্ত হত ; যদি বা সামান্য মজুরি তারা লাভ করত, তা তাদের শ্রমের পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত না হয়ে জীবনযাত্রার নিম্নমান অনুযায়ী নির্ণীত হত। এভাবে সমাজের দরিদ্রতর ও অধিকতর নিঃসম্বল অংশের শ্রমশক্তির শোষণ ছিল স্বীকৃত সত্য। সমাজের মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল। যদিও সোমযাগ ছিল সবচেয়ে ব্যয়-বহুল, তবুও এযুগে প্রায়ই তা অনুষ্ঠিত হত ; কেননা আত্মিক ও পার্থিব পুণ্যলাভের প্রতিশ্রুতি ছাড়াও সোমযাগ অনুষ্ঠান সামাজিক প্রতিপত্তির প্রতীক হয়ে উঠেছিল। সোম অবশ্য ততদিনে দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে ; তাই গৌতম ধর্মসূত্রের দ্বিতীয় খণ্ডে সোমের অনেকগুলি বিকল্পের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে—অবশ্য এদের মধ্যে একটিও উত্তেজক পানীয় নয়, ফলে স্বভাবতই সোমযাগ ক্রমশ নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

কৃষি-ভিত্তিক সমাজে তিনটি উচ্চতর বর্ণের নারী যেহেতু প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না তাই স্বভাবতই তাদের স্থান গৃহে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ত—যেখানে তারা কোনো স্বীকৃত অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন করতেন না। এছাড়া নারীর সামাজিক অবনমনের অন্যান্য হেতুও ছিল ; যেমন, মূলগতভাবে পিতৃতান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য সমাজে অনার্যগোষ্ঠীভুক্ত পত্নীরা নির্দিষ্ট কিছু কিছু সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে

যোগদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হতেন। তাছাড়া পৃথিবীর সর্বত্র সামন্ততান্ত্রিক সমাজভুক্ত নারী সামাজিকভাবে হীনতর বলে বিবেচিত হত। গর্ভবতী নারী যেন পুত্র সন্তানের জননী হবে এই উদ্দেশ্যে প্রসূতির সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিহিত থাকার মধ্যে পূর্বোক্ত তথ্য প্রতিফলিত। পুংসবন নামক বিশেষ অনুষ্ঠানে পুত্র-সন্তান-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হলেও কন্যা সন্তানের জন্য কোনো অনুষ্ঠান পরিকল্পিত হয় নি। কিছু কিছু অনুষ্ঠানে যদিও পুত্রের সঙ্গে কন্যাও উদ্দিষ্ট হয়েছে, তবু কন্যা—সংশিল্ট অনুষ্ঠানে কোনো মন্ত্রের ব্যবহার না হওয়াটা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। যজ্ঞে পত্নী যদিও স্বামীর পাশে উপবেশন করতেন, সেখানে তাঁর ভূমিকা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ও নির্বাক পুত্তলিকার মত ; কখনো কখনো যজ্ঞকর্মে স্বামীর সহায়তা করলেও মন্ত্র উচ্চারণ করার কোনো অধিকার তাঁর ছিল না। অনিচ্ছুক পত্নীকে তাড়না করার নির্দেশ যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমনি প্রয়োজনবোধে তাকে প্রহার করে যৌন সংসর্গে বাধ্য করাও হত। বিশ্বাসঘাতিনী সন্দেহে পত্নীকে বলপ্রয়োগে অপমানিত করে অমানুষিক ও ঘৃণ্য নিষ্ঠুরতার সঙ্গে শাস্তি বিধান করা হত। যদিও বলা হয়েছে যে এরূপ নারীকে উপভোগ করার পক্ষে কোনো বাধা নেই। পাণিনি যদিও ভল্ল ও বর্শাধারিণী নারীর উল্লেখ করেছেন তবু সাধারণভাবে নারী সমাজে হীন ছিল ও পুরুষের দ্বারা নিপীড়িত হত। বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্বেই বিবাহ অনুষ্ঠান ক্রমশ অধিকতর মাত্রায় প্রথারূপে গৃহীত হচ্ছিল। উচ্চতর তিন বর্ণের দরিদ্র পিতা যৌতুকের উপকরণগুলি কোনো শূদ্রের নিকট থেকে জোর করে কেড়ে নিতে পারতেন। এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসে নারী ধীরে ধীরে অধিকতর অবনমিত হয়ে অস্থাবর সম্পত্তি বা দ্রব্যমাত্রে পরিণত হচ্ছিল। কন্যাপণের পরিবর্তে যৌতুকদান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল—বধূকে পরিবারের কাছেই সম্প্রদান করা হত। কিছু কিছু নিয়মে অবশ্য মানবিক চিন্তার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায় : 'সমস্ত বর্ণের পুরুষের কর্তব্য—সম্পত্তি অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান বিবেচনায় পত্নীকে রক্ষা করা'। (বৌধায়ন ধর্মসূত্র ২ : ৪২) ; কিন্তু এখানেও নারী পুরুষের সম্পত্তি। আবার অন্যদিকে দেখি বন্ধ্যা বা কন্যা-সন্তানের জননী বা মৃতবৎসা পত্নীকে স্বামী পরিত্যাগ করতে পারত। তাছাড়া শূদ্রের পত্নীকে অন্য তিন বর্ণের পুরুষেরা যথেচ্ছ ভোগ করতে পারত। (আপস্তম্ব ধর্মসূত্র, ২ : ১০ : ২৭ : ১০) পুত্রের উপর শুধু পিতারই অধিকার ছিল, মাতার নয়। অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলিতে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা ক্রমশ বর্ধিত হওয়ার ফলে জীবনযাত্রার বিশেষ কোনো উন্নতি বা বৈচিত্র্য দেখা যায় নি। পুরোহিতরা সমাজের প্রহরীরূপে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছিলেন—সামাজিক ও ধর্মীয় আচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অসংখ্য নিয়মগুলির মধ্যে কোনো গৌণ নিয়মও কোথাও

ভঙ্গ হচ্ছে কিনা, যাতে সেই অনুযায়ী যথাযথ প্রায়শ্চিত্তমূলক নিয়ম ও অনুষ্ঠানের নির্দেশ দিতে পারেন। স্পষ্টত সামাজিকভাবে সর্বাধিক অসহায় শূদ্র ও নারীরা এই প্রক্রিয়ায় বিধ্বস্ত হতেন। নারীর আচরণ বিষমানুপাতিকভাবে সমাজপতিদের কঠোর মনোযোগ আকর্ষণ করত ও সামান্যতম যৌন স্খলনেও তাকে নির্মমভাবে শাস্তি প্রদান করা হত। প্রাচীন ইহুদীদের মধ্যেও কুমারীত্ব ও সতীত্বের উপর অনুরূপ গুরুত্বদানের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ভারতবর্ষে পুরুষের ত্রুটিকে খুব সামান্যই কলঙ্করূপে বিবেচনা করা হয়েছে ; সাধারণত পূর্বোক্ত দুটি নৈতিক আদর্শের জন্য শুধুমাত্র নারীই নিপীড়িত হয়েছে।

কল্পসূত্রে প্রতিফলিত ধর্ম ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে অনুসৃত ধর্ম অপেক্ষা মূলগতভাবে ভিন্ন নয়। দেব-সঙ্ঘে নবাগত দেবতারা পৌরাণিক ধর্মের পূর্বসূরী। প্রেততত্ত্ব এই পর্যায়ে স্পষ্টতরভাবে প্রচারিত হয়েছে কেননা পুনর্জন্ম ও কর্মবাদ ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত তথ্যে পরিণত হয়ে একটি দৃঢ় ও যুক্তিনিষ্ঠ ভিত্তিতে স্থাপিত হয়েছে। অধ্যাত্মবিদ্যায় নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন পূর্বানুমান স্বীকৃতি লাভ করেছে যেহেতু বিচিত্র ধরনের চিন্তাধারা এই পর্যায়ে স্পষ্টভাবে বিকশিত। নিরীশ্বরবাদ এ যুগে বিভ্রান্ত ও বিপথচালিত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর অভিমত বা দর্শনরূপে অভিহিত হয়েছে ; এমন কি অগ্নিপরীক্ষার মাধ্যমে বিচারও নাস্তিকের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। প্রতীক উপাসনা, প্রতিমা ও মন্দিরের অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া গেছে এবং পিতৃ-উপাসনা ক্রমশ প্রভূত গুরুত্ব লাভ করেছে। সূত্রসাহিত্যের একটি নূতন গ্রন্থ রচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞানুষ্ঠানের সংখ্যা বহুগুণ বর্ধিত হওয়ার ফলে বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ায় দেখা দিল আতিশয্য ও প্রতিরোধ। প্রতিমাপূজা যে ইতোমধ্যে প্রচলিত হয়ে পড়েছে, তা পাণিনির একটি নিয়মে প্রতিফলিত ; ঐ নিয়মে প্রতিমা নির্মাণ ততক্ষণ পর্যন্ত অনুমোদিত হয়েছে যতক্ষণ সেটি বিক্রয়ের দ্রব্য হিসাবে বিবেচিত না হচ্ছে। অর্থাৎ ভাস্কর্যজাত বস্তুর মধ্যে প্রতিমাও বাণিজ্যের উপাদান ছিল।

ধর্মসূত্র সাহিত্যের বিষয়বস্তুকে স্থূলভাবে মোট চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ— (ক) চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের জন্য পালনীয় আচার ; (খ) আচারবিধি ভঙ্গ করার প্রায়শ্চিত্ত, (গ) দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনের মামলা (ব্যবহার), (ঘ) রাজধর্ম। সম্মিলিতভাবে এগুলি কোনো ব্যক্তির সামাজিক জীবনের প্রায় অসম্পূর্ণ পরিধিকে স্পর্শ করে ; এর পেছনে এই সংস্কারও সক্রিয় যে বৈদিক সাহিত্য বা 'শ্রুতি' অর্থাৎ দৈব প্রেরণাজাত সাহিত্যে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। অবশ্য প্রকৃতপক্ষে কল্পসূত্রের সমাজ, এমন কি, বৈদিক যুগের শেষ পর্যায় থেকেও স্পষ্টত বহু দূরে সরে এসেছে। সামাজিক সংগঠনে অনেক বেশি মাত্রায় জটিলতা

সৃষ্টি হওয়ার ফলে বিচিত্র ধরনের বিধি, উপবিধি, ব্যতিক্রম ও প্রায়শ্চিত্তের অদ্ভুত সহাবস্থান দেখা দিল। এটা যেহেতু নিয়ত প্রসারণশীল বিষয়, পরবর্তী স্মৃতিযুগে তাই আমরা ধর্মশাস্ত্রের অন্তত কুড়িজন লেখকের নাম জানতে পারি। প্রাচীনতম উপনিষদ্ ও নবীনতম সূত্রগুলির মধ্যে সময়ের ব্যধান এক সহস্রাব্দ ; এই যুগে সাহিত্যিক মানের পীড়াদায়ক অবনমন প্রকট হয়ে উঠেছে। ধর্মও সাহিত্যকে অনুপ্রেরণা দিতে পারে নি, যেহেতু ইতোমধ্যে তা নিতান্ত শূন্যগর্ভ নির্মোকে পরিণত।

কল্পসূত্রে আমরা দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তিকে সক্রিয় দেখি—ব্যাপক অর্থে মানবতাবাদ কিছু কিছু সামাজিক বিবিধ মৌলিক বৈশিষ্ট্য, যেগুলির মধ্যে সমন্বয়ী প্রবণতা নিহিত এবং যা সর্বদাই সমাজের দ্বিতীয় মৌল শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় ; এই দ্বিতীয় মৌল শক্তি হল, সংকীর্ণ সম্প্রদায়কেন্দ্রিক রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি যা প্রায় সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মণ ও বিত্তবানদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, পুরুষতান্ত্রিক ও বর্ণবিভক্ত সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এই দুটি শক্তির আততি ও সংঘর্ষের ফলেই কল্পসূত্রগুলি উদ্ভূত হয়েছিল এবং এই দুটি ধারার স্পষ্ট নিদর্শন সূত্রগুলির মধ্যে নিহিত রয়েছে। অর্বাচীনতর উপনিষদ্গুলি রচিত হওয়ার সময়ে বিভিন্ন কৌম ও গোষ্ঠীর খণ্ডিত হওয়ার প্রক্রিয়া সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল ; এরপরেই আমরা অসংখ্য বর্ণ ও উপবর্ণের উদ্ভব লক্ষ্য করি—প্রাগার্য সামাজিক সংগঠন আর্যদের দ্বারা জাতিগত, সংস্কৃতিগত, ও বৃত্তিগতভাবে আত্মীকৃত হওয়ার ফলে এটা ঘটেছিল। পরবর্তীকালে অর্থাৎ সূত্র-সাহিত্যের যুগে বর্ণগুলি এতটা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও কঠোর শ্রেণীভেদ অনুযায়ী বিন্যস্ত হয়েছিল যে বর্ণভেদ যেকোনো ধরনের সামাজিক প্রগতির পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছিল। বিশেষত অর্বাচীনতর ধর্মসূত্র-সাহিত্য এই নৈরাশ্যজনক চিত্রই তুলে ধরেছে।

সূত্রযুগের সমাজ সার্বিক পশ্চাদগতির এক বিষণ্ণ চিত্র উপস্থাপিত করেছে, যখন দেশের সীমান্ত-বহির্ভূত অঞ্চলসমূহের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল এবং আত্মসংবৃত ও আত্মসন্তুষ্ট গ্রামীন জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন নগর ও দেশের অবশিষ্ট অংশের বহিঃপৃথিবীর সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্বন্ধ সম্পূর্ণ রহিত হয়ে সমাজ ক্রমশ স্থবির হয়ে পড়েছিল। নৌ-বাণিজ্যকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছিল ; যা কিছু অন্তর্বাণিজ্য অবশিষ্ট ছিল তা শুধুমাত্র নগরগুলির উপর তাৎক্ষণিক প্রভাব বিস্তার করছিল। এছাড়া আমরা পদার্থবিজ্ঞানের উন্নতি সম্পর্কেও আগ্রহের অভাব লক্ষ্য করি—যদিও একমাত্র বিজ্ঞানচর্চাই সে যুগের মানসিক অবসাদ দূর করতে পারত। সমালোচকরা লক্ষ করেছেন যে ভারতীয়দের মত গ্রিকরাও নিরীক্ষা-নির্ভর বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনে ব্যর্থ হয়েছিল কেননা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী

দার্শনিকরা ভদ্রলোক এবং ভদ্র-ব্যক্তি কখনও কায়িক শ্রম করেন না। যেসব ব্যাপক যুদ্ধবিগ্রহ পরোক্ষভাবে বহির্জগতের সঙ্গে গ্রামগুলির সম্পর্কে যে সমাজিক নিষেধ জারি হয়েছিল তার ফলেও গ্রামবাসীরা বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এমন একটি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে পড়ল যা মনের স্বাভাবিক ও সুস্থ বৃদ্ধির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ধর্মসূত্রের বিভিন্ন বিধি-নিষেধের মধ্যে এর পরিণতি সবচেয়ে স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত। এই রচনাগুলি বিভিন্ন বর্ণ ও আশ্রমের কর্তব্য সম্পর্কিত ক্রমবর্ধমান অনাবশ্যক অনুপুঙ্খে পরিপূর্ণ এবং ব্যক্তির আত্মিক উন্নতির প্রতি তা খুবই সামান্য মনোযোগ দিয়েছে। বস্তুত, সমাজে মানুষের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে তীক্ষ্ণ সচেতনতা-বৃদ্ধিতে তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। খাদ্যগ্রহণ সম্পর্কে অসংখ্য বিধিনিষেধ এবং আনুষ্ঠানিক পরিচ্ছন্নতা, শুদ্ধতা, অন্ত্যেষ্টি-বিষয়ক অনুষ্ঠান ও প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে অসংখ্য বিধানের উদ্ভাবন দীর্ঘকাল ধরে আধ্যাত্মিক জীবনীশক্তির ক্রমাগত ক্ষয়ই প্রতিফলিত করেছে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং তার সমৃদ্ধ ও সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় বহুবিধ শিল্প ও বিজ্ঞানের চর্চার ফলে যদিও সাংস্কৃতিক পরিশীলনের সূত্রপাত হয়েছিল, তবুও তা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সংকুচিত পরিসরে বন্দী ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র গ্রামীণ সমাজের নিষ্প্রাণ গতানুগতিকতা দূর করার জন্য বিশেষ কোনো ভূমিকা নিতে পারে নি। বস্তুত, তৎকালীন সমাজের বিপুল অংশের পক্ষে বাস্তব পরিস্থিতি ছিল নিতান্ত নির্মম। নগরগুলিতে পরিশীলিত সংস্কৃতির বিকাশ হলেও দেশে অসংখ্য মানসিক কুহেলিকা, সংস্কারসর্বস্বতা, ব্যক্তিত্বহীনতা ও তন্দ্রাচ্ছন্নতার অবগুণ্ঠন নেমে আসে ; যেখানে একমাত্র বর্ণভেদ ও চতুরাশ্রমই ছিল চূড়ান্ত সত্য।

পৃথক বৈশিষ্ট্যের অভাবে গ্রামগুলির মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় ; তাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ, আত্মসংবৃত বিচ্ছিন্ন অর্থনীতিতে মুদ্রার প্রায় কোনো ভূমিকাই ছিল না। নিষ্ক্রিয়তা ও স্থবিরতা আধ্যাত্মিক নিষ্প্রাণতার জন্ম দিয়েছিল—সার্থকভাবে কাল অতিবাহন সম্পর্কে কোনো চেতনাও গড়ে ওঠে নি। এমন কি গ্রামবাসীর মধ্যেও বর্ণগত ভেদের ফলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল—এরা স্বভাবত এত আত্মতৃপ্তি ছিল যে অসংখ্য প্রজন্ম ধরে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতায় জীবনযাপন করতে তাদের পক্ষে কোনো বাধা সৃষ্টি হয় নি। সাহিত্যে প্রকৃত সৃজনশীলতার পক্ষে যেসব বৃদ্ধি, সংঘাত, টানাপোড়েন ও আদর্শগত দ্বন্দ্ব আবশ্যক—সেসব সর্বব্যাপী আত্মিক তুচ্ছতার মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। ইতোমধ্যে সৃজনশীল শক্তিরূপে বৈদিক ধর্মের প্রেরণা ধীরে ধীরে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। তাই কল্পসূত্রগুলির মধ্যে আমরা একটি বন্ধ্যা, প্রেরণাহীন তুচ্ছ- প্রয়োজন-কেন্দ্রিক ও যুক্তিহীন মতবাদনিষ্ঠ সাহিত্যরূপের সঙ্গে পরিচিত হই।

ধর্মসূত্রগুলির মধ্যে আমরা এমন ধরনের সামাজিক আচার-বিধির পরিচয় পাই যা বহুপূর্বে তার ঐতিহাসিক প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলে সমাজের উপর জগদ্দল ভারের সৃষ্টি করেছিল। বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম ও অন্যান্য প্রতিবাদী সন্ন্যাস-নির্ভর ধর্ম-আন্দোলনগুলি বৈদিক ধর্মের ভিত্তিমূলক সপ্রশ্ন প্রত্যাহ্বান জানোনোর ফলে ব্রাহ্মণ্য যজ্ঞধর্মের যান্ত্রিক ধারাবাহিকতা কালধর্ম-বিরুদ্ধ ও অবাস্তব হয়ে পড়েছিল। এতে বৈদিক যজ্ঞকেন্দ্রিক প্রাচীন ধর্মীয় উন্মাদনার ধর্মগত জীবনশক্তির পুনরুত্থানের কোনো ইঙ্গিত আমরা পাই না, বরং এমন একটি আধ্যাত্মিক অবসাদের লক্ষণ দেখি যা পরিবর্তনশীল সামাজিক বাস্তবতার প্রত্যাহ্বান-সমূহের সম্মুখীন হতে অস্বীকার করেছিল।

বৈদিক সাহিত্যের পরিধির মধ্যে সংহিতা থেকে সূত্র-সাহিত্য পর্যন্ত বিধৃত, অর্থাৎ খ্রীস্টপূর্ব দ্বাদশ শতক থেকে খ্রীস্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার বছরে বেদকেন্দ্রিক যে-সাহিত্য রচিত হয়েছিল তার ইতিহাস। এ-সাহিত্যের প্রথম পর্যায়ে, বহু-দেবতার উদ্দেশে রচিত স্তব, প্রার্থনা যেমন আছে, তেমনি আছে সমাজজীবনের নানা গৌণ চিত্র ও কিছু অধ্যাত্মবিষয়ক রচনাও।

পরবর্তী ব্রাহ্মণসাহিত্যে যজ্ঞের প্রণালী, উপযোগিতা, পুরোহিতের ভূমিকা ও দক্ষিণা সম্বন্ধে নির্দেশ এবং তৎসংশ্লিষ্ট কিছু আখ্যায়িকাও আছে। তার পরে কর্মকাণ্ড অর্থাৎ যজ্ঞকর্ম ও যজ্ঞতত্ত্ব অনেকটা গৌণ, রূপকায়িত আকারে দেখা দেয় আরণ্যকসাহিত্যে, যার পূর্ণ পরিণতি উপনিষদে। এদুটিকে জ্ঞানকাণ্ড বলে।

এই গ্রন্থে বেদকে তার আর্থসামাজিক পরিবেশের মধ্যে রেখে বিচার করার চেষ্টা রয়েছে। বেদ লিখিত রচনা নয়, কথ্য ও শ্রৌত রচনা, ফলে লিখিত রচনা থেকে তার প্রকৃতি ও উপাদান কতকটা ভিন্ন। পরিশেষে, বৈদিক সাহিত্য যে শুধু ধর্মগ্রন্থই নয়, সাহিত্যও বটে, এই কথাটি স্মরণে রেখে যথাসম্ভব এর সাহিত্যিক মূল্যায়নেরও প্রয়াস আছে এ গ্রন্থে।

লেখিকা একাদিক্রমে আঠাশ বছর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপিকা ছিলেন। বহু জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের রচয়িতা। বর্তমানে এশিয়াটিক সোসাইটির সিনিয়র রিসার্চ ফেলোরূপে গবেষণা গ্রন্থ রচনায় নিযুক্ত।

একশো চল্লিশ টাকা